লিও তলস্তয়

শৈশব

কৈশোর

যৌবন

কে গাঙ্গুলী অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
৮বি লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১

॥ প্রথম বাংলা সংস্করণ ॥

আশ্বিন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৯ শকাব্দ)

॥ প্রকাশক ॥

শ্রীক্ষেত্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়

কে গাঙ্গুলী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

॥ মুদ্রাকর ॥

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

॥ অনুবাদিকা ॥

সাবিত্রী ঘোষাল

॥ প্রচ্ছদপট ॥

শ্রীশংকর দাশগুপ্ত (এসডিজি)

॥ প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ ॥

ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

॥ গ্রন্থক ॥

নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দাম পাঁচ টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

সূচীপত্র

শৈশব

কৈশোর

যৌবন

শৈশব

প্রথম অধ্যায়

আমাদের শিক্ষক কার্ল ইভানিচ্

সেবার আঠার শ—সালের ১২ই আগস্ট আমার দশ বছর পুরল, কি চমৎকার সব উপহার যে পেলাম সেবার! ঠিক তার তৃতীয় দিনে ১২ই আগস্টের ভোর সাতটায় কার্ল ইভানিচ্ হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন—লাঠির ডগায় একটুকরো চিনি-মাখানো কাগজ সেঁটে একটা মাছির ওপর ঝাপটা মারলেন একেবারে ঠিক আমার মাথার ওপরে। তাও আবার মারলেন এমনি অসাবধানে যে বিছানার মাথার দিকে ওক কাঠের তাকের ওপর ছোট্ট যে দেবদূতের মূর্তিটি ছিল সেটাতে গেল জড়িয়ে, আর ব্যস্, মরা মাছিটা টুপ করে সোজা এসে পড়ল একেবারে আমার মাথার ওপর। চাদরের তলা থেকে উঁকি মেরে চাইলাম, মূর্তিটি তখনও অল্প অল্প নড়ছিল, হাত বাড়িয়ে সোজা করে দিয়ে মরা মাছিটাকে ঝেড়ে মাটিতে ফেলে দিলাম—তারপর ঘুম-জড়ানো চোখে কটমট করে তাকালাম কার্ল ইভানিচের দিকে। ওঁর অবশ্য কোন ভ্রূক্ষেপই নেই···নানা রঙে রঙীন নরম কাপড়ের একটা ঢিলেঢালা ড্রেসিং-গাউন সেই কাপড়েরই একটা কোমরবন্ধ, লাল রঙের হাতে বোনা আঁটসাঁট ছোট্ট একটা টুপি মাথায় ঝুলছে তাতে একটা টাস্‌ল, নরম ভেড়ার চামড়ার জুতো পায়ে, কার্ল ইভানিচ্ দেয়ালের ধারে ধারে মাছি মেরেই বেড়াতে থাক্‌লেন।

"আমি না হয় ছোটই আছি, তাই বলেই উনি আমাকে এমনিভাবে বিরক্ত করবেন?"—আমি ভাবলাম। "কেন, উনি ভলোদিয়ার বিছানার চারধারে মাছি মেরে বেড়ান না! ওদিকে তো একদম ভর্তি। না তা হবে না, ভলোদিয়া আমার চাইতে বড়, আমি কিনা সব চাইতে ছোট্ট—তাই আমাকেই খালি এমনি বিরক্ত করা! ওঃ আমার পেছনে লাগা ছাড়া যেন আর কোন কাজ নেই ওঁর!—মনে মনে বিড়বিড় করি। খুব ভাল করেই জানেন

উনি যে আমাকে হঠাৎ জাগিয়েই ভয় পাইয়ে দিয়েছেন কিন্তু ভাবখানা এমনি যেন কিছু বুঝতেই পারেন নি, নজরেই আসেনি—কি ভয়ানক বিচ্ছিরী লোক একটি সত্যি ! আর ওঁর ওই বিদ্‌ঘুটে পোশাকটা, টুপি আর টাস্‌লটা—জঘন্য, একেবারে জঘন্য !

কার্ল ইভানিচের ওপর বিরক্তিটা নিয়ে নিজের মনে মনেই এভাবে তোলা-পাড়া করছিলাম—কার্ল ইভানিচ্ ততক্ষণে ঘুরতে ঘুরতে নিজের বিছানার কাছে পৌঁছেছেন, এক চমক তাকিয়ে দেখলেন, দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে, তারপর মাছি-মারা লাঠিটা একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে বেশ খুশি খুশিভাবেই তাকালেন আমাদের দিকে।

"কি খোকন, ঘুমোচ্ছ নাকি ? ওঠ, ওঠ, কত বেলা হল।" কোমল স্বরে জার্মান ভাষায় কার্ল ইভানিচ্ আমাকে ডাকলেন।* এবারে আমার বিছানায় পায়ের কাছে এসে বসে পকেট থেকে ছোট্ট নস্যির ডিবেটি বার করেন। ভান করলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। কার্ল ইভানিচ্ প্রথমে এক টিপ নস্যি নিলেন, নাকটা মুছলেন, আঙুল মটকালেন তারপর মনোযোগ দিলেন আমার দিকে। পায়ের গোড়ালিতে সুড়সুড়ি দিতে দিতে হাস্‌তে হাস্‌তে বলতে লাগলেন, "এইবার, কুড়ে কোথাকার, এইবার ?"

সুড়সুড়িকে আমার কি যে ভয়—তবুও আমি দাঁতমুখ খিঁচে থাক্‌লাম, বিছনা থেকে লাফিয়েও উঠলাম না, কোন জবাবও দিলাম না ; সোজা বালিশে মাথা গুঁজে প্রাণপণে দুপায়ে লাথি মারতে থাকি, চেষ্টা করি যেন কিছুতেই হেসে না ফেলি। "সত্যি কি ভাল উনি, আমাদের কি ভালই বাসেন, আর ওঁর সম্বন্ধে কি বিচ্ছিরিই সব না ভাবছিলাম আমি !"

বিষম বিরক্তি ধরে যায় : নিজের ওপরেও, কার্ল ইভানিচের ওপরেও। হাসিও আসছে, আবার কান্নাও পাচ্ছে। গোটা শরীরেই যেন স্নায়ুগুলো সব বিকল হয়ে গেছে !

"আঃ, কার্ল ইভানিচ্—ছাড়ুন, ছাড়ুন—বলছি—", বালিশের তলা থেকে এক ঝট্‌কা মেরে মাথাটাকে বাইরে এনে সজল চোখে বলে উঠলাম। কার্ল ইভানিচ্ তো একেবারে অবাক্ ; সুড়সুড়ি দেওয়া ছেড়ে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন কি হল ? আমার কি হয়েছে : কোন খারাপ স্বপ্ন

* কার্ল ইভানিচ্ সাধারণত জার্মান ভাষাতেই কথা বলেন।

দেখেছি কি? কার্ল ইভানিচের মমতাভরা জার্মান মুখশ্রী, আর কি যে ব্যাকুলতা, কি যে আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমার কান্নার কারণ বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—এতে যেন আমার অশ্রুর ফোয়ারা একেবারে খুলে গেল! আমার ভীষণ লজ্জা হল; ভাবতেই পারলাম না কি করে এই আগের মুহূর্তেই কার্ল ইভনিচ্‌কে মনে মনে ঘৃণা করছিলুম, ওর ড্রেসিং-গাউন, টুপি আর টাস্‌ল দেখে বিরক্তির আর অন্ত ছিল না, আবার এখনই এই মুহূর্তে সবগুলোকেই ভাল লাগছে, ভীষণ ভাল—ঐ যে টাস্‌ল, ওটা পর্যন্ত যেন ওঁর সুন্দর মনেরই পরিচয় দিচ্ছে! তাড়াতাড়ি জানালাম, ভারি খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি—মা যেন মারা গেছেন, সবাই যেন নিয়ে যাচ্ছে মাকে কবর দিতে। সবটাই বানিয়ে বললাম—আসলে আমার কিচ্ছু জানা ছিল না সে রাতে কি স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু আমার এই মিথ্যে স্বপ্নের কথা শুনেই কার্ল ইভানিচ্‌ একেবারে গলে গেলেন, আকুল হয়ে বারবার নানাভাবে আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন—আমারও তখন মনে হল যেন কিছু মিথ্যে না, সব সত্যি, ঐ দুঃখের স্বপ্নটা যেন সত্যি সত্যিই আমি দেখেছি। আবার আমার চোখের জল ঝরতে শুরু করল, কিন্তু এবার সেটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

কার্ল ইভানিচ্‌ উঠে চলে যেতে, আমিও উঠে বসে ছোট ছোট পায়ে মোজা পরতে লাগলাম। এখন আমার কান্না প্রায় থেমেছে কিন্তু তবুও ঐ মিথ্যে স্বপ্নটার দুঃখের রেশ যেন সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি। নিকোলাই এল। নিকোলাই ছেলেদের চাকর—চমৎকার চট্‌পটে, ছোটখাট পরিচ্ছন্ন মানুষ—গম্ভীর, স্বল্পভাষী, বিনয়ী, কার্ল ইভানিচের বিশেষ বন্ধু। আমাদের পোশাক আর জুতো নিয়ে এসেছে। ভলোদিয়ার বুট আছে কিন্তু আমার কপালে এখনও সেই ফিতেবাঁধা জুতো। অসহ্য! নিকোলাই পাছে কান্না দেখে ফেলে, তাই লজ্জা পেলাম। ওদিকে বাইরে ভোরের সূর্য চারদিকে আলো ঝরাচ্ছে, জানালা দিয়ে ঘরে উঁকি মারছে সে আলো খুশিতে চঞ্চল—ভলোদিয়া হাতমুখ ধোবার বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মেরিয়া আইভনোভ্‌নাকে (আমার বোনেদের গভর্নেস) নকল করে এমনি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে যে অত যে গম্ভীর নিকোলাই এক হাতে শাসন, আরেক হাতে তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছে সে পর্যন্ত হেসে ফেলে বলল, "ব্যস্‌, ব্যস্‌, ভ্লাদিমির পেট্রোভিচ্‌, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়, এবার হাতমুখ ধুয়ে ফেল।" আমার মনেও আনন্দের ছোঁয়াচ লাগল।

"তোমাদের কি সব হল ?" পড়ার ঘর থেকে কার্ল ইভানিচের গলার স্বর ভেসে এল।

এবার তার স্বর রুক্ষ, সেই মিষ্টি ভাবটা আর নেই—মা আমার চোখে জল এনে দিয়েছিল। পড়ার ঘরে কার্ল ইভানিচের চেহারা একেবারেই আলাদা—সেখানে তিনি আর কিছু নন কেবল শিক্ষক। আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম, হাত মুখ ধুয়ে ভিজে চুল আচড়াতে আচড়াতে পড়ার ঘরে এসে ঢুকলাম।

দরজা আর জানালার মাঝামাঝি তাঁর অভ্যস্ত জায়গায় যথারীতি বসে আছেন কার্ল ইভানিচ্, চোখে চশমা, হাতে একখানা বই। দরজার বাঁদিকে দুটি বইয়ের সেল্ফ। একটি আমাদের—ছেলেদের ; অন্যটি কার্ল ইভানিচের নিজস্ব সম্পত্তি। আমাদেরটিতে বই স্তূপাকার, সব রকমের, স্কুলের বই, এমনি নানা বই। কোনটা সোজা দাঁড়িয়ে আছে, কোনটা মুখ থুবড়ে প'ড়ে। 'হিস্টয়রে দেস ভয়েজেস'-এর লাল মলাটে বাঁধাই দুটি খণ্ড কেবল দেয়ালের গায়ে সোজা দাঁড়িয়ে, তারপর একটা বইয়ের অরণ্য—লম্বা, বেঁটে, সরু, মোটা বই ছাড়া শুধু মলাট আর মলাট-ছেঁড়া বইয়ের জটলা। খেলতে যাবার আগে কার্ল ইভানিচ্ যখন আমাদের লাইব্রেরী গুছোতে বলতেন—ঐ সেল্ফটাকেই উনি লাইব্রেরী বলতেন—তখন আমরা ওমনি অগোছালো করে স্তূপ করে জড় করে রাখতাম সব বইখাতা। কার্ল ইভানিচের নিজস্ব সেলফ্‌টা, আমাদের চাইতে একটু ছোট, সেটিতেও হরেক রকমের বই। তিনটির কথা আমার মনে পড়ে—একটি জার্মান পুস্তিকা বাঁধাকপির বাগান-করা সম্বন্ধে, মলাট ছেঁড়া ; "হিস্ট্রী অফ্ সেভেন ইয়ারস্ ওয়ার"-এর একখণ্ড, চামড়ায় বাঁধানো মলাটের এক কোণ আগুণে পুড়ে গেছে, আর একটি পুরো "কোর্স অফ্ হাইড্রোস্ট্যাটিক্‌স্"। দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই কার্ল ইভানিচ্ কাটান বই পড়ে, এমন কি চোখদুটির যথেষ্ট ক্ষতিও করেছেন—কিন্তু পড়তেন খালি এই বইকটাই আর একটা জনপ্রিয় পত্রিকা "দি নর্দার্ন বী"।

সেল্‌ফে যতগুলো জিনিস ছিল তার মধ্যে একটাই বিশেষ করে আজও আমাকে সবচেয়ে বেশী মনে করিয়ে দেয় কার্ল ইভানিচ্‌কে। কাঠের তৈরি একটা স্ট্যাণ্ডের মাথায় গোল একটুকরো কার্ডবোর্ড বসিয়ে বাতির একটি ঢাক্‌না—কাঠের একটা বল টিপ্‌লে সেটা আবার ওঠানামা করে। কার্ডবোর্ডের টুক্‌রোটায় একজন ভদ্রমহিলা ও তার কেশপরিচর্যাকারিণীর চমৎকার একটা ব্যঙ্গচিত্র সাঁটা। এমনিধারা সব মজার জিনিস তৈরি করতে ওস্তাদ ছিলেন

কার্ল ইভানিচ্, চড়া আলো থেকে নিজের ক্ষীণদৃষ্টি বাঁচাবার জন্য ওটা তৈরি করেছিলেন উনি নিজেই।

এখনও যেন আমি তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাই—লম্বা দেহটি, নরম কাপড়ে তৈরি তাঁর রাত্রিবাস আর লাল রঙের টুপিটার নীচে পাত্‌লা পাকা চুল। আমি তাঁকে দেখতে পাই বসে আছেন একটি ছোট টেবিলের সামনে, ব্যঙ্গচিত্র আঁকা বাতির আবরণটি মুখের উপর ছায়া ফেলছে সামান্য দূর থেকে ; এক হাতে একটি বই ধরা, অন্য হাতটি রাখা চেয়ারের হাতলে ; সামনে একটি ঘড়ি,— গায়ে আঁকা একটি শিল্পকারীর ছবি ; ওর ডোরাকাটা রুমাল, নস্যির ডিবে আর সবুজ রঙের চশমার খাপ—প্রতিটি জিনিস পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, ঠিক ঠিক জায়গায় সাজানো-গুজোনো। দেখলে স্বভাবতই মনে হবে কার্ল ইভানিচের মনটি সাদা, অন্তরে শান্তি।

ছেলেবেলা আমার অভ্যাস ছিল ওপর থেকে নীচের হলে নেমে আসবার পর আবার পা টিপে টিপে ওপরে উঠে পড়ার ঘরে উঁকি মারতুম, দেখতে পেতুম হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে বসে প্রশান্ত গম্ভীর মুখে তাঁর কোন একটি প্রিয় বই পড়ছেন কার্ল ইভানিচ্। কোন কোন দিন হয়তো আমি হঠাৎ এসে পড়েছি, সেই মুহূর্তে তিনি কোন বই পড়ছেন না, নিশ্চল হয়ে বসে, নাকের ওপর চশমাটা ঝুলে পড়েছে, আধবোজা চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে সামনের দিকে, তাতে যেন কেমন একটা অদ্ভুত ভাব, মুখে একটুকরো বিষণ্ণ হাসির আবছা রেশ। ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ, খালি তাঁর নিশ্বাস আর বড় ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া!

এরকম অবস্থায় উনি সাধারণত আমাকে লক্ষ্য করতেন না আর আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে ভাবতাম : আহা, বেচারা, বেচারা বুড়ো মানুষ। আমরা তো সংখ্যায় অনেক, কেমন খেলাধুলো করতে পারি নিজেরা নিজেরা আর ইনি এক্কেবারে একা, কেউ নেই, মায়াদয়া দেখাবারও একটা লোক নেই। ছেলেবেলাতেই বাপ-মা মারা গেছেন, উনি নিজেই বলেছিলেন। ওঁর জীবনকাহিনীটাই সত্যি এত মর্মস্পর্শী! মনে পড়ল নিকোলাইকে বলছিলেন একদিন নিজের জীবনের কথা, ওঁর মতন অবস্থায় পড়া সত্যি কি ভয়ানক!

ভাবতে ভাবতে বিগলিত হয়ে ঘরে ঢুকে ওঁর একখানা হাত ধরে বলতাম, "লিয়েবার কার্ল ইভানিচ্"। এতে উনি খুশীই হতেন নিশ্চয় কেননা সবসময়

পিঠ চাপড়ে দিতেন আমার—স্পষ্ট বোঝা যেত আমার সহানুভূতি স্পর্শ করেছে ওঁকে।

অপর দেয়ালটিতে ঝোলানো থাকত কতকগুলো মানচিত্র, বেশীর ভাগই ছেঁড়া, মেরামত করা কার্ল ইভানিচের নিজের হাতে। তৃতীয় দেয়ালটায়, সেটার মাঝামাঝি নীচে যাবার দরজা—তাতে ঝুলছে 'দুটো রুলার'। একটা একেবারেই ভাঙাচোরা—সেটা আমাদের ; আরেকটা আনকোরা নতুন, সেটা তাঁর নিজস্ব। তাঁর নিজেরটা দিয়ে অবশ্য আমাদের খাতায় লাইন কাটার চেয়ে আমাদের খবরদারিটাই বেশী চলত। দরজার আরেকদিকে একটা কালো বোর্ড, তাতে হিসেব রাখা হত আমাদের দৈনন্দিন অপরাধের—গুরুতর অপরাধের চিহ্ন হল গোল্লা আর অপেক্ষাকৃত হাল্‌কাগুলোর চিকে। বোর্ডের বাঁদিকের কোণটি ছিল আমাদের শাস্তির জায়গা, হাঁটু গেড়ে বসে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

সেই ছোট্ট কোণটুকু যেন এখনও আমার চোখে ভাস্‌ছে। সেই যন্ত্রটা যেটার ভিতর থেকে গরম হাওয়া ছড়িয়ে পড়ত আর তার বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ মনে পড়ে। ঐ কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাঁটু আর পিঠ ব্যথায় টনটন করত, ভাবতাম আমার কথা বোধহয় একদম ভুলেই গেছেন। 'ওঃ, উনি দিব্বি নিজের হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে বসে মজা করে হাইড্রোস্ট্যাটিকস্‌ পড়ছেন,—আর এদিকে আমার অবস্থাটা ?' আমার কাথাটা মনে করিয়ে দিতে করতাম কি, আস্তে আস্তে গরম হাওয়া খেলবার যন্ত্রটা খুলতাম আর বন্ধ করতাম আর নয়তো খুঁটে খুঁটে দেয়ালের চুনবালি তুলে ফেলতাম। কিন্তু ধরুন, হঠাৎ যদি একটা বড় চাপ্‌ড়া খসে পড়ত শব্দ করে—তবে এমনি চমকে উঠতাম যে সেটা আবার শাস্তিরও বাড়া হত। কার্ল ইভানিচের পানে উঁকি মেরে তাকাতাম, কিন্তু তিনি নির্বিকার, বই হাতে বসে আছেন যেন কোন কিচ্ছুই কানে যায় নি।

ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, কালো রঙের ছেঁড়া-খোঁড়া একটা অয়েলক্লথে ঢাকা—টেবিলঢাকার তলা থেকে উঁকি মারে টেবিলের ধারগুলো, জায়গায় জায়গায় পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে কাটা। চারধারে ছড়ানো কতগুলো টুল, তাতে রঙ নেই কিন্তু বহুদিন ব্যবহারে মসৃন। সবচাইতে শেষের দেয়ালটা ভর্তি হয়েছে পর পর তিনটে জানালা দিয়ে। জানালা দিয়ে দেখা যায় সামনে রাস্তা, গাড়ি চলে চলে ক্ষয়ে যাওয়া পথটা, ওর প্রতিটি নুড়ি, প্রতিটি গর্ত আমার

চিরপরিচিত আর কত প্রিয়। রাস্তাটার ওপারে আর একটা চওড়া রাস্তা, তাতে ছাঁটা ছাঁটা লেবু গাছের সারি, সারির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ঝোপ-ঝাড়ের বেড়া। বেড়ার পরে ময়দান, একদিকে একটা শস্যের গোলা, অন্যদিকে বন। চৌকিদারের কুটিরটাও চোখে পড়ে দূরে। ডানদিকের জানালাটার বাইরে একটুকরো ছাত যেখানে বড়রা সাধারণত ডিনারের আগে বসেন। কার্ল ইভানিচ্ যখন মাথা নীচু করে আমাদের শ্রুতিলিখনের খাতা দেখেন, তখন ওদিকপানে তাকালে একচমক চোখে পড়ত হয়তো আমার মায়ের কালো মাথাটির একটি পাশ কিংবা অন্য কারুর পিঠের সামান্য একটু অংশ ; হয়তো কানে আসত ওদের কথাবার্তার টুকরো টুকরো শব্দ আর হাসির একটু-আধটু ক্ষীণ রেশ। ওখানে যেতে পারব না মনে হতে বিরক্তির আর সীমা থাকত না আর খালি মনে হত, "আঃ, কবে যে আমি বড় হব, যখন লেখাপড়া করতে হবে না আর যাদের ভালবাসি তাদের কাছেকাছেই সবসময় থাকতে পাব!" বিরক্তি থেকে ক্রমে আসত দুঃখ, আর অদ্ভুত জটিল সব চিন্তায় মগজটা এমনি ভরে উঠত যে কানেই ঢুকত না কার্ল ইভানিচ্ কখন থেকে বকাবকি করছেন ভুল লেখার জন্যে।

অবশেষে এতক্ষণে কার্ল ইভানিচ্ ড্রেসিং গাউনটা খুলে ফেলে পেছনদিকে কাটা আর কাঁধে ভাঁজফেলা লম্বা কোটটা পরে নিলেন, নেকটাইটা টেনেটুনে ঠিক করলেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে—তারপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে নীচে চললেন মাকে সুপ্রভাত জানাতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মা

মা বসেছিলেন বসবার ঘরে, চা ঢালছিলেন ; একহাতে তাঁর টি-পট ধরা, অন্যহাতে সামোভারের কলটা—চা এসে পড়ছে কাপে। স্থিরদৃষ্টিতে ওইদিকেই তাকিয়েছিলেন মা, কিন্তু তবুও কিছুই দেখছিলেন না, আমাদের ঢোকাও নজরে এল না।

কোন প্রিয়জনকে মনে করতে চাইলেই অতীতের এত স্মৃতি ভীড় করে আসে মনে, যার আড়ালে সে আসল মানুষটিই যায় আবছা হয়ে—ঠিক যেন কান্নায়-ভেজা চোখ মেলে যেন কাউকে দেখা। ঠিক সেই সময়কার মাকে মনে করতে চেষ্টা করলে খালি চোখে ভেসে ওঠে বাদামী চোখদুটি, যার ব্যঞ্জনায় টলমল করত দয়া আর স্নেহ। আর মনে পড়ে একটি ছোট তিল ঘাড়ে যেখান থেকে কোঁকড়ানো চুলের গোছা শুরু ঠিক তার নীচে, তাঁর সাদা কাজকরা কলার, ঠাণ্ডা, নরম হাত—যা দিয়ে সব সময়ই আদর করতেন আমাকে আর আমিও সবসময় চুমু খেতাম—সেই হাত ; কিন্তু সব মিলিয়ে মায়ের পুরো চেহারাটা হারিয়ে গেছে আমার মন থেকে।

সোফার বাঁ দিকে মস্তবড় পুরনো বিলিতী পিয়ানো। আমার ছোটবোন লিউবা—এর গায়ের রঙটা একটু চাপা—পিয়ানোতে বসে ক্লেমেন্তির সুর বাজাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, ছোট্ট হাতদুটি রক্তরাঙা কনকনে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে এসেছে বলে। লিউবার বয়স এগার। একটি খাটো লিনেনের পোশাক পরনে সাদা লেস বসানো, বাজনায় সে সবে আটটা সুর একটানা বার করতে শিখেছে। ওর পাশে সামান্য একটু পাশ ফিরে বসে আছে মেরিয়া আইভা-নোভ্না নীল রঙের জ্যাকেট গায়ে, গোলাপী রঙের রিবন লাগানো টুপি মাথায়। মেরিয়ার মুখ লাল, যেন চটে আছে, আর তা যেন আরও কঠিন হয়ে উঠল কার্ল ইভানিচ্‌কে দেখে। রাগত চোখে একবারমাত্র তাকিয়ে, কার্ল ইভানিচের অভিবাদনের কোন জবাব না দিয়ে, সে আরও জোরে জোরে আর আদেশের সুরে তাল ঠুকতে থাকে—এক, দুই, তিন। এক···দুই···তিন।

কার্ল ইভানিচ্ অবশ্য এতে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না, সোজা আমার কাছে এগিয়ে গিয়ে যথারীতি সুপ্রভাত জানালেন জার্মান ভাষায়। মা একটু চমকে উঠলেন, কিসের একটা দুশ্চিন্তা মনের ভিতর পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল, মাথা নেড়ে সেটাকে যেন দূর করে দিলেন মন থেকে, তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন কার্ল ইভানিচের দিকে আর কার্ল ইভানিচ্ যখন মুখ নীচু করে তার হাতে চুমু খেতে গেলেন তখন ছোট একটি চুমু এঁকে দিলেন তার রেখাঙ্কিত কপালে। "ধন্যবাদ কার্ল ইভানিচ্।" মা বললেন। তারপর জার্মানেতেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন : "ছেলেরা ভাল ঘুমিয়েছিল তো ?"

কার্ল ইভানিচ্ এমনিতেই একটা কানে শোনেন না তারপর পিয়ানোর গোলমালে এখন আর একবর্ণও শুনতে পেলেন না। তিনি সোফার ওপর আরও একটু ঝুঁকে পড়লেন, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর টেবিলের ওপর একটা হাত রেখে। তারপর মুখে একটুকরো হাসি টেনে এনে—যা আমার কাছে চরম মার্জিত বলে মনে হল—বললেন, আমাকে অনুমতি দেবেন কি, নাটালিয়া নিকোলায়েভিনা ?

ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে কার্ল ইভানিচ্ তাঁর লাল টুপিটি মাথা থেকে কক্ষনো খুলতেন না কিন্তু যখনই বসবার ঘরে ঢুকতেন তার জন্য প্রতিবারই অনুমতি চেয়ে নিতেন।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওটা থাক, কার্ল ইভানিচ্······আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম ছেলেদের রাতে ভাল ঘুম হয়েছে কিনা"—আর একটু কাছে এগিয়ে আরও একটু জোরে মা বললেন।

কিন্তু বৃথা, এবারেও ওঁর কানে কিছুই ঢুকল না। লাল টুপিটা হাতে নিয়ে মিষ্টি একটু হাসি মুখে নিয়ে সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এবারে মা একটু হেসে মেরিয়া আইভানোভ্নাকে লক্ষ্য করে বললেন, "একটু থাম মিমি, কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমরা।"

মা এমনিতে খুবই সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু স্নিগ্ধ হাসিটি যেন সে মুখে একেবারে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠত, চারিদিকে সে হাসির আলো ছড়িয়ে পড়ত। জীবনের চরম সঙ্কটময় মুহূর্তেও সেই অনবদ্য হাসির একটুকরো যদি দেখতে পেতাম, সব দুঃখ ভুলে যেতে পারতাম তবে। আমার মনে হয় সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায়, তা সত্যি লুকিয়ে থাকে ঐ হাসিতেই। হাসিতে যদি মুখের শ্রী বাড়ে, তবে সেই মুখ সুন্দর ; হাসিতে যদি তার শোভার কোন পরিবর্তন

না হয় তবে সে মুখ সাধারণ আর যদি তাতে শ্রী নষ্ট করে তবে নিঃসন্দেহে কুশ্রী সে মুখ।

আমাকে সুপ্রভাত জানাতে মা দুহাত বাড়িয়ে আমার মাথাটা টেনে নিলেন, গভীর দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, "আজ সকালে কাঁদছিলে তুমি ?"

কোন জবাব দিলাম না। মা আমার চোখে চুমু খেলেন তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন জার্মান ভাষায়, "কেন কেঁদেছিলে ?"

আমাদের আদর করে কথা বলতে হলে সবসময় জার্মানেতেই কথা বলতেন মা—ও ভাষাটা চমৎকার আসত মা-মণির।

"আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেঁদেছিলাম মা"—মিথ্যে বানানো স্বপ্নটার খুঁটিনাটি মনে করতে করতে ভয়ে যেন একবার শিউরেও উঠলুম।

কার্ল ইভানিচ্‌ও আমার কথাটা সমর্থন করলেন কিন্তু স্বপ্নটা সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করলেন না কিছু। আবহাওয়া সম্বন্ধে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে—মিমিও এতে অংশ নিল—মা তাঁর প্রিয় চাকরবাকরদের জন্য কয়েক টুকরো চিনি ট্রের ওপর রেখে, জানালার পাশে রাখা হাতের কাজের নক্সার ফ্রেমের সামনে গিয়ে বসলেন।

"এবার ছেলেরা, পালাও, বাবাকে গিয়ে খবর দাও, কাজে যাবার আগে যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যান অতি অবশ্য।"

আবার সেই বাজনা, তার সঙ্গে তাল ঠোকা আর কটমট করে তাকানো শুরু হল আর আমরাও বেরিয়ে চলে এলাম বাবার কাছে। সেই ঠাকুর্দার আমল থেকে যে ঘরটায় খাবারদাবার রাখা হয় সেই ঘরের ভিতর দিয়ে আমরা এসে ঢুকলাম বাবার পড়ার ঘরে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাবা

বাবা তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে, সামনে ছড়ানো কতকগুলো খাম, কাগজপত্র আর ব্যাঙ্কনোটের কয়েকটা তাড়ার দিকে ইঙ্গিত করে বেশ চড়া সুরে কথা বলছিলেন, জমিজমার কাজ-সংক্রান্ত কর্মচারী ইয়াকভ মিখাইলোভের সঙ্গে। ইয়াকভ যথারীতি দরজা আর ব্যারোমিটারের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে হাতদুটো পেছনে, উত্তেজিতভাবে আঙুলগুলো একবার খুলছে আরেকবার বন্ধ করছে।

বাবা যত বেশী চটে উঠছেন, আঙুলগুলোও ততই লাফালাফি করছে, আর বাবা যেই থেমেছেন আঙুলও ওমনি নিশ্চল। কিন্তু ইয়াকভ যখন নিজে কথা বলতে শুরু করে, আঙুলগুলোর উত্তেজনা তখন চরম, একেবারে মাতামাতি শুরু করে দেয় যেন। আমার মনে হল ইয়াকভের আঙুলের গতি থেকে বোধ হয়, ওর মনের গুপ্ত চিন্তারও আঁচ পাওয়া যায়। এদিকে ইয়াকভের মুখভাব—তা কিন্তু সবসময়ই অতি শান্ত। তাতে একটা সম্ভ্রান্ত ভাবের ছাপ; আবার বিনয়ের ভাবও সুস্পষ্ট; মনে হয় যেন বলছে, 'আমিই ঠিক, তবে কিনা আপনার যেমন ইচ্ছে করতে পারেন'।

আমাদের দিকে নজর পড়তে বাবা শুধু বললেন, "একটু দাঁড়াও।" তারপর ইশারা করলেন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে।

"হা ভগবান, তোমার আজ হয়েছে কি ইয়াকভ?" বাবা আবার শুরু করলেন অভ্যেস মত কাঁধটা অল্প একটু ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, "এই খামটাতে এই যে আটশ রুবল…"

ইয়াকভ কাঠের ফ্রেমে গোল গোল চাকতি বসানো গোনবার যন্ত্রটা নেড়েচেড়ে আটশ রুবল গুনে নিল, তারপর অনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল উৎকর্ণ হয়ে এর পর কী আসে কানে।

"…এটা হল আমার অনুপস্থিতিতে চাষআবাদ চালাবার খরচ। বুঝলে? কারখানা থেকে পাবে এক হাজার রুবল। ঠিক তো? আচ্ছা। কোষাগার

থেকে ধার পাবে আট হাজারের মতন ; আর বিচালির কথা—তুমি নিজেই হিসেব দিয়েছ সাত হাজার পুড (১ পুড প্রায় ৪০ পাউণ্ডের মতন) বিক্রি করতে পারবে ৪৫ কোপেক হিসেবে—তাহলে ধর পেলে তিন হাজার। এবার কত হল সবশুদ্ধ ? বার হাজার, কেমন বেশ তো ?”

“হ্যাঁ ঠিক”—ইয়াকভ জবাব দেয়।

আঙুলের দ্রুত নাড়াচাড়া দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম এক্ষুনি এগুলিও প্রতিবাদ করবে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই বাবা বাধা দিলেন :

“এবার এই টাকা থেকে দশ হাজার রুবল তুমি কাউন্সিলে পাঠিয়ে দেবে পেট্রোভ্স্কয়ের জন্যে। আর অফিসে যে টাকা আছে সেটা তুমি আমার কাছে এনে দেবে, আর আজ থেকে খরচ চলবে তা থেকে। (ইয়াকভ তার গোনবার যন্ত্রটা নাড়াচাড়া করে, ওপুড় করে দিল একবার, বোধ হয় ইঙ্গিত করল যে ঐ একুশ হাজারও এভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে) আর এই খামটায় যে টাকা আছে সেটা ঐ ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।”

আমি টেবিলের একেবারে খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিকানাটায় চোখ পড়ল, “কার্ল ইভানিচ্ ময়্যার”।

বাবার নিশ্চয় নজর এড়ায় নি যে ঠিকানাটা আমি জেনে ফেলেছি, যেটা দেখা আমার পক্ষে মোটেই উচিত নয়, তাই আমার কাঁধে সামান্য একটু চাপ দিয়ে ইঙ্গিত করলেন টেবিলের কাছ থেকে সরে যেতে। আমি ঠিক ধরতে পারলাম না আমাকে আদর করলেন, না বক্লেন ; ওঁর মনে যাই থাক, আমি কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চুমু খেয়ে দিলাম কাঁধের ওপর রাখা মস্ত বড় পৌরুষব্যঞ্জক হাতখানায়।

“হ্যাঁ, কর্তা”, ইয়াকভ বলে, “আর খাবারোভকার টাকা সম্বন্ধে আপনার কি আদেশ ?”

খাবারোভকা একটা গ্রাম, মায়ের সম্পত্তি। “ও টাকা অফিসে রেখে দেবে আর কোন কারণেই আমার অনুমতি ছাড়া তা খরচ করবে না।”

ইয়াকভ নিস্তব্ধ হয়ে রইল, কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র—তার পরই তার আঙুলগুলো দ্রুত সঞ্চালিত হতে থাকল আর এতক্ষণ ধরে যে নম্র বশ্যতার দৃষ্টি নিয়ে মনিবের আদেশ শুনছিল, সেটা বদলে আস্তে আস্তে তার স্বাভাবিক ধূর্ত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিরে এল—গোনবার যন্ত্রটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে এবার সে মুখ খুলল :

"যদি অনুমতি দেন, পিয়ত্র আলেকজান্দ্রোভিচ্ তবে বলি কাউন্সিলকে সময় মত টাকা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।" চিন্তিতভাবে সে বলতে থাকে, "আর আমরা যে কারখানার, বিচালিবিক্রির আর ঋণের টাকার ওপর নির্ভর করছি··· সেটা, সেটা বোধ হয় আমাদের পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে"—একটু থেমে থেমে সোজা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে কথাটা সে শেষ করল।

"কেন ?"

"আমাকে অনুমতি দিন হিসেবটা খুলে বলি। কারখানা সম্বন্ধে—ওর পরিচালককে আমি ইতিমধ্যেই তিনবার ডেকে দেরির জন্য কৈফিয়ত চেয়েছি, কিন্তু সে শপথ করে বলছে, তার কাছে টাকা নেই। এখন এখানেই আছে সে। আপনি দয়া করে নিজে তার সঙ্গে কথা বলবেন কি ?"

বাবা হাত নেড়ে ইশারা করে জানালেন যে তিনি নিজে কথা বলতে চান না। "কি বলছে সে ?"

"সেই পুরনো কাহিনী। কাজ হয়নি মোটেই। টাকা যা ছিল হাতে সব খরচ করতে হয়েছে বাঁধের পেছনে। ওকে যদি এখন আমরা তাড়িয়েও দি, বিন্দুমাত্র সুবিধা হবে কি ? এবার ঋণের কথা—যেটা আপনি উল্লেখ করলেন দয়া করে—সে সম্বন্ধে তো আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি আমাদের টাকা ওখানে ডুবে গেছে, শীগ্‌গির আর কিছু পাবার আশা নেই। আমি কিছু ময়দা পাঠিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে শহরে ইভান আকানামিচের কাছে এ সম্বন্ধে একটা চিঠি লিখে ; তিনি জবাবে জানিয়েছেন পিয়ত্র আলেকজান্দ্রাভিচের কোন উপকারে লাগতে পারলে যথার্থই খুশী হতেন তিনি কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যাপারটা বর্তমানে তার হাতের বাইরে কাজেই অন্তত পক্ষে দুমাসের এদিকে কিছুই পাবেন না আপনি। তারপর বিচালির কথা বলছিলেন। ধরুন ওটা যদি আমরা তিন হাজারেই বিক্রি করি···"

এখানে সে তার যন্ত্রটাতে তিন হাজারে দাগ মারল, তারপর একবার যন্ত্রটার দিকে আরেকবার বাবার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে রইল ভাবটা যেন, "দেখুন না, আপনি নিজেই দেখুন সামান্য এটা। তাছাড়া এখন যদি বিক্রি করি আমরা তবে লোকশান দিয়েই করতে হবে, তা তো আপনি নিজেও জানেন···"

স্পষ্ট বোঝা গেল প্রচুর যুক্তিতর্ক তৈরি করেই এসেছে সে। সেই ভয়েই নিশ্চয় বাবা তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, "আমার ব্যবস্থার কোনরকম রদবদল

হবে না, সেটা নিশ্চয় জেনো ; তবে কিনা এই টাকাটা—এটা যদি পেতে সত্যি সত্যিই দেরী হয় তাহলে······তাহলে অবশ্য কি আর করা যাবে, খাবারোভকার টাকা থেকেই দরকার মত নিয়ে নেবে।"

"আচ্ছা।"

ইয়াকভের মুখের ভাব আর আঙ্গুল দেখে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল শেষের আদেশটাই বিশেষ করে আনন্দ দিয়েছে তাকে।

ইয়াকভ ছিল ক্রীতদাস, অদ্ভুতরকম উৎসাহী আর প্রভুভক্ত মানুষ। যে কোন সাধু কর্মচারীর মতই সে ছিল প্রভুর টাকাকড়ির ব্যাপারে অতিরিক্ত মিতব্যয়ী আর তার স্বার্থসম্বন্ধে তেমনি সজাগ। কিসে যে প্রভুর স্বার্থ সবচাইতে বেশী—সে সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ধারণা ছিল তার। সবসময় ছটফট করে বেড়াচ্ছে কি করে প্রভুপত্নীর সম্পত্তির বিনিময়ে প্রভুর সম্পত্তি বাড়ানো যায়। কিন্তু এদিকে ভাবখানা দেখাবে যেন পেট্রোভস্কয়ের (যে গ্রামে আমরা বাস করতাম) উন্নতির জন্যই নিতান্তই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল মায়ের সম্পত্তির আয়ের সবটাই ব্যয় করা। তাই এই মুহূর্তে সে বিজয়ী। তার মতটাই বহাল রইল শেষ পর্যন্ত।

বাবা আমাদের সুপ্রভাত জানালেন। তারপরে সোজা কাজের কথায় এলেন ; আমাদের আর কুঁড়েমি করে দিন কাটালে চলবে না—যথেষ্ট বড় হয়েছি এবার নাকি আমাদের মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো কবার সময়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

"তোমরা নিশ্চয় জান আজ রাতে আমি মস্কো যাচ্ছি, তোমাদেরও নিয়ে যাব ঠিক করেছি। সেখানে দিদিমার কাছে থাকবে তোমরা, মা এখানে থাকবেন মেয়েদের নিয়ে। বুঝতেই পারছ তখন তার কেবলমাত্র একটাই সান্ত্বনা থাক্‌বে যে তোমরা বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা করছ ; আর শিক্ষকরা সবাই বেশ খুশী তোমাদের ওপর।"

দিনকয়েক ধরেই বাড়িতে কি যেন সব তোড়জোড় চলছিল, অস্বাভাবিক একটা কিছু আশাও করছিলাম আমরা—তবুও এ যেন একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! ভলোদিয়ার মুখচোখ একেবারে লাল টকটকে হয়ে উঠল! কাঁপা কাঁপা স্বরে কোনমতে মায়ের দেওয়া খবরটা জানাল সে।

"ওঃ, এই তাহলে আমার সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটার মানে"—আমি ভাবলাম, "হে ভগবান, এর চাইতে বেশী খারাপ যেন আর কিছু না হয়!"

চোখ ফেটে আমার জল এল মায়ের কথা ভেবে। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে 'আমরা বড় হয়েছি' এই কথাটা মনে একটা আনন্দের হাওয়াও বইয়ে দিল।

"আজ রাতে যদি চলে যাই, তবে নিশ্চয় আজ আর পড়তে হবে না। কি মজা!" আমি ভাব্‌লাম, কিন্তু দুঃখ হচ্ছে কার্ল ইভানিচের জন্যে। ওঁকে নিশ্চয় ছাড়িয়ে দেওয়া হবে এবার—সেইজন্যেই বুঝি ওই খামটা তৈরি হয়েছে ওঁর নামে। নাঃ, তার চাইতে যেন জন্ম জন্ম ধরে এইখানেই পড়াশুনা করি—তাহলে মাকেও ছেড়ে যেতে হয় না আর বেচারী কার্ল ইভারনিচ্‌কেও আঘাত দিতে হয় না! আহা, বড় দুঃখী কার্ল ইভানিচ্‌!

এমনিধারা সব উল্টোপাল্টা চিন্তা তালগোল পাকাতে লাগল মনের মধ্যে আর আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম জুতোর কালো ফিতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

তাপমাত্রার নিম্নগতি সম্বন্ধে কার্ল ইভানিচের সঙ্গে বাবা কয়েকটা কথা বললেন, ইয়াকভকে হুকুম দিলেন কুকুরগুলোকে যেন না খাইয়ে রাখে, যাতে খাবার পর বেরিয়ে গিয়ে বাচ্চা হাউণ্ডগুলোকে বিদায় নেবার আগে একটু পরীক্ষা করে দেখতে পারেন—তারপর আমাদের সব আশা ধূলিসাৎ করে আবার সোজা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন পড়তে। কেবল সেই সঙ্গে একটুমাত্র সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে, আমাদের নাকি শিকারে নিয়ে যাওয়া হবে।

ওপরে যাবার পথে আমি একছুটে ছাতের ওপর চলে গেলাম। বাবার প্রিয় গ্রেহাউণ্ড মিল্‌কা যেখানে রোদে শুয়ে শুয়ে চোখ পিট্‌পিট করছে।

"মিলোচ্‌কা", ওর পিঠটা চাপড়ে, নাকে একটা চুমু খেয়ে বললাম, "আমরা আজ চলে যাচ্ছি, জান্‌লে? বিদায়। আর আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাব না কোনদিন।"

আর চাপতে পারলাম না, এবার চোখ ফেটে ঝর ঝর করে জল পড়তে শুরু করে।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঠ

কার্ল ইভানিচের শরীরটা মোটেই ভাল ছিল না। তার গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকে কাপড় রাখবার আলমারিতে কোটটাকে একবার ছুঁড়ে ফেললেন, রেগেমেগে কোমরবন্ধটাকে ক'ষে বার বার জড়ালেন, আর আমাদের চলতি কথা শেখার বইটাতে নখ দিয়ে কেটে কেটে দাগ মারলেন, কোনটে মুখস্থ করতে হবে—এ সবই নিঃসন্দেহে শরীর খারাপের সাক্ষ্য।

ভলোদিয়া যথাসাধ্য মন দিয়েই পরিশ্রম করে পড়া তৈরি করছিল—কিন্তু আমি······আমার এতই মনে লেগেছিল যে বলতে গেলে কিছুই প্রায় পড়তে পারলাম না। বহুক্ষণ ধরে হাবার মত একদৃষ্টে বইটার দিকে তাকিয়ে আছি—কিন্তু আসন্ন বিদায়ের কথা মনে করে চোখ আমার ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে, ঠিকমত পড়তে পারছি না একটা অক্ষরও। মুখস্থ বলার যখন সময় এল আর কার্ল ইভানিচ্ একচোখ বন্ধ করে শুন্‌তে লাগলেন, যেখানে একজন জিজ্ঞাসা করছে, "কোথা থেকে আসছ তুমি?" আর একজন জবাব দিচ্ছে, "আমি আসছি কফি-ঘর থেকে"—সেখানে চোখের জল আর আমার বাধা মানল না, ফোঁপানির চোটে স্পষ্ট করে বলতেই পারলাম না 'হেবেন সাই ডাই জিটাং নিস্‌ট জেলেসেন?' যখন লিখতে বস্‌লাম, কাগজের ওপর টপ্‌টপ্ বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরে লেখা সব মুছে গেল, জল দিয়ে ব্লটিং পেপারের ওপর লিখলেও ওর চাইতে আর কি খারাপ হত?

এতবড় অবাধ্যতা, আর নাটুকেপনা (কথাটা ওঁর খুব প্রিয়)! কার্ল ইভানিচ্ বিষম চটে আমাকে ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন, ছোট্ট রুলারটা নেড়ে নেড়ে ভয় দেখালেন আর বলতে লাগলেন, আমাকে ক্ষমা চাইতেই হবে—কিন্তু সবই বৃথা, চোখের জল একটা কথাও বলতে দিল না আমাকে। অবশেষে কার্ল ইভানিচের মনও ভিজল, নিশ্চয় বুঝতে পারলেন যে তাঁরই অন্যায় তাই উঠে সোজা নিকোলাইয়ের ঘরে চলে গেলেন, পেছন থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে।

নিকোলাইয়ের ঘর থেকে কথাবার্তার স্বর আমাদের এই পড়ার ঘরেও ভেসে এল।

"তুমি কি শুনেছ, নিকোলাই, যে ছেলেরা মস্কো চলে যাচ্ছে?"—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করেন কার্ল ইভানিচ্।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, শুনেছি বৈ কি।" নিকোলাই জবাব দিল, নম্র স্বরে।

সে নিশ্চয় সমীহ করে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল কারণ কার্ল ইভানিচকে বলতে শোনা গেল, "না না, উঠ না নিকোলাই।" বলে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন। আমি পা টিপে টিপে কোণ থেকে বেরিয়ে এসে দরজার গায়ে কান পেতে কথা শুনতে লাগলাম।

কার্ল ইভানিচ্ আবেগের সঙ্গে বলে চললেন, "দেখ নিকোলাই, তুমি যতই কেন না মানুষের উপকার কর, যতই ভালবাস না কেন, কক্ষনো কৃতজ্ঞতা আশা কর না কারুর কাছ থেকে।"

নিকোলাই জানালার ধারে বসে জুতো তৈরি করছিল, সায় দিল মাথা নেড়ে।

"আমি এ বাড়িতে বাস করছি আজ বার বছর ধরে আর ভগবানের নামে শপথ করতে পারি, নিকোলাই"—ছাদের দিকে চোখ তুলে আর এক হাতে নস্যির ডিবেটা উঁচু করে তুলে ধরে—বলতে থাকেন কার্ল ইভানিচ্, "এদের আমি ভালবেসেছি, প্রাণ দিয়ে; এদের ভালমন্দ নিয়ে ব্যাকুল হয়েছি, ঠিক যেন আমার নিজেরই সন্তান। তোমার মনে আছে, নিকোলাই, সেই যেবার ভলোদিয়ার অসুখ হল, কি ভাবে আমি দিনরাত তার সেবা করেছি, চোখের পাতা বুজিনি ন'দিন ধরে? হ্যাঁ, তখন অবশ্য আমি ছিলাম 'প্রিয় কার্ল ইভানিচ্'—তখন আমার মূল্য ছিল। আর এখন", কার্ল ইভানিচ্ একটু তিক্ত হাস্‌লেন, "এখন ছেলেরা সব বড় হয়েছে, মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করবে! যেন এখানে তারা আর পড়াশুনা করছে না!"

"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো বলব ছেলেরা যথেষ্টই পড়াশুনা করে এখানে"—নিকোলাই জুতো সেলাইর ছুঁচটা নামিয়ে রেখে দুহাত দিয়ে সুতোটা খুলে নিল।

"আমার আর কোন প্রয়োজন নেই, আমাকে এবার বিদায় নিতে হবে। কিন্তু তারা যে সব কথা দিয়েছিল, সে সব? কোথায় তাদের কৃতজ্ঞতা? নাটালিয়া নিকোলায়েভ্‌নাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, নিকোলাই,"

কার্ল ইভানিচ্ তাঁর বুকে হাত রাখেন, "কিন্তু তাঁর মূল্য কি? তাঁর কথার দাম তো এ বাড়িতে এই যে……দেখ, এর চাইতে বেশী নয়—" কার্ল ইভানিচ্ অবজ্ঞাভরে একটুকরো চামড়া মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিকোলাইকে ইঙ্গিত করলেন। "আমি জানি এ কাজ কার, আর কেনই বা আমার প্রয়োজন ফুরাল। অনেকের মতন আমি ধামা ধরতে পারি না যে, চিরদিন সত্যি কথাই বলতে অভ্যস্ত," কার্ল ইভানিচের কথার সঙ্গে গর্বের সুর মিশল। "ভগবান নিজেই বিচার করবেন এদের। আমাকে তাড়িয়ে ওরা কিছু, বেশী বড়লোক হয়ে যাবে না আর ভগবানের দয়ায় আমিও আমার একটু সংস্থান করে নিতে পারবই। কি বল, নিকোলাই, পারব না?"

নিকোলাই মাথা তুলে তাকাল কার্ল ইভানিচের দিকে। তার চোখ ছুটি যেন নীরব ভাষায় সমর্থন জানায়, বেচারা ইভানিচ্কে, তবে মুখ ফুটে সে কোন কথাই বলল না।

কার্ল ইভানিচ্ এ ধরনের আরও অনেক আক্ষেপ জানালেন। অমুক জেনারেলের বাড়ি যেখানে তিনি এর আগে ছিলেন—তারা নাকি ওঁকে অনেক বেশী সম্মান করতেন, ওঁর কাজের অনেক বেশী দাম ছিল সেখানে (শুনে আমার এত কষ্ট হল!), সেক্সনীর কথা বললেন, গল্প করলেন ওঁর বাবা মার, বন্ধু সিওনহিয়েতের, ওর দরজীর আরও এদিক ওদিক অনেকের।

কার্ল ইভানিচের দুঃখের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ছিল আমার; এখন এই ভেবে ভারী কষ্ট হল যে বাবা আর কার্ল ইভানিচ্, যে দুজনকে আমি প্রায় সমান ভালবাসি, ওরা দুজনে কেন পরস্পরকে বুঝতে পারেন না? আমি ধীরে ধীরে আবার আমার কোণটিতে ফিরে গেলাম, নুয়ে পড়ে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম কি করে এদের দুজনের মিলন ঘটান যায়।

কার্ল ইভানিচ্ পড়ার ঘরে ফিরে এলেন। আমাকে আদেশ দিলেন উঠে এসে খাতাপত্র তৈরি করে বসতে—শ্রুতিলিখন দেবেন। যখন সব তৈরি হল তিনি জাঁকিয়ে এসে বসলেন চেয়ারে, তারপর গম্ভীর সুরে বলতে লাগলেন:

"মানুষের যতগুলো মনোবৃত্তি আছে, তার মধ্যে সব চাইতে ঘৃণ্য হল"—লিখেছ তো? আস্তে আস্তে একটিপ নস্যি নিয়ে নতুন উৎসাহে আবার বলতে শুরু করেন, "সবচাইতে ঘৃণ্য হল, অ-কৃ-ত-জ্ঞ-তা……হ্যা অকৃতজ্ঞতা, 'অ'টা বেশ বড় করে লেখ।" আমি শেষ শব্দটা লিখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

"ব্যাস্" অতি ক্ষীণ একটু হেসে তিনি খাতাটা দিয়ে দিতে ইশারা করলেন।

এই একটিমাত্র লাইন যা তারই অন্তরের ভাবদ্যোতক—বারবার করে পড়লেন তিনি, নানাভাবে নানাসুরে আর বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গে। এরপর আমাদের ইতিহাসের একটা পড়া তৈরি করতে বলে নিজে গিয়ে তিনি বস্লেন জানালার পাশে। মুখ থেকে দুঃখের ছায়াটা যেন একটু কেটে গেছে, কোন অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার করতে পারলে মানুষের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের একটু আভা যেন তার মুখে।

পৌনে একটা বেলা; কিন্তু কার্ল ইভানিচের আমাদের বিদায় দেবার কোনই ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে না—বরঞ্চ নতুন করে আবার পড়া দিতে লাগলেন।

বিরক্তি আর ক্ষিদে দুটোই তাল রেখে বাড়ছে। বিষম অধৈর্য নিয়ে আমি চারিদিকে নজর করতে লাগলাম, টেবিলে খাবার দেবার প্রস্তুতি চল্ছে। নানাচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। খাবার প্লেট পরিষ্কার করে যে মেয়েটি সে তার বিশেষ ধরনের ব্রাসটি হাতে নিয়ে এল। তারপর কানে এল ডিস্ নাড়াচাড়ার টুংটাং শব্দ। চাকরবাকরেরা টেবিল সরাচ্ছে, চেয়ারগুলো জায়গামত পাতছে। তারপর মিমি বাগানের দিক থেকে এল, সঙ্গে লিউবোচ্কা আর কেটেনকা (কেটেনকা মিমির মেয়ে, বার বছরের)। কিন্তু হলে কি হবে, আসল যে বাবুর্চি ফোকা তারই কোন পাত্তা নেই কোনদিকে। সেই এসে খবর দেয় খাবার দেওয়া হয়েছে আর কেবলমাত্র তখনই আমরা বই ছুঁড়ে ফেলে, কার্ল ইভানিচের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই দৌড়ে নীচে পালাতে পারি।

এতক্ষণে পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে—কিন্তু না এত ফোকা নয়! ও নতুন শব্দ। ফোকার পায়ের শব্দ খুব ভাল করেই জানি, ওর বুটের আওয়াজ শুনলেই আমি ধরতে পারি। দরজাটা খুলে গেল, একটি মূর্তি এসে ঘরে ঢুকল—আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

তীর্থযাত্রী

ঘরে এসে ঢুকল একটি লোক, বয়স প্রায় বছর পঞ্চাশ, লম্বাটে ফ্যাকাসে, বসন্তের দাগে ভরা মুখ, মাথাভর্তি লম্বা লম্বা পাকা চুল আর অল্প লালচে পাতলা দাঁড়ি। এত লম্বা যে দরজা দিয়ে ঢুকতে শুধু মাথা নয় সারা শরীরটাই নোয়াতে হল তাকে। গায়ে একটা ছেঁড়াখোড়া পোশাক, দেখতে আচকানও মনে হয়, আবার পাদ্রীদের লম্বা পোশাকের সঙ্গেও তার মিল, হাতে বেশ মোটা একটি লাঠি। ঘরে ঢুকেই সেটি দিয়ে ঠকাস্ করে গায়ের জোরে মাটিতে একবার ঠুকল তারপর মুখ হাঁ করে, ভুরু কুঁচকে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠল। তার একটা চোখ কানা আর সেই চোখের সাদা মণিটা অনবরত ঘুরছে—ভীষণ কুৎসিত মুখখানাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

"ওঃ হো, পেয়েছি পেয়েছি, তোমাকে পেয়েছি," বলে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে এসে লোকটি ভলোদিয়াকে ধরে; মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে চাঁদিটা লক্ষ্য করতে থাকে খুব সাবধানে। তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর থমথমে মুখ করে টেবিলের কাছে গেল, তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে থাকল। "ওঃ হো, কি লজ্জা! ওঃ হো, কি দুঃখ! ওরা পালিয়ে যাবে!" কাতরভাবে ভলোদিয়ার দিকে তাকিয়ে, কান্নাভরা কাঁপা কাঁপা স্বরে বারবার একই কথা আবৃত্তি করতে থাকে। চোখের জল ঝরছিল, জামার হাতা দিয়ে একবার মুছে নিল।

লোকটির গলার স্বর রুক্ষ, কর্কশ, চলাফেরা দ্রুত কিন্তু ঠেকে ঠেকে যাওয়া, কথাগুলো অর্থহীন, অস্পষ্টও—তবুও বলার ভঙ্গীটা এত মর্মস্পর্শী আর ওর কুৎসিত ফ্যাকাসে মুখখানায় মাঝে মাঝে এমনি অকৃত্রিম বেদনার আভাস ফুটে উঠছিল যে ওর কথা শুনতে শুনতে আপনিই অদ্ভুত একটা মনের ভাব হয়—ভয়, দুঃখ আর অনুকম্পা মেশানো সে ভাব, এ হল তীর্থযাত্রী গ্রিশা।

ও কোথা থেকে এসেছে? কার সন্তান ও? এ-রকম তীর্থযাত্রীর জীবনই

বা বেছে নিল কেন? সঠিক জবাব কেউ জানে না। আমি কেবল জানতাম পনের বছর বয়স থেকেই লোকে ওকে বোকা-হাবা বলেই জানে, খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়, কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে আর যাকে মনে ধরে ছোট ছোট মূর্তি উপহার দেয়, অদ্ভুত অসংলগ্ন কথা বলে—সেগুলোকে অনেকে আবার মনে করে ভবিষ্যৎবাণী। এ ছাড়া ওর অন্য কোন চেহারা লোকের কাছে অজানা। মাঝে মাঝে ও আমার দিদিমার কাছেও যায়; কেউ কেউ বলে ও নাকি কোনো ধনীর দুর্ভাগা সন্তান, তবে নির্মলচরিত্র আর সাধুপ্রকৃতির; আবার কেউ বা বলে ওটা নেহাতই একটা হতভাগা চাষা।

অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত ও সময়ানুবর্তী ফোকার দেখা মিলল, আমরাও নীচে নেমে গেলাম। গ্রিশাও ফোঁপাতে ফোঁপাতে আর জড়ানো অস্পষ্ট স্বরে বিড়-বিড় করতে করতে আমাদের পিছু পিছু নামে, নামবার পথে প্রতিটি সিঁড়িতে লাঠি ঠুকে ঠুকে দেখে। বাবা আর মা বসবার ঘরে এসে ঢুকলেন হাতে হাত দিয়ে, নীচু গলায় কথা বলতে বলতে। মেরিয়া আইভানোভ্না একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে সোজা শক্ত হয়ে বসে, পাশে বসা মেয়েদের কঠিন নীচু গলায় তিরস্কার করছিল। কার্ল ইভানিচ্‌কে ঘরে ঢুকতে দেখে সে একবার একটু চোখ তুলে তাকাল বটে কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল তখুনি, ভাবটা যেন, "কার্ল ইভানিচ্, তুমি আমার মনোযোগের অযোগ্য।" মেয়েদের চোখগুলো স্পষ্ট নীরব ভাষায় জানাচ্ছে যে বিশেষ দরকারী কিছু খবর দেবার জন্যে ছটফট করছে মনে মনে—কিন্তু মুস্কিল হল লাফালাফি করে আমাদের কাছে আসাটা আবার মিমির ব্যবহারিক নিয়মের বিরুদ্ধে। আমাদেরই প্রথমে এগিয়ে গিয়ে বলতে হবে, "সুপ্রভাত মিমি" আর সেই সঙ্গে মেঝেতে বুটটা সামান্য একটু ঠোকা—তবে গিয়ে অনুমতি মিলবে কথাবার্তা বলার।

উঃ কি অসহ্য ছিল এই মিমি! ওর সামনে কোন কথাই বলা চলত না—সবাই নাকি অন্যায় আর অসঙ্গত ওঁর মতে! তাছাড়া ভদ্রমহিলা প্রতিমুহূর্তেই আমাদের খোঁচাতেন ফ্রেঞ্চ বলাবার জন্যে। এককে সময় মনে হত যেন হিংসে করেই এমনি জ্বালাতন করেন। সে মুহূর্তে হয়তো আমাদের খুব মন চাইছে রাশিয়ান ভাষায় একটু গল্পগুজব করতে অথবা খেতে বসে হয়তো একটা রান্নার স্বাদ খুব ভাল লেগেছে, নিজের মনে আয়েস করে একটু একটু করে চাখছি—অমনি নিঃসন্দেহে উনি চট্ করে বলে উঠলেন, "রুটি খাও, রুটি খাও ওর সঙ্গে"। অথবা "এ্যা, তোমার কাঁটা কোথায় গেল?"

……আচ্ছা বাপু তার সবতাতে সর্দারী কেন? আমরা দাঁত কিড়মিড় করতাম, "সে তার মেয়েদের শেখাক, আমাদের জন্য তো কার্ল ইভানিচই রয়েছেন।" এইজন্যই কার্ল ইভানিচের 'কোনো কোনো লোকদের' ওপর এত ঘৃণা—আমি খুব সমর্থন করি।

"এই, মাকে বল না আমাদেরও যেন শীকারে নিয়ে যান"—বড়রা সব খাবার ঘরে চলে গেলে কাটেনকা আমার জামার হাতাটা ধরে টেনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে।

"আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করব।"

গ্রিশাও খাবার ঘরে বসেছে, তবে ওর একটা ছোট টেবিল আলাদা। সে তার প্লেট থেকে একবারও চোখ তুলছে না, বিকৃত নানা মুখভঙ্গি করে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর নিজের মনেই কি সব বিড়বিড় করছে…দুঃখের কথা…সে উড়ে চলে গেছে…কপোত উড়ে চলে যাবে স্বর্গে…ওঃ কবরে একখণ্ড পাথর…ইত্যাদি ইত্যাদি, পাগলের নানা প্রলাপ।

মা-মণির মনটা আজ সকাল থেকেই ভার-ভার; তার ওপর গ্রিশার উপস্থিতি, তার অসংলগ্ন কথাবার্তা আর হাবভাব, আরও বোধহয় বেশী বিব্রত করে তুলল তাঁকে।

"ও, হ্যা, আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম একটা কথা তোমাকে বলতে,"—বাবাকে এক প্লেট স্যুপ এগিয়ে দিতে দিতে মা বলেন।

"কি, বল তো?"

"দয়া করে তোমার ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোকে একটু বেঁধে রেখো। বেচারা গ্রিশা তখন চাতালটা পার হচ্ছিল আর ওকে প্রায় কামড়েই দিয়েছিল। ছেলেদেরও আক্রমণ করতে পারে কোন সময়।"

নিজের নামটা কানে যেতে গ্রিশা মুখ তুলে টেবিলের দিকে তাকায়, তারপর জামার ছেঁড়া লেশগুলো দেখিয়ে খাবার-ভর্তি মুখে বিড়বিড় করে বলতে থাকে।…

"কামড়ে মেরে ফেলার মতলব…ভগবান করতে দেবেন না।…পাপ, পাপ, কুকুর লেলিয়ে দেওয়া পাপ! মেরো না, বলশাক* মেরো না…কেন মারা? ভগবান ক্ষমা করবেন…সময় বদ্‌লে গেছে এখন।"

* গ্রামের, পরিবারের অথবা কোন ধর্মীয় দলের নেতা।

কঠিন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করতে করতে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, "কি বলছে ও ? একটা কথাও বুঝতে পারছি না।"

"আমি—আমি অবশ্য পারছি বুঝতে", "মা জবাব দেন, "ও বলছে কোন কোন কুকুরের রক্ষী ওর ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয় ইচ্ছে করেই, ওকে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে। কিন্তু তার জন্য তুমি যেন লোকটাকে কোন শাস্তি দিও না। সেই অনুরোধ জানাচ্ছে।"

"ও, তাই বল। কিন্তু ও কি করে জান্‌ল যে লোকটিকে শাস্তি দিতে চাই আমি ? তুমি জান, এ ধরনের লোকদের মোটেই পছন্দ করি না আমি ; আর…" বাবা এবার ফরাসীতে যোগ করলেন, "বিশেষ করে এটি, এটিকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। উচিত হচ্ছে…"

মা যেন একটু ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি বাধা দেন, "বলো না গো, অমন করে বলো না।" ওর সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জান ?

"আমার ধারণা, এ ধরনের লোকদের বেশ ভাল করে জানার যথেষ্ট সুযোগই আমি পেয়েছি। তোমার কাছে অনেকে আসে এরকম—সবাই এক ধরনের। সেই পুরনো গল্পকেই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা।"

এটা স্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে মায়ের ধারণা সম্পূর্ণ অন্যরকম। কিন্তু এ নিয়ে কোন তর্ক তুললেন না তিনি।

"আমাকে একটা প্যাটী দেবে ?" মা কথা ঘুরিয়ে নিলেন," "ভাল তৈরি করেছে তো ?"

বাবা একটা প্যাটী তুলে নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন বটে, কিন্তু সেটাকে মায়ের ঠিক নাগালের বাইরে রেখে বলতে থাকেন, "বিরক্তি লাগে, আমার ভীষণ বিরক্তি লাগে যখন দেখি বুদ্ধিমান, মার্জিত লোকেরা এদের ফাঁদে পড়ে।" কাঁটাটা তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর একটা ঘা দেন বাবা।

"একটা প্যাটী দিতে বলেছিলাম তোমাকে"—হাত বাড়িয়ে প্যাটীটা নেবার চেষ্টা করেন মা।

"এ সমস্ত লোকদের"—বাবা হাতটা আরও একটু দূরে সরিয়ে নেন,—"যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন খুব ভাল কাজই করা হয়। এদের কাজই হল খালি দুর্বল প্রকৃতির লোকদের বশ করা…।" এ আলোচনায় মা খুবই অসন্তুষ্ট হচ্ছেন দেখে বাবা সামান্য একটু হাসলেন, তারপর প্যাটীটা দিয়ে দিলেন।

"দেখ, এ বিষয়ে একটা মাত্র কথাই বল্‌বার আছে আমার। এ কথা বিশ্বাস

করা খুবই শক্ত যে একটা লোক যে নাকি ষাট বছর বয়স পর্যন্ত খালি পায়ে বেড়াল, কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম, জামার নীচে গলায় একটা হার পরে, নিদেন পক্ষে তার ওজন দুই পুড, খোলে না কখনো স্বাভাবিক সহজ জীবনযাপনের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে বহুবার, এমনি একটা লোক—এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে সে এসব করছে কেবলমাত্র কুঁড়েমির জন্যে?"

"আর ভবিষ্যৎবাণীর কথা যদি বল", একটু থেমে ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা যোগ দেন, "আমি বোধহয় তোমাকে বলেছি কিরুসা কিভাবে বাবার মৃত্যুর সঠিক দিন এমনকি সমাধি পর্যন্ত বলে দিয়েছিল?"

"এই যাঃ, তুমি কি করলে?" বাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন; মিটিমিটি হাসতে হাসতে, মিমি যেদিকটায় বসেছিল সেদিকে গালে হাত দিয়ে হতাশ একটা ভঙ্গী করে বললেন, (বাবা এরকম করলে আমি সবসময় কান খাড়া করে থাকি মজার কিছু শুনব বলে) "আমাকে তার পায়ের কথা মনে করিয়ে দিলে কেন? আমি তাকিয়ে ফেলেছি, এখন আর কিছু মুখে তুলতে পারব না।"

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লিউবোচকা আর কাটেনকা খালি আড়চোখে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, উস্‌খুস্ করছে চেয়ারে বসে! আড়চোখে তাকাবার মানেটা অবশ্য হচ্ছে, "এই, আমাদের শীকারে নিয়ে যাবার কথাটা তুলছ না কেন?" আমি কনুই নিয়ে একটা খোঁচা মারলুম ভলোদিয়াকে; ভলোদিয়া মারল আমাকে, শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই সাহস সঞ্চয় করে শুরু করল বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে। সে বলতে থাকে—প্রথমে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে, তারপর জোরে—যেহেতু আমরা আজ চলে যাচ্ছি, তাই আমাদের ইচ্ছে যে মেয়েদেরও যেন আজ আমাদের সঙ্গে শীকারে নিয়ে যাওয়া হয়। বড়দের মধ্যে সামান্য একটু আলোচনা হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটে আমাদেরই স্বপক্ষে। এর ওপর আবার মামণি যখন জানালেন যে তিনিও আসবেন, খুশির আর অন্ত রইল না আমাদের।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শীকারের আয়োজন

খাওয়ার শেষেরদিকে ইয়াকভের ভার পড়ল—গাড়ি, কুকুর, জিন দেওয়া ঘোড়া সব কিছু সম্বন্ধে খুঁটিনাটি করে হুকুম দেওয়া হল। ঘোড়াগুলোকে এমনকি নাম করে করে ঠিক করে দেওয়া হল। ভলোদিয়ার সাধারণ ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে গেছে, তাই বাবা তার জন্য একটা শিকারী ঘোড়ায় জিন কষাতে বললেন। এই "শিকারী" শব্দটা সবসময়ই মামণির মনে আতঙ্ক জাগায়—ওঁর মনে হয় সে ঘোড়াটা নিশ্চয় একটা বুনো আর ভয়ঙ্কর; নির্ঘাৎ ভলোদিয়াকে নিয়ে ছুট লাগাবে আর শেষে মেরে ফেল্‌বে। বাবা আর ভলোদিয়া নানাভাবে চেষ্টা করে মাকে আশ্বস্ত করতে; ভলোদিয়া বীরের মত বারবার জানাতে থাকে সেই তো ভাল। ঘোড়াটা দৌড় লাগালেই তো সবচাইতে বেশী মজা—কিন্তু বেচারী মা, তাঁর ভয় একটুও কমে না, খালি বলতে থাকেন সারাটা পথ তিনি আর বিন্দুমাত্র শান্তি বা স্বস্তি পাবেন না

খাওয়া শেষ হল; বড়রা সব লাইব্রেরীতে চলে গেলেন কফি খেতে। আমরা ছোটরা ছুট লাগালাম বাগানের দিকে,—বাগানে যাবার পথটাতে হলুদ রঙের পাতা টুপটাপ ঝরে পড়ছে, তাতে পা ঘসতে ঘসতে কত কথা হল আমাদের: ভলোদিয়া কি করে তেজী ঘোড়াটায় চাপবে, কি লজ্জার কথা লিউবোচ্‌কা কাটেনকার মত জোরে দৌড়তে পারে না, গ্রিশার গলার হারটা দেখতে পেলে কেমন মজা হত ইত্যাদি ইত্যাদি। আসন্ন বিদায়ের কথা কেউ একটিবারও তুললাম না! আমাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ল, একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল, একটা করে বাচ্চা চাকর প্রত্যেকটা পাদানীতে দাঁড়িয়ে গাড়িটার পেছন পেছন এল হাউণ্ডগুলোর রক্ষী, কুকুরের পাল তাড়িয়ে নিয়ে, তার পেছনে আমাদের গাড়ির চালক ইগ্‌নাট, ভলোদিয়ার ঘোড়াটাতে চেপে, আর আমার জিন দেওয়া ঘোড়াটার রাশ ধরে। আমরা দুরে বাগানের রেলিংএর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, মজার জিনিসগুলো সব ভাল করে দেখতে তারপর সেখান

থেকে সব দৌড় লাগালাম ওপরে, খুশির চোটে চেঁচাতে চেঁচাতে আর পা ঠুকতে ঠুকতে। যতদূর সম্ভব আসল শীকারীর মত সাজপোশাক করতে হবে! এর একটা উপায় হচ্ছে প্যাণ্টের পায়ের দিকটা বুটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। ঝটপট সেটা সেরেই আবার ছুটে গেলাম বারান্দায়; কুকুর আর ঘোড়াগুলোকে প্রাণ ভরে দেখে নিই আর রক্ষীদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলি।

দিনটা বেশ গরম—সারাটা সকাল ধরে দিগন্তে সাদা মেঘের দল খেলা করে বেড়াচ্ছে। আরও একটু বেলায় সামান্য জোর হাওয়ার পাখায় ভর দিয়ে মেঘগুলো কাছে, আরও কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু এবারের মেঘ ঘন আর কালো—বেশ বোঝা গেল এ মেঘ ঝড়ও আনেনি, বাজও না অর্থাৎ আমাদের বেড়াবার আনন্দটুকু নষ্ট করতে পারবে না। সন্ধ্যের দিকে মেঘের রাশি আবার হালকা হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল : কতকগুলো বিবর্ণ হয়ে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে দিগন্তে মিশে গেল···আর বাকীগুলো মাথার ওপর ঝুলে রইল হাল্কা সাদা মেঘ হয়ে। কেবল পুব দিকে একখণ্ড ঘন কালো মেঘ লেগেই থাকল। কার্ল ইভানিচ্ সব সময়ই জানেন কোন্ মেঘ কখন কোন্ দিকে যাবে—তাঁর মতে এই মেঘ যাবে মাসলোভকার দিকে, বৃষ্টি হবে না আর আবহাওয়া ভালই থাকবে বেশ।

ফোকার যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্বেও প্রচুর উৎসাহ সহকারে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল, চীৎকার করে হুকুম দিল, "গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে এস আর নিজে গাড়ি দাঁড় করাবার জায়গা আর দরজার চৌকাঠ এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় পা দুটো ফাঁক করে বেশ মুরুব্বি চালে দাঁড়িয়ে রইল : ভাবটা যেন 'আমার কর্তব্য আমি ঠিকই জানি, তা আর মনে করিয়ে দিতে হয় না কাউকে।' মেয়েরা একে একে গাড়িতে চড়লেন তারপর কে কোন্দিকে বসবেন আর কে কাকে ধরবেন তা নিয়ে সামান্য কথা-কাটাকাটি করে যে যার জায়গা ঠিক করে বসে পড়লেন। ছোট ছোট রঙচঙে ছাতা খুলে সবাই মাথায় ধরলেন,—গাড়িও ছেড়ে দিল। গাড়ি চলতে শুরু করলে শিকারী ঘোড়াটির দিকে আঙুল দেখিয়ে মা কাঁপাস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন কোচোয়ানকে, এই ঘোড়াটাই কি ভ্লাদিমি পেট্রোভিচের জন্য? কোচোয়ান ইশারা করে হাঁ বলাতে মা হাতটা চিত করে একটা বিশেষ ভঙ্গী করে মুখ ফেরালেন। আমি ততক্ষণে একেবারে অধৈর্য ; নিজের ঘোড়াটাতে চেপে সোজা তার দুচোখের মাঝখানে দৃষ্টি রেখে আঙ্গিনার চারধারে পাক দিয়ে বেড়াতে থাকি।

রক্ষীদের মধ্যে একজন ডেকে বলল "দেখবেন কুকুরগুলোকে চাপা দেবেন না যেন।"

"না, না কিছু চিন্তা করো না—আমি এর আগেও ঘোড়ায় চড়েছি।" বেশ গর্বের সঙ্গে জবাব দিই।

ভলোদিয়া চড়ল তার নির্দিষ্ট ঘোড়ায়। যথেষ্ট সাহস থাকা সত্ত্বেও ওঠবার সময় গাটা কয়েকবার কেঁপে উঠল, পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বার কয়েক জিজ্ঞাসাও করল, "ঘোড়াটা শান্ত তো ?"

ঘোড়ার পিঠে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল ওকে—ঠিক যেন বড়দের মতন। জিনের ওপর ওর পাদুটো এমন সুন্দর খাপে খাপে বসেছে যে আমার হিংসেই হচ্ছিল—আরও বিশেষ করে এই কারণে যে আমার নিজের ছায়াটা সামনে দুলছে, তাই দেখে অনুমান করছি ওর চেহারার আভিজাত্যের বিন্দুমাত্রও আমার ভেতর নেই।

এতক্ষণে সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শোনা গেল ; ছোট্ট কুকুরগুলোর চালক চারিদিকে ছিটিয়ে-পড়া হাউণ্ডগুলোকে একজায়গায় জড় করল, কুকুরের রক্ষীটা চিৎকার করে গ্রে-হাউণ্ডগুলোকে ডাকতে ডাকতে টপাটপ ঘোড়ায় চড়তে লাগল। চাকর ঘোড়াটা নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল সিঁড়ির মুখে—বাবার কুকুরগুলো ছবির মত ভঙ্গী করে চারিদিকে ছড়িয়ে শুয়ে ছিল। এবার সবকটা একসঙ্গে দৌড়ল তার দিকে। তারপর এল মিলকা, গলায় মোতির মালা টুং টাং করে বাজছে। মিলকা চিরদিনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় অন্য কুকুরদের একটু আদর করে নেয়। আজও কারুর কারুর সঙ্গে একটু খেলা করল, কাউকে একটু শুঁকে গরগর করে চারিদিকে ঘুরে বেড়াল, আর বাকী সকলের গায়ে পোকা বেছে দিল।

বাবা ঘোড়ায় চাপলেন, সবাই রওনা হলাম।

সপ্তম অধ্যায়

শীকার

কুকুর রক্ষীদের প্রধান, নাম টবেকা, সে চলেছে মস্ত বড় একটা ঘন ধূসর রঙের ঘোড়ায় চেপে ; একটা পুরনো বিচ্ছিরি টুপি মাথায়, কাঁধের ওপর বিরাট একটা শিঙ্গে, মস্ত একটা ছুরি ঝুলছে কোমরবন্ধ থেকে। মুখখানা অতি গম্ভীর ভয়াবহ,—দেখলেই মনে হবে যেন এটা সাধারণ শীকারের আয়োজন নয়, বিষম একটা রক্তক্ষয়ী কাণ্ডকারখানা করতে চলেছি কোথাও। তার ঘোড়ার পায়ে পায়ে দৌড়চ্ছে হাউণ্ডের দল—রঙবেরঙের জড়াজড়ি করা আঁকাবাঁকা বিরাট একটা তরঙ্গ। এদের মধ্যে যে একটু পিছিয়ে পড়ত তার আর রক্ষে নেই, তাব কপালে যা ঘটত দেখলে সত্যি দুঃখ হত। সে তার চেনে-বাঁধা অপর কুকুরটাকেও টানাটানি করতে শুরু করত আর সেই মুহূর্তেই পেছনের ঘোড়ার পিঠ থেকে ছপাং করে চাবুক এসে পড়ত তার পিঠে, "যাও, দৌড়ও শীগ্‌গির দলে গিয়ে মেশ।"

আমরা ফটক পার হতেই বাবা আমাদের আর চাকরবাকরদের হুকুম দিলেন সোজা বড় রাস্তা ধরে ঘোড়া চালাতে আর নিজে একটা সরষের খেত লক্ষ্য করে চাবুক কষলেন।

পুরো ফসলের সময় ; চোখধাঁধানো হলুদ রঙের তরঙ্গায়িত মাঠ বিস্তৃত হয়ে রয়েছে দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে, একদিকে গিয়ে মিশেছে নীলাভ উঁচু বনের ধারে—এই বনটা আমার কাছে মনে হয় যেন দূরে, বহুদূরে, আর কি এক রহস্যময়, ওর পিছনে হয়তো পৃথিবীটাই শেষ হয়ে গেছে, নয়তো শুরু হয়েছে একটা অজানা রাজ্য। গোটা মাঠটা জুড়ে মাঝে মাঝে কাটা ফসলের ছোট ছোট আঁটি আর মানুষ। এখানে সেখানে যে সব দিকগুলোতে ফসল কাটা হয়ে গেছে, হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে যায় দোলায়মান শীর্ষের তরঙ্গের মাঝে একটা বাঁকানো পীঠ, দুহাতে ধরা তার ফসলের গোছা, নয়তো কোন একটা মেয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছায়ায় রাখা কোন দোলনার ওপর কিংবা ইতস্তত ছড়ানো ফসলের

আঁটির ওপর—কাটা ফসলের গোড়া আর নীলচে রঙের মেঠো ফুলে ভর্তি মাঠ। লম্বা জামা গায়ে কৃষকেরা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে, ফসলের আঁটি বোঝাই করছে, শুকনো পোড়ো জমিতে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে। ফসলকাটার খবরদারী করছিল যে লোকটি, লম্বা বুট পায়ে কাঁধের ওপর আলগা করে ঝোলানো আরমুয়্যাক*। আর হাতে মাপের হিসাব রাখবার ছোট ছোট লাঠির বাণ্ডিল—দূর থেকে বাবাকে দেখতে পেয়ে পশমের টুপিটা মাথা থেকে সে খুলে নিল, একটা তোয়ালে দিয়ে লালচে মুখ আর দাড়ি বেশ করে মুছে নিয়ে একটা জোর হাঁক পাড়ল মেয়েদের উদ্দেশ্যে। বাবার ঘোড়াটা বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে দুলকি চালে চলছে, মাঝে মাঝে মাথাটা নীচু করে রাশে টান লাগছে আর লোমওয়ালা মস্ত লেজের ঝাপটা মেরে গা থেকে মশা-মাছি তাড়াচ্ছে। ঘোড়াটার খুরে খুরে দৌড়চ্ছে দুটো গ্রে হাউণ্ড। কাটা ফসলের লম্বা গোড়াগুলো ছাড়িয়ে তাদের লেজদুটো হেলছে দুলছে, বাঁকানো কাস্তের মত। মিলকা দৌড়চ্ছে সামনে সামনে, মাথাটি অল্প ঘোরানো পিছন দিকে—কিছু একটা আশা করে। কথাবার্তার গুঞ্জন, গাড়ি আব ঘোড়াগুলোর শব্দ, কোয়েইল পাখির আনন্দভরা শিস, মাথার ওপর বাতাসে একঝাঁক পোকামাকড় তাদের সন্‌সনানি, তেঁতো গাছের শেকড়, খড় আর ঘোড়ার ঘাস—এই তিনে মেশানো একটা কটু গন্ধ। উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফসলের গোড়ার ওপর চোঁখ ধাঁধানো সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে কত না রঙের আবছায়ার খেলা, দূরের বনের নীলচে আর মেঘের হাল্‌কা বেগুনি রঙ, সাদা সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, অথবা কাটা ফসলের গাছে পড়েছে—এ সমস্তগুলোর প্রতিটি জিনিস আমি দেখ্‌লাম, শুনলাম আর অনুভব করলাম সমস্ত হৃদয় দিয়ে।

কালিনোভো বনে পৌঁছে দেখি গাড়িটা আগেই পৌঁছে গেছে, আর সব চাইতে আনন্দের, যা আমাদের আশার অতীত তাই অর্থাৎ অদূরে একটা দুচাকার গাড়ি, তার ওপর বসে বাবুর্চি। একটা সামোভার উঁকি মারছে খড়ের তলা থেকে, একটা বরফের পাত্র আরও নানা রকমারি সব বাক্স, আর বেতের ঝুড়ি—রীতিমত উত্তেজক ব্যাপার! এ ইঙ্গিতগুলোর মানে বুঝতে একটু ভুল হল না—তার মানে আমরা খোলা মাঠে বসে খাব চা, আইসক্রীম, ফল ইত্যাদি। গাড়িটা দেখেই আনন্দে হল্লা করে উঠলাম সবাই—বনের ভেতর ঘাসের ওপর

* লম্বা চওড়া এক জাতীয় মস্ত বড় কোট যা সাধারণত কৃষকেরা ব্যবহার করে।

বসে চা খাবার খাওয়া কি ভীষণ মজা, আবার বিশেষ করে এমন জায়গায় যেখানে কেউ কোনদিন খায় নি। ওঃ কি মজা!

টারকা এই ছোট বনটাতে এসে থামল—মন দিয়ে বাবার সব আদেশ শুনল, খুঁটিনাটি সব উপদেশ—কোনদিক দিয়ে তাড়া করতে হবে, কোথা থেকে আক্রমণ করবে ইত্যাদি সব (যদিও সে কোন্‌দিনই এ সব উপদেশ শুনে কাজ করে না, করে নিজের যা ইচ্ছে তাই) তারপর কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে, ধীরে সুস্থে বগলসগুলোকে সাজিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে ছোট বার্চগাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাউণ্ডগুলো এতক্ষণ পর ছাড়া পেয়ে কি খুশি যে হল—গা ঝাড়া দিয়ে মাটি শুঁকে লেজ নাড়তে নাড়তে যে যার ইচ্ছেমত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"একটা রুমাল আছে?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন। পকেট থেকে একটা টেনে বার করে দেখালাম।

"বেশ, এই ধূসর রঙের কুকুরটার গলায় বাঁধ।"

"ঝিরান?" এবার বুঝতে পারছি।

"হ্যা—এবার রাস্তা ধরে ছুট লাগাও। যখন ছোট্ট একটা মাঠের ধারে পৌঁছবে তখন থেমে চারিদিকে নজর কর। অন্তত একটা খরগোস না ধরে আমার কাছে ফিরে এসো না কিন্তু।

ঝিরানের লোমওয়ালা গলায় রুমালটা বেঁধে পড়ি কি মরি করে ছুট লাগালাম। বাবা হাসতে হাসতে পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "ছোট, ছোট, আরও জোরে, নইলে দেরী হয়ে যাবে।"

ঝিরান দাঁড়িয়ে পড়ে, কান খাড়া করে, শীকারের সাড়াশব্দ শুনতে থাকে; আমি প্রাণপণ হেঁচড়েও একটুও নড়াতে পারছি না ওকে, তখন গলা ছেড়ে চীৎকার শুরু করলাম, "তালী হো, হ্যা···লো।" এবার ঝিরান একটা হ্যাচকা টান মেরে এমনি কষে ছুট লাগাল যে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে আমি বেশ বারকয়েক লুটোপুটি খেলাম মাটিতে। একটা ঝাঁকড়া উঁচু ওক গাছ বেছে নিয়ে তার ছায়ায় ঘাসের ওপর শুয়ে, ঝিরানকেও শুইয়ে দিলাম পাশে, তারপর অপেক্ষায় রইলাম। এমনি সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়,—আমার বেলাতেও তাই হল, কল্পনা আমাকে বয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে বাস্তবকে ছাড়িয়ে। কল্পনায় যখন আমি তৃতীয় খরগোসটার পিছু ধাওয়া করছি, এমন সময় প্রথম হাউণ্ডটার চীৎকার শুনতে পেলাম। টারকার গলার পরিষ্কার জোর

আওয়াজ ভেসে এল বনের ভেতর থেকে—একটা হাউণ্ড ভয় মেশানো সুরে নীচু গলায় ডাকল প্রথমবার, তারপর বার বার কয়েকবার ; এবার আরও বেশী গম্ভীর একটা আওয়াজ যোগ দিল, তারপর তৃতীয়, তারপর চতুর্থ। ডাকের জোর ক্রমশ বাড়তে বাড়তে শেষে একটানা একটা বিষম গর্জন বনকে কাঁপিয়ে তুলল। রক্ষীদের ভাষায়, কুকুর নয়—বনটা নিজেই নাকি গর্জন ছাড়ছে।

আমি নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে বসে আছি। বনের প্রান্ত লক্ষ্য করতে করতে কেমন একটু বোকার মত হাসলাম। ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে জবজবে—গাল বেয়ে বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু মুছতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি এই মুহূর্তটির মত দরকারী পৃথিবীতে আর কিছু নেই, এই মুহূর্তেই সবকিছুর সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। চরম উত্তেজনার মুহূর্ত—এ ভাব বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না। বনের প্রান্ত থেকে হাউণ্ডগুলোর ডাক মিইয়ে এল—কিন্তু কোনদিকেই খরগোসের কোন পাত্তা নেই। চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। ঝিরানেরও আমার মতই অবস্থা ; প্রথমে গরগর করে খানিকটা ঘুরে বেড়াল, তারপর পাশে শুয়ে আমার হাঁটুতে নাকটা রেখে চুপচাপ পড়ে রইল।

যে ওক গাছের নীচে আমি বসেছিলাম, তার গুঁড়িতে কাতারে কাতারে পিঁপড়ের সারি চলে বেড়াচ্ছে—ছড়ানো শেকড়ের ফাঁকে ফাঁকে, রোদে-পোড়া তামাটে জমিতে···, ঝরে পড়া ওক গাছের পাতার রাশিতে আর ফলে, হলদে সবুজ আগাছার ঝোপে, আর পাতলা ঘাসের সবুজ শীষে।

ওরা নিজেদের তৈরি পথে দ্রুতলাফে সবাই চলেছে ; কারুর কাঁধে ভারী বোঝা কেউ বা খালি হাত পা। ছোট একটা ডাল তুলে নিয়ে আমি ওদের পথে পেতে দিলাম। কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলাম কি ভাবে কেউ কেউ সব বিপদ অগ্রাহ্য করে বেয়ে বেয়ে ডালের ওপর উঠতে লাগল, আর অন্যেরা বিশেষ করে যাদের সঙ্গে বোঝা আছে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল, হতভম্ব হয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কেউ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, কেউ বা ঘুরে ঘুরে অন্য একটা পথ খুঁজে ফিরতে লাগল, কেউ ফিরে চলল, আবার কেউ কেউ বা গাছের ডাল বেয়ে বেয়ে আমার হাতের ওপর উঠতে চেষ্টা করল—মতলব বোধ হয় জামার হাতায় আশ্রয় নেবে। এমনি সব মজার মজার জিনিস থেকে আমার দৃষ্টি এবার আকৃষ্ট হল হলুদ রঙের পাখাওয়ালা একটা প্রজাপতির দিকে—খুব কাছেই উড়ে উড়ে প্রলুব্ধ করছিল আমাকে। যেই আমি মনোযোগ দিলাম ওর দিকে অমনি ও উড়ে কয়েক পা দূরে সরে গেল, গোল হয়ে হয়ে

ঘুরতে লাগল ওখানেই। ও কি সূর্যের আলোয় গা গরম করছে নাকি আগাছা থেকে রস টেনে নিচ্ছে কে জানে; কিন্তু উপভোগ যে করছে, সেটা স্পষ্ট। মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটে উড়ে যায় ফুলের কাছে, নিশ্চল হয়ে থাকে গাছ ঘেঁসে। আমি মাথা দোলাতে দোলাতে খুশী মনে ওদের হালচাল লক্ষ্য করতে লাগলাম। হঠাৎ চীৎকার করে উঠে ঝিরান এমন একটা হ্যাঁচ্কা টান লাগাল যে আমি প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম। মুখ তুলে তাকালাম। বনের ধারে একটা ছোট্ট খরগোস লাফিয়ে উঠল,—একটা কান খাড়া, একটা নীচু। ছলাৎ করে মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল আমার, মুহূর্তের জন্য সব কিছু ভুলে তীব্র একটা চীৎকার করে উঠ্লাম—কুকুরটা যাক্, ওর পিছনে ধাওয়া করুক। কিন্তু একটা মুহূর্ত; তার পরেই আমাকে অনুতাপ করতে হল ভীষণভাবে—খরগোসটা কান খাড়া করে একটা লাফ দিল, ব্যস্, আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

এর পরে যখন দেখতে পেলাম খরগোসের সেই জায়গা থেকে তাড়া করে বেরিয়ে এল কতগুলো হাউণ্ড আর,···আর তাদের পেছনে টারকা একটা ঝোপের আড়াল থেকে। আমার অপমানের তখন আর সীমা রইল না। আমার ভুলটা ও দেখতে পেয়েছে (অপেক্ষা করেনি, সেটাই আমার ভুল)। আমার দিকে তাকিয়ে ধিক্কার দিয়ে শুধু বলল, "এই ঝরিন*।" ব্যস্ এই কথাটুকুই। কিন্তু তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে, সে স্বরে আমার মনে হল এর চাইতে ও আমাকে ওর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল না কেন একটা খরগোসের মত?

গভীর হতাশায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কতক্ষণ কে জানে! না পারলাম কুকুরটাকে ডেকে ফেরাতে না পারলাম নিজে কিছু করতে কেবল নিজের উরুতে চাপড় মারতে মারতে বার বার মনে মনে হা-হুতাশ করতে লাগলাম, "হায়, হায়, এ আমি কি করলাম, আমি কি করলাম!"

শুনতে পেলাম হাউণ্ডগুলো দূরে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, শুনতে পেলাম বনের অপর পারে কুকুরগুলো সব একসঙ্গে গর্জন করে উঠ্ল, তারপর খরগোসটাকে মারল, শুন্লাম টারকা ডাক্ছে কুকুরগুলোকে চাবুকের শব্দ করে—কিন্তু, তবুও আমি নড়লাম না একচুলও।

* ঝরিন—প্রভু

অষ্টম অধ্যায়

খেলা

শীকার শেষ হয়েছে। বার্চগাছের ছায়ায় একটা গালচে বিছানো, সবাই জড় হয়েছে সেখানে। নরম সবুজ ঘাসের দল মাড়িয়ে মাড়িয়ে বাবুর্চি গ্যাভরিলো খাবারের প্লেটগুলো মুছে পরিষ্কার করল তারপর পাতায় জড়ানো খেজুর আর পীচের বাক্সগুলো উজাড় করে প্লেটগুলো বোঝাই করল। সূর্য চারিদিকে কিরণ ছড়াচ্ছে ; চারা বার্চগাছের সবুজ ডালপালা ভেদ করে তার বাঁকা রশ্মি এসে লুটিয়ে পড়ছে গালচের নক্সায়, আমার পায়ে, এমনকি গ্যাভ্রিলোর ঘামে-ভেজা টেকো মাথার ওপরেও। চমৎকার মন-মাতানো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে গাছের ফাঁকে ফাঁকে, আমার আগুন-ঝরা মুখ আর চুল নিয়ে খেলা করছে।

বরফ আর ফল শেষ করে ফেলার পর আমাদের আর গালচেতে বসে থাকার কোন উৎসাহ রইল না। সূর্য হেলে পড়েছে, রোদ একটু বাঁকা হয়ে এসে পড়ছে, কিন্তু তবুও বেশ কড়া—তা হোক্, আমরা তা গ্রাহ্য না করেই চলে গেলাম খেলতে।

ঘাসের ওপর লাফাতে লাফাতে আর চড়া রোদে চোখ পিটপিট করতে করতে লিউবোচ্‌কা জিজ্ঞেস করে, "এবার কি খেলা হবে? এস, সেই রবিনসনের খেলা খেলি।"

"নাঃ, একঘেয়ে"—চারিদিকে শেকড় ছড়ানো ঘাসের চাপড়ায় আলসেমী করে গড়াতে গড়াতে আর দাঁত দিয়ে একটা শীষ কাটতে কাটতে ভলোদিয়া বলে, "সব সময় ঐ একই খেলা খেলছি আমরা। যদি খেলতেই হয়, বরঞ্চ ডালপালা দিয়ে একটা ছায়াঘেরা ঘর বানানো যাক্।"

ওঃ, ভারী ভারিক্কি চাল দেখাচ্ছে ভলোদিয়াটা : শিকারী ঘোড়াটায় চেপে এসেছে বলে ভারী গর্ব, তাই ভাব দেখাচ্ছে যেন কতই না পরিশ্রান্ত! আর নয়তো ও এত বোকা কল্পনা-শক্তি এত কম যে 'রবিনসন্' খেলাটার মজাটাই ও

ধরতে পারে না। 'রবিনসন স্থইসে' (স্থইস্ পরিবার রবিনসন) বইটা থেকে কয়েকটা দৃশ্য অভিনয় করে এই খেলাটা জমানো—সম্প্রতি বইটা পড়েছি আমরা।

"ওঃ, লক্ষীটি···অন্ততপক্ষে আমাদের জন্যও শুধু দোহাই তোমার", মেয়েটা পীড়াপীড়ি করতে থাকে। "তুমি তোমার ইচ্ছে মতন সাজ, চার্লস, আর্নেস্ট, অথবা বাবা যা ইচ্ছে তাই"—কাটেনকা ওর জামার হাতা ধরে টেনে মাটি থেকে ওঠাতে চেষ্টা করে।

"আমার সত্যিই ইচ্ছে করছে না, এত ক্লান্ত", ভলোদিয়া তৃপ্তির হাসি হেসে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে।

লিউবোচ্কার চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে, "কেউ যদি নাই খেলবে, তবে বাড়িতে থাক্লেই তো হত!" বিষম ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে এটি!

"বাপরে বাপ, আচ্ছা, আচ্ছা এস তবে, কেবল দয়া করে কেঁদো না। ঐটি আমার সয় না।"

ভলোদিয়া মুরুব্বি চাল দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলতে রাজী হল বটে, আমরা কিন্তু কেউ একটুও খুশী হতে পারলাম না; বরঞ্চ ওর প্রাণহীন, এলোমেলো ধরনে আমাদের খেলাটার উৎসাহই মাঠে মারা গেল। যখন সবাই মাটিতে বসে দাঁড় টানার ভঙ্গীতে জোরে জোরে হাত নাড়ছি, যেন নৌকা বেয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছি, ভলোদিয়া কারুর কথা না মেনে হাত দুখানা ভাঁজ করে শক্ত হয়ে বসে রইল—সেটা আর যাই হোক্ অন্ততপক্ষে কোন জেলের ভঙ্গী নয়! আমি তাই বলাতে আবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠ্ল—ওমনিভাবে হাত নেড়ে নাকি কোন লাভই নেই, একচুলও কি এগোতে পারব ওতে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিতে হল ওর কথা। যখন শীকারের পালা, একটা লাঠি কাঁধে নিয়ে; আমি বনের দিকে রওনা হলাম—ভলোদিয়া মাথার তলায় হাত দিয়ে সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আবার বলে দিল আমি যেন কল্পনা করে নিই যে সেও চলেছে আমার সঙ্গে। এই ধরনের বক্তৃতা আর ব্যবহার আমাদের সবায়ের উৎসাহের মাথায় জল ঢেলে দিল, আমাদের এত খারাপ লাগল যে কি বলব! আরও বেশী খারাপ লাগছিল এই কারণে যে ভলোদিয়ার কথাই যে আসলে সত্যি এটা আমরাও মনে মনে স্বীকার না করে পারছিলাম না।

আমি নিজেই কি আর জান্তাম না যে আমার লাঠিটা দিয়ে পাখিকে গুলি করাই অসম্ভব, মারা তো দূরের কথা?—কিন্তু খেলা তো খেলাই! ও ভাবে যদি

তর্ক তোল তবে তো চেয়ারে বসে ঘোড়ায় চড়াও যায় না ; কিন্তু, মনে মনে ভাবলাম আমি ভলোদিয়ার তো অন্তত মনে পড়া উচিত শীতের লম্বা সন্ধ্যেগুলোতে আমরা কি করতাম—একটা হাতলওয়ালা চেয়ারের মাথায় কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে বনাতঢাকা গাড়ি তৈরি হত, আমরা একজন হতাম সইস আর একজন তকমা-আঁটা চাকর, মেয়েরা গোল হয়ে জড়াজড়ি করে বসত মাঝখানে, সামনে তিনখানা চেয়ার হত তিনটে ঘোড়া : তারপর আমাদের তিন ঘোড়ার জুড়িগাড়ি টগ্‌বগ্‌ করে চলতে শুরু করত। পথে যেতে যেতে কত ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে পড়তাম ! আর কি আনন্দে শীতের সন্ধ্যেবেলাগুলো উড়ে চলে যেত ! সব সময় খালি যদি বাস্তবের কথাই তোল তবে তো খেলা হয় না, আর খেলাই যদি না থাকল তো জীবনে আর বাকি রইল কি ?

নবম অধ্যায়

প্রথম প্রেমের মত

লিউবোচ্‌কা একটা গাছ থেকে ফল তোলবার ভান করছিল। হঠাৎ মস্ত শুঁয়োপোকা সমেত একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে হাতঝাড়া দিয়ে সেটাকে ফেলে লাফিয়ে পেছনে সরে আসে, এত ভয় যেন পোকাটা ওর গায়ে বিষ ছিটিয়ে দেবে! খেলা থেমে গেল, সবাই একসাথে জড়াজড়ি করে নীচু হয়ে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করে দেখতে লাগলাম জিনিসটা কি।

শুঁয়ো পোকাটার সামনে এক টুক্‌রো পাতা রেখে কাটেনকা সেটাকে তুলতে চেষ্টা করছে, আমি ঠিক ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মারলাম।

যে সব মেয়েরা গলাখোলা ফ্রক পরে, জামাটা নীচে নেমে গেলে লক্ষ্য করেছি, তাদের অনেকে কাঁধ দুটোর একটা বিশেষ ভঙ্গী করে জামাটাকে আবার জায়গা মতন তুলে নেয়। মনে পড়ছে মিমি ভয়ঙ্কর চটে যেত এই ভঙ্গী করতে দেখলে কাউকে। আজ পোকাটার ওপর নীচু থেকে কাটেনকা ঠিক সেই ভঙ্গী করলে আর···আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাতাসের একটা ঝাপটা লেগে ওর ধবধবে ফর্সা গলার রুমালটা খুলে গেল। ওর ছোট্ট ঘাড় আর আমার ঠোঁট দুটির মাঝে ব্যবধান মাত্র দুটি আঙুলের! পোকাটার দিকে আর আমার নজর নেই, কাটেনকার ঘাড়টা দেখছি তো দেখছিই—তারপর হঠাৎ এক সময় প্রাণপণে, আমার সমস্ত জোর দিয়ে চুমু খেয়ে দিলাম সেখানে। কাটেনকা ঘাড় ফেরাল না কিন্তু দেখতে পেলাম লাল রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল ওর ঘাড় এমন কি কান দুটিও। ভলোদিয়াও ঘাড় উঁচু না করেই ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, "বাঃ, কি ছেলেমানুষী"।

কিন্তু আমার চোখ দুটি ততক্ষণে জলে ভরে উঠেছে। কাটেনকার মুখ থেকে আমি আর চোখ ফেরাতে পারছি না। ওর ছোট্ট সুন্দর বুলবুলে মুখখানা তো কতদিন ধরেই দেখছি, সব সময় ভালও বেসেছি ঐ মুখখানাকে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আরও মন দিয়ে দেখলাম; আরও, আরও ভাল লাগল তাকে।

যখন আমরা বড়দের সঙ্গে গিয়ে মিশলাম বাবা জোর গলায় সবাইকে জানালেন যে মায়ের অনুরোধে আজকের মত আমাদের যাত্রা পিছিয়ে দেওয়া হল। কি আনন্দ!

গাড়ি রওনা হল; গাড়ির পাশে পাশে টগবগিয়ে চলেছি আমি আর ভলোদিয়া, কার কত সাহস আর কে কত ভাল ঘোড়া চড়তে পারে, দুজনে তার পাল্লা দিতে দিতে। আমার ছায়াটা এবার আগের চাইতে অনেক লম্বা—তাই কল্পনা করলাম, আমাকে দেখাচ্ছেও চমৎকার ঘোড়সোয়ারের মত। কিন্তু এই বিশ্বাস আর আত্মতৃপ্তি ভেঙে গেল একটু পরেই একটা ঘটনায়। আমি ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়লাম,—গাড়িতে যারা আছে তাদের একেবারে চমক লাগিয়ে দেব বলে। তারপর পিঠে চাবুক কষে আর জুতোর কাঁটা দিয়ে পেটে খোঁচা মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম উল্কাবেগে, নিজে মুখে চমৎকার একটা নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে তুলে বসে রইলাম সোজা হয়ে—মতলব গাড়ির যে দিকটায় কাটেনকা বসেছে সেই পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে যাব। সবে আমি ভাবছি মনে মনে যে চুপচাপ বিদ্যুতের গতিতে বেরিয়ে যাব, না গাড়িটার পাশ কাটাবার সময় বিরাট একটা হুঙ্কার ছেড়ে জানান দেব সবাইকে—ঠিক সেই মুহূর্তেই হতভাগা ঘোড়াটা গাড়ির ঘোড়াগুলোর পাশে আসামাত্রই এমনি এক বিষম ঝাঁকুনী মেরে চট্‌ করে থেমে দাঁড়াল যে আমি একেবারে জিনের ওপর থেকে ছিটকে গিয়ে লম্বা হয়ে পড়লাম ঘোড়ার গলা জড়িয়ে। পিঠ থেকে উল্টে প্রায় পড়েই গেলাম বলতে গেলে!

দশম অধ্যায়

কি প্রকৃতির লোক ছিলেন আমার বাবা ?

আমার বাবা ছিলেন গত শতাব্দীর লোক, তাঁর চরিত্রও ছিল তাই সেকালের বিশেষ বিশেষ দোষ আর গুণের একটি সুষ্ঠু সমন্বয় ; সিভারলি গ্যালাণ্ট্রী, কার্যক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস আর চরিত্রগত অসংযম অর্থাৎ সেকালের তরুণদের সব বিশেষত্বগুলোই আমার বাবার প্রকৃতিতেও প্রবল ছিল। বর্তমান কালকে মনে মনে তিনি বিদ্রূপ করতেন। একদিকে তাঁর অহমিকা, আরেকদিকে নিজের যৌবনে প্রতিটি পদক্ষেপে যে সফলতা আর অন্যের ওপর প্রভাব-বিস্তারের যে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, আজকের জীবনে কেন তা পুরোপুরি পাচ্ছেন না এই নিয়ে একটা গোপন অসন্তোষ—এই দুই-ই ছিল এই মনোভাবের গোড়াকার কথা। তাস আর মেয়েমানুষ—এই দুটিই ছিল জীবনের প্রধান নেশা। জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছেন তাসের খেলায়, আর যৌবন উপভোগ করেছেন সকল স্তরের অসংখ্য মেয়েমানুষ নিয়ে।

লম্বা, জাঁকালো চেহারা, অদ্ভুতরকম ছোট পদক্ষেপে হাঁটা। যখন তখন কাঁধে ঝাঁকুনী মারার অভ্যেস, ছোট চোখদুটি যেন হাস্‌ছে সব সময়ই, লম্বা একটু বাঁকা নাক, অসমান ঠোঁট জোড়া সব সময়ই চেপে বসা, একটু তোঁত্‌লা আর মাথায় একটি টাক—এই হল বাবার চেহারা যতদূর আমার মনে পড়ে। এই চেহারার জোরেই তিনি নাম কিনেছিলেন "বড়লোক" বলে, তা অবশ্য তিনি ছিলেনও ; এমন কি এর জোরেই তিনি প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সবার—প্রত্যেকের কাউকে বাদ না দিয়ে তিনি যে কোন স্তরের যে কোন অবস্থারই লোক হোন না কেন, বিশেষ করে তাঁদের যাদের তিনি খুশী করতে চাইতেন।

কি করে কাজ আদায় করতে হয় তা তিনি বেশ জানতেন। যদিও সমাজের একেবারে ওপরতলার বাসিন্দে তিনি ছিলেন না, তবুও ঘোরাফেরা করতেন সেই সমাজেই আর সকলের কাছ থেকে সম্মান আদায়ের ফন্দী ফিকিরও জানতেন। ব্যবহারে ঠিক কতটুকু গর্বের সঙ্গে কতটুকু আত্মবিশ্বাসের ভাব

প্রকাশ পেলে তা দিয়ে কাউকে আঘাত দেওয়া হবে না অথচ জগতের চোখে উঁচু হতে পারবেন নিজে—এ সব হিসেবে কোনদিন এক চুলও ভুল হত না তাঁর। একেবারে সাধারণের দলে পড়তেন না তিনি, চরিত্রে অভিনবত্ব ছিল একটু—যেখানে অর্থে বা বংশগৌরবে খাটো হয়ে পড়তেন, সেখানে কাজে লাগাতেন চরিত্রের এই বিশেষত্বটুকু। এ পৃথিবীতে কোন কিছু দেখেই তিনি বিস্মিত হতেন না—যেমনি অবস্থাই হোক্ না কেন, তাতেই যেন তিনি অভ্যস্ত জন্ম থেকে। জীবনের অন্ধকার দিক্‌টা আর তার সঙ্গে জড়িত ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো কি নিপুণভাবেই যে তিনি লুকিয়ে রাখতেন সকলের কাছ থেকে—এমন কি নিজের কাছ থেকেও—লোকেরা তাই দেখে হিংসে না করে পারত না।

জীবনে আনন্দ আর আয়েস আনে এমন যে কোন জিনিসেরই চুলচেরা বিচার করতেন তিনি আর যথাসম্ভব উপভোগও করতেন। সমাজের উঁচু স্তরের লোকদের সঙ্গে পরিচয়ের গর্ব ছিল মনে—কিছুটা হয়েছিল আমার মায়ের সঙ্গে বিয়ের ফলে, আর খানিকটা ছেলেবেলাকার বন্ধুদের মারফত। এই সব বন্ধুদের সম্বন্ধে অবশ্য ওঁর মনে মনে একটা গোপন আক্রোশের ভাব ছিল, তারা আস্তে আস্তে সবাই উঁচুতে উঠে গিয়েছে আর উনি নিজে কিনা শেষ পর্যন্ত অবসর নিলেন রক্ষীবাহিনীর লেফটেন্যান্ট পদ থেকে। সৈন্যদলের আর পাঁচজন প্রাক্তন অফিসারের মতনই উনিও বাহারে পোশাক করতে জানতেন না, কিন্তু তাহলেও একটা বৈশিষ্ট্যের ও রুচির পরিচয় পাওয়া যেত সে পোশাকে। বাবার পোশাক ছিল সব সময়ই ঢিলেঢালা আর হাল্‌কা, সব চাইতে দামী কাপড়ে তৈরি, জামার আস্তিনের কাফ আর গলার কলার উল্টানো সবসময়। এটা সত্যি যে তিনি যাই কেন না পরতেন—তাঁর লম্বা সুঠাম চেহারা, টাক মাথা আর শান্ত সংযত ব্যবহারের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যেত। তাঁর হৃদয় ছিল সংবেদনশীল এমন কি অতি অল্পেই চোখে জল এসে যেত। কোন বই জোরে পড়তে পড়তে যদি দুঃখের কোন জায়গায় এসে পৌঁছলেন তো অমনি তাঁর গলা কাঁপতে শুরু করল, আস্তে আস্তে চোখেও জল এসে গেল—আরও একটু এগিয়ে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বইটা নামিয়েই রাখতেন। গান ভালবাসতেন, নিজে গাইতেনও পিয়ানোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুর লেখা রোম্যান্স, কতগুলো জিপসী গান আর কয়েকটা অপেরার সুর, কিন্তু রাগপ্রধান গানের দিকে মোটেই ঝুঁকতেন না—এমনকি আর পাঁচজনের মতের

বিরুদ্ধেও খোলাখুলি বলতেও কসুর করতেন না যে বিঠোফেনের 'সোনাটা' শুনলে নাকি ওঁর ঘুমই পায়, আর ম্যাডাম সেমোনোভার গাওয়া "ওয়েক নট দি মেইড" আর জিপসী মেয়ে তানিউসার "নান বাট দি"—এ দুটির বাইরে আর কোন গান জানেনও না। জগতের চোখে যাচাই হয়ে সে জিনিসের মূল্য ঠিক হয়েছে—বাবার কাছে একমাত্র সেই জিনিসেরই কোন দাম বা সম্মান আছে। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে তাঁর সঠিক কোন নীতি ছিল কিনা বলা কঠিন; গোটা জীবনটাই তাঁর ভরপুর ছিল নানা ধরনের প্রেরণা আর আবেগে, কাজেই ও-সব চিন্তার কোন অবসরই মিলত না, আর জীবনে আনন্দও ছিল প্রচুর তাই ওর কোন প্রয়োজনও ছিল না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে বাবার একটা নির্দিষ্ট মতবাদ গড়ে উঠল, চলাফেরা আদবকায়দাতেও একটা বিশেষ ধরনের ঝোঁক দেখা গেল—এগুলো অবশ্য খুবই বাস্তবসম্মত। সে পথে চলে, সে কাজ করে তিনি নিজে জীবনে আনন্দ পেয়েছেন, পেয়েছেন শান্তি—তাঁর মতে একমাত্র সেই পথই হচ্ছে শুভ; তাঁর বিশ্বাস একমাত্র এই পথেই পৃথিবীসুদ্ধ সবাই চলতে বাধ্য। চমৎকার বাক্‌পটু ছিলেন তিনি। আমার বিশ্বাস এই গুণটাই তাঁর রীতিনীতিগুলোর চেহারা অদ্ভুতরকম পালটে দিত প্রয়োজন মত। একই কাজকে, তাঁর বলবার গুণে; কখনো মনে হচ্ছে মহা উদ্ভট তামাসা—আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, উঃ কি জঘন্য নীচ কাজ!

একাদশ অধ্যায়

পড়ার আর বসবার ঘরে

সেদিন যখন বাড়ি পৌঁছলাম, চারিদিকে বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। মা গিয়ে বসলেন পিয়ানোর সামনে। আমরা ছেলেরা কাগজ, পেন্সিল আর রঙ নিয়ে এসে গোল টেবিলটার চারধারে ঘিরে বসলাম ছবি আঁকতে। আমার খালি নীল রঙ—তা হোক্, গোটা শীকারের ছবিটাই আঁকব ঠিক করেছি। ঝটপট এঁকে ফেললাম নীল রঙের ঘোড়ার ওপর নীল একটি ছেলে, কতগুলো নীল কুকুর—কিন্তু এবারেই মুস্কিল, নীল রঙের খরগোস হয় কি? দৌড়লাম লাইব্রেরীতে বাবার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে। বাবা বই পড়ছিলেন, মাথা না তুলেই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন, "হয় বৈকি খোকন, নিশ্চয় হয়।"

টেবিলে ফিরে গিয়ে বেশ করে একটি নীল খরগোস আঁকলাম, তারপর মনে হল খরগোসটাকে একটা ঝোপ বানিয়ে ফেলা যাক্। নাঃ, ঝোপটাও স্থবিধে হল না, ওটাকে করলাম একটা গাছ, সেটা থেকে একটা খড়ের গাদা, তা থেকে মেঘ—শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল কাগজের ওপর নীল রঙের অজস্র হিজিবিজি। মহাবিরক্তিতে কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ইজিচেয়ারে গিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম ঘুম লাগাবার মতলবে।

মা পিয়ানোতে ফিল্ডের সেকেণ্ড কন্‌সার্টো বাজাচ্ছিলেন—ওঁর কাছেই বাজনা শিখেছিলেন মা।

আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। বাজনার স্থরের লহরী আমার তন্দ্রাতুর মনকে আনন্দের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দিল। এরপরে মা বাজালেন বিঠোফেনের 'সোনাটা প্যাথেটিক,' আর আমার মনটাও কেমন দুঃখের আবেশে মূর্ছাহত হয়ে রইল। এ দুটো বাজনা মা মাঝে মাঝেই বাজাতেন তাই এদের সম্বন্ধে আলাদা আলাদা মনের ভাব স্পষ্ট মনে আছে আমার। এটা যেন একটা পূর্বস্মৃতি—কিন্তু কিসের তা জানতাম না। মনে হত আর কোন সত্যিকারের অস্তিত্ব নেই, এমন কোন ঘটনারই স্মৃতি বুঝি।

ঠিক আমার উল্টো দিকে বাবার পড়ার ঘর ; দেখতে পেলাম ইয়াকভ ঢুকল, মস্ত মস্ত দাড়িওয়ালা আচ্‌কান গায়ে কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এবারে সব কাজের কথা আমি ভাবলাম। ঠিক এই মুহূর্তে পড়ার ঘরে বসে যে সব ভীষণ দরকারী কথাবার্তা হচ্ছে—আমার মনে হল তার চাইতে দরকারী কোন কথা বোধ হয় আজকের ছুনিয়াতে আর নেই। যারা ঐ ঘরে গেল তারাও কেমন যেন পা টিপে টিপে সসব্যস্তে ঢুকল আর কথা বলল ফিসফিস্ করে—তাই আমার বিশ্বাসও দৃঢ় হল। ঘর থেকে বাবার গলার জোর আওয়াজ ভেসে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সিগারেটের গন্ধ ; এই গন্ধটা সব সময়ই আমার মনে উত্তেজনা আনে—কেন কে জানে! ইজিচেয়ারে পড়ে ঝিমুতে ঝিমুতে হঠাৎ একটু চমকে উঠলাম বাবুর্চিখানায় অতি পরিচিত জুতোর সামান্য একটু শব্দ পেয়ে। কার্ল ইভানিচ্, হাতে একতাড়া কাগজ, মুখে কঠোর সংকল্পের ছাপ—পা টিপে টিপে গিয়েই পড়ার ঘরের দরজায় টোকা মারলেন। তাঁকে ঢুকিয়ে নিয়েই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

"ওখানে আবার কিছু না ঘটে।" ভাবলাম আমি।

"কার্ল ইভানিচ্ তো ভীষণ চটে আছেন, যা হোক্ কিছু একটা করে বসতে পারেন।"

আবার একটু তন্দ্রা ভাব নেমে এল।

কিন্তু কোন বিপদই ঘটল না। ঘণ্টা খানেকের কাছাকাছি, আবার সেই জুতোর মচমচ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কার্ল ইভানিচ্ পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চললেন আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে। বাবাও তাঁর পেছনে পেছনে বেরিয়ে এসে ঢুকলেন বসবার ঘরে।

"জান, আমি কি ঠিক করেছি?" বাবা জিজ্ঞাসা করলেন নীচু হয়ে মার কাঁধে একটা হাত রেখে।

"কি?"

"ছেলেদের সঙ্গে কার্ল ইভানিচকেও নিয়ে যাব। গাড়িতে জায়গা হয়ে যাবে। ছেলেদের অভ্যেস হয়ে গেছে ওঁকে আর উনিও খুব ভালবাসেন ওদের। আর খরচ তো ভারী বছরে সাতশ রুবল, কি আর এমন?"

বাবা কেন যে কার্ল ইভানিচের সম্বন্ধে এমনি অবজ্ঞা দেখিয়ে কথা বললেন জানি না।

"আমি সত্যি খুশী হলাম খুব।" মা বললেন, ছেলেদের কথা ভেবে আবার ভদ্রলোকের জন্যও। ভারী চমৎকার লোক উনি।

"তুমি যদি শুধু একবার দেখতে ভদ্রলোকের মুখের ভাবখানা—আমি যখন বললাম, ওই পাঁচশ রুবল আর ফিরিয়ে দেবার দরকার নেই, ওটা ওঁকে আমার উপহার! কিন্তু সব চাইতে কৌতুকের হল এই হিসেবটা যেটা এক্ষুনি দিলেন আমাকে। এটা দেখবার যোগ্য"—বাবা হেসে হেসে কার্ল ইভানিচের হাতের লেখায় ভর্তি একখানা কাগজ মার দিকে এগিয়ে দিলেন, "পড়ে দেখ, কি মজার!"

হিসেবটাতে ছিল :

"ছেলেদের জন্য দুটো বড়শি—সত্তর কোপেক।"

"রঙ্গীন কাগজ, সোনালী পাড় দেওয়া, উপহারের বাক্স তৈরির জন্য, একটি চাপ দেবার যন্ত্র আর আঠা—ছয় রুবল পয়ষট্টি কোপেক।"

"ছেলেদের জন্য উপহার, একটি বই এবং আর একটি তীরধনু—আট রুবল ষোল কোপেক।"

"নিকোলাইয়ের জন্য প্যাণ্ট—চার রুবল।"

"একটা ঘড়ি আমার জন্যে সেটা পিয়াত্র আলেকজান্দ্রোভিচ্ মস্কো থেকে এনে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন—একশ চল্লিশ রুবল।"

"মাইনে বাদে কার্ল মউয়ারের সবসুদ্ধু প্রাপ্য—একশ উনষাট রুবল উনআশি কোপেক।

কী অদ্ভুত লোক! ছেলেদের দেয়া সব উপহারের দাম ধরেছেন এমনকি তাঁকে যে উপহার দেবার কথা দেওয়া হয়েছিল তার দাম পর্যন্ত! কিন্তু তাই বলে কেউ যদি ভাবেন কার্ল ইভানিচ্ একটি চশমখোর স্বার্থসর্বস্ব লোক মাত্র তবে নিতান্তই ভুল করবেন।

পড়ার ঘরে যখন ঢোকেন কার্ল ইভানিচের হাতে তখন এই তৈরি হিসেবটি আর মগজে ঠাসা বেশ একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা—ঠিক করেছেন বাবার ওপর বক্তৃতাটি ঝাড়বেন, আমাদের বাড়িতে কত কষ্ট সহ্য করেছেন তার একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে। শুরু করলেন বেশ চমৎকার ভাবেই; কিন্তু ক্রমে নিজের বাক্‌চাতুর্যে এমনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে সেখানটায় বলতে হল, ছেলেদের ছেড়ে যাওয়াটা যে আমার পক্ষে কত বেদনার—সেখানটায় এসে সত্যি সত্যিই গলা কেঁপে গেল থরথর করে, চোখ জলে ভরে উঠল, গলা ভেঙ্গে যাওয়ায় পকেট থেকে ডোরাকাটা রুমালটা বার করতে বাধ্য হলেন।

"হ্যাঁ, পিয়াত্র আলেকজান্দ্রোভিচ্"—চোখের জলের ভেতর দিয়ে তিনি বলে চললেন (যদিও এ কথাগুলো তাঁর তৈরি বক্তৃতায় ছিল না), "ছেলেদের নিয়ে এমনি মজে গেছি যে ওদের ছাড়া আমার দিন কি করে কাটবে জানি না। আমাকে আপনি থাকতে দিন···শুধু থাকতে দিন, টাকাকড়ির কিছু দরকার নেই"—ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় কার্ল ইভানিচ্ শেষ করলেন একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে আরেক হাতে হিসেবটা এগিয়ে দিয়ে।

কার্ল ইভানিচের মমতার কথা আমি জানি—তাঁর আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিনি। কিন্তু তবুও ওঁর মুখের কথাগুলোর সঙ্গে কি করে যে ঐ হিসেবটার মিল ঘটানো যায়—সেটা আজও আমার কাছে একটা রহস্য ! বাবা আস্তে আস্তে ওর কাঁধে টোকা মেরে সান্ত্বনা দেন, "আমাদের ছেড়ে যেতে আপনার যদি কষ্ট হয় কার্ল ইভানিচ্ তবে আপনাকে ছেড়ে দিতে আমাদের কষ্ট আরও বেশী। আমি আমার মত বদলে ফেলেছি।"

রাতের খাবারের সময়ের সামান্য একটু আগে গ্রিশা এসে ঘরে ঢুকল। বাড়িতে এসে ঢোকা অবধি ওর কান্নার আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের আর শেষ নেই ; যাঁরা ওর ভবিষ্যতবাণীতে বিশ্বাসী তাঁদের মতে শীঘ্রই আমাদের কোন বিশেষ বিপদ ঘটবে, এ নিশ্চিত তারই পূর্বাভাস। অবশেষে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় জানিয়ে গেল কাল সকালেই নাকি বিদায় নেবে। ভলোদিয়ার দিকে একটু চোখ টিপে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

"কি ব্যাপার ?"

"গ্রিশার গলার হারটা দেখতে চাও তো শীগগির ওপরে চল। দ্বিতীয় ঘরটাতে থাকে গ্রীশা। বাজে জিনিস রাখার ঘরটা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে।"

"চমৎকার। দাঁড়াও মেয়েদের ডেকে আনি।"

মেয়েরাতো শুনেই দৌড়ে বেরিয়ে এল—সবাই মিলে ওপরে গেলাম। কে আগে যাবে তাই নিয়ে একটু আলোচনা করে একে একে সবাই অন্ধকার ঘুপ্‌চি ঘরটাতে ঢুকে পড়লাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

গ্রিশা

অন্ধকারটা যেন বোঝার মত ভারী হয়ে বসেছে আমাদের ওপর : সবাই মিলে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে আছি, মুখে কারুর কথা নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিশা এসে ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে। এক হাতে তার মোটা লাঠিটা আর এক হাতে পিতলের বাতিদানে একটা মোমবাতি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম আমরা।

"প্রভু যীশু! ও পবিত্র যীশুমাতা! পিতা-পুত্র এবং পবিত্র অশরীরী প্রেত!" বারবার সে এই কথা-ক'টারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে নানা স্বরে, নানা ঢঙে আর নানা সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করে।

প্রার্থনা করতে করতেই সে লাঠিটা ঘরের এককোণে দাঁড় করিয়ে রাখে, বিছানাটা বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে তারপর পোশাক খুলতে থাকে। কালো রঙের বেল্টটি খুলে হলদে সুতির ঢিলেঢালা ছেঁড়াখোঁড়া শার্টটি খুলে বেশ পরিপাটি ভাঁজ করে একটা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখল। মুখের সেই সবসময়কার বোকাবোকা ভাবটি যেন আর নেই। বরঞ্চ সে-মুখে এখন প্রশান্তি, বিষাদ এমনকি একটু আভিজাত্যের ছাপও। চলাফেরাতেও যেন একটা চিন্তা আর সঙ্কল্পের ছাপ।

এবার সে আস্তে আস্তে বিছানায় চেপে বসে, চারদিকে ক্রুশচিহ্ন আঁকে তারপর বেশ একটু চেষ্টা করে শার্টের তলায় হাত ঢুকিয়ে গলার হারটা ঠিক করে নেয়। একটুক্ষণ চুপ করে বসে জামাটা চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কয়েকটা ফুটো লক্ষ্য করল তারপর উঠে বাতিদানটা তুলে নিয়ে ঘরের কোণে উঁচু করে ধরে দাঁড়াল—সেখানে একটা বেদীর ওপর কয়েকটি মূর্তি বসানো। বিড়বিড় করে প্রার্থনা জানাতে জানাতে বারবার ক্রুশচিহ্ন আঁকে তারপর মোমবাতিটা তুলে একদম উল্টো করে দেয়। শ্ শ্ শব্দ করে নিভে গেল মোমবাতিটা। বনের মাথার ওপর দিয়ে প্রায় পূর্ণ চাঁদের আলো এসে জানালার

ভেতর লুটিয়ে পড়ছে। ফিকে রূপোলী আলোর ঝরণায় এই অদ্ভুত লোকটির লম্বা চেহারাটার একটা দিক আলোয় আলোময়; আরেকটা দিক একদম অন্ধকার—জানালার কপাট থেকে মেঝেতে, সেখান থেকে ছাত পর্যন্ত বিরাট একটা কালো ছায়া যেন ঝুলে রয়েছে। নীচের আঙিনা থেকে প্রহরীর পায়ের শব্দ ভেসে আসছে।

হাতদুটি আড়াআড়িভাবে বুকের কাছে রেখে মাথাটি নীচু করে গ্রিশা সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেদীর সামনে, থেকে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। এবার একটু কষ্ট করে হাঁটু গেড়ে বসল, প্রার্থনা শুরু হল।

প্রথমে পরিচিত প্রার্থনাগুলোই আওড়াল নীচু গলায়, কেবল কোন কোন কথায় একটু বেশী জোর দিয়ে। এবার আবার পুনরাবৃত্তি, আরও একটু জোর গলায় আরও একটু বেশী উৎসাহ নিয়ে। তারপর শুনতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে নিজের শব্দ ব্যবহার করছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, স্লাভ ভাষায় ও নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে; কথাগুলো ওর অস্পষ্ট জড়ানো, কিন্তু ওর ভাব মানুষকে বিচলিত করে। সবারই জন্যে ও প্রার্থনা জানাল, যাঁরা যাঁরা ওকে আশ্রয় দিয়েছিল—তার ভিতর আমার মার নাম, আমাদের নাম; নিজের জন্যে প্রার্থনা করল, ক্ষমা চাইল ওর গুরুতর সব পাপের তারপর বলল, "প্রভু তুমি আমার শত্রুদের ক্ষমা কর।" একটা অস্পষ্ট গোঙানির মত আওয়াজ করে গ্রিশা এবার মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল, একই কথা বারবার আবৃত্তি করে আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আবার উঠল এমনি চলল—গলার হারটার ওজনের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রতিবারই মেঝেতে ঠুকে গিয়ে ঝন ঝন করে বেজে উঠছে সেটা।

ভলোদিয়া খুব জোরে একটা চিমটি কাটল আমার পায়ে, আমি ফিরেও তাকালাম না। জায়গাটা হাত দিয়ে একটু ঘসে একমনে লক্ষ্য করতে লাগলাম গ্রিশাকে, ওর প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গি যেন গিলে খাচ্ছি—সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে আমার একটা শিশুসুলভ বিস্ময়, করুণা আর শ্রদ্ধার ভাব!

ঘরটায় ঢোকার সময় যে হাসি আর মজা আশা করেছিলাম তার বদলে মনটা যেন কেমন দমে গেল, কেমন যেন একটা গা-ছমছমানি ভাব।

গ্রিশা বহুক্ষণ ধরে এমনি উদ্বেল চিত্তে বসে রইল, নিজের ইচ্ছে মতন প্রার্থনা করল, "প্রভু দয়া কর"। এই কথাটাই সে কতবার বলল কিন্তু প্রতিবারই নতুন শক্তিতে নতুন ভাবে। আকুল হয়ে বলতে থাকে, ক্ষমা কর প্রভু ক্ষমা কর; আমি কি করব বলে দাও, প্রভু বলে দাও—যেন মনে হয় এক্ষুনি সত্যসত্যই

জবাব আশা করছে। কোন কোন সময় একটু হাহুতাশের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। একটু পরে সে উঠে হাঁটু গেড়ে বুকের ওপর হাতদুখানি আড়াআড়ি ভাবে রেখে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

চুপিচুপি খুব আস্তে, দরজার ভেতর দিয়ে আমি মাথাটা একটু বাড়িয়ে দিই—নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকাই। গ্রিশা নড়েও না, চড়েও না, বুক ফেটে খালি দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝড়, আর অন্ধ চোখের নিস্তেজ মণিটার ওপর এক ফোঁটা চোখের জল—চিক্‌চিক্ করছে চাঁদের আলোয়।

"প্রভু তোমার ইচ্ছারই জয় হবে", হঠাৎ কান্নাভেজা গলায় তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার করে উঠে গ্রিশা মাটিতে কপাল ঠুকে পড়ে গেল, শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

কত যুগ পার হয়ে গেছে এরপর। অতীতের কত ঘটনাই মূল্যহীন হয়ে গেছে আজকের জীবনে, তাদের স্মৃতিও তাই ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেছে স্বপ্নের মত। সে কতকাল হল তীর্থযাত্রী গ্রিশাও তার তীর্থ পরিক্রমা শেষ করেছে—কিন্তু সেদিনকার সে ছবি, সে মনোভাব কোনদিনই মুছে যাবে না আমার মনের পট থেকে।

গ্রিশা, তুমি ছিলে প্রকৃত সাধক, আসল খৃষ্টান! বিশ্বাসের জোর তোমাকে ভগবানের কাছে, একেবারে কাছে পৌঁছে দিয়েছিল! তোমার ভালবাসা এত গভীর যে সে প্রেমের কথা তোমার ঠোঁট থেকে আপনিই ঝরে পড়ত, যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের সংযত করবার দরকার হত না। কথা খুঁজে না পেলে তুমি শুধু কাঁদতে, মাটিতে পড়ে কাঁদতে—ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের কি অপরূপ সহজ উপায়! ধন্য, গ্রিশা, তুমি ধন্য!

যে আবেগ নিয়ে গ্রিশার কথা শুন্‌ছিলাম, সে ভাব টি কল না বেশীক্ষণ। প্রথমত আমার কৌতূহল মিটে গিয়েছিল, দ্বিতীয়ত অনেকক্ষণ একভাবে বসে থেকে থেকে পা দুটো জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল আর ঠিক পেছনে কানের কাছে অন্ধকারে যে ফিস্‌ফিসানি চল্‌ছিল অনবরত তাতে যোগ দিতেও মন চাইছিল। অন্ধকারে একটা হাত এসে পড়ল আমার হাতে, ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, "এটা কার হাত?" চারিদিকে চাপা অন্ধকার, কিন্তু তবুও স্পর্শে আর গলায় বুঝলাম এ কাটেনকা।

কেমন একটা আচ্ছন্নভাবে, সম্পূর্ণ নিজের অজান্‌তেই কাটেনকার হাতটা ধরে আমি ঠোঁটের কাছে তুলে নিলাম। ও নিশ্চয়ই হঠাৎ খুব চম্‌কে উঠল,

এক ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গেল আর তাতেই সেই জোরে হাতটা ছিট্‌কে গিয়ে শব্দ করে পড়ল একটা ভাঙ্গা চেয়ারের ওপর। ত্রিশা মাথা তুলে চারিদিকে তাকাল, বিড়বিড় করে প্রার্থনা আওড়ে ঘরের কোণে কোণে ঘুরে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে লাগল। আমরাও ঘুপ্‌চি ঘরটা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে জোরে ফিস্‌ফিস্ করতে করতে নীচে নেমে গেলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নাতালিয়া সাভিশনা

গত শতকের মাঝামাঝি খাবারোভ্‌কা গ্রামের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে ছুটোছুটি করে বেড়াত ছোট্ট একটি মেয়ে, নাম নাতাশকা, পরণে ছেঁড়াখোঁড়া জামা আর পা-দুখানা খালি, কিন্তু গোলগাল, লাল টুকটুকে গাল আর সবসময়ই যেন খুশির একটা ফোয়ারা। ওর বাবা সাব্‌ভা ছিলেন একজন দাস আমার দাদুর অধীনে, ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন—তারই অনুরোধে দাদু নাটাশকাকে ভর্তি করে নিলেন আমার দিদিমার পরিচারিকাদের দলে। চমৎকার নম্র ব্যবহার আর কাজে অফুরান উৎসাহ, এ-দুটির জোরে নাটাশকা প্রিয় হয়ে উঠল সবার। আমার মা যখন জন্মালেন, একজন নার্সের দরকার পড়ল—নাতাশকার ওপরেই পড়ল সে ভার। এই নতুন কাজে, এই নব আগন্তুক ছোট্ট প্রভুটির পরিচর্যাতেও নাতাশকা সবাইয়ের প্রশংসা পেল। ক্লান্তিহীন সেবা, অনুরাগ আর মমতা দিয়ে শিশুটিকে যেন সে ঘিরে থাকল চারধার থেকে।

সেই নাতাশকা প্রেমে পড়ল তরুণ বাবুর্চি ফোকার সঙ্গে। নিজের কাজ উপলক্ষেই ফোকাকে সব সময় আসতে হত নাতালিয়ার সংস্পর্শে আর নাতাশকাও খুব সহজেই মুগ্ধ হয়ে গেল তার চেহারা, পোশাক আর আদবকায়দায়—উজাড় করে ঢেলে দিল তার সরল হৃদয়ের প্রাণভরা ভালবাসা। সেই জোরে সাহস পেয়ে সে সোজা চলে গেল মনিবের কাছে ফোকাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইতে। দাদুর কাছে কিন্তু এ অনুরোধের মানে হল অকৃতজ্ঞতা—চটেমটে নাতাশকাকে তিনি ঘর থেকে বার করে দিলেন আর শাস্তি দিতে বেচারা মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলেন অনেক দূরে সেই স্তেপে তাঁর একটা গ্রামে গরুর রাখালী করতে। কিন্তু মাস ছয়েকও কাটল না নাতাশকাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হল পুরনো জায়গায়—তার বদলে কাজ করার যোগ্যতাই নেই কারুর। বাড়িতে ফিরেই নাতাশকা গেল দাদুর কাছে, উপুড় হয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে অঝোরধারে কাঁদল কতক্ষণ, ভিক্ষে করল—তিনি যেন ওকে আবার

স্নেহ করেন সেই আগেরই মত, আর ভুলে যান ওর অপরাধের কথা—সে অপরাধের আর কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটবে না জীবনে। সে প্রতিজ্ঞা কোনদিন ভোলেনি নাতাশকা।

সেইদিন থেকে নাতাশকার নাম হল নাতালিয়া সাভিশ্‌না, মাথায় উঠল একটা টুপি। এবার তার প্রেম নতুন রূপ নিল; জীবনের সবটুকু রূপ, রস নিংড়ে সে তার ছোট্ট একফোঁটা প্রভুটিকে ভাসিয়ে দিল অফুরন্ত ভালবাসার বন্যায়।

আরও পরে, একজন গভর্নেস যখন এলেন তার জায়গায়—নাতাশকাকে তখন দেওয়া হল গৃহকার্যের তত্ত্বাবধানের ভার, বাড়ির সমস্ত কাপড়চোপড় আর খাবারদাবার থাকত তার জিম্মায়। এই কাজেও পরিচয় পাওয়া গেল তার সেই সমান উৎসাহ আর কুশলী হাতের স্পর্শ। প্রভুর সম্পত্তি রক্ষাই যেন তার জীবন! চারিধারেই সে খালি দেখতে পায় চুরি, আর অপচয় আর অপব্যয়—আর এদের সংযত করাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত!

আমার মা তার বিয়ের সময় নাতালিয়ার কুড়ি বছরের নিরলস সেবা আর বিশ্বস্ততার পুরস্কার দেবেন ঠিক করলেন। ঘরে ডেকে এনে মা তাকে চমৎকার ভাষায় ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানালেন তারপর হাতে দিলেন একখানা সরকারী দলিল যাতে লেখা আছে নাতালিয়া সাভিশ্‌নাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হল চিরতরে। আরও জানালেন মা যে এবার থেকে নিয়মিতভাবে বছরে তিনশ রুবল করে পেনসন্‌ পাবে সে, এ বাড়িতে আর সে কাজ করুক বা না করুক। নাতালিয়া সাভিশ্‌না চুপ করে শুনল শেষ পর্যন্ত। হাত বাড়িয়ে দলিলখানা নিয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে কিছুক্ষণ, বিড়বিড় করে কি যেন বলল আপন মনে, তারপর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে। এর মানে কী—মা তো ভীষণ অবাক; শেষ পর্যন্ত ওর ঘরে গেলেন। নাতালিয়া তার বড় বাক্সটার সামনে চুপ করে বসে আছে, বড় বড় চোখ দুটি জলে ছলছল। আঙুলের ভেতর রুমালটা একবার পাকাচ্ছে, আরেকবার খুলছে; সামনে মেঝেতে ছড়ানো একরাশ ছেঁড়া কাগজের টুকরো, সেই মুক্তিপত্রখানার—সেই দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে।

"নাতালিয়া, কী হয়েছে লক্ষ্মীটি?" ওর একখানা হাত ধরে আকুল হয়ে মা জিজ্ঞাসা করেন।

"কিছু না, কিছু না। আমি নিশ্চয় সেবা করে খুশী করতে পারিনি তোমাকে, তাই তাড়িয়ে দিতে চাইছ। বেশ, আমি যাব, তাই যাব।"

মায়ের হাত ছাড়িয়ে অতিকষ্টে চোখের জল রোধ করে নাতালিয়া চেষ্টা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু মা তার পথ আটকে একেবারে দুহাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন তাকে—তারপর গলা জড়াজড়ি করে দুজনে বসে কাঁদেন কতক্ষণ কে জানে!

যতদূর আমার স্মৃতি যায়, মনে পড়ে নাতালিয়া সাভিশ্‌নাকে—ভালবাসা আর মমতায়-ভরা তার মিষ্টি মুখখানা; তবুও মনে হয় আজই বোধ হয় কেবল তার পুরো দাম দিতে পারি—এর আগে ছেলেবেলার সেই দিনগুলোতে এ কথা বোধ হয় একটিবারও মনে হয়নি কি চমৎকার এ মেয়েটি, এর তুলনা নেই। নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও তার মুখ থেকে কেউ কোনদিন শোনেনি। নিজের কথা সে ভাবতই না একটিবারও—সারা জীবনটাই ছিল তার একটানা একটা ভালবাসা আর ত্যাগের ইতিহাস। আমাদের ওপর তার মায়া, মমতা আর স্বার্থহীন ভালবাসা ছিল এমন সহজ আর স্বাভাবিক যে এ ছাড়া অন্য আর কিছু সম্ভব বলে মনেই হত না; মুহূর্তের জন্যও নিজেকে কখনো কৃতজ্ঞ বোধ করিনি এর জন্যে বা একটিবারও এ প্রশ্ন মনে জাগেনি যে এতে সে নিজে সুখী তো, সন্তুষ্ট তো।

অনেক সময় সামান্য ছলছুতোতেই, পড়া ছেড়ে পালিয়ে যেতাম ওর ঘরে, কত কল্পনার, কত কথার জাল বুনতাম জোরে জোরেই, ওর উপস্থিতেতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা না পেয়ে। নাতালিয়া সব সময়ই ব্যস্ত কোন না কোন কাজে: হয়তো মোজা বুনছে, নয় কাপড়চোপড়ের হিসেব মেলাচ্ছে, নয়তো ওর ঘরভর্তি বড় বড় কাপড়ের বাক্সগুলো গোছাচ্ছে, পরিষ্কার করছে; কিন্তু হাতে কাজ করলেও তার কান আছে ঠিকই আমার যত রাজ্যের আজেবাজে আর পাগলামীভরা কথাবার্তায়। যেমন ধরুন, 'আমি যখন জেনারেল হব তখন বিয়ে করব একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে, কেমন চমৎকার একটা গেরুয়া রঙের ঘোড়া কিনব, স্ফটিকের একটা বাড়ি তৈরি করব, আর সেক্সনী থেকে নিয়ে আসব কার্ল ইভানিচের সব, সব আত্মীয়স্বজনকে', এমনি ধারা আরও কত কি! নাতালিয়া কিন্তু হাতে কাজ করতে করতেও প্রতিটি কথা শুনছে আর মাঝে মাঝেই মাথা নাড়ছে, "নিশ্চয়, খোকনবাবু, নিশ্চয় করবে বৈকি!" তারপর একসময় উঠে আস্তে আস্তে আমি যখন যাবার জোগাড় করি, নাতালিয়া তখন উঠে নীল রঙের

একটা বাক্স খোলে—মনে পড়ছে সে বাক্সটার ভিতর দিকের ডালায় সাঁটা দুটো ছবি, একটা একজন অশ্বারোহীর আরেকটা ভলোদিয়ার নিজের হাতে আঁকা একটা ছবি—তার ভিতর থেকে বেরুত একটি ধূপকাঠি। সেইটি জ্বালিয়ে নাড়তে নাড়তে নাতালিয়া বলে, "দেখ খোকন, এটি হচ্ছে অচাকভের সুগন্ধি ধূপ। তোমার দাদু—ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন—যখন তিনি গিয়েছিলেন তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, সেখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন এগুলো। এটাই শেষ টুক্‌রো।" নাতালিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

নাতালিয়া সাভিশনার ঘরের বাক্সগুলোতে গরু হারালে তাও পাওয়া যেত। আমাদের যা দরকার হোক না কেন, অমনি ছুটতাম ওর কাছে—"যাই নাতালিয়া সাভিশনাকে জিজ্ঞেস করি গিয়ে।" আর একটু খোঁজাখুঁজি করে হাত্‌ড়ে সে ঠিক দরকারী জিনিসটা বার করে দিত, বলত, "ভাগ্যিস লুকিয়ে রেখেছিলাম।" বাক্সগুলোর ভিতর এমনি হরেক রকমের সব জিনিস থাকত, বাড়ির লোকেরা কেউ তা জানতও না, মাথাও ঘামাত না।

একদিন আমি ভীষণ চটে গিয়েছিলাম ওর ওপর। ব্যাপারটা বলি: ডিনারে বসে সেদিন কৃভাসের* বোতলটা ভেঙ্গে টেবিলঢাকাটা নষ্ট করে ফেললাম। মা বললেন, "নাতালিয়া সাভিশনাকে ডাক, দেখুক এসে তার আদুরে গোপাল কি করেছেন!"

নাতালিয়া সাভিশনা এসে ব্যাপার দেখে ঘন ঘন মাথা নাড়ে; এবার মা ওকে ইসারা করে কাছে ডেকে কি যেন বলেন চুপিচুপি আর সেও আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

খাবার পর আমি বেশ খোস-মেজাজে লাফাতে লাফাতে হলের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ কোন্ দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নাতালিয়া, হাতে তার সেই টেবিলঢাক্‌নাটা; কিছু বোঝার আগেই আমাকে শক্ত করে জাপ্‌টে ধরে টেবিলক্লথের ভিজে দিক্‌টা আমার মুখে ঘসে দিতে দিতে বলতে লাগল আমাকে, "খবরদার আর কখনো টেবিলক্লথ নষ্ট কর না। করবে? আর করবে?" প্রাণপণ শক্তিতে টানাহ্যাচড়া করেও কিছুতেই হাত ছাড়াতে পারি না। আমি তো রেগে একেবারে টং!

উঃ কি স্পর্ধা! আমার মুখে ভিজে টেবিলক্লথ ঘসে দিচ্ছে, যেন আমি একটা

* একপ্রকারের রবিশস্য রাশিয়ার প্রধান খাদ্য; তা থেকে তৈরি হয় বিয়ার।

বাচ্চা চাকর! অসহ্য! অসহ্য! চোখের জলটা গিলে নিতে নিতে ভাবছি আর অস্থির-পায়ে সারা ঘরে পায়চারি করছি।

নাতালিয়া যখন দেখল আমি কাঁদছি, তখন আমাকে একা ঘরে রেখে বেরিয়ে চলে গেল—আর আমি পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলাম কি করে অভদ্র নাতালিয়ার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়, বেশ ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া যায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাতালিয়া আবার ফিরে আসে! এবারে নরম হয়ে মিষ্টি কথায় আমাকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে, "শোন শোন, খোকন শোন, কেঁদো না লক্ষ্মীটি। ক্ষমা কর আমাকে, আমি তো একটা বুড়ো হাবড়া। তুমি আমাকে মাপ করবে, করবে না সোনা আমার, মানিক আমার? এই দেখ, এটা এনেছি তোমার জন্যে।"

রুমালের তলা থেকে বেরয় একটা লাল কাগজের প্যাকেট; তা থেকে দুটো ক্যারামেল আর একটা খেঁজুর বার করে কাঁপা কাঁপা হাতে আমাকে দেয়। ওর মুখের দিকে আর সোজা চাইতে পারছি না, মাথাটা একটু ফিরিয়ে হাত বাড়িয়ে উপহারটা তুলে নিলাম; চোখের জলের ধারা আবার বইতে শুরু করে—এবারে আর রাগে কিংবা দুঃখে নয়, ভালবাসায় আর লজ্জায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিদায়

যে দিনের বিবরণ দিয়েছি, তার পরদিন ঠিক বেলা বারটায় দরজার কাছে একটা ক্যালাস[১] আর একটা ব্রিচকা[২] দাঁড়িয়ে। নিকোলাই ভ্রমণের পোশাক পরে তৈরি অর্থাৎ প্যাণ্টের পায়ের দিকটা বুটের ভিতর ঢুকিয়েছে আর পুরনো কোটটার বেল্ট বেশ করে বাঁধা। ব্রিচকার পাশে দাঁড়িয়ে সে ওভারকোট আর কুশনগুলোকে বসবার আসনের তলায় ঢোকাচ্ছে। বেশী উঁচু হয়ে গেলে নিজে লাফিয়ে উঠে চেপে চেপে নীচু করে নিচ্ছে।

ক্যালাস থেকে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে বাবার খাস চাকর নিকোলাইকে ডেকে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, "ঈশ্বরের দোহাই, নিকোলাই দিমিত্রিচ, মনিবের বাক্সটা একটু তোমাদের গাড়িতে ঢোকানো যায় না? বেশী জায়গা নেবে না।"

"তোমার সেটা আগেই বলা উচিত ছিল, মিথাই ইভানিচ্", শোনামাত্রই নিকোলাই ঝট করে জবাব দেয়, সঙ্গে সঙ্গে চটেমটে ব্রিচকার মেঝেতে ঝম্ করে একটা বাক্স আছড়ে ফেলে গায়ের জোরে, "ওঃ ভগবান, আমার বলে এখানে মাথা ঘুরে যাচ্ছে, আর উনি এলেন এখন ওঁর মাল নিয়ে!" টুপিটা খুলে কপালের বড় বড় ঘামের ফোঁটা মুছতে থাকে।

চাকরবাকরেরা কেউ কোট, কেউ কাফ্‌তান আবার কেউ বা শার্ট গায়ে, খালি মাথায় মেয়েরা সব ডোরাকাটা পেটিকোট আর জামা পরে, ছেলেপুলে কোলে-কাঁখে নিয়ে আর একটু বড় বাচ্চারা মায়ের পাশে খালিপায়ে গাড়ি-বারান্দার নীচে ভীড় করে সবাই দাঁড়িয়ে, লটবহর দেখছে আর ফিস্‌ফিস্ করে নানা আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে গাড়ির। সইসদের মধ্যে একজন বুড়ো মতন, সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে গায়ে একটা 'আরম্যকার', মাথায় শীতের টুপি—হাতে ক্যালাস চালাবার একটা চাবুক, সাবধানে সেটাকে পরীক্ষা করে

১। ক্যালাস, নীচু ঘেরাটোপ দেওয়া হালকা গাড়ি।

২। ব্রিচকা, ঘেরাটোপ দেওয়া গাড়ি, শোবার জায়গা থাকে।

দেখছে। আর একটি ছোক্‌রা মতন বেশ সুন্দর চেহারা, ঢিলেঢালা একটা চাষীদের শার্ট গায়ে, কালো ভেড়ার লোমের একটা টুপি মাথায়,—সে হাত বাড়িয়ে চালকের বসবার জায়গায় আরম্যকটা রাখে, ঘোড়ার বল্‌গাগুলোও একে একে ওখানেই ছুঁড়ে ফেলে; তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে একবার নিজের বুটের দিকে আরেকবার সইসগুলোর দিকে যারা ব্রিচকাতে চবি মাখাচ্ছিল। একজন তাদের মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টায় একটা চাকা তুলে ধরেছে, আর একজন তার ওপর ঝুঁকে পড়ে সাবধানে ফলাগুলোতে চর্বি মাখাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত অবশিষ্টটুকু চাকতিটাতে মাখিয়ে দিল পাছে একটি ফোঁটাও চর্বি নষ্ট হয়। বেড়ার ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রঙবেরঙের শ্রান্ত ক্লান্ত কতকগুলো ঘোড়া কোনোটা লেজ নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে, কতকগুলো চোখ বুঁজে ঝিমোচ্ছে, লোমশ ফোলা ফোলা পাগুলো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, আর বাকিগুলো একঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পরস্পরের গা ঘস্‌ছে অথবা গাড়িবারান্দার গায়ে ঘন সবুজ লতা থেকে একটা দুটি পাতা বা শীষ ছিড়ে নিচ্ছে। রোদে শুয়ে হাঁপাচ্ছে কতগুলো গ্রেহাউণ্ড; বাকিগুলো গাড়ির ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে চাকা থেকে চর্বি চাটছে। চারিদিকে কেমন একটা ধুলোভরা ছায়া-ছায়া ভাব; আকাশময় একটা পাঁশুটে লালচে ভাব, কিন্তু মেঘের একটুক্‌রো আভাসও নেই কোন কোণে। পশ্চিম দিগন্ত থেকে একটা ঝোড়ো বাতাস উঠে রাস্তা থেকে, মাঠ থেকে ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে দিল, বাগানের উঁচু বার্চ আর লিণ্ডেন গাছের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে, শুক্‌নো হল্‌দে পাতার রাশি উড়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে আর আমি বসে আছি জানালার ধারে, অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছি—কখন শেষ হয় এসব উদ্যোগ আয়োজনের।

বসবার ঘরে মস্ত টেবিলটার চারধার ঘিরে এসে সবাই জড় হল, বিদায়ের আগে কয়েকটা মুহূর্ত একসঙ্গে কাটাতে—আমার মনে কিন্তু দুঃখের বাষ্পটুকুও নেই, একবারও মনে হল না যে সামনেই অপেক্ষা করছে বিচ্ছেদের দুঃখ। বাজে, অর্থহীন সব চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার মাথায়। মনে মনে হিসেব করছি কোন্‌ সইসটা ক্যালাস চালাবে কোনটাই বা ব্রিচ্‌কাটা; বাবার সঙ্গে কে যাবে, কার্ল ইভানিচের সঙ্গেই বা কে; আর···দূর ছাই আমাকে কেন যে ওরা এই একটা গলাবন্ধ আর আলখাল্লা গোছের নরম একটা ওভারকোটে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

"আমি কি এতই দুর্বল যে শীতে জমে যাব? আর কখন যে এদের এসব শেষ হবে! ইচ্ছে করছে গাড়ি চড়ে একেবারে ছুট লাগাই।"

"ছেলেমেয়ের কাপড়চোপড়ের হিসেবটা কার হাতে দিই ?" কান্নায় ফুলো-ফুলো চোখে এসে নাতালিয়া মাকে জিজ্ঞেস করে।

"নিকোলাইয়ের হাতে দাও। আর এস, ছেলেদের বিদায় দিয়ে যাও।"

বেচারা নাতালিয়া কিছু বলতে চেষ্টা করে কিন্তু কান্নায় গলা বোঁজা। হঠাৎ থেমে রুমালখানা তুলে তা দিয়ে মুখ ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে।

সেই ভঙ্গি দেখে হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল আমার কিন্তু সে ঐ একটি মুহূর্তই—রওনা হবার তাড়া যে তার চাইতেও বেশী! এবার পরম নির্বিকারভাবেই শুনতে থাকি বাবা-মার কথাবার্তা। ওঁরা দুজনে কত নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন, যদিও এটা স্পষ্ট এ সবের কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই দুজনের কারুর। যেমন বাড়ির জন্য কি কি জিনিস কিনতে হবে, প্রিন্সেস সোফিকে কি কি বলতে হবে, ম্যাডাম জুলিকেই বা কি, ভ্রমণটা ভাল হবে কিনা ইত্যাদি, ইত্যাদি। ফোকা এসে ঘরে ঢুকল; দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় হেঁকে জানাল গাড়ি তৈরি—ঠিক যে স্বরে সে প্রতিদিন খবর দেয়, খাবার দেওয়া হয়েছে টেবিলে। বেশ দেখতে পেলাম মা একবার সারা শরীরে কেঁপে উঠলেন—যেন ঠিক আশা করেননি বা তৈরি ছিলেন না এমনি একটা খবরের জন্য।

ফোকাকে হুকুম দেওয়া হল ঘরের সব দরজাগুলো বন্ধ করে দিতে।* আমার কিন্তু মনে হল, কি অদ্ভুত কারুর কাছ থেকে সবাই মিলে লুকিয়ে থাকছি যেন। সবাই বসে পড়তে ফোকা নিজেও একটা চেয়ার টেনে তার একটা ধারে বসল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা দরজা ক্যাচ্ করে উঠল, সবাই ফিরে তাকালাম। নাতালিয়া সাভিশ্না তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে, কোনদিকে না তাকিয়ে ঝুপ্ করে দরজার কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল—ফোকা যে চেয়ারটায় বসেছে, সেটার আর একটা ধারে। আমি যেন এখনও দেখতে পাই ফোকার টেকো মাথা, রেখাঙ্কিত, ভাবহীন মুখ, টুপি মাথায় বিনম্র একটা ভঙ্গী, টুপির তলায় পাকা চুলের আভাস। একটা ছোট চেয়ারে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে দুজনেই একটু আড়ষ্ট। আমার কিন্তু কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই, একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়েছি। মোটে দশটা সেকেণ্ড

---

* পুরনো রাশিয়ার একটি রীতি: কোথাও দূর পথে যাত্রা করার আগে ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে সবাই মিলে কিছুক্ষণ বসে থাকা।

বোধহয় সবাই মিলে দরজা বন্ধ করে বসেছিলুম—আমার কিন্তু মনে হল পুরো একটি ঘণ্টা! শেষ পর্যন্ত একসময় সবাই মিলে উঠে দাঁড়ালাম, ক্রুশচিহ্ন আঁকলাম, তারপর বিদায় নেবার পালা। বাবা মাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন কয়েকবার। "যথেষ্ট হয়েছে", তারপর বললেন, "আমরা তো আর চিরদিনের মত বিদায় নিচ্ছি না।"

"তবুও···তবুও মন তো মানে না।" চাপা কান্নায় মার গলা থরথর করে কাঁপে। সে স্বর যখন আমার কানে এল, দেখলাম মার ঠোঁট দুটি কাঁপছে আস্তে আস্তে, তারপর জলে টলমল করে উঠল দুটি চোখ। আমার বুকেও একটা কান্নার ঢেউ ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল; কি একটা গভীর আতঙ্কে শরীর আমার শিউরে উঠল, মনে হল পালিয়ে যাই, বিদায় নেবার চাইতে ছুটে পালিয়ে যাই, দূরে মায়ের কাছ থেকে। এবার বুঝলাম মা যখন বাবার কাছে গেছেন, তাঁর মন তার আগেই বিদায় নিয়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে।

ব্যাকুল হয়ে মা ভলোদিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে আর আশীর্বাদ করতে থাকেন, কতক্ষণ ··তার যেন আর শেষ নেই; মনে হল আমার দিকে বুঝি আর ফিরবেনই না—তাই নিজেই কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। তাও মা ভলোদিয়াকে ছাড়ছেন না। শেষ পর্যন্ত আমিও জড়িয়ে ধরলাম মাকে, আর তারপর আকুল হয়ে, অবশ হয়ে কাঁদলাম যে কতক্ষণ! সেই মুহূর্তেই দুঃখ ছাড়া আর কোনো চিন্তাই রইল না মনে।

সেখান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম গাড়িতে উঠতে, পাশের ছোট ঘরটায় চাকরবাকরেরা সব এসে জড়ো হল বিদায় দিতে। তাদের প্রত্যেকের সেই, "আপনার হাতটা দেখি একটু" বলা, তারপর জোরে শব্দ করে কাঁধের ওপর চুমু খাওয়া, তাদের মাথার সেই চবির গন্ধ—সবে মিলে কি রকম একটা গা ঘিনঘিন করতে থাকে আমার। সেই একই ভাবে, নিতান্তই নির্বিকার ভঙ্গিতে নাতালিয়া সাভিশ্‌নার টুপিতেও একটা চুমু খেয়ে নিলাম। আর বেচারা নাতালিয়া সাভিশ্‌না বিদায় দিতে এসেছিল আমাদের। শোকে বিহ্বল হয়ে চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে! এইসব চাকরবাকরদের মুখ আজও স্পষ্ট আমার মনে গেঁথে আছে, কিন্তু কি আশ্চর্য মার, আমার মায়ের মুখখানা আর বিদায়ক্ষণে তার সেই ব্যাকুলতার ছবিটাই সম্পূর্ণ মুছে গেছে! কারণটা বোধহয় এই যে সেই সময়ে একটি মুহূর্তের জন্যও সাহস করে মায়ের মুখের দিকে তাকাইনি।

খালি মনে হয়েছিল একটিবার যদি চোখে চোখ পড়ে যায় তাহলেই আর রক্ষে নেই, বাঁধ ভেঙে যাবে দুজনেরই।

আমিই সবার আগে দৌড়ে গিয়ে ক্যালার্সে চড়ে পেছনদিককার একটা আসনে বসে পড়লাম। গাড়ির পেছন দিকটা তোলা থাকায় কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবুও আমার মন বলছিল মা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে।

"আরেকবার তাকাব কি না! তাকাব? তাকাব—আচ্ছা, একটিবার, এই শেষবার।" গাড়ি থেকে মাথা বাড়িয়ে গাড়িবারান্দার দিকে তাকালাম; ঠিক সেই মুহূর্তেই মা আবার নেমে ঘুরে গাড়ির এদিকে এসেছেন আমাকে দেখতে। হঠাৎ পেছনে আমার নাম শুনতে পেয়ে চট্ করে মাথাটা ফেরাতেই ঠক্কাস্ করে ঠুকে গেল মায়ের মাথার সঙ্গে। ম্লান একটু হাসলেন মা তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেলেন আমাকে আবেগের সঙ্গে শেষবারের মত।

গাড়িটা বেশ কয়েক গজ দূরে চলে যেতে তবে আমি আরেকবার তাকাতে পারলাম মায়ের দিকে। মার মাথায় বাঁধা নীল রঙের রুমালটা বাতাসে উড়ছে, মাথা নীচু করে দুহাতে মুখ ঢেকে মা আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন—ফোকা সাবধানে ধরে রয়েছে তাকে।

আমার পাশে বসে বাবা। কান্নায় আমার গলা বোঁজা, গলায় কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠছে, মনে হচ্ছে গলা আটকে দমবন্ধ হয়ে যাবে বুঝি! বড় রাস্তায় পড়তে দেখি কোন বাড়ির দোতলার ঝুল-বারান্দা থেকে কে যেন একটা সাদা রুমাল ওড়াচ্ছে—আমিও আমারটা ওড়ালাম। মনটা যেন একটু শান্ত হল। তবুও কান্না বন্ধ হল না। আর এই কান্নায় আমার কোমল মনেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে মনে করে আনন্দও পেলাম, সান্ত্বনাও পেলাম।

আধ মাইল খানেক পার হতে মনটা আমার একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল। চারিপাশে কি ঘটছে তার দিকে এবার নজর দিলাম একটু। দেখতে লাগলাম আমি যে পাশটায় বসেছি সেদিকে দৌড়চ্ছে নানা রঙের ছিট্ দেওয়া একটা ঘোড়া, তার পেছন দিক্‌টা দেখা যাচ্ছে। জানোয়ারটা কেমন লেজ আছড়াচ্ছে, একটা পা রাখল আরেকটার পেছনে, অমনি পাকানো একটা চাবুক এসে পড়ল পিঠে ছপাং করে—ঘোড়াটাও দু পা তুলে লাফাতে শুরু করল। এদিক-ওদিক তাকালাম; কাছে, দূরে মাঠ-ভর্তি পাকা যবের ঢেউ, কালো রঙের অনুর্বর জমি, এখানে সেখানে এক-আধজন চাষী লাঙল কাঁধে অথবা একটা ঘোড়া নিয়ে সঙ্গে একটা বাচ্চা; পথের হিসেব রাখা পাথরটার কাছে এসে এমনকি একবার

তাকিয়েও দেখলাম কোন সহিসটা আমাদের গাড়ি চালাচ্ছে। চোখের জল তখনও আমার শুকোয়নি কিন্তু এলোমেলো ভাবনাগুলো মাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেক দূর—তবুও, তবুও প্রতিটি চিন্তাই ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত সেই আমার মাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিন একটা ব্যাংয়ের ছাতা পেয়েছিলাম বার্চগাছে ঘেরা সরু একটা পথে, কাটেনকা আর লিউবোচ্‌কা ঝগড়া করেছিল কে সেটা আগে তুলবে বলে আর মনে পড়ল, ওরা দুজনে কি কান্নাটাই কেঁদেছিল আমাদের বিদায় দিতে হবে বলে।

কি ভীষণ কষ্ট যে হল আমার এদের সব ছেড়ে যেতে—কাটেনকা, লিউবোচ্‌কা, নাতালিয়া সাভিশ্‌নাকে, এই বার্চ-ঘেরা পথটাকে, ফোকাকে। এমনকি হিংসুটে মিমিকে পর্যন্ত। সবার কথাই মনে থাকবে আমার, মনে পড়বে সব সময়। আর বেচারী মা? আমার মা-মণি! আবার চোখে জল টলটল করে উঠল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ছেলেবেলা

কি আনন্দের, কি সুখের ছেলেবেলা! সে দিনগুলো উড়ে চলে গেছে, আর ফিরবে না! তবুও তাকে না ভালবেসে কি পারি, সেই ঝক্‌ঝকে রঙীন দিনগুলোর স্মৃতি কি ভোলবার? সে স্মৃতি মনকে, প্রাণকে সজীব করে, আত্মাকে নির্মল করে—জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সে-স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেবে, সে আলো ম্লান হবে না কখনো।

চায়ের টেবিলে একটা বড় চেয়ারে ঢুকে বসে আছি—ছুটোছুটি করে ভয়ানক ক্লান্ত। চিনি দিয়ে এক কাপ দুধ খেয়েছি অনেক আগেই; ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তাও নড়ছি না জায়গা থেকে—বসে বসে শুনছি। মা-মণি কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন, মিষ্টি রিনরিনে গলায়। ওই গলার স্বরটা কানে এলেই যেন আমার মনটা কত কথা বলে ওঠে! তন্দ্রায় আমার চোখ ছাওয়া—মার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখি মার মুখটা ছোট হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই, ছোট, আরও ছোট—এবারে এই এত্তটুকু যেন একটা বোতাম। কিন্তু ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখনও। খুব ভাল লাগল মাকে এত্তটুকু ছোট্ট দেখতে! চোখের পাতাদুটো আরও একটু বুজলাম, চোখের মণির মধ্যে যতটুকু ছবি দেখা যায়, মা-মণি যেন ততটুকুন। কিন্তু আমি একটু নড়ে উঠলাম আর অমনি স্বপ্নটা টুটে গেল। চোখ কচলাই, চোখের পাতা নিয়ে এদিক-ওদিক করি, কতরকমেই চেষ্টা করি—কিন্তু না, বৃথা, সে জিনিস আর এল না।

আমি উঠে পড়ে, একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বেশ আরাম করে শুলাম।

"আবার ঘুমিয়ে পড়বে তুমি নিকোলেঙ্কা" মা ডেকে বললেন, "তার চাইতে ওপরে যাও।"

"বিছানায় শোব না মা, ততক্ষণে আবার হাল্‌কা একটা স্বপ্নালু ভাব আস্তে আস্তে আমার মগজ ছেয়ে ফেলছে। গাঢ় ঘুমে আমার চোখের পাতা বুজে এল, গভীর ঘুমের অতলে ডুবে রইলাম যতক্ষণ না মা আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন।

স্বপ্নেই যেন টের পেলাম কার একখানা নরম নরম হাত আমাকে স্পর্শ করেছে। স্পর্শেই বুঝতে পারলাম সে কে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হাতখানা ব্যগ্রভাবে চেপে ধরে আকুল হয়ে ঠোঁটের কাছে তুলে নিলাম।

ততক্ষণে আর সবাই চলে গেছে বসবার ঘর ছেড়ে; একটা মাত্র মোমবাতি জ্বলছে। মা-মণি এসে বসেছেন আমার পাশে, হাল্কা কোমল হাতে আস্তে আস্তে চাপড় মারছেন চুলে আর মিষ্টি চেনা গলা কানে এল, "ওঠ, খোকন সোনা, ওঠ, বিছানায় শোবে যে।"

আশেপাশে কেউ নেই যে তাকিয়ে থেকে অপ্রস্তুত করবে, তাই নির্ভয়ে মা একবারে আদরের বন্যায় আমাকে ভাসিয়ে দিলেন। আমি উঠলাম না, আবেগের সঙ্গে মার হাতে চুমু খেতে লাগলাম।

"ওঠ, মানিক, ওঠ।"

আরেকটা হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরেন মা, সরু সরু নরম আঙুলে আমার ভারী সুড়সুড়ি লাগে। ঘরটা নিস্তব্ধ, প্রায় অন্ধকার। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আর সুড়সুড়িতে শরীরে উত্তেজনার ছোঁয়াচ। পাশে বসে মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন, তার গলা শুনতে পাচ্ছি, গায়ের মিষ্টি গন্ধ নাকে আসছে। লাফিয়ে উঠে দুহাত বাড়িয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরলাম, বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে কাঁপা কাঁপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলি, "মা, আমার মা-মণি, কত ভালবাসি তোমাকে।" ম্লান কিন্তু যাদু-করা হাসি হাসলেন মা; দুহাত দিয়ে আমার মাথাটি তুলে ধরে, ভুরুর ওপর ছোট্ট একটি চুমু খেলেন তারপর তুলে হাঁটুর ওপর বসিয়ে দিলেন।

"তাহলে, তুমি আমাকে খুব ভালবাস, না?" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলেন, "সবসময় খুউব ভাল বাসবে আর কখনো ভুলবে না কেমন? মা-মণি যখন মরে যাবে তখনও ভুলবে না, ভুলবে না তো নিকোলেঙ্কা?

মা আরও বেশী আদর করে চুমু খান।

ওকথা বলো না মা, লক্ষ্মীটি কক্ষনো না"—মার হাঁটুতে চুমু খেয়ে আমি কেঁদে উঠি। চোখের জল ঝরতে থাকে ঝরঝর করে—ভালবাসা আর আনন্দের সে জল।

এরপর ওপরে উঠে গেলাম শোবার ঘরে। সেখানে ছোট নরম কাপড়ের রাত্রিবাস পরে দেবতার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার ছোট হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা দিয়ে প্রার্থনা করলাম, "হে প্রভু আমার বাবা আর মাকে আশীর্বাদ

কর।" আমার কচি গলায় মা ডাকের পরই বোধহয় এই ছোট্ট প্রার্থনাটুকুই সব প্রথমে শিখেছি—তাই মনের প্রথম অনুরাগে কি করে যেন মায়ের ভালবাসা আর ভগবানের ভালবাসা দু'য়ে মিশে এক হয়ে গেছে।

প্রার্থনা শেষ করে ছোট্ট কম্বলটি মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম, মনটা হালকা আর খুশিতে ভরা একটার পর একটা স্বপ্ন দেখলাম, তাদের স্পষ্ট কোনো চেহারা নেই—কিন্তু সবটা মিলে কেমন চমৎকার একটা ভালবাসা—আশা আর আনন্দের ভাব রেশ ছড়ালো ঘুমন্ত মনে। তারপরে মনে পড়ল বেচারা কার্ল ইভানিচ্ আর তার দুঃখের কপাল—ঐ একটি মাত্র দুঃখী লোককেই আমি জানি। এত ভালবাসি তাকে, এত দুঃখ হয় তার জন্য—আমার চোখ জলে ভরে উঠল, মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, 'ভগবান তাকে সুখী করো। আমাকে ক্ষমতা দাও যেন তাঁকে সাহায্য করতে পারি, তাঁর দুঃখ কমাতে পারি। তাঁর জন্য আমি সব কিছু ছাড়তে পারি।' এবার আমি আমার মনের মতন খেলনাগুলো—একটা চীনামাটির কুকুর. একটা খরগোস বালিশের এক কোণে ছুঁড়ে ফেললাম। খুশী হলাম ভেবে ওরা খুব আরামে থাকবে ওখানে। প্রার্থনা করলাম আবার, ভগবান যিনি সব্বাইকে সুখী করে, সব্বাই যেন মনের আনন্দে থাকে, কালকে যেন আবহাওয়া খুব ভাল থাকে—বেড়াতে যেতে পারি। আরেক পাশে ফিরলাম, এমনি এলোমেলো সব চিন্তা আর স্বপ্নে মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে—তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম আস্তে আস্তে শান্তিতে, সুখে গাল তখনো ভিজে চোখের জলে।

ছেলেবেলাকার সেই নির্মল হাল্কা খুশির ভাব, সেই প্রাণভরে ভালবাসার ইচ্ছে আর বিশ্বাসের জোর—সেকি আর ফিরে আসবে কোনদিন? নির্দোষ আনন্দ আর সীমাহীন ভালবাসার এ দুটি ভাবই যখন কেবলমাত্র সত্যি থাকে মনে, তখনকার চাইতে ভাল দিন কি আর জীবনে আসতে পারে?

কোথায় গেল সেই প্রাণঢালা প্রার্থনা? সেই অনুরাগে ঝরে-পড়া অশ্রু—সব চাইতে দামী উপহার? কে এসে মিষ্টি হেসে মুছিয়ে দিত সে অশ্রু আর মধুর স্বপ্নে ভরে দিত ছেলেবেলার কল্পনা?

জীবনটা কি এমনি ভার-বোঝা হয়ে উঠল যে সেদিনকার সে অশ্রু আর উচ্ছ্বাস একেবারে মুছে গেল জীবন থেকে? স্মৃতি থাকল কেবল সম্বল?

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবিতা

মস্কো পৌঁছবার প্রায় মাসখানেক পরে একদিন দিদিমার বাড়িতে ওপরের ঘরে বসে লিখছি। মস্ত টেবিলটার আর এক পাশে আমাদের আঁকা শেখাবার মাস্টারমশাই পেন্সিলে আঁকা একটা তুর্কীর মাথায় পেন্সিলের আঁচড় কাটছেন শেষ বারের মত। পেছনে দাঁড়িয়ে বকের মত গলা বাড়িয়ে ওঁর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে ভলোদিয়া। এই মাথাটা ভলোদিয়ার প্রথম পেন্সিলে আঁকা ছবি—সেদিনই দিদিমার নামকরণের স্মৃতি উৎসব, ওটা উপহার দেওয়া হবে তাঁকে।

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁকি মেরে ছবির গলাটা দেখিয়ে ভালোদিয়া বলে, "আচ্ছা স্যর, এখানটা আর একটু কালো করে দেবেন না?"

"নাঃ, কিচ্ছু দরকার নেই।" পেন্সিল আর ছবি আঁকার কলমটা বাক্সে ভরে রাখতে রাখতে মাস্টারমশাই বলেন, ঠিক আছে এটা, তোমার আর কিচ্ছু করবার দরকার নেই। ছবিটা সামনে তুলে ধরে চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করতে করতে এবার আমাকে বলেন, "কিন্তু, তুমি নিকোলেঙ্কা? তোমার গোপন কথা বলবে না আমাদের? দিদিমাকে কি দিচ্ছ? আমার তো মনে হয়, এরকম আরেকটা মাথা এঁকে দিলেই সবচেয়ে ভাল উপহার হবে। আচ্ছা, চলি তবে বিদায়।" টুপি আর খাতা তুলে নিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

ঠিক সে সময় আমি নিজেই ভাবছিলাম একটা মাথা আঁকলেই বোধ হয় ভাল হত—যা করছি তার চাইতে। যেই জানতে পারলাম দিদিমার নামকরণ উৎসব আসছে—আর আমাদের উপহার তৈরি করতে হবে নিজের খুশি মতন—আমার মাথায় হঠাৎ ঢুকল কবিতা লিখতে হবে আব চট্ করে বসে দুটো পংক্তি লিখেও ফেললাম, ভাবলাম, আর কি, এবার বাকিটা আপনিই ঝটঝট এসে যাবে। আমার মতন একটি ছোট্ট ছেলের মাথায় কি করে যে এটা ঢুকল, তা আশ্চর্য, খুবিই আশ্চর্য্য—কিন্তু আমি নিজে খুশী হলাম বেজায়। কারুর

কাছেই কথাটা ভাঙলাম না, সকলের জেরার জবাবে শুধু জানালাম দিদিমাকে আমি উপহার দেব নিশ্চয়ই, কিন্তু কি দেব কাউকে কিচ্ছুটি বলব না এখন।

কিন্তু যা আশা করেছিলাম তা হল না—সেই মুহূর্তের উচ্ছ্বাসে যে দুটো ছত্র লিখেছিলাম সেই পর্যন্তই, তার পরে আর একটা লাইনও লিখতে পারছি না মাথা-কপাল কুটেও। বইয়ের সব কবিতাগুলোই একে একে পড়ে ফেললাম কিন্তু না, বৃথা দমিত্রিয়েভ বা জেরঝাভিন কোনই সাহায্যে এল না। বরঞ্চ ঠিক উল্টো, তারা যেন আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমার অক্ষমতা। কার্ল ইভানিচের কবিতা টুকে রাখার অভ্যেস আছে: চুপিচুপি তাঁর কাগজপত্র সব হাঁতড়ে দেখলাম, জার্মান কবিতা ছাড়া একটি ছোট রাশিয়ান কবিতাও আছে—নিশ্চয়, ওঁর নিজেরই লেখা। পাঁচ লাইন কবিতায় কে একজন ম্যাডাম লিকে কবি ভালবেসেছেন আর বারবার মিনতি জানাচ্ছেন তাঁকে সে কথা স্মরণ রাখতে—জীবনে এমন কি মরনের পরপারেও।

পাতলা কাগজে গোটা গোটা মুক্তোর মত অক্ষরে কবিতাটি লেখা—এর ভাব আমার মনেও উদ্দীপনা জাগিয়ে দিল। আর কি, ব্যস, এবারে তরতর করে লিখে চললাম। উৎসবের দিন এসে পৌঁছল আমারও বার ছত্রে একটি মস্ত কবিতা তৈরি—পড়ার ঘরে বসেছি পার্চমেন্টের মত চমৎকার মোলায়েম এক রকম কাগজে সুন্দর হাতের লেখায় টুকে নিতে।

দুখানা কাগজ ছিঁড়ে ফেললাম ঝটপট, কবিতাটা তো অতি চমৎকার, ওতে আর হাত দেবার যো নেই, কিন্তু কি মুস্কিল, তৃতীয় লাইন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত লাইনগুলো খালি বাঁকা হয়ে হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে—শেষে দূর থেকে তাকিয়ে দেখি গোটা কবিতাটাই আঁকাবাঁকা একটা সাপের মতন ; নাঃ, কিচ্ছু হয়নি !

তৃতীয় কাগজখানারও একই দশা, কিন্তু আমিও ঠিক করেছি যা হয়েছে ; বেশ হয়েছে আর টুকব না। কবিতাতে আমি অভিনন্দন জানিয়েছি দিদিমাকে, অনেক বছরের আয়ু কামনা করেছি, আর শেষ দু'লাইনে আশ্বাস দিয়েছি যে তাকে আমরা শান্তি দেব আর ভালবাসব নিজেরই মায়ের মত !

শুনতে খুবই ভাল লাগল, কিন্তু তবুও কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগল ঐ শেষ লাইনটায়। "ভালবাসব···ভালবাসব···মায়ের···মত"—বারবার আওড়াতে থাকি নিজের মনে। 'মা'-এর বদলে কি দিতে পারি ? ওই ছন্দে ? যাকুগে, মরুকগে। কার্ল ইভানিচের কবিতার চাইতে ভাল হয়েছে তো তাহলেই হল !

এবার শেষ লাইনটা লিখে ফেললাম। তারপর শোবার ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করার ভঙ্গিতে জোরে জোরে বেশ আবেগের সঙ্গে একবার পড়ে ফেললাম গোটা কবিতাটা। তার না আছে ছন্দ না আছে তাল,—তবে কিনা ওসব নিয়ে মাথাই ঘামালাম না মোটে। কিন্তু শেষ লাইনটা এবারেও কানে খট করে উঠল, আরও বেশী অস্বস্তি লাগল। বিছানায় বসে পড়ে ভাবতে থাকি : কেন লিখলাম ও লাইনটা? মায়ের মত ভালবাসব? মা তো এখানে নেই। কি দরকার ছিল তার কথা উল্লেখের? দিদিমাকে ভালবাসি এ কথা ঠিক, সম্মানও করি, কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি আমার মা-মণির সমান তো নয়! কেন লিখলাম ওটা? মিথ্যে কথা লিখলাম? হলই বা একটা কবিতা তাহলেই বা মিথ্যে লিখব কেন?

দরজি এসে ঘরে ঢুকল আমার নতুন জামা নিয়ে। "যাক্‌গে যাক্‌গে",—মহা বিরক্তিতে কবিতা-লেখা কাগজটা বালিসের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দৌড়ে বেরিয়ে যাই নতুন পোশাক পরে দেখতে।

বাঃ, পোশাকটা কি চমৎকার! হলদে-বাদামী মেশানো রঙের কোমর পর্যন্ত ঝুলওয়ালা কোট, তাতে ঝকঝকে তামার বোতাম, গায়ে বেশ আঁটশাট, আরামের,—গাঁয়ে যেমনটি বানায় তেমন নয়। কালো রঙের প্যাণ্টটিও বেশ মাপমতন—পাশের পেশীগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর জুতোটিও ঢাকা পড়েছে।

ঘুরেফিরে পায়ের চারিদিক দেখতে দেখতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাবলাম : 'ওঃ কি মজা, এতদিনে সত্যিকারের বগলস্-আঁটা প্যাণ্ট পেয়েছি। পোশাকটা অবশ্য একটু বেশী আঁট হয়েছিল, নড়াচড়া করতেও কষ্ট হচ্ছিল—কিন্তু সেটা লুকিয়ে রাখলাম সবার কাছ থেকে, বরঞ্চ উল্টে আবার শুনিয়ে রাখলাম পোশাকটাতে খুবই আরাম লাগছে তবে খুব সামান্য একটু বড় এই যা। এবারে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পমেটম মেখে চুল আঁচড়ালাম—কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন তালুর ওপরকার চুলের ঝুঁটিটাকে বাগ মানাতে পারি না কিছুতেই। যেই ব্রাসটা মাথা থেকে তুলে নিয়ে দেখতে যাই এবারে আমার কথা মানে কিনা, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই ঝুঁটিটা উঁচু হয়ে চারিদিকে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে, আমার মুখখানা তখন দেখলে নিশ্চয় হাসি পাবে।

কার্ল ইভানিচ্‌ পোশাক পরছিলেন আরেক ঘরে, পড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে তাঁর তলায়-পরবার জামাকাপড় আর নীল কোট নিয়ে যেতে দেখলাম। নীচের

সিঁড়ির মুখে দরজার কাছে দিদিমার একজন ঝিয়ের গলা পেলাম। দরজা খুলতে দেখি, তার হাতে কড়া ইস্ত্রি করা শার্টের সামনে পরবার অংশ। বলল, কার্ল ইভানিচের জন্য এনেছে। সে নাকি কেবলমাত্র এটাকেই ঠিক করে দিতে কাল সারা রাত ঘুমোয়নি। কার্ল ইভানিচকে দিয়ে দেব বলে হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দিদিমা উঠেছেন কিনা।

"ও হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওঁর কফি খাওয়া শেষ হয়েছে, পাদ্রীও এসে গেছেন। বাঃ কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে।" আমার নতুন স্যুটের দিকে হাসিমুখে তাকায় সে।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম। এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এক পাক ঘুরে নিলাম, আঙুল মটকালাম, তারপর কি করি···একটা লাফ দিলাম। বোধ হয় ওকে দেখাতে চাইলাম সত্যি সত্যিই কতটা ভাল দেখাচ্ছে আমাকে, তা ও ঠিক মত বুঝতে পারেনি।

কার্ল ইভানিচের কাছে যখন শার্ট-ফ্রন্টটা নিয়ে গেলাম, দেখি ওটার আর কোনো দরকার নেই; উনি আর একটা পরে ফেলেছেন ততক্ষণে আর টেবিলের ওপর-রাখা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে টাইয়ের ফুল বাঁধছেন—পরিষ্কার কামানো গালের উঁচু নীচু নানাভঙ্গি করে দেখছেন, টাইটা ঠিক যুতসই হল কিনা। আমাদের জামাপ্যান্ট টেনেটুনে দিয়ে আর তাঁর নিজেরটা নিকোলাইকে টেনে দিতে বলে তিনি আমাদের নিয়ে চললেন দিদিমার কাছে। যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম কি জোর পমেটমের গন্ধ বেরোচ্ছিল আমাদের তিনজনের গা থেকে—ভাবলে এখনও আমার হাসি পায়।

কার্ল ইভানিচ্ নিজে একটা উপহারের বাক্স তৈরি করেছেন, ভলোদিয়ার আছে আঁকা ছবি, আমার কবিতা; আর উপহারটা হাতে দিয়ে যা বলব তা আছে আমাদের জিভের ডগায়। বসবার ঘরের দরজাটা খুললেন কার্ল-ইভানিচ: ঠিক সেই মুহূর্তে পাদ্রী তার পোশাক পরছেন আর এই সবে শুরু হয়েছে অনুষ্ঠান।

দিদিমাও এসে গেছেন বসবার ঘরে, দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ারের পিঠে হাত দুখানা রেখে মাথা নীচু করে প্রার্থনা করছেন—বাবা পাশে দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে একচোখ তাকিয়ে একটু হাসলেন, আমরা তখন দরজা পেরিয়ে ভেতরে পা দিয়েই সবাই থম্‌কে দাঁড়িয়েছি। উপহার-ভরা হাতগুলো পেছনে লুকিয়ে ফেলে চেষ্টা করছি যাতে আমাদের কেউ দেখতে না পায়। হঠাৎ গিয়ে উপহার দিয়ে অবাক করে দেব বলে আশা করেছিলাম, তা নষ্ট হল।

অনুষ্ঠান শেষ হল, আমাদের উপহার দেবার সময় এল। হঠাৎ কেমন যেন একটা ভয় আমার পিঠ বেয়ে শিরশির করে নামতে লাগল। লজ্জায়, অস্বস্তিতে কেমন একরকম হয়ে গিয়ে কার্ল ইভানিচের পেছনে গিয়ে লুকোলাম, বুঝলাম সাহস করে কিছুতেই উপহারটা দিতে পারব না। কার্ল ইভানিচ তখন চমৎকার ভাষায় দিদিমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, বলা শেষ করে উপহারের বাক্সটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে সরে এলেন, ভলোদিয়াকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে।

সোনালী রাংতায় চারটে কোণ-মোড়া বাক্সটা উপহার পেয়ে দিদিমাকে খুব খুশী মনে হল, মিষ্টি হেসে তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন। বাক্সটা নাড়াচাড়া করে শেষ পর্যন্ত কোথায় রাখবেন বুঝতে না পেরে তুলে দিলেন বাবার হাতে, দেখতে বললেন চমৎকার বাক্সটা।

বাবা নিজের কৌতূহল মিটিয়ে বাক্সটা দিয়ে দিলেন পাদ্রীর হাতে, তিনি আবার এই সামান্য জিনিসটা দেখে একেবারে মজে গেলেন। মাথা নেড়ে নেড়ে কৌতূহলভরে একবার বাক্সটা দেখেন আর একবার শিল্পীকে দেখেন।

ভলোদিয়া তার ছবিটা দিল,—আবার চারিদিক থেকে প্রশংসা পেল।

এবার আমার পালা। দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উৎসাহ দিলেন।

যাঁরা তাদের লাজুক স্বভাবের জন্য ভুগেছেন, তারা জানেন যতই সময় বয়ে যায় ততই তাদের লজ্জা আর আড়ষ্টভাব বাড়ে আর সেই অনুপাতে কমে সঙ্কল্পের জোর। অর্থাৎ এই ভাবটা যত বেশীক্ষণ টেঁকে ততই সেটা কাটিয়ে ওঠবার ক্ষমতা লোপ পায়।

কার্ল ইভানিচ্ আর ভলোদিয়া যতক্ষণে তাদের উপহার দিচ্ছে, ততক্ষণে আমার সাহসের শেষ বিন্দুটিও উবে গিয়েছে। লজ্জায় আমার কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে—মনে হচ্ছে চড়চড় করে মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। একবার লাল হয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তেই একেবারে ফ্যাকাসে—নাকের ডগায় আর কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা। সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল, যেন কালো ঘাম ছুটে গেল; পা বদল করে একবার এ-পায়ে আরেক বার ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু নড়তে পারলাম না একচুলও।

"এস, নিকোলেঙ্কা দেখাও, তুমি কি এনেছ? একটা বাক্স না একটা ছবি?" বাবা ডাকলেন।

আর কোনো উপায় নেই! কোনোমতে হাত বাড়িয়ে মোচড়ানো

দোমড়ানো, পাকানো কাগজের তাড়াটা দিলাম—কিন্তু গলা দিয়ে আমার একটুও স্বর বেরোল না, দিদিমার সামনে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকলাম। চমৎকার বাক্স কিংবা ছবির বদলে আমার এই বিচ্ছিরি কবিতাটা এক্ষুনি পড়া হবে সবার সামনে, মায় সেই শেষ লাইনটা, "তোমাকে ভালবাসব মায়ের মত"—ভাবতেও মাথা আমার ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল। দিদিমা নিজে পড়তে পড়তে হাতের লেখা বুঝতে না পেরে থম্‌কে গিয়ে বাবার দিকে তাকালেন, আমার মনে হল ঠোঁটে একটুক্‌রো ব্যঙ্গের হাসি,—তারপরে ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য সবটা শেষ না করেই বাবার হাতে দিয়ে অনুরোধ করলেন সবটা আবার গোড়া থেকে পড়তে। আমার যে তখন মনের কি অবস্থা, কি করে বোঝাই। আমার তো মনে হল দিদিমা পড়লেন না কেননা অমনি বাজে আর আঁকাবাঁকা করে লেখা কবিতা কে পড়ে! তা ছাড়া উনি চাইলেন বাবা ওই শেষ লাইন নিজেই পড়ুন, দেখুন, কি দুষ্টু ছেলেটা, নিজের মাকে ভালবাসে না একটুও, কেমন ভুলে গিয়েছে তাকে এরই মধ্যে! আমি আশা করে রইলাম বাবা এক্ষুণি আমার নাকে একটা ঠোকা মেরে বলবেন, "তবেরে দুষ্টু ছেলে, নিজের মাকে ভুলে যাওয়া? দেখ, দেখ তবে।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই ঘটল না এসব। সবটা পড়া শেষ হতে দিদিমা বললেন, "বাঃ, সুন্দর, চমৎকার!" আর কপালে চুমু খেলেন আমার।

দিদিমা সবসময় যে চেয়ারটায় বসতেন, তার সঙ্গে ছোট একটা টেবিল লাগানো থাকত—তার ওপর পর পর সাজিয়ে রাখা হল ছোট বাক্সটা, ছবি, কবিতাগুলো আর একটা নস্যির ডিবে, তাতে মায়ের ছবি আঁকা।

"প্রিন্সেস বারবারা ইলিনিচনা এসেছেন"—দিদিমার গাড়ির পা-দানিতে সবসময় যে দুজন লম্বা চওড়া ফুটম্যান থাকে, তাদের মধ্যে একজন এসে জানালে।

নস্যির ডিবেটার ওপরে কচ্ছপের খোলার ঢাক্‌না তার ওপর ছবিটা বসানো, দিদিমা গভীর মনোযোগ দিয়ে তাই দেখছেন, কোনো জবাব দিলেন না।

"প্রিন্সেসকে এখানে আনব কি?" ফুটম্যান আবার জিজ্ঞেস করে।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রিন্সেস করনাকোভা

"এখানে নিয়ে এস"—দিদিমা ঠিকঠাক হয়ে চেয়ারে বসলেন।

প্রিন্সেসের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, দেখতে বেঁটে, রোগা, শুক্‌নো গোছের রাগী-রাগী চেহারা ; ঠোঁট দুটিতে চমৎকার একটু অমায়িক হাসি কিন্তু চোখের তারা দুটির রঙ কেমন যেন বিচ্ছিরি পাঁশুটে-সব্‌জে আর তাতেই নষ্ট হয়ে গেছে ঠোঁটের হাসির ঐ মাধুর্যটুকু। অস্ট্রিচ্‌ পাখির পালক লাগানো ভেলভেটের টুপির নীচে লালচে পাতলা চুল ; মুখখানা রুগ্ন ফ্যাকাসে, তাই তার তুলনায় আরও বেশী লাল্‌চে দেখায় চোখের ভুরু আর পক্ষ্ম। কিন্তু তবুও তাঁর ছোট ছোট হাত দুখানা চেহারার এক বিশেষ ধরনের রুক্ষতা আর একান্ত অসঙ্কোচ ব্যবহার—এই সবে মিলে একটা আভিজাত্যের ছাপ দিয়েছে সে চেহারায়।

প্রিন্সেস একটানা কথা বলে চললেন। এক জাতীয় লোক আছেন যাঁরা সব সময় কথা বলেন এমন ভঙ্গিতে যেন লড়াই করছেন প্রতিপক্ষের সঙ্গে, যদিও কেউ জবাব দেননি একটা কথারও—এই মহিলা হচ্ছেন সেই জাতীয়া। এঁর গলার স্বরে ঢেউ খেলছে, একবার খুব জোরে আবার পরমুহূর্তেই স্বর নামিয়ে নিচ্ছেন খাদে—তারপর উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে যেন তাদের সমর্থন চাচ্ছেন, যদিও তারা কেউই কথাবার্তায় কোনো অংশ নেননি, আবার নতুন উৎসাহে শুরু করছেন।

প্রিন্সেস এসেই দিদিমার হাতে চুমু খেয়েছেন আর কথা বলছেন খুবই হৃদ্যতার সঙ্গে—কিন্তু তবুও আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম দিদিমা যেন মোটেই খুশী নন। ওঁর ওপর প্রিন্সেস যখন বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিলেন কেন প্রিন্স মিখাইলো নিজে এসে দিদিমাকে অভিনন্দন জানাতে পারলেন না, তার নিজের আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। দিদিমা কেমন এক অসন্তুষ্ট ধরনে যেন ভুরু দুটি কুঁচকে কথা শুনছিলেন। এবারে প্রিন্সেসের ফ্রেঞ্চ ভাষার জবাবে রাশিয়ান

ভাষায় জবাব দিলেন, "আপনার মনোযোগের জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আর প্রিন্স মিখাইলোর না আসা সম্বন্ধে, দয়া করে আর ওর উল্লেখ করবেন না। তিনি সব সময়ই খুব ব্যস্ত আমি জানি, তাছাড়া, আমার মতন একজন বুড়ো মানুষকে দেখতে এসে আর কি আনন্দ পাবেন তিনি?" প্রিন্সেসকে এর কোনো প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই দিদিমা সঙ্গে সঙ্গেই আবার জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা ছেলেমেয়েরা সব কেমন?"

"ভগবানকে ধন্যবাদ। তারা ভালই আছে, বেশ বড়সড় হয়েছে আর যত রকমের সব দুষ্টুমি খেলছে তাদের মাথায়, বিশেষ করে এতিয়েনে। ঐটিই আমার সব চাইতে বড় আর ওটি দিনকে দিন হয়ে উঠছে একটি আস্ত বদমাস। তবে হ্যা, এতিয়েনে আমার যেমনি বুদ্ধিমান তেমনি চালাকচতুর—ভবিষ্যতে উন্নতি করবে।"

দিদিমার অবশ্য বিন্দুমাত্রও উৎসাহ দেখা গেল না প্রিন্সেসের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে, বরঞ্চ নিজের নাতিনাতনীদের নিয়ে গর্ব করতেই বেশী উৎসুক তিনি ততক্ষণে; বাক্স থেকে আমার কবিতা-লেখা কাগোজগুলো বার করে আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রিন্সেস তাই দেখে চট করে এবার বাবার দিকে ফিরলেন, "বুঝুন একবার, কল্পনা করুন, সেদিন করল কি···।"

প্রচুর উত্তেজিত ভাবে তিনি ঘটনাটা বলতে থাকেন। গল্পটা আমি কান দিয়ে শুনিনি, শেষ হতে প্রিন্সেস জোরে হেসে উঠে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, "কি বলেন, আপনি, অ্যাঁ? বেত লাগান উচিত, না? কিন্তু দুষ্টুমিটা সত্যি এত বুদ্ধি খরচ করে করতে হয়েছিল আর এত মজার যে আমি শেষ পর্যন্ত ক্ষমাই করে ফেললাম।"

দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস হাসতেই থাকেন মুখে কোন কথা না বলে।

"ছেলেমেয়েদের আপনি কি মারেন?" অর্থপূর্ণ ভাবে ভুরুদুটো ওপরে তুলে দিদিমা এবার জিজ্ঞাসা করেন "মারেন" কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে।

"কি করি বলুন", সরলভাবেই উনি জবাব দেন বাবার দিকেও একবার একটু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন, "এ সম্বন্ধে আপনার মতামত তো আমি জানি। খুবই দুঃখিত কিন্তু কি করি, ঠিক এই ব্যাপারটায় আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি না। বই আমি অনেক পড়েছি এ সম্বন্ধে, অনেক ভেবেছি, অনেক উপদেশও শুনেছি, কিন্তু তাহলেও অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে একমাত্র

ভয়ের সাহায্যেই শাসন করা যায় বাচ্চাদের। তাদের ভেতরকার ভাল গুণগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে হলে 'ভয়' বিশেষ দরকারী। আর তাহলেই ধরুন, লাঠির চাইতে আর কোন্ জিনিসকে তারা বেশী ভয় করে ?"

এবার প্রশ্নভরা চোখে উনি যেন বিশেষ করে আমাদের দিকেই তাকালেন ; সে দৃষ্টির সামনে আমি বেশ আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, স্বীকার করছি।

"যাই বলুন না কেন, বার বছরের, এমন কি চোদ্দ বছরের একটি ছেলেও বাচ্চাই ধরতে গেলে। তবে হ্যা, মেয়েদের কথা অবশ্য একটু আলাদা।"

"উঃ, কি সৌভাগ্য যে ওঁর ছেলে হয়ে জন্মাইনি", মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

"হ্যা, তা খুব ভাল কথা ঠিক কথা"—দিদিমা এবার আস্তে আস্তে ভাঁজ করে কবিতাটি আবার বাক্সে ভরে রাখলেন। বোধহয় ভাবলেন, এ ধরনের কথাবার্তা বলার পর আর প্রিন্সেস এমন চমৎকার কবিতা শোনবার যোগ্য নন।

"ঠিক কথা, কিন্তু বলুন তো এরপর আর ছেলেমেয়েদের ভেতর কোনরকম সূক্ষ্ম রুচির আশা আপনি করতে পারেন কি ?"

এ যুক্তির আর কোনো জবাব নেই ঠিক করে নিয়ে দিদিমা একেবারে এ আলোচনার ছেদ টানলেন, "যাই হোক, এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই নিজের মত খাটাবার অধিকার আছে।"

প্রিন্সেস আমাদের সবায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন যেন একটু কৃপা করেই—ভাবটা যেন, যাক্‌গে, যাঁকে উনি বিশেষ সমীহ করেন, তাঁর ভেতর একটুআধটু এরকম অদ্ভুত ধরনের সংস্কার থাকলই বা, তা তিনি সহ্য করে নিতে প্রস্তুত আছেন।

"দয়া করে এবার ছেলেপুলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন না"—আমাদের ইঙ্গিত করে স্নেহের হাসি হাসেন প্রিন্সেস।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম প্রিন্সেসের দিকে—ঠিক মাথায় ঢুকল না কি করে বোঝাব যে আমাদের পরিচয় ঘটে গেছে।

"ওঁর হাতে চুমু খাও", বাবা বলেন।

"তোমরা তোমাদের এই বুড়ি মাসীকে ভালবাসবে, কেমন ভালবাসবে না ?" ভলোদিয়ার চুলে চুমু খেয়ে উনি বলেন। "আমি অবশ্য খুবই দূর সম্পর্কের মাসী, কিন্তু রক্তের সম্পর্কের চাইতেও মনের সম্বন্ধকেই আমি বেশী

দাম দিই। শেষের কথাগুলো দিদিমাকে লক্ষ্য করে বলা। কিন্তু দিদিমা তখনও তার ওপর অপ্রসন্ন, জবাবে বলেন, "কিন্তু ওরকম সম্পর্কের ঠিক কি আর আজকাল কেউ দাম দেয় ?"

"আমার এটির বেশ বিষয়-বুদ্ধি হবে, আজকের জগতের সঙ্গে খাপ খাবে", ভলোদিয়াকে দেখিয়ে বাবা বলেন, "আর এটি হবে একজন কবি।"

বাবা যখন এই শেষের কথাটি যোগ দিলেন আমি ঠিক তক্ষুনি নীচু হয়ে প্রিন্সেসের হাতে চুমু খাচ্ছি, শুকনো ছোট হাতটিতে ঠোঁট ছোঁয়াতেই আমার কল্পনায় পরিষ্কার ভেসে উঠল এই হাতে ধরা একটি বেত আর বেতের ঠিক নিচে একটি বেঞ্চি, আর তাতে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার হাতটা আটকে রেখেই প্রিন্সেস জিজ্ঞেস করেন, "কোনটি ?"

"ওই যে ছোট্ট ভদ্রলোকটি, মাথায় একটি চুলের ঝুঁটি—", বাবা মজা করে হেসে ওঠেন।

আচ্ছা, আমার ঝুঁটিটা নিয়ে ওর কি দরকার ? কথা বলার আর কি কিছু নেই ? আমি একটা কোণে পালিয়ে গেলাম।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার অদ্ভুত সব ধারণা। এমনকি কার্ল ইভানিচ্ পর্যন্ত আমার চোখে পৃথিবীতে সব চাইতে রূপবান। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত জানতাম যে আমি দেখতে মোটেই সুন্দর নই—আর এ ধারণাতে কোনো ভুল ছিল না। তাই চেহারার কোনো উল্লেখে কাঁটা বিঁধত আমার মনে।

খুব ভাল করেই মনে পড়ে একদিন, আমার তখন ছ বছর বয়স, ডিনারে বসে আলোচনা চলছিল আমার চেহারা নিয়ে। মা প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন রূপের ছিঁটেফোঁটা আবিষ্কার করতে আমার মুখে; বলছিলেন আমার চোখে বুদ্ধির ছটা, হাসিটা মিষ্টি···কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার যুক্তি আর চাক্ষুষ প্রমাণের কাছে হার মানতেই হল মাকে। স্বীকার করতে হল যে আমার মুখখানা নিতান্তই সাধারণ। ডিনারের শেষে আমি যখন সেদিন মাকে ধন্যবাদ দিলাম, মামণি তখন আমার গালে আদর করে বললেন, "তাহলে খোকনসোনা, মনে রেখো, শুধু মুখ দেখে কেউ তোমাকে ভালবাসবে না। তোমাকে হতে হবে ভাল, বুদ্ধিমান চালাকচতুর, সেই চেষ্টা করবে, কেমন ?"

কথাগুলো আমার মনে চিরস্থায়ী দাগ কেটে দিল : আমি কুৎসিত, আমাকে চেষ্টা করে ভাল হতে হবে, বুদ্ধিমান হতে হবে।

তবুও মাঝে মাঝে গভীর ক্ষোভ জাগত ; হতাশ মনে ভাবতাম আমার

মতন চওড়া নাক, মোটা ঠোঁট আর কুতকুতে পাঁশুটে চোখ নিয়ে জীবনে সুখ কোথায় ? আকুল হয়ে প্রার্থনা জানাতাম, "হে ভগবান, দয়া কর, তুমি তো যাদু জান, তাই দিয়ে তুমি সুন্দর করে দাও আমায় ; আমার এখন যা আছে ভবিষ্যতে যা থাকবে, স-ব দিয়ে দেব তোমাকে, তার বদলে তুমি শুধু একটুকু রূপ দাও আমাকে।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রিন্স ইভান ইভানিচ্

প্রিন্সেস শেষ পর্যন্ত কবিতাটা শুনলেন আর প্রচুর প্রশংসা করলেন কবির, তবে গিয়ে একটু নরম হলেন আমার দিদিমা। শেষ পর্যন্ত প্রিন্সেসের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বললেন, 'আপনি' ছেড়ে 'তুমিতে' নামলেন আর সন্ধ্যেবেলায় ছেলেমেয়েদের সব্বাইকে নিয়ে আবার আসতে নেমন্তন্ন করলেন। প্রিন্সেস রাজি হলেন, সামান্য একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সেদিন সকালে এত অতিথি অভিনন্দন জানাতে এলেন যে সারাটা সকাল ধরেই ফটকের সামনে আঙ্গিনায় গাড়ির পর গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল।

একজন অতিথি ঘরে ঢুকে নীচু হয়ে চুমু খেলেন দিদিমার হাতে, সুন্দর ফরাসী ভাষায় অভিনন্দন জানালেন।

ভদ্রলোকের বয়স প্রায় সত্তর, সুন্দর, সুঠাম চেহারা, পরনে মিলিটারি পোশাক, কলারের তলায় সাদা ঝক্‌ঝকে ক্রুশ, প্রশান্ত, সরল মুখভাব। ওঁর ব্যবহারের স্বচ্ছন্দভাব আর আন্তরিকতা বিস্মিত করল আমাকে। মুখখানা এখনও ভারী সুন্দর—যদি চুল মোটে অবশিষ্ট গলার ঠিক ওপরদিকে অর্ধচন্দ্রের মত একটা লাইনে, আর বসে-যাওয়া ওপর ঠোঁটের ফাঁকে দেখা গেল দাঁত নেই।

গত শতকের শেষের দিকে, প্রিন্স ইভান ইভানিচ্ খুব অল্প বয়সেই চমৎকার উন্নতি করেছিলেন। ওঁর নিখুঁত চেহারা, অতুল সাহস, সৎস্বভাব ও ক্ষমতাশালী বংশ, আর সব চাইতে বেশী ওঁর নিজের সৌভাগ্য—এই সবগুলোই ছিল তার মূলে। সেনা-বাহিনীতে থাকলেন আর এত তাড়াতাড়ি ওঁর সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গেল যে বাকি আর রইল না কিছু চাইবার। ভবিষ্যতে সে উঁচু সম্মানের আসনে ভাগ্য তাঁকে বসিয়ে দিয়েছিল—সেই আসনটি নেবার জন্যে সেই ছাঁচেই যেন তিনি ঢালাই করেছিলেন নিজেকে সেই ছোটবেলা থেকেই। হতাশা, বিফলতা তাঁর জীবনেও এসেছে দুচারবার, যেমন প্রতিটি লোকেরই এসে থাকে,—তবুও মানসিক প্রশান্তি তাঁর নষ্ট হয় নি, উচ্চচিন্তা বা ধর্মাধর্মের

সুস্পষ্ট নীতি থেকেও ভ্রষ্ট হননি একচুলও; লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে যতটা তাঁর ক্ষমতার জন্যে, তার চাইতেও বেশী তাঁর দৃঢ়তার জন্যে, তার স্থৈর্যের জন্যে। তাঁর মনীষা বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না, কিন্তু ধন্যবাদ তাঁর ক্ষমতার আসনকে—সেখানে বসে তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পেরেছেন নীচে জনতার কোলাহলের দিকে আর দৃষ্টিকেও ফিরিয়ে রেখেছেন সব সময় ওপরের দিকে। আসলে তাঁর প্রকৃতি ছিল নরম আর অনুভূতিপ্রবন কিন্তু বাইরের ব্যবহার ছিল নির্বিকার, উদ্ধত। বহু লোকের উপকার করার ক্ষমতা তাঁর ছিল, তাই এই কঠোর, উদ্ধত ব্যবহারের আড়ালে তিনি আত্মরক্ষা করতেন অসংখ্য লোকের আবেদন-নিবেদনের হাত থেকে যাঁরা কেবলই তাঁর ক্ষমতার সুযোগ নিতে চাইতেন। কিন্তু সমাজের যে উঁচু স্তরের লোক তিনি, তারা কৃপা করেও অমায়িক ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত, তাই এর ফলে তাঁর ব্যবহারের কঠোরতা কমে যেত অনেক সময়।

ভদ্রলোক ছিলেন সংস্কৃতিসম্পন্ন, পড়াশুনাও করেছিলেন প্রচুর। কিন্তু সে সংস্কৃতির গতি রুদ্ধ হয়েছিল তাঁর যৌবনে—অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষের দিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দর্শনের ওপর ফ্রান্সে উল্লেখযোগ্য যা কিছু লেখা হয়েছে, সব পড়েছেন তিনি, ফরাসী সাহিত্যের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু উপভোগের তার সঙ্গে প্রিন্স ইভানের ঘনিষ্ঠ পরিচয়; মুখস্থ বলতে পারতেন রেসিন, কর্নেই'ল, বয়লিউ, মলেয়ার, মণ্টেইন, ফেনেলন—সবাইয়ের বই থেকে আর ভালও বাসতেন তা করতে। পৌরাণিক কাহিনীতে জ্ঞান তার অগাধ, আগের যুগের মোটামুটি সব মহাকাব্যের ফরাসী অনুবাদ পড়েছেন, ইতিহাসেরও জ্ঞান মোটামুটি ভালই কিন্তু গণিতশাস্ত্রের জ্ঞানের দৌড় ঐ পাটিগণিতের বাইরে যেত না, ফিজিক্স জানতেন না আর জানতেন না সমসাময়িক সাহিত্য। গ্যেটে, শীলার বা বায়রন সম্বন্ধে তিনি হয় ভদ্রভাবে চুপ করে থাকেন, নয়তো বড়জোর অতি সাধারণ দুচারটে মন্তব্য করেন কিন্তু তাদের বই পড়েন না কখনো। কিন্তু ফরাসী ভাষা ও এই সব কঠিন বিষয়ে দখল থাকা সত্ত্বেও তাঁর কথাবার্তার ধরন ছিল অতি সাধারণ, অলঙ্কার-বিহীন,—এই গুণেই অনেক বিষয়ের অজ্ঞানতা তাঁর ঢাকা পড়ে যেত আর আলাপ আলোচনাতেও রুচির পরিচয় পাওয়া যেত। যে কোনরকমের খামখেয়ালিপনাকেই তিনি ঘৃণা করেন, বলেন ওটা অশ্লীলতারই নামান্তর। সামাজিকতা ওঁর জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ, যেখানেই বাস করুন না কেন; মস্কোতেই থাকুন কিংবা বিদেশে যান, যথেষ্ট খরচপত্র করেই

দিন কাটান, আর নানা উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝেই গোটা শহর নেমন্তন্ন করেন। সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা এতই বেশী ছিল যে, যে কোনো একজন লোক ওঁর কাছ থেকে একবার একখানা নিমন্ত্রনপত্র পেলে সেখানাকে অনায়াসেই অন্য যে কোনো ড্রইংরুমে ঢোকবার ছাড়পত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন। কত অসংখ্য সুন্দরী তরুণী খুশী মনে তাদের আরক্তিম গাল বাড়িয়ে দিয়েছে ওঁর ঠোঁটের কাছে, পিতৃস্নেহের ভান দেখিয়ে উনি চুমু খেয়েছেন তাতে আর কত নামকরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক লালায়িত হয়ে থেকেছেন ওঁর বাড়ির কোনো উৎসবে নিমন্ত্রণপত্র পাবার আশায়!

আজকের দিনে সে যুগের অতি সামান্য কয়েকজন মাত্র লোকই অবশিষ্ট আছেন, যাঁরা দিদিমার মত তাঁর একই সমাজের লোক, একই বয়সের, একই ধরনের শিক্ষাদীক্ষা আর একই ভাবধারার বাহক, তাই দিদিমার বন্ধুত্বের একটা বিশেষ মূল্য ছিল তাঁর কাছে, ওঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতেন তিনি।

প্রিন্সের দিকে আমি ভাল করে তাকাতেই পারলাম না। সবাই এত সম্মান দেখাচ্ছে, ওঁর মিলিটারি পোশাকের সেই জাঁকজমক, দিদিমা এত করে আনন্দ প্রকাশ করছেন ওঁকে দেখে, আর বিশেষ করে আমার চোখে তিনিই বোধহয় একমাত্র লোক যিনি দিদিমাকে ভয় করছেন না একটুকুও, বরঞ্চ কথাবার্তা বলছেন কেমন সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ ভাবে—সবে মিলে আমার ছোট্ট মনেও তাঁর জন্য একটা শ্রদ্ধার আসন পাতা হয়ে গেল, দিদিমাকে যতটা সম্মান করি তার চাইতে বেশী না হলেও তার মতন তো বটেই। দিদিমা কবিতাটা দেখাতে, আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে প্রিন্স বললেন, "কে জানে, বোন, এ-ও একদিন দেরঝাভিন হয়ে দাঁড়াবে কিনা?"

এই বলে এত জোরে আমার গাল টিপে দিলেন যে আমি প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি—কোনমতে সামলে নিলাম, মনকে বোঝালাম, আসলে উনি আমাকে আদর করতেই চেয়েছেন।.

অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেন, বাবা আর ভলোদিয়াও। বসবার ঘরে রইলাম কেবল আমি, দিদিমা আর প্রিন্স।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রিন্স আচমকা জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, "আচ্ছা, আমাদের নাতালিয়া নিকোলায়েভ্না এল না কেন?"

দিদিমা একটু মাথা নীচু করলেন, তারপর প্রিন্সের ইউনিফর্মের হাতার ওপর নিজের হাতখানা রেখে বললেন, "যদি সে নিজের ইচ্ছে মতন কাজ করতে

পারত তবে কি সে না এসে থাকত? আমাকে লিখেছে, পিয়ের্ নাকি বলেছিল আসতে কিন্তু ও নিজেই গররাজী হয়েছে, এ বছর আয় মোটেই হয়নি তাই। লিখেছে: তা ছাড়া, এ বছর সমস্ত লোকজন নিয়ে মস্কো চলে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। লিউবোচ্কা খুবই ছোট এখনও, আর ছেলেদের কথা···তারা রয়েছে তোমার কাছে, সে তো আমার কাছে থাকার চাইতেও ভাল।. খুবই চমৎকার!" দিদিমার গলা থেকে অবশ্য বোঝা গেল ওঁর মতে চমৎকার নয় মোটেই। ."ছেলেদের এখানে পাঠানো উচিত ছিল আরও অনেক আগে, কিছু লেখাপড়া আর সমাজের আদবকায়দা শিখতে। সেই গাঁয়ে থেকে কি-রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ওদের? বড়টির তো তের হল আর ছোটটির এগার। তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, ওরা একেবারেই জংলী এখনো, কি করে ঘরে ঢুকতে হয়, সে কায়দাটুকু পর্যন্ত জানে না।"

"কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না", প্রিন্স দিদিমাকে বাধা দিলেন, "প্রতিবারই এই টাকার অভাবের কথা তোলা হয় কেন? ওর স্বামীর তো যথেষ্ট সম্পত্তি আর নাটাশার নিজের 'খাবারোভ্কা'—সেটার আয় তো বেশ ভালই। সেখানে একবার তোমার সঙ্গে থিয়েটার করেছিলাম, মনে আছে? জায়গাটা আমি খুব ভাল করেই জানি, একেবারে আমার নিজের হাতের তালুর মতন।"

"দেখ, আসল ব্যাপারটা তোমার মত বন্ধুকে বলতে বাধা দেখি না", দিদিমা খুবই দুঃখের সঙ্গে বলেন, "আমার মনে হয় কি জান, এসব অজুহাতগুলো তৈরি করা হয়েছে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে জামাই এখানে একলা থাকতে পারে, আর ক্লাবে, ডিনারে গিয়ে মজা লুটতে পারে, আরও কি করে না করে ভগবানই জানেন। কিন্তু আমার মেয়ে···কিছু সন্দেহ করে না। তুমি তো জান কি চমৎকার মেয়ে আমার, স্বামীর ওপর তার অখণ্ড বিশ্বাস। স্বামীই ওকে বুঝিয়েছে ছেলেদের নিয়ে মস্কো আসা দরকার আর ও থাকবে সেই গ্রামে একটা মূর্খ গভর্নেসকে সঙ্গী করে—আর ও-ও তাই বিশ্বাস করেছে। ওর স্বামী যদি আজকে বলে যে ছেলেদের বেত মারা দরকার, ওই প্রিন্সেস ভারভারা ইলিনিচ্না যেমন করে—খুব সম্ভব তাতেও রাজী হয়ে যাবে ও।" দিদিমা চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন যেন সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করতে চাইলেন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, দুটি রুমাল থেকে একটি তুলে নিয়ে চোখের জল মুছে, আবার শুরু করলেন, "হ্যাঁ, সত্যি বুঝলে,

স্বামী ওকে বুঝতেও পারে না, ওর দামও দেয় না। তাই অত সুন্দর স্বভাব নিয়ে আর স্বামীকে অত ভালবেসেও নাটাশা আমার আসলে সুখী নয়। সে ব্যথা ও সবসময়ই চেপে রাখতে চেষ্টা করে—কিন্তু আমি জানি, তবুও জানি, আর আমার কথা শোন তুমি, যদি না ওর স্বামী—", দিদিমা রুমালে মুখ ঢাকলেন।

"ছিঃ, কি হচ্ছে?" প্রিন্স বকে উঠলেন "আমি দেখছি, তোমার একটুও জ্ঞান বাড়েনি, সেই আগেরই মত মনগড়া দুঃখ নিয়ে সব সময় কষ্ট পাচ্ছ। আর এ সব কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না? ছিঃ। তোমার জামাইকে আমি তো কত দিন ধরেই জানি, জানি চমৎকার ছেলে, স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, কত যত্ন করে আর তার চাইতেও বেশী হচ্ছে সে অতি সৎ লোক।"

যা আমার শোনা কিছুতেই উচিত নয়, অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও তেমনি আলোচনাই আমার কানে এসে গেল—এবার আমি পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, ভয়ঙ্কর উত্তেজিত ভাবে।

উনবিংশ অধ্যায়

ইভিন ভায়েরা

"ভলোদিয়া! ভলোদিয়া! ইভিন, ইভিন, ইভিনরা এসেছে", আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, জানালা দিয়ে তাকিয়ে যেই দেখতে পেলাম আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে রাস্তা পার হয়ে আসছে তিনটি ছেলে বীভার কলারওয়ালা ওভার কোট পরে, সঙ্গে তাদের সৌখীন তরুণ মাস্টার।

ইভিনরা সম্পর্কে আমাদের আত্মীয়, বয়সেও আমাদের সমান, মস্কো এসেই ওদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আর এখন তো আমরা একেবারে একাত্মা।

দ্বিতীয় ভাই সেরিওঝার রঙ একটু ময়লা, চুল কোঁকড়ানো, নাকের ডগা খুব সামান্য একটু ওপর দিকে ওল্টানো, ঠোঁট দুটি সুন্দর লাল টুকটুকে কিন্তু তাতে ঝক্‌ঝকে সাদা একটু বড় বড় ওপরের দাঁতগুলো প্রায়ই চাপা পড়ে না, চমৎকার ঘন-নীল চোখ আর সবসময়েই বেশ একটা চট্‌পটে, সচেতন ভাব। অল্প হাসা তার অভ্যেস ছিল না, হয় একদম চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকত, না হয় পরিষ্কার সুরেলা গলায় জোরে খিলখিল করে হেসে উঠত,—সে হাসি ভীষণ ছোঁয়াচে। প্রথম দর্শনেই ওর রূপে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপর থেকেই একটা তীব্র আকর্ষণ জন্মাল ওর ওপরে। শুধু চোখের দেখাতেই মন আমার ভরে থাকত। আর সেই সময়টার জীবনে আমার ঐ একটি মাত্রই ইচ্ছে; কোনো সময়ে যদি তিন চারটে দিন কেটে যেত পরপর ওকে একটিবারও দেখতে না পেয়ে—মন যে আমার কী ভীষণ খারাপ হত, কিছুই ভাল লাগে না, সবকিছু বিস্বাদ, কোথা থেকে অকারণে চোখেও জল এসে পড়ে মাঝে মাঝে! স্বপ্ন যা দেখতাম, জেগেই থাকি আর ঘুমিয়েই থাকি, তা সবই ওকে নিয়ে। যখন ঘুমোতে যেতাম, কামনা করতাম ওকেই যেন স্বপ্নে দেখি, চোখ বুজলে ওকেই দেখতাম সামনে—আর এই স্বপ্নটিকেই তখন মনে হত বুঝি বা জীবনের চরম আনন্দ! জীবনের প্রথম অনুরাগ, কি ভয়ঙ্কর দাম এর—তাইতো কাউকেই বিশ্বাস করে বলতাম না একথা। সেরিওঝা কিন্তু ওদিকে আমার চাইতে

ভলোদিয়ার সঙ্গেই কথা বলতে, খেলা করতে বেশী ভালবাসে—হয়তো বিরক্তি বোধ করে ওর মুখের দিকে সব সময় অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি বলে, নয়তো এমনিতেই ভাল লাগে না আমাকে ওর। কিন্তু তবুও আমি সুখী; আমি কিছু চাইনি, কিছু দাবিও করিনি, যা আছে আমার সবকিছু ত্যাগ করতেই চাই ওর জন্যে। আমার এই গভীর অনুরাগ ছাড়া আরও একটা ভাবও বিশেষ প্রবল হত ও সামনে এলে—পাছে কোনো ব্যবহারে ও অসন্তুষ্ট হয়, বিরক্ত হয়, পাছে কোনো কথায় ওকে আঘাত দিয়ে ফেলি, সব সময় সেই একটা ভয়! আমি ওকে ভালবাসতাম যতটা, ভয়ও করতাম ততটা। বোধহয় ওর মুখে সব সময় একটা উদ্ধত ভাব লেগে থাকত তাই কিংবা আমি নিজে শ্রীহীন বলে অন্যের সুশ্রী মুখের দাম ভয়ানক বেশী মনে হত তাই—আর নয়তো, এটাই বোধহয় বেশী সম্ভব, এই হচ্ছে প্রেমের নিশ্চিত লক্ষণ! সেরিওঝা প্রথম যেদিন কথা বলল আমার সঙ্গে, সে আনন্দে, সে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে আমি ঘাবড়েই গেলাম একদম—একবার লাল হয়ে উঠি তো আরেকবার ফ্যাকাসে, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না একটাও! ওর একটা বিশ্রী অভ্যেস ছিল, যখন কিছু ভাবত, কোনো একটা বিশেষ দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করত আর একই সঙ্গে নাক আর ভুরু মলত। সবাই স্বীকার করত একবাক্যে, ভারী বিশ্রী স্বভাব। কিন্তু আমার চোখে তাই-ই চমৎকার আর তার ফলে নিজের অজ্ঞান্তেই মুদ্রাদোষটা রপ্তও করে ফেললাম কখন। দিনকতক পরেই দিদিমা একদিন জিজ্ঞেস করলেন: আমার চোখে কিছু হয়েছে নাকি, পেঁচার মত চোখ পিটপিট করছি কেন? একটা ভালবাসার কথাও আমাদের মধ্যে হয়নি কখনও, তবুও সে জানত, তার অবচেতন মনে জানত আমার ওপর তার প্রভাবের কথা—। তাই তো দেখি আমাদের সেই ছেলেমানুষী আলাপ পরিচয় খেলাধুলার ভেতরেও সেরিওঝা জোর খাটাত আমার ওপরে, এমনকি পীড়ন করতেও কসুর করত না। আর আমার কথা, আমার তো মন চাইত প্রাণমন উজাড় করে সব ওকে ঢেলে দিতে, কিন্তু মুস্কিল হত সেইখানে, লজ্জায় খোলাখুলি কোনো কথাই বলতে পারতাম না। আমি চেষ্টা করতাম সবসময় নির্বিকার উদাসীন হয়ে থাকতে, আর ও যা বলত তাই মেনে নিতাম টুঁ শব্দটি না করে। সময় সময় ওর জোর আমার কাছে অসহ্য লাগত, অত্যাচার বলে মনে হত—কিন্তু তবুও···তবুও তা থেকে মুক্তি নেবার ক্ষমতা আমার নিজের হাতে ছিল না!

আজ ভাবতেও দুঃখ হয়, শিশু-হৃদয়ের অমন যে চমৎকার তাজা অনুভূতি,

নিঃস্বার্থ আর অসীম ভালবাসা,—সে ভাবও কেমন আস্তে আস্তে মরে গেল নিজেকে প্রকাশ করতে না পেরে আর পরিবর্তে ভালবাসা না পেয়ে। কেন যে আমি যখন ছোট ছিলাম কেবলি বড়দের অনুকরণ করতে চাইতাম, আর যখন বড় হলাম কত সময়েই না চেয়েছি আবার ছেলেবেলার সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে!

এই অস্বাভাবিক অনুকরণের ইচ্ছেটাই সব সময় বাধা রচনা করেছে আমার আর সেরিওঝার মাঝে। এরই ফলে কত স্বাভাবিক আবেগকে দমন করে রেখেছি কত সময়! সাহস করে কখনো একটা চুমু খাইনি, যদিও কত ইচ্ছে হয়েছে—ওর হাতখানা ধরিনি, একবারও বলিনি কত খুশী হয়েছি ওকে দেখে, এমন কি একটু ঘনিষ্ঠভাবে সেরিওঝা বলে ডাকিনি পর্যন্ত, সবসময় ডেকেছি ভদ্রতা করে সাজি বলে। যে কোনো রকমের উচ্ছ্বাসকেই মনে হত ছেলেমানুষি, ভাবতাম লোকে বলবে পাগলামি! যে সব তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বড়রা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সাবধান হয়ে উদাসীন ভাবে, আমাদের জীবনে সে সব অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি। তবুও যে সেদিন আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেছি আমাদের স্বাভাবিক শিশুমনের সুকুমার স্নেহ আর ভালবাসা থেকে—সে কেবল বড়দের নকল করার এই অদ্ভুত ইচ্ছেরই ফলে। সেদিন পাশের ছোট্ট ঘরটায় ইভিনদের সঙ্গে দেখা হল, নমস্কার করে দুচারটে কথা বলেই পড়ি কি মরি করে ছুট লাগালাম দিদিমার ঘরে। খুশীতে ডগমগ হয়ে ওদের আসার খবর দিলাম যেন দিদিমারও এবার আর আনন্দের সীমা থাকবে না! সেরিওঝার সঙ্গে বসবার ঘরে ঢুকলাম, এক মুহূর্তের জন্যও ওর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে ওর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে করতে। দিদিমা যখন তাঁর স্থূচের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে করতে বলছিলেন, কত বড় হয়ে গেছে ও, আমি তখন আশা-নিরাশায় দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করছি! যে মন নিয়ে একজন শিল্পী তার শিল্পের পসরা নিয়ে দাঁড়ায় কোনো বিচারকের সামনে, যাঁর বিচার ক্ষমতার ওপর সে শ্রদ্ধাশীল,—ঠিক তেমনি আকুল বক্ষে সেদিন আমি অপেক্ষায় থেকেছি দিদিমা আর সেরিওঝার মুখের দিকে তাকিয়ে!

ইভিনদের তরুণ মাস্টার হের্ ফ্রস্ট দিদিমার অনুমতি নিয়ে সামনের বাগানে গেলেন আমাদের নিয়ে। বসলেন একটি সবুজ বেঞ্চের ওপর আড়াআড়ি ভাবে পা-দুখানা রেখে ছবির মত আর দু-পায়ের মাঝে মাথার দিকটা তামা

দিয়ে বাঁধানো একটা লাঠি শুইয়ে রেখে বসে বসে মনের আনন্দে সিগারেট টানতে লাগলেন—ভাবখানা যেন নিজের ব্যবহারে বিশেষ তৃপ্ত !

হের ফ্রস্টও একজন জার্মান কিন্তু আকাশপাতাল তফাত আমাদের চমৎকার মানুষ কার্ল ইভানিচের সঙ্গে তুলনা করলে। প্রথমত হের্ ফ্রস্ট রুশভাষা বলতেন নির্ভুলভাবে, ফ্রেঞ্চ বলতেন ভুল উচ্চারণ ভঙ্গিতে, আর সকলের মাঝে বিশেষ করে মহিলাদের কাছে যথেষ্ট সুনাম ছিল, তাঁর বিদ্বান বলে ; দ্বিতীয়ত তাঁর গোঁফ ছিল লালচে, কালো সাটিনের নেকটাইয়ে পরতেন একটা চুনি বসানো পিন, হালকা নীলরঙের প্যাণ্টে বগ্‌লস আর স্প্রিংয়ের বোতাম ; তৃতীয়ত, বয়সে তরুণ, সুদর্শন, হাবেভাবে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব, আর বিশেষ করে পা-দুটি চমৎকার সুগঠিত, পেশীবহুল। বেশ বোঝা যেত, শেষেরটির জন্যেই ভদ্রলোক বিশেষ গর্বিত, তাঁর ধারণা, মেয়েদের কাছে এ-দুটির আকর্ষণ একেবারে অমোঘ—তাই বোধহয় একটু বেশী সচেতন ও-দুটি সম্বন্ধে, যতটা সম্ভব দেখিয়ে দেখিয়েই চলেন প্রতিটি মুহূর্তে আর যে ভঙ্গীতেই থাকুন না কেন, বসেই থাকুন বা দাঁড়িয়েই থাকুন, অনবরতই নাড়ছেন হাঁটুদুটো। উনি ছিলেন আমাদের দেশের এক ধরনের জার্মানদের দলে যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ফুলবাবু হয়ে হাসিতে-খুশিতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া আর মেয়েদের প্রিয়পাত্র হওয়া।

বাগানে বেশ মজাতেই সময়টা কাটছিল। ডাকাতের খেলা খেলছিলাম, উঃ কি উত্তেজনা ! কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে খেলাটার মজা একেবারে মাটি হবার যোগাড় ! ডাকাত হয়েছিল সেরিওঝা, যাত্রীদের পেছনে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক ভীষণ আছাড়। হাঁটুটা এমনি জোরে ঠুকে গেল একটা গাছের গায়ে যে আমি ভাবলাম, ব্যস্, ভেঙে গেছে নিশ্চয়। আমি যদিও পুলিশ, ডাকাতকে ধরাই আমার কর্তব্য—তবুও সে কথা ভুলে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে সহানুভূতি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি, লেগেছে কিনা। সেরিওঝা তো একদম চটেমটে লাল ; হাত মুঠো করে, মাটিতে পা ঠুকে, এমনি গলায় চীৎকার করে উঠ্‌ল সে বেশ বোঝা গেল সত্যিই চোটটা খুবই বেশী। "তোমার তাতে কি, অ্যাঁ ? তুমিই তো খেলাটা মাটি করে দিচ্ছ। এস, আমাকে ধর, ধরছ না কেন ?" সেরিওঝা বারবার এই একই কথা বলে ভলোদিয়া ও বড় ভাই ইভিনের দিকে আড়চোখে কেবলি তাকায়। ওরা তো যাত্রী—দুজনে ততক্ষণে রাস্তা ধরে ছুটছে পাল্লা দিয়ে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার করে উঠে, হা হা করে হাসতে হাসতে ওদের ধাওয়া করে সেরিওঝা।

এই বীরত্বে আমি যে কী ভয়ঙ্কর অভিভূত হলাম, তা বলে বোঝাতে পারব না। এত যন্ত্রণা পেয়েও কাঁদল না একটিবার, এমনকি বুঝতেই দিল না কাউকে যে চোট পেয়েছে, খেলাও বন্ধ করল না একটি মুহূর্তের জন্যেও!

সেদিনই আর একটু পরে যখন ইলেন্‌কা গ্রাপ এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল আর সবাই মিলে ওপরে গেলাম ডিনারের সময় পর্যন্ত খেলা করে কাটাতে। চমৎকার সাহস আর চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়ে সেরিওঝা আরেকবার অবাক করে দিল আমাকে।

ইলেন্‌কা গ্রাপের বাবা একজন গরীব বিদেশী ভদ্রলোক, একসময় বাস করতেন আমার দাদুর বাড়িতে, কিছু ধারও করেছিলেন তাঁর কাছে—তাই মাঝে মাঝেই দেখাসাক্ষাৎ করতে পাঠিয়ে দিতেন তাঁর ছেলেকে। দেওয়াটা নিতান্তই কর্তব্য বলে মনে করতেন। যদি মনে করে থাকেন যে আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে তাঁর ছেলে বিন্দুমাত্রও সম্মান বা তৃপ্তি পাবে, তাহলে অবশ্য সেটা একটা প্রকাণ্ড ভুল; আমরা আসলে ইলেন্‌কার সঙ্গে কোনরকম বন্ধুত্বই করিনি,—যখন মজা করতে ইচ্ছে করত তখনই কেবল আমাদের নজর পড়ত ওর দিকে। ইলেন্‌কার বছর তের বয়স; লম্বা, ক্ষীণ চেহারা, মুখ ফ্যাকাসে,—পাখির মত—আর সে মুখে মাখানো একটা স্বাভাবিক সরল বিনম্র ভাব। অতি সাদাসিধে, গরিবানা সাজ-পোশাক কিন্তু চুলে এমনি জবজবে পমেটম মাখানো যে আমরা বলাবলি করতাম রোদ উঠলে নিশ্চয়ই ওর পমেটম গলে গিয়ে জামার তলা দিয়ে বেয়ে বেয়ে পড়ে। আজকে যখন ওর কথা মনে পড়ে, দেখি: ছেলেটি ছিল নিতান্তই শান্তশিষ্ট, বাধ্য আর নরম স্বভাবের। কিন্তু তখন মনে হত নিতান্তই অবহেলার, অবজ্ঞার, করুণা দেখাবার—এমনকি কোনরকম চিন্তা করবারও যোগ্য নয়।

ডাকাতের খেলা শেষ হতে আমরা তো ওপরে চলে গেলাম, তারপর শুরু হল লম্ফঝম্প, আর নানা কসরত দেখানো। ইলেন্‌কা বসে বসে আমাদের খেলা দেখছে, মুখে একটুকরো ভীরু প্রশংসার হাসি; আমরা যখন বললাম এবার ওর পালা ও তখন খেলতে অস্বীকার করে বললে ওর গায়ে নাকি বেশী জোর নেই।

সেরিওঝাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল: গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছে, গাল আর চোখ দুটি জলজল করছে, অনবরত হাসছে আর যত সব মজার মজার খেলা বার করছে মাথা থেকে। তিনটে চেয়ার পর পর সাজিয়ে লাফ দিয়ে

পার হয়ে গেল, 'তাস্তিসেভে'র অভিধানখানা ঘরের মাঝখানে পেতে তার ওপর মাথা রেখে পা-দুটো উঁচু করে দাঁড়াল, আবার সেই অবস্থাতেই পা-দুটো দিয়ে এমনি কসরত দেখাচ্ছে যে আমরা একেবারে হেসে গড়াগড়ি। এই শেষ খেলাটার পর ও একটু ভাবল চুপ করে, অভ্যেস মত চোখ পিটপিট করতে করতে ; তারপর সোজা ইলেন্‌কার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। "এই যে এবার তুমি এটা কর। দেখ না, মোটেই শক্ত নয়।"

আমাদের সকলেরই নজর ওর দিকে বুঝতে পেরে গ্রাপ তো একদম লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, কোনমতে ক্ষীণস্বরে জানাল, ও বোধ হয় ঠিক অমনটি করতে পারবে না কিছুতেই।

"আরে এই ছেলেটার হয়েছে কি ? কিছু করতে চায় না কেন ? সবাই ভাববে ও বুঝি একটা মেয়ে। নাঃ, ওকে মাথার ওপর দাঁড়াতেই হবে।"

সেরিওঝা এবার গিয়ে ওর হাত ধরে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়, দাঁড়াও, মাথার ওপর দাঁড়াও শীগগির"—আমরা এবারে সবাই মিলে ইলেন্‌কাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলতে থাকি। ইলেন্‌কা দেখি এবার বেশ ভয় পেয়েছে, একদম ফ্যাকাসে মেরে গেছে। আমরা সবাই মিলে ওকে ধরে টানাটানি করে নিয়ে গেলাম অভিধানটার কাছে।

বেচারী চেঁচাতে থাকে, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি নিজেই করছি, আমার জামা ছিঁড়ে ফেলবে তোমরা"। ওর মিনতি আমাদের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিল। হাসতে হাসতে আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—টানাটানি করছি আর ইলেন্‌কার সবুজ জামাটা সেলাইয়ের ধারে ধারে ফেঁসে যাচ্ছে।

ভলোদিয়া আর ইভিনদের বড় ভাই দুজনে মিলে ধরাধরি করে ওর মাথাটা নীচু করে অভিধানের ওপর বসিয়ে দিল। আমি আর সেরিওঝা ওর রোগা-পট্‌কা পা-দুটোকে ওপর দিকে তুলে ধরে প্যাণ্টের নীচের দিকটা গুটিয়ে দিই ; ইলেন্‌কা প্রাণপণে গায়ের জোরে পা-দুটো ছুঁড়ছে চারিদিকে, আমরা হো হো করে হাসতে হাসতে শক্ত করে চেপে ধরে পা-দুটো খাড়া করে রেখেছি আর ইভিনদের ছোট ভাই চেষ্টা করছে বাকী শরীরটার টাল সামলাতে।

হঠাৎ আমাদের জোর হাসি বন্ধ হয়ে গেল, সবাই একদম চুপ মেরে গেলাম। ঘরে টুঁ শব্দটি নেই, খালি শোনা যাচ্ছে ইলেন্‌কার নিঃশ্বাসের শব্দ। ঠিক সে মুহূর্তে আমাদের একটু সন্দেহ জাগে,—সত্যি সত্যিই সমস্ত ব্যাপারটা খুব হাসির আর মজার তো ?

"বাঃ, এইবার বেশ, ঠিক হয়েছে"—সেরিওঝা বলে ওকে একটা চড় মেরে।

ইলেন্‌কা মুখে কোনো সাড়া শব্দ না দিয়ে ক্রমাগত গায়ের জোরে পা-দুটো এদিক-ওদিক-সেদিক ছুঁড়ে যাচ্ছিল আমাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। সেই ভাবেই হঠাৎ একটা পায়ের গোড়ালি এইসা জোরে ছুটে এসে লাগে সেরিওঝার একটা চোখে সে তখুনি ইলেন্‌কার পা ছেড়ে দিয়ে নিজের চোখটা চেপে ধরে। সে চোখটা দিয়ে তখন জল পড়তে শুরু করেছে, আর সেই সঙ্গে ইলেন্‌কাকে একটা ধাক্কা মেরে দেয় গায়ের জোরে। আমরা আর ধরে না থাকায় ইলেন্‌কা এবার হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে—চোখের জলের ভিতর দিয়ে সে শুধু বলতে পারল, "কেন তোমরা এমনি অত্যাচার কর?"

বেচারা ইলেন্‌কার কাতর চেহারা, চোখের জলে-ভেজা মুখ, উস্কো-খুস্কো চুল, গুটনো প্যাণ্টের তলায় নোংরা বুট—সবে মিলে আমাদের মাথা একটু ঠাণ্ডা করে দিল, আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করলাম।

সেরিওঝাই সবপ্রথমে ঠিক করে নেয় নিজেকে।

"এই যে ছিঁচকাঁদুনে খোকা কোথাকার!" পা দিয়ে একটু ঠেলে দেয় ইলেন্‌কাকে, "ঠাট্টাও বোঝে না। খুব হয়েছে, নাও, ওঠ এবার।"

"তুমি একটা পাজী, বদ্‌মাস," বেদম চটে গিয়ে ইলেন্‌কা বলে, তারপর পেছন ফিরে ফোঁপাতে থাকে জোরে জোরে।

"কি, প্রথমে লাথি মারলে, তারপর আবার গালাগালি করা?" চেঁচিয়ে উঠে সেরিওঝা ভারী অভিধানখানা তুলে নিয়ে ইলেন্‌কার মাথার ওপর দোলাতে থাকে আর বেচারা ইলেন্‌কা কোনরকম আত্মরক্ষার কথা না ভেবে খালি হাতদুটো দিয়ে চাপা দিয়ে রাখে মাথা।

"নাও, নাও, হল তো? চল, ও যখন একটা ঠাট্টাও বোঝে না, চল তবে ওকে এখানে একা ফেলে রেখে সবাই মিলে নীচে চলে যাই।"

আমি একটু সহানুভূতির চোখে তাকালাম,—মাটিতে উপুড় হয়ে অভিধানটার ভিতর মুখখানা গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে ছেলেটা, কাঁদতে কাঁদতে বুঝি বা মরেই যায়!

"ও সাজি" আমি বললাম, "কেন তুমি অমন করলে?"

"বেশ করেছি, খুব করেছি। কই, আমি তো কাঁদিনি আজকে যখন হাঁটুটা কেটে গিয়েছিল প্রায় হাড় পর্যন্ত, তখন? কেঁদেছিলাম?"

"হ্যাঁ, তা ঠিক," মনে মনে ভাবলাম, ইলেন্‌কাটা কিচ্ছু না, একটা ছিঁচকাঁদুনে, বোকারাম! আর সেরিওঝা, হ্যাঁ একটা বীর বটে!

আমি কি সেদিন ধারণা করতে পেরেছিলাম হতভাগ্য ছেলেটার শরীরের চাইতে মনের আঘাত কত বেশী ছিল—পাঁচটি ছেলে যাদের হয়তো ও পছন্দ করত, সবকজনেই মিলে ওকে ঘৃণা করছে, অত্যাচার করছে বিনা কারণে, এখানেই ছিল ওর কান্নার উৎস!

আমার নিজের দিক্‌কার নিষ্ঠুরতারও কোনো ব্যাখ্যা করতে পারি না। কেন আমি ওর কাছে গেলাম না, ওকে রক্ষা করলাম না, সান্ত্বনা দিলাম না? কোথায় পালিয়েছিল আমার সেই অনুভূতি আর মায়ায় ভরা সুকুমার মন—যে মন কারুর এতটুকু দুঃখ সইতে পারত না, অঝোরে কাঁদত যদি কখনো দেখত একটা ছোট্ট শকুনছানা পড়ে গেছে বাসা থেকে; কিংবা কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে একটা কুকুরছানাকে বা বাবুর্চি ধরে নিয়ে যাচ্ছে একটা মুরগিকে সুপ করবে বলে?

বিংশ অধ্যায়

অতিথিসমাগম

খাবার ঘরে সেদিন বিশেষ কর্মচাঞ্চল্য, চারিদিকে আলোর ঝলমলানি, সে আলোয় বসবার আর অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার এই দুটি ঘরেই যেন উৎসবের ছাপ লেগেছে, আরও বিশেষ করে প্রিন্স ইভান ইভানিচ্ সেদিন তাঁর নিজস্ব গাইয়ে-বাজিয়ের দলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের বাড়িতে—এ সব থেকে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম যে বাড়িতে আজ অনেক অতিথি আসবেন।

রাস্তায় চল্‌তি কোন গাড়ির আওয়াজ পেলেই আমি দৌড়ে গিয়ে জানালায় দাঁড়াচ্ছিলাম, কাচে নাক লাগিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে চারিদিক লক্ষ্য করছিলাম। চারিদিকে মিশকালো আঁধার, প্রথমটায় জানালায় দাঁড়ালে কিছুই নজরে পড়ে না। তার পর ধীরে, অতি ধীরে ফুটে ওঠে রাস্তার ওপারে একটা চেনা দোকান, ভেতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, আরও দূরে একটা বড় বাড়ি, নীচের তলায় দুটো জানালা আলোকিত; রাস্তার মাঝখানে একটা ছ্যাকরা-গাড়ি, ভিতরে দুজন লোক, অথবা একটা খালি ক্যালাস্ ফিরতিমুখে ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। দেখতে দেখতে একটা গাড়ি সত্যি সত্যিই এসে লাগল গাড়ি-বারান্দায়, নিশ্চয় ইভিনরা এসেছে, ওরা কথা দিয়েছিল তাড়াতাড়ি আসবে বলে—আমি ছুট লাগালাম ছোট্ট ঘরটায় ওদের অভ্যর্থনা জানাতে। না, ইভিনরা নয়, দুজন ভদ্রমহিলা এসে ঢুকলেন, তকমা-আঁটা বেয়ারা দরজা খুলে দিল; একজন লম্বা, নীলরঙের ক্লোক গায়ে তাতে ফারের কলার—আর যেটি ছোট তার সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি সবুজ শালে, তলা দিয়ে খালি দেখা যাচ্ছে ফার দেওয়া বুটপরা ছোট্ট পা-দুখানি। পাশের সেই ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে আমার দিকে কোনরকম লক্ষ্য না করেই—যদিও আমি কর্তব্য মনে করে মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের নমস্কার জানিয়েছি,—সেদিকে না তাকিয়েই ছোট মেয়েটি সোজা গিয়ে দাঁড়াল বড়জনের সামনে। তিনি এবার খুলে দিলেন ছোট মেয়েটির মাথায় বাঁধা রুমাল আর ক্লোকের বোতামগুলো, চাপরাসী

যখন এগুলো নিজের জিম্মায় নিয়ে মেয়েটির ফার দেওয়া বুটজোড়া খুলে দিল—এতসব আবরণের তলা থেকে তখন বেরিয়ে এল একটি ছোট্ট সুন্দরী মেয়ে, বয়েস বছর বার, পরেছে গলাখোলা সাদা মস্‌লিনের ফ্রক আর সাদা প্যাণ্ট, পায়ে ছোট্ট কালো রঙের স্লীপার। ছোট্ট ফর্সা গলার ওপর কালো ভেলভেটের রিবন; ছোট্ট মাথাটিতে কালো কুচকুচে থোপা থোপা একরাশ চুল, ফর্সা টুকটুকে ঘাড়ের ওপর ঝুলে পড়েছে—সুন্দর মুখখানা ঘিরে চমৎকার মানিয়েছে। আমি একেবারে বিমুগ্ধ; সে সময় যদি কার্ল ইভানিচ্ নিজে এসেও বলতেন যে "মস্কো গেজেট" দেখে সারা সকাল ধরে এই চুলগুলোকে কোঁকড়ানো হয়েছে বা তার ওপর গরম ইস্ত্রি চালানো হয়েছে—তাহলেও বোধহয় বিশ্বাস করতাম না সে কথা। এত স্বাভাবিক যে মনে হয় অমনি কোঁকড়ানো মাথাটি নিয়েই বুঝি জন্মেছে মেয়েটি।

ওর মুখের বিশেষত্ব ছিল খুব বড় বড়, ভাসা ভাসা, টলটলে চোখ দুটি—ছোট্ট মুখখানার তুলনায় একটু বেশী বড়, কিন্তু সে বেমানান নয় একতিলও। ঠোঁট-দুটি শক্ত করে চাপা, চোখ-দুটির ভাবও গম্ভীর—সবে মিলে মুখখানার ভাব এমনি যেন সেখানে হাসি দেখবার আশা করা যায় না; তাই বোধহয় হাসিটা ওর আরও স্নিগ্ধ, মুগ্ধ করে দেয় মানুষকে।

চুপিচুপি সরে পড়লাম; হলঘরের ভেতর ঢুকে অন্যমনস্ক ভাবে এ-মাথা থেকে সে-মাথা অবধি পায়চারী করতে লাগলাম—যেন কি গভীর চিন্তায় মগ্ন, অতিথিরা এসেছেন, দেখতেই পাইনি। ওরা যখন চলতে চলতে হলঘরের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছেন, তখন যেন হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম, মাথা ঝুঁকে নমস্কার জানিয়ে বললাম দিদিমা বসবার ঘরে আছেন। মাদাম ভালাখিনা আমার দিকে চেয়ে স্মিতমুখে মাথা নাড়লেন—ওঁর মুখখানা ভারী ভাল লাগল আমার—আরও বিশেষ করে, ওঁর মেয়ে সোনেচ্‌কার সঙ্গে ওঁর নিজের মুখের ভারী সাদৃশ্য।

দিদিমা খুব খুশী হলেন সোনেচ্‌কাকে দেখে; ওকে কাছে ডেকে, সস্নেহে কপালের ওপর লুটিয়ে-পড়া একগোছা চুল সরিয়ে দিতে দিতে, একদৃষ্টিতে মুখখানা দেখতে দেখতে আদর করে বলেন, "বাঃ, ভারী চমৎকার দেখতে মেয়ে!" সোনেচ্‌কা একটু হেসে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, এত সুন্দর দেখাল যে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আমি নিজেও লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম।

গাল ধরে মুখখানা সামান্য একটু তুলে দিদিমা বললেন, "লক্ষ্মী মেয়ে এখানে নিশ্চয় খারাপ লাগবে না তোমার। যাও মজা কর গিয়ে, আর যতক্ষণ মন চায়

প্রাণভরে নাচ, কেমন? তাহলে আমাদের এখানে এখন আছেন দুজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা, কি বল?" আমার গায়ে হাত ঠেকিয়ে ইসারা করে মাদাম ভালাখিনাকে বললেন দিদিমা।

আমাকে সুদ্ধু জড়িয়ে বলাতে আনন্দে আমি আবার আরক্তিম হয়ে উঠলাম। বুঝতে পারলাম আমার লজ্জা ক্রমশ বাড়ছে, এদিকে গাড়ির শব্দও শুনতে পাচ্ছি—অতএব আমি এবার কেটে পড়লাম। সেই পাশের ছোট্ট ঘরটায় দেখা হল প্রিন্সেস করনাকোভার সাথে—সঙ্গে তাঁর ছেলে, আর···আর অসংখ্য মেয়ে! মেয়েদের সবার চেহারা একরকম—সবাই প্রিন্সেসের মত দেখতে, কুৎসিত। একজনও তাকাবার যোগ্য নয়। ক্লোক খুলে ফেলতে না ফেলতেই ওরা সবাই মিলে একসাথে কথা বলতে শুরু করল উঁচু মিহি স্বরে, কি একটা ব্যাপার নিয়ে যেন সবাই ঠেলাঠেলি, হাসাহাসি জুড়ে দেয়—বোধহয় ওরা নিজেরাই এতজন, তাই নিয়ে। ছেলে এতিয়েনের বয়স বছর পনের, বেশ মোটাসোটা, রক্তহীন, ফ্যাকাসে মুখ, বসা চোখ, চোখের নীচে কালি, হাত-পা খুব বড় বড় বয়সের অনুপাতে। কি রকম বোকাবোকা, আর গলার স্বরটা বিচ্ছিরি ভাঙা। কিন্তু বেশ একটা আত্মতৃপ্তির ভাব চেহারায়। কয়েক মুহূর্ত সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পরকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখলাম। তারপর দুজনেই সামান্য একটু এগোলাম, দেখে মনে হবে এবার বোধহয় চুমু খাব আমরা—কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোন কারণে আমরা মত বদলে ফেললাম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। ওর সবকটি বোনেরই পোশাকের খস্‌খসানি যখন আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তখন আমি কথা বললাম,—যা হোক কিছু একটা বলে কথাবার্তাটা শুরু করা নিতান্তই দরকার তাই জিজ্ঞেস করলাম গাড়িতে ওদের খুবই ঠেসাঠেসি হয়েছিল কিনা।

"কে জানে", এতিয়েনে অবহেলাভরে জবাব দিল, "আমি কখনো গাড়িতে চড়িই না; আমার শরীর খারাপ লাগে, মা তা জানেন। সন্ধ্যেতে কোনদিন কোথাও যেতে হলে আমি কোচোয়ানের বাক্সে বসি। সে তবু অনেকটা ভাল, চারধারটা বেশ দেখা যায়। ফিলিপ আমাকে চালাতে দেয়, কোন কোন সময়ে চাবুকটাও নিই। অবশ্য, বুঝতেই পারছ, কখনো-সখনো সে চাবুক রাস্তার আশেপাশের লোকজনের পিঠেও পড়ে"—হাত নেড়ে ভঙ্গী করে সে হেসে ওঠে, "ওঃ, কি মজা!"

"হুজুর", ফুটম্যান এসে ঘরে ঢোকে, "ফিলিপ্‌স জানতে চাইছে, আপনি চাবুকটা কোথায় রেখেছেন?"

"কেন ? তাকেই দিয়ে দিয়েছি নিশ্চয় !"

"সে বলছে, দেননি।

"বেশ তো, তাহলে দেখ গিয়ে লণ্ঠনের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছি।"

"ফিলিপ বলছে, লণ্ঠনের ওপরও সেটা নেই। তারচেয়ে আপনি বরং বলুন যে আপনি ওটা নিয়েছিলেন, হারিয়ে ফেলেছেন, নইলে আপনার খেয়ালের জন্য ফিলিপকে গচ্চা দিতে হবে নিজের পকেট থেকে"—ফুটম্যানের রাগ ক্রমশ চড়ে যাচ্ছে।

ফুটম্যানটি বেশ ভদ্রগোছের গম্ভীর প্রকৃতির লোক—সে ফিলিপের পক্ষ নিয়েছে, মতলব যেভাবেই হোক ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবেই করবে। নিতান্তই অনিচ্ছুক ভাবে একটু একপাশে সরে গেলাম, যেন ব্যাপারটা আদপেই আমার নজরে আসেনি। কিন্তু অন্য চাকরবাকরা—তারা আবার সবাই বুড়োর কাছ ঘেঁসে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে সমর্থন জানাতে থাকে।

"বেশ, বেশ, আমিই না হয় হারিয়েছি, তাতে কি হল ?" এতিয়েনে আর বেশী কথা বাড়াল না।

"ওটার যা দাম হয়, আমি দিয়ে দেব। বাঃ ভারী মজার তো !" শেষের কথাটা আমার কাছে এগিয়ে এসে বলে আমাকে নিয়ে বসবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

"ক্ষমা করবেন, আপনি কি করে দামটা দেবেন, শুনি ? আপনি তো মারিয়া ভাসিলিয়েভ্নার কুড়ি কোপেক শোধ দিচ্ছেন আজ আট মাস ধরে, আমার ব্যাপারেও তাই, আর দুবছর হল পেত্রুশকার······"

রাগের চোটে ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে এতিয়েনে চেঁচিয়ে ওঠে, "এই, খবরদার, মুখ সামলে। দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি।"

"বলুন, যান যান বলুন গিয়ে", ব্যঙ্গ করে ওঠে ফুটম্যান। আমরা বসবার ঘরে পা দিলাম, সেও ক্লোকগুলো হাতে নিয়ে কাপড় রাখবার আলমারির দিকে এগোতে এগোতে আরেকবার ধিক্কার দিল, "ছিঃ, কি লজ্জা।"

"ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে",—পেছনের ঘর থেকে আরেকটা গলাও শোনা গেল।

দিদিমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, কারুর সম্বন্ধে কোনো মতামত দিতে হলে, নিজস্ব একটা ধরনে 'তুমি' 'আপনি' মিশিয়ে কথা বলতেন। কথা দুটোর ব্যবহার তিনি করতেন সাধারণ চিরাচরিত রীতির একেবারে বিপরীত অর্থে;

ফলে কথাত্নটোর একেবারে আলাদা বিশেষ মানে হয়ে দাঁড়াত। এবারে এতিয়েনে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, তাকে আপনি বলে সম্বোধন করে গুটিকতক কথাবার্তা বললেন এমনি তিক্তস্বরে যে, যদি আমি হতাম তো লজ্জায় মরে যেতাম। এতিয়েনে অবশ্য ও-সবের পরোয়া করবার বান্দাই নয়—সে দিদিমার অভ্যর্থনার দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না, এমনকি দিদিমার উপস্থিতিকেই গ্রাহ্য করল না, ঘরের আর সকলের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে সকলকে উদ্দেশ্য করে একটা নমস্কার ঠুকে দিল, খুব বেশী সৌজন্য না দেখালেও অন্ততপক্ষে বিনাসঙ্কোচে।

আমার মন জুড়ে থাকল সোনেচ্‌কা; মনে পড়ছে যখন আমি, ভলোদিয়া আর এতিয়েনে ঘরের একটা কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম যেখান থেকে দেখা যাচ্ছে সোনেচ্‌কাকে, আর সেও দেখতে পাচ্ছে, কথা শুনতে পাচ্ছে আমাদের—আমি একেবারে খুশিতে ডগমগ হয়ে কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছিলাম; যদি কোথাও একটা মজার কথা বা বেশ পুরুষালী কোন কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি তো অমনি খুব জোরে জোরে বলে উঠে বসবার ঘরের দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু যেই আমরা জায়গা বদল করলাম, বসবার ঘর থেকে আর আমাদের দেখা বা কথা শোনা যাচ্ছে না—আমিও অমনি চুপ্‌সে গেলাম, কথাবার্তায় আর কোন উৎসাহই রইল না।

বসবার আর অভ্যর্থনার ঘরত্নটি আস্তে আস্তে অতিথিতে ভরে গেল। সাধারণত ছোটদের উৎসবে যেমনটি হয়, এখানেও ঠিক তেমনি বড় কিছু ছেলের দল ছিল যারা নাচবার বা স্ফূর্তি করার কোন সুযোগই হারাতে রাজী নয় অথচ ভাব দেখায় যেন স্ফূর্তি করছে সে তো শুধু গৃহকর্ত্রীকেই আনন্দ দিতে।

ইভিনরা এসে পৌঁছল? সাধারণত সেরিওঝাকে দেখে কত খুশী হই, সেদিন কিন্তু মনের মাঝে কেবলি একটা অস্বস্তির কাঁটা খচ্‌খচ্ করে বিঁধতে থাকে—এইবার সেরিওঝা সোনেচ্‌কাকে দেখতে পাবে, আর সোনেচ্‌কাও সেরিওঝাকে!

একবিংশ অধ্যায়

মাঝুরকা নাচের আগে

"তোমাদের এখানে দেখছি আজ নাচ হবে"—বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পকেট থেকে একজোড়া নতুন নরম চামড়ার দস্তানা বার করে সেরিওঝা বলে, "দস্তানাটা পরতে হয় তবে"।

"তাই তো, আমাদের তো দস্তানা নেই, আমার মনে পড়ল, "যাই ওপরে গিয়ে খুঁজেপেতে দেখি।

সমস্ত ড্রয়ারগুলো হাতড়ে শেষ পর্যন্ত পেলাম আমাদের রাস্তায় চলবার আঙুল-খোলা সবুজ দস্তানা আর একটা মাত্র নরম চামড়ার দস্তানা; তা সেটাও আবার আমার কোন কাজে লাগবে না,—একে তো বহুদিনের পুরনো, নোংরা, মাপেও অনেক বড় আমার হাতের চাইতে তারপরে আবার মাঝের একটা আঙুল কাটা, বোধহয় কার্ল ইভানিচ্ কোনদিন কেটে নিয়ে থাকবেন হাত ব্যথার জন্যে। তবুও দস্তানার সেই অবশিষ্ট অংশটুকুই হাতে পরে নিলাম তারপর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে-পড়া মাঝের আঙুলটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি ও আঙুলটা আবার সদাসর্বদাই কালি মাখান থাকে!

নাতালিয়া সাভিশনা যদি থাকত, তবে নিশ্চয় যে করেই হোক দস্তানা খুঁজে বার করে দিত। কিন্তু দস্তানা না পরে নীচে যাইই বা কি করে? যদি ওরা জিজ্ঞেস করে নাচব না কেন। তবে কি বলব? এখানে থেকে যাব, তাও তো অসম্ভব, সবাই খুঁজবে নিশ্চয়, কি করি?

"এই, এইখানে কি করছ?" ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকে ভলোদিয়া, "শীগ্‌গির সঙ্গিনী ঠিক কর গিয়ে, নাচ আরম্ভ হবে এখুনি।"

"ভলোদিয়া", নোংরা দস্তানাটায় দুটো আঙুল ঢুকিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে হতাশ ভরে বলি, "ভলোদিয়া, তুমি এটার কথা ভুলে গেছ।"

"কি, কি?" অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে ভলোদিয়া, "ওঃ, দস্তানা!" কথাটা বিশেষ আমলেই আনল না! "হ্যাঁ, আমাদের নেই, তা ঠিক। দিদিমাকে

জিজ্ঞেস করতে হবে, উনি কি বলেন।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছুট লাগাল নীচের দিকে।

এমন একটা ভীষণ দরকারী কথাতে ওর এমনি তাচ্ছিল্য দেখে আমিও একটু ঠাণ্ডা হলাম ; তাড়াতাড়ি বসবার ঘরে চললাম ; একদম ভুলেই গেলাম যে বাঁ হাতে তখনও সেই ছেঁড়া দস্তানাটা ঢোকানো।

সাবধানে দিদিমার ইজিচেয়ারের কাছে গিয়ে ওঁর ঢিলেঢালা পোশাকটায় সামান্য একটু টান দিয়ে ফিসফিস করে বলি, "দিদিমা আমরা কি করব? আমাদের যে কোন দস্তানা নেই ?"

"কি, কি বলছ দাদু ?"

আমি আরও একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলে হাতদুটো রাখি, "আমাদের দস্তানা নেই যে!"

"নেই ? তবে এটা কি ?" হঠাৎ দিদিমার চোখ পড়ে যায় আমার বাঁ হাতের দিকে, "এই যে, শোন, শোন ; ম্যাডাম ভ্যালাখিনাকে ডেকে বলেন, দেখ, এই তরুণ ভদ্রলোকটি কেমন ফিটফাট হয়ে এসেছেন তোমার মেয়ের সঙ্গে নাচবেন বলে।"

দিদিমা শক্ত করে আমার বাঁ হাতটা ধরে থেকে পরম গম্ভীর মুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সব অতিথিদের দিকে তাকান ; তাঁরা সব্বাই বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে কৌতুহল মেটায়—তারপর সারা ঘরে একটা হাসির রোল পড়ে যায়।

আমি তখন লজ্জায় মরে গিয়ে ভ্রুকুটি করে প্রাণপণে চেষ্টা করছি হাত ছাড়িয়ে পালাতে। সেরিওঝা যদি তখন দেখে ফেলত, ভীষণ মুষড়ে যেতাম নিশ্চয, কিন্তু সোনেচ্কা যে কাছেই রয়েছে, দেখছে, তাতে কিন্তু কিচ্ছু এসে যাচ্ছে না—হাসতে হাসতে সোনেচ্কার চোখে জল এসে গেছে, কোঁকড়ানো চুলের রাশ বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আরক্তিম মুখখানার চারদিকে। ওর ছলছলে হাসিটা যেমনি স্বাভাবিক, তেমনি আনন্দের : তাতে বিদ্রূপের কোনো ভাব নেই ; তাছাড়া দুজনে মিলে একসঙ্গে হাসছে, তাতে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম দুজনে। দস্তানার ব্যাপারটা খুবই খারাপ হতে পারত আমার পক্ষে কিন্তু ঠিক ভালটাই হল—ড্রইংরুম-বাসিন্দাদের, যাঁদের আমি ভয় করতাম ভীষণ, এর ফলে তাদের দলে সেদিন আমি সহজ হয়ে গেলাম একদম। বলনাচের ঘরে যখন ঢুকলাম, আমার মনে তখন লজ্জার বাষ্পটুকুও নেই কোথাও।

লাজুক লোকদের মনের আসল কষ্ট হচ্ছে, লোকেরা তাকে নিয়ে না জানি কি ধারণাই গড়ছে, সেই ভাবনা। কিন্তু একবার মতামতটা প্রকাশ হয়ে গেলে, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক, তাদের দুশ্চিন্তা কাটে, তারা স্বাভাবিক হয়।

কি অপরূপ যে দেখাচ্ছিল সোনেচ্‌কা ভালাখিনাকে—আমার ঠিক উল্টো দিকে 'ফ্রেঞ্চ কোয়াড্রিল' নাচছিল ক্যাবলাকান্ত এতিয়েনের সঙ্গে। হাত ধরে গোল হয়ে ঘোরার যখন পালা এল, কি মিষ্টি হেসেই না ছোট্ট হাতখানা দিয়ে আমার হাত ধরল এসে! সোনালী কোঁকড়ানো চুলের গোছা কেমন চমৎকার দুলতে লাগল তালে তালে, ছোট্ট পাদুটি কেমন সুন্দর এসে মিশল একসঙ্গে। নাচের মাঝে একবার আমার জুড়ি চলে গেল অন্যকে নিয়ে নাচতে নাচতে আর আমিও অপেক্ষায় আছি, কখন একা নাচার তাল পড়ে—সোনেচ্‌কা শক্ত করে ঠোঁট চেপে এপাশে-ওপাশে তাকাল। কিন্তু ওর ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে সাবলীল ভঙ্গিমায় আমি নাচলাম, এদিকে-ওদিকে সামনে-পেছনে, তারপর খুব ধীর তালে নেচে যখন ওর কাছে পৌছলাম তখন মজা করে দুটো আঙুল বার করা দস্তানাটা একটু দেখিয়ে দিলাম। মিঠে রিনরিনে গলায় হাসির ঝলকে ঘর ফাটিয়ে দিয়ে সোনেচ্‌কা মোমঘসা চক্‌চকে মেঝেতে যেন নাচের একেবারে ঘূর্ণি বইয়ে দিল। এখনও বেশ মনে আছে, আমরা যখন সবাই হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে গেলাম, তখন সোনেচ্‌কা একটু নীচু হয়ে, আমার হাত থেকে হাত না খুলেই দস্তানা দিয়ে টুক করে নাকের ডগাটা কেমন একটু চুলকে নিল! এগুলো সব এখনও এত স্পষ্ট যেন চোখের সামনেই ঘটছে। এখনও পরিষ্কার শুনতে পাই "দি ড্যানিউব মেইড"-এর সেই নাচের সুরটা!

দ্বিতীয়বার কোয়াড্রিল নাচলাম সোনেচ্‌কার সঙ্গে। তবুও বিরতির সময় যখন দুজনে পাশাপাশি গিয়ে বসলাম, কেমন যেন আড়ষ্ট লাগল, কি বলব বুঝে উঠতে পারছি না। বেশ খানিকটা সময় চুপচাপ কেটে যেতে ভয় হল ও নিশ্চয়ই আমাকে একটা আস্ত বোকা ভাবছে: ভাবলাম আমার সম্বন্ধে এরকম একটা ভুল ধারণার হাত থেকে তো ওকে বাঁচাতেই হয়! অতএব বেশ কায়দা করে ফরাসীতে কথা বলতে শুরু করলাম, দুএকটা কথা বললাম, সোনেচ্‌কাও জবাব দিল সপ্রতিভ ভাবে। আরম্ভটা তো বেশ ভালই হল, ফরাসী ভাষায় আমার দখল আছে; তারও বেশ প্রমাণ হল—কিন্তু তবুও বুঝতে পারলাম এ ধরনের কথাবার্তা বেশীক্ষণ চালানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

আমাদের আবার নাচের পালা আসতে অনেক দেরি, কাজেই চুপমেরে য়েতে হল আবার। অস্বস্তির সঙ্গে খালি ওর দিকে তাকাই, আমার সম্বন্ধে না জানি কি ধারণাই ও করছে, সেই দুশ্চিন্তা আর ভাবছি ও নিশ্চয় সাহায্য করবে আমাকে এ সঙ্কটে। আচ্ছা, ওই মজার দস্তানাটা কোথায় পেলে? হঠাৎ ও জিজ্ঞাসা করে উঠল আর আমারও মনটা আনন্দে, স্বস্তিতে হাল্‌কা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জানাই, দস্তানাটা আসলে কার্ল ইভানিচের—তারপর ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে কত কথা বলি কার্ল ইভানিচ্‌ সম্বন্ধে: লাল টুপিটা খুলে ফেললে কেমন কিম্ভুত দেখায় ওঁকে, ঝোল্লা ওভারকোটটা গায়ে দিয়েই একদিন কেমন ঘোড়া থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছিলেন ঘোলা জলের ছোট্ট পুকুরটায়, এমনি আরও কত কি! কোয়াড্রিল কখন শেষ হয়ে গেল, আমরা টেরই পেলাম না। মজা হল খুবই কিন্তু···কিন্তু কার্ল ইভানিচ্‌কে এইভাবে ঠাট্টা করে ছোট করলাম কেন? ওঁর ওপর যে ভালবাসা আর শ্রদ্ধা আমার আছে, তাই দিয়েই যদি ছবিটা আঁকতাম তবে কি সোনেচ্‌কার আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণাটা খারাপ হয়ে যেত?

কোয়াড্রিল শেষ হয়ে যেতে, সোনেচ্‌কা মিঠে গলায় আমাকে বলল, "ধন্যবাদ"—এমনি মিষ্টি করে বলল যেন সত্যিই ওর কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য কিছু করেছি। আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম, কোথা থেকে আমি এমনি জোর বিশ্বাস আর সাহস পেলাম!

"আমি কিছুতেই ঘাবড়াই না," নাচের ঘরে পায়চারী করতে করতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভাবি, আমি এখন সব কিছুর জন্যে তৈরি।

সেরিওঝা এসে ওর সামনের হলে নাচতে বলল আমাকে। বেশ, ভাল কথা, আমি বললাম, "আমার কোন জুড়ি নেই, আচ্ছা খুঁজে নিচ্ছি একজনকে।" ঘরের চারিদিকে তাকাতে দেখি মেয়েরা সবাই যে যার সঙ্গী বেছে নিয়েছে,— বাকী কেবল একজন তরুণী বসবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক সে সময় এদিক থেকে একজন সুবেশ তরুণ পায়ে পায়ে এগোচ্ছে তার দিকে। বুঝলাম নাচতে ডাকবে। ছেলেটি মাত্র কয়েক পা দূরে মেয়েটি থেকে, আর আমি এদিকে হলের আর এক কোণে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঝক্‌ঝকে পালিশ করা মেঝের ওপর দিয়ে যেন উড়ে চলে গেলাম, ভদ্রমহিলার সামনে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পাটা একটু ঠুকে বেশ গম্ভীর গলায় আমন্ত্রণ জানালাম আমার সঙ্গিনী হতে। ভদ্রমহিলা একটু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে, আমার হাতে হাত মেলালেন। ছেলেটি একা দাঁড়িয়ে রইল।

আমি তখন নিজের ক্ষমতায় মত্ত—ছেলেটিকে কোন আমলই দিলাম না। পরে অবশ্য শুনেছি ছেলেটি জিজ্ঞেস করেছিল, ঐ বিদঘুটে ছেলেটা কে—যে দৌড়ে এসে লাফিয়ে পড়ে তার সঙ্গিনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ?

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মাঝুরকা

যে ছেলেটির সঙ্গিনী আমি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম—সে প্রথম জোড়ায় নাচল। নাচ শুরু হতেই লাফিয়ে উঠে সঙ্গিনীর হাত ধরে সে দৌড়ে চলল, শেষ সীমানায় পৌঁছে গোড়ালি ঠুকে শব্দ করে ঘুরে নিল এক পাক, তার পর আবার এগলো সামনের দিকে।

আমার কোন সঙ্গিনী না থাকায়, দিদিমার উঁচু চেয়ারটার পিছনে বসে দেখছিলাম।

"ও, অমনি করছে কেন?" আমি একটু চিন্তা করলাম, "মিমি তো আমাদের ওরকমটা শেখায় নি? সে সবসময়েই বলত, মাঝুরকা নাচতে হয় পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে। কিন্তু এখন দেখছি, অমনি করে নাচে না কেউ। ইভিনরা নাচছে, এতিয়েনে নাচছে—কই কেউ তো অমনি ভঙ্গীতে নাচছে না। ওইতো, ভলোদিয়া পর্যন্ত নতুন কায়দাটা শিখে নিয়েছে! মন্দ নয় তো! আঃ, কি চমৎকার—সোনেচ্‌কা! ঐ যে, ঐ যে দেখা যাচ্ছে।"

খুশির আর শেষ নেই আমার।

মাঝুরকা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। কয়েকজন বয়স্ক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা দিদিমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। চাকর-বাকরেরা সাবধানে নাচিয়েদের এড়িয়ে ডিশটিশগুলো পেছনের ঘরে নিয়ে গেল। দিদিমাও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন,—কথা বলছেন খুব ধীরে ধীরে নিতান্ত অনিচ্ছায়। বাজিয়েরা মন্থর গতিতে সেই একই সুর একঘেয়ে বাজাচ্ছে—এই নিয়ে তিরিশ বার হল। সেই তরুণী, যার সঙ্গে আমি নেচেছিলাম—নাচের একটা ভঙ্গী করতে করতে হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ে গেল তার। একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে—নিশ্চয় আমার দিদিমাকে খুশী করার মতলব—সে

সোনেচ্কা আর এতিয়েনের অসংখ্য বোনেদের মধ্যে একজনকে নিয়ে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

"গোলাপ, না বিছুটি"—আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"ও, তুমি তাহলে এখানে, অ্যাঁ ?" দিদিমা চেয়ারে ঘুরে বসে, "যাও, সোনা, নাচ গিয়ে।"

যদিও সে সময় চেয়ারের পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারলেই বর্তে যেতাম, উঠে আসতে পা সরছিল না—কিন্তু না বলি কি করে ? উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, বললাম, "গোলাপ", আর কাতর চোখে তাকালাম সোনেচ্কার দিকে। কিছু বুঝতে না বুঝতেই কার যেন সাদা, নরম দস্তানা-পরা একখানা হাত আমার হাতে এসে পড়ল ; এতিয়েনের বোন প্রিন্সেস মধুর হেসে আমাকে নিয়ে আসরের দিকে এগোলেন—বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করলেন না যে এ নাচে পাদুটো নিয়ে কি করতে হয়, বেচারা আমি তাইই জানি না।

বুঝতে পারছি এ নাচের সেই পুরনো ভঙ্গী যা আমি জানি, এখানে একদম অচল, করলে লজ্জা পেতে হবে, এবং বোকা বনতে হবে সবার সামনে। কিন্তু আসরে নেমে নাচের সেই চির-পরিচিত সুরটা কানে আসতেই, কেমন একটা উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল আমার শিরায় শিরায়, তারপর আস্তে আস্তে তা সঞ্চারিত হয়ে গেল পা-দুটোয়, আর পা-দুটোও অমনি আমার অজান্তেই, আসরের সবাইকে অবাক করে দিয়ে, সেই মারাত্মক ভঙ্গীতে নাচ শুরু করে দিয়েছে,—পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচ ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছিলাম, "যা হোক্ একধরনে চলছিল, কিন্তু যখন ফিরলাম, তখন দেখি খুব সাবধানে না চললে, নির্ঘাৎ সঙ্গিনীর চাইতে এগিয়ে চলে যাব। সে ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াতে আমি টপ করে থেমে গেলাম—মতলব, প্রথম জোড়ার সেই ছেলেটির মত সুন্দর করে আচম্কা একপাক ঘুরে নিয়ে এগিয়ে আসব ! কিন্তু আমিও পা-দুটো ফাঁক করে সবে লাফিয়ে ওঠবার উদ্যোগ করছি, রাজকুমারীও সে সময় দ্রুত-তালে আমাকে প্রদক্ষিণ করছিল,—সে একেবারে বিস্ময়ে, কৌতুকে হতভম্ব হয়ে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। ব্যস্, হয়ে গেল আমার ! নিজের ওপর আর জোর রইল না একফোঁটাও. কি করছি কিছুই বুঝলাম না—নাচার বদলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভাবে পা ঠুক্তে ঠুক্তে একসময় একদম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে—কেউ অবাক হয়ে, কেউ কৌতূহল নিয়ে, আবার

কেউ বা সহানুভূতির সঙ্গে; কেবলমাত্র দিদিমাই তাকিয়েছিলেন নির্বিকার ভাবে।

"নাচতে জান না, নেমেছ কেন?" বাবার ক্রুদ্ধস্বর আমার কানে এল; সামান্য একটু ধাক্কা মেরে আমাকে সরিয়ে দিয়ে বাবা আমার সঙ্গিনীর হাত ধরে, পুরনো ধাঁচে একটুক্ষণ নেচে, তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কৌচে বসিয়ে দিলেন। সবাই বেজায় খুশি হল, মাঝুরকাও শেষ হল!

ভগবান, এমনি কঠোর শাস্তি কেন দাও আমাকে?

দুনিয়ার সব্বাই আমাকে ঘৃণা করে, চিরদিন করবে। সব পথ—ভালবাসার পথ, বন্ধুত্ব, সম্মানের পথ—সব পথই বন্ধ আমার কাছে! সব গেল, আমার সব গেল! কেন ভলোদিয়া আমার দিকে তাকিয়ে ইসারা করতে গেল, যা আর সবায়ের চোখে পড়ল, অথচ আমি কোন মানে ধরতে পারলাম না কেন? ওই বিচ্ছিরি রাজকুমারীটা কেন তাকাল আমার দিকে অমনি করে? আর সোনেচ্‌কা—অত ভাল, অত সুন্দর···কিন্তু তবুও ঠিক ওই মুহূর্তটিতেই হেসে ফেলল কেন? বাবা কেন মুখ চোখ লাল করে আমাকে গিয়ে ধরল? আমার জন্যে বাবাও লজ্জা পেল? উঃ কি ভয়ানক!···আমার মা-মণি যদি আজ এখানে থাকত কক্ষনো, কক্ষনো সে লজ্জা পেত না তার নিকোলেঙ্কাকে নিয়ে। মায়ের কথা মনে পড়তেই এবার আমি কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে স্বপ্নের দেশে উড়ে চলে গেলাম। দেখলাম বাড়ির সামনে ছোট্ট মাঠটা, দেখলাম মস্ত লম্বা লেবু গাছের সারি বাগানে, ছোট্ট পুকুরটার ওপর ডানা ঝাপটাচ্ছে বাবুই পাখির দল, নীলাকাশে স্বচ্ছ মেঘের দল, টাট্‌কা খড়ের গন্ধ—এমনি কত, আরো কত আনন্দের স্মৃতি আমার কল্পনায় ভেসে বেড়াতে থাকে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মাঝুরকার পরে

রাতে খাবার সময় প্রথম জোড়ায় নেচেছিল যে ছেলেটি সে এসে আমাদের সঙ্গে ছোটদের টেবিলে বসে আমার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলে। অন্যদিন হলে নিশ্চয় বিশেষ আপ্যায়িত বোধ করতাম, কিন্তু সেদিনের ভয়ঙ্কর বিপদের ফলে আমি তখনও একেবারে মুহ্যমান! কিন্তু ছেলেটিও যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার মন ভাল করবেই। নানারকমে আমাকে ঠাট্টা করছে, প্রশংসা করছে, শেষ পর্যন্ত বন্ধুরা যখন কেউ আমাদের খেয়াল করছেন না—সে ফাঁকে নানা বোতল থেকে মদ নিয়ে আমাকে খাওয়াল পীড়াপীড়ি করে। খাওয়ার শেষে বাবুর্চি এসে যখন তার তোয়ালে জড়ানো বোতল বার করে নিয়মমাফিক আমার ছোট্ট শ্যাম্পেন গ্লাসের এক চতুর্থাংশ ভরে দিল, আমার সঙ্গী তখন জেদাজেদি করে গ্লাসটা পুরো করে দিল আর আমিও তার কথায় সবটা মেরে দিলাম এক চুমুকে। এর পরে চমৎকার আরামদায়ক একটা উষ্ণতা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল আমার সারা শরীরে, আর খুব ভাল লাগল, মমতা হল আমার এই হাসিখুশিতে ভরা সঙ্গীর ওপর, আমার রক্ষাকর্তার ওপর। আমি হাসলাম প্রাণ ভরে মন খুলে।

নাচের ঘর থেকে 'গ্রাণ্ডফাদার'-এর সুর ভেসে এল, অতিথিরাও সবাই একে একে উঠতে লাগলেন টেবিল ছেড়ে। আমাদেরও বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেল নিমেষে—আমার সঙ্গী চলে গেল বড়দের সঙ্গে। আমার সাহস হল না তাকে অনুসরণ করতে। তাই গুটিগুটি এগিয়ে গেলাম মাদাম ভালাখিনার কাছে, কৌতুহলের সঙ্গে শুনতে লাগলাম মা আর মেয়ের আলাপ।

"মা, আর আধ ঘণ্টা, লক্ষ্মীটি মা-মণি"—সোনেচ্‌কা মিনতি জানাচ্ছে।

"না সোনা, অসম্ভব"।

"লক্ষ্মীটি মা, দোহাই তোমার আমার জন্যে", সে জেদ করে।

"কালকে যদি আমার অসুখ হয়, খুশী হবে তো?" মাদাম ভালাখিনা বলেন কিন্তু সেই সঙ্গে একটু হেসেও ফেলেন।

"তবে, তবে আমি থাকতে পারি না মা-মণি?" সোনেচ্‌কা আনন্দে নাচতে থাকে।

"কি আর করি বল? আচ্ছা, বেশ যাও নাচ গিয়ে। এই যে তোমার একটি সঙ্গী রয়েছে।" আমাকে দেখিয়ে বললেন।

সোনেচ্‌কাতে আমাতে হাত ধরাধরি ধরে বল-নাচের ঘরে ছুট লাগালাম।

সোনেচ্‌কা, ওর আনন্দ আর আমার মদের প্রভাব—সবে মিলে মাঝুরকার কথা আমার মন থেকে একদম মুছে দিল। পায়ের কত রকম মজার ভঙ্গী করলাম; একটা ঘোড়া দুলকি চালে চলেছে, গর্বিতভাবে পা তুলে খটখট করে হেঁটে তাই দেখালাম, একটা ভেড়া হলাম, কুকুরে তাড়া করেছে, আর সেটা লাফাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভরে হাসলাম, দর্শকেরা কে কি ধারণা করছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে। সোনেচ্‌কাও খালি হাসছে; আমরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে ঘুরছি, তখনও সে হাসছে; একজন বুড়ো ভদ্রলোক খুব সাবধানে পা তুলে একখানা রুমাল মাড়িয়ে দিলেন, ভান করলেন যেন ভীষণ কষ্ট হল তাঁর—সোনেচ্‌কা তাই দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ল; আর আমি যখন উৎসাহ দেখাতে ছাদ পর্যন্ত একটা লাফ মারলাম তখন সে হেসে প্রায় মরে যাবার জোগাড়।

দিদিমার পড়ার ঘর দিয়ে পার হয়ে যেতে যেতে আয়নাটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিজের চেহারাখানা একবার দেখে নিলাম। সারা মুখ ঘামে জবজবে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, মাথার ওপরের ঝুঁটিটা খাড়া হয়ে রয়েছে বিশ্রী—তবুও সারা মুখখানায় এমনি একটা আনন্দ আর স্বাস্থ্যের জোয়ার যে আমার ভালই লেগে গেল সে মুখখানাকে।

"সব সময় যদি এমনি থাকি," ভাবলাম আমি, "তাহলে বোধহয় আমিও লোককে খুশী করতে পারি।"

তবুও যখন আমার সঙ্গিনীর ছোট্ট কোমল স্নিগ্ধ মুখশ্রীর দিকে তাকালাম, দেখলাম সে মুখে জলজল করছে স্বাস্থ্য আর আনন্দের আভা; তাছাড়াও অদ্ভুত কমনীয় সে মুখ—তখন নিজেকে নিয়ে কেমন বিব্রত বোধ করলাম যেন! বুঝতে পারলাম আমার দিকে এর মত সুন্দরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা—নেহাতই বোকামি!

পরিবর্তে ভালবাসা আমি আশা করতে পারি না, আর সত্যি তা আমি করিও নি। আমার মন ভরে আনন্দ উপচে পড়ছে। যে ভালবাসা আমার মনকে মাতিয়ে দিয়েছে, সে আনন্দ অক্ষয় হোক, এর চাইতে বেশী আর কিছু চাইবার আছে নাকি? আমি সুখী; আমার হৃদয় কপোতের মত ডানা ঝাপটাচ্ছে, রক্তধারা উত্তাল হয়ে উঠেছে—আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

আমরা যখন বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম সিঁড়ির নীচে অন্ধকার ভাড়ারঘরটা পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে একবার ভাবলাম কি মজাই হত যদি এই অন্ধকার ঘরটাতে সকলের অজান্তে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম সোনেচ্‌কাকে নিয়ে!

"আজ সন্ধ্যেটা খুব মজায় কাটল, না?" আস্তে কাঁপা স্বরে বলে ফেলেই তাড়াতাড়ি পায়ের গতি বাড়িয়ে দিই। যা বলেছি, ভয় তার জন্যে নয়—ভয় যা বলতে চেয়েছিলাম তার জন্যে।

"হ্যা, খুব চমৎকার কাটল"—সোনেচ্‌কা তার ছোট্ট মাথাটি আমার দিকে ফিরিয়ে এমনি সহজ সপ্রতিভভাবে বলল যে আমারও ভয় দূর হয়ে গেল।

"বিশেষ করে খাওয়ার পরে। কিন্তু যদি জানতে কি ভীষণ দুঃখিত আমি (অসুখী বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু সাহসে কুলোল না), এক্ষুণি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে বলে। আর হয়তো কক্ষনো দেখাই হবে না।"

"কিন্তু আমাদের আর দেখা হবে না কেন?" নীচু হয়ে স্লীপারের গোড়ালিটা লক্ষ্য করতে করতে আর আমাদের সামনের পর্দাটায় হাত বুলোতে বুলোতে সোনেচ্‌কা জিজ্ঞেস করে, "আমি আর মা তো প্রতি মঙ্গল আর শুক্রবার ভারস্কয় বুলেভারে বেড়াতে যাই। তুমি কি কখনো বেড়াতে যাও না?"

"জান, এক্ষুণি কি ভাবছিলাম আমি?" হঠাৎ বলে ওঠে সোনেচ্‌কা। "বাড়িতে যে ছেলেরা আসে তাদের আমি সবসময় 'তুই' বলি। এস আমরাও দুজনে দুজনকে 'তুই' বলে ডাকি। রাজী আছ?" মাথাটা একটু পেছন দিকে হেলিয়ে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞাসা করে।

ঠিক সেই সময় আমরা নাচের ঘরে ঢুকেছি। 'গ্রাণ্ডফাদার' নাচের দ্বিতীয় অংশ সবে আরম্ভ হচ্ছে। "আমি রাজী……তোমার কথায়"—ভাবলাম গানের গোলমালে আমার কথা চাপা পড়ে যাবে।

"বল্, তোর কথায়", সোনেচ্‌কা হেসে শুধ্‌রে দেয়।

'গ্রাগুফাদার' শেষ হল, আমি ততক্ষণে তুই দিয়ে একটা লাইনও কথা বলে উঠতে পারি নি—মনে মনে অবশ্য সবসময়ই চিন্তা করছিলাম কি ধরনের কথা বললে বেশ অনেকবার ব্যবহার করা যায় ঐ শব্দটা। কিন্তু সাহসেই কুলোচ্ছে না আমার। কানে বাজছে খালি তুই করবি? আর একটা নেশার মত ঘোর লাগছে। সোনেচ্কাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি ওর কোঁকড়ানো চুলগুলো কানের পিঠে গুছি করে বাঁধা, তাতে ভুরু আর কপালের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, সবুজ আলোয়ানটি বেশ করে জড়ানো, খালি নাকের ছোট্ট ডগাটুকু বার হয়ে আছে—সত্যি ওর ছোট্ট গোলাপী আঙুলগুলো নিয়ে মুখের কাছটায় যদি একটু ফাঁক করে না নিত, তাহলে নির্ঘাৎ দমবন্ধ হয়ে যেত। মায়ের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমাদের দেখতে পেয়ে চট্ করে ফিরে ছোট্ট মাথাটি হেলিয়ে বিদায় জানিয়ে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভলোদিয়া, ইভিনরা, এতিয়েনে সবাই—সবাই আমরা সোনেচ্কাকে ভালবেসে ফেলেছি। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সবাই ওকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে লাগলাম। ঠিক কার দিকে ফিরে ও মাথাটি হেলাল জানি না, কিন্তু সে সময়ে আমার নিজের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যে সে লোকটি আর কেউ নয়, আমি!

ইভিনদের বিদায় দেবার সময় বেশ অসঙ্কোচে কথাবার্তা বলে হাত ঝাঁকালাম—বিশেষ করে সেরিওঝাকে···তাকেও বিদায় দিলাম বেশ নির্বিকার ভাবে। আমার ভালবাসা আর আমার ওপর তার প্রভাব—এই দুইটি হারাল সেরিওঝা সেদিন থেকে। যদি সে বুঝতে পেরে থাকে, তবে নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছি খুব; অবশ্য হাবেভাবে সে উদাসীন থাকতেই চেষ্টা করেছে।

জীবনে এই প্রথম ভালবাসাকে অপমান করলাম আবার প্রথম এই সমস্ত প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম ভালবাসার মাধুরী। পুরনো পরিচিত একটা স্নেহের ভাবকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে, রহস্য আর অনিশ্চয়তা ভরা ভালবাসার একটা নতুন, তাজা অনুভূতি জায়গা করে নিল। তাছাড়া, একই সময়ে ভালবাসা থেকে সরে যাওয়া, আবার নতুন করে ভালবাসা—তার মানে দ্বিগুণ তেজে, নতুন উৎসাহে ভালবাসার জোয়ারে ভেসে যাওয়া।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিছানায়

"সেরিওঝাকে আমি এতদিন ধরে এমনি আকুল হয়ে ভালবেসেছিলাম কি করে?"—বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি, "নাঃ, ও আমাকে কোনদিন বুঝতে পারেনি, আমার ভালবাসার মর্মও ধরতে পারেনি, আর ও তার যোগ্যও নয়। আর সোনেচ্‌কা? কি মিষ্টি! 'করবি তুই'? 'এবার তোর পালা'।"

ওর ছোট মুখখানা স্পষ্ট মনে আসতেই লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম, চাদরটা দিয়ে মাথা অবধি ঢেকে বিছানার চারদিকে বেশ করে গুঁজে দিলাম যখন দেখি চারিদিকে কোথাও আর একটুও ফাঁক নেই, তখন তার মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়লাম—নরম একটা উষ্ণতা আমাকে জড়িয়ে ধরল, মধুর স্বপ্ন আর স্মৃতির আবেশে ডুবে গেলাম। নরম লেপের লাইনিংয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম সোনেচ্‌কাকে ঠিক যেমনটি দেখেছি এক ঘণ্টা আগে; মনে মনে কথা বললাম ওর সঙ্গে—সে কথার যদিও অর্থ কিছু নেই, তবুও কি আনন্দ যে পেলাম, তাতে রয়েছে অসংখ্যবার 'তুই', 'তোকে', 'তোর সাথে,' 'তোর' ইত্যাদি।

স্বপ্নগুলো এত স্পষ্ট যে একটা মধুর আবেশে আমার ঘুমই এল না আর ইচ্ছে করল এই উপচে-পড়া আনন্দের ভাগ দিই কাউকে।

"মিষ্টি মেয়ে!" এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরে বেশ জোরেই একবার বলে ফেললাম, "ভলোদিয়া জেগে আছ?"

"না", তন্দ্রাচ্ছন্ন অস্পষ্ট গলায় সে জবাব দেয়, "কি ব্যাপার?"

"আমি ভালবেসেছি, ভলোদিয়া। সত্যি সত্যিই সোনেচ্‌কার প্রেমে পড়েছি।"

"বেশ তো, তা কি?" শরীরটা টান করতে করতে ভলোদিয়া বলে।

"ও ভলোদিয়া! তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, আমার ভিতরে কি হচ্ছে। এখানে আমি এই চাদরের তলায় ঢুকে রয়েছি, আর স্পষ্ট, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওকে; কথা বললাম ওর সঙ্গে—আঃ কি যে চমৎকার,

বলে বোঝাতে পারি না। আর জান, শুয়ে শুয়ে যখনি ওকে ভাবছিলাম এত কষ্ট হল যে, মনে হল কাঁদি।"

ভলোদিয়া একটু নড়ে চড়ে শুল।

"আমার শুধু এখন একটাই ইচ্ছে," আমি বলে চলি, "তা হচ্ছে সবসময় ওর কাছাকাছি থাকা, সবসময় ওকে দেখতে পাওয়া। আর চাই না কিছু। আচ্ছা, তুমি কি ভালবেসেছ? সত্যি কথা বল, ভলোদিয়া।" প্রশ্নটা অদ্ভুত। কিন্তু আমার মন চাইছে সব্বাই, এ পৃথিবীর সব্বাই যেন সোনেচ্‌কাকে ভালবাসে, আর তাই নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করে।

"তাতে তোমার কি?" আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভলোদিয়া বলে, "বোধ হয়।"

"তোমার একটুও ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না, খালি ভান করছ।" ভলোদিয়ার চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে ও ঘুমোবার কথা মোটেই ভাবছে না বুঝতে পেরে আমি চাদরের ঢাকাটা সরিয়ে দিলাম, "এস, আমরা ওর সম্বন্ধে আলোচনা করি। কি চমৎকার, না? ও যদি বলে নিকোলেঙ্কা, এই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড় কিংবা এই আগুনে ঝাঁপ দাও—শপথ করে বলছি, আমি তখুনি তা করব, আর কি আনন্দের সঙ্গেই করব। সত্যি ও যেন যাদু জানে।" কল্পনায় ওকে আবার সামনে দেখতে পেয়ে আমি হঠাৎ ওপাশ ফিরে বালিশে মুখ গুঁজলাম। "ও ভলোদিয়া, আমার কান্না পাচ্ছে ভীষণ কান্না পাচ্ছে।"

"দূর বোকা"—একটু হেসে ও বলে, তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। "আমার অবশ্য তোমার মতন একটুও লাগছে না। খালি মনে হচ্ছে যদি ওর পাশে বসে একটু কথাবার্তা বলি।"

"ও তাহলে তুমিও ভালবেসেছ, বল?" আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম।

"তারপর," একটু কোমল হাসির সঙ্গে ভলোদিয়া বলে চলে, "তারপর ওকে চুমু খাই—ওর ছোট্ট আঙুলে, চোখে, ঠোঁটে, নাকে, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে—সবজায়গায়, সবজায়গায় ওকে চুমু খাই।"

"বাঃ, কি বাজে", বালিশের তলা থেকে চেঁচিয়ে উঠি।

"তুমি এসব কিছু বোঝ না।" ভলোদিয়া বিদ্রূপ ভরে বলে।

"হ্যা, হ্যা আমি বুঝি, খুব বুঝি, তুমিই কিছু বোঝ না আর খালি বাজে কথা বলছ।" আমার চোখে জল এসে গেছে।

"বেশ, বেশ, কাঁদবার কিছু নেই তো? কি ছিঁচকাঁদুনে ছেলেরে বাবা!"

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

চিঠি

এর প্রায় মাস ছয়েক পরে, ১৬ই এপ্রিল তারিখে আমরা বসে পড়ছি, বাবা ওপরে এসে আমাদের জানালেন সেদিন রাত্রেই আমরা তাঁর সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে যাব। কথাটা শুনেই বুকটা ধক্ করে উঠল···মা, আমার মা-মণি, মা-মণির কিছু হয়নি তো? এই চিঠিটাই আমাদের অকস্মাৎ বিদায়ের কারণ:

পেত্রোভস্কায়া, ১২ই এপ্রিল

"আজ রাত দশটায় তোমার ৩রা এপ্রিলের চিঠিখানা পেয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে বসেছি, যেমনটি আমার চিরদিনের অভ্যেস। ফিয়োডোর চিঠিটা শহর থেকে কাল রাতেই এনেছিল, কিন্তু রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় মিমিকে দেয়। আমি একটু অসুস্থ তাই মিমি আবার চিঠিটা সারাটা দিন লুকিয়ে রাখে। আমার একটু জ্বরের মতন হয়েছে, সত্যি বলতে কি, আজ চারদিন ধরে বিছানায় আছি।

"তুমি কিন্তু অকারণে ভয় পেয়ো না, লক্ষ্মীটি। আমার শরীর বেশ ভালই আছে আর ইভান ভাসিলিচ্ যদি অনুমতি দেন, কালই উঠে পড়ব ভাবছি।

"শুক্রবার দিন মেয়েদের নিয়ে একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম, কিন্তু বড় রাস্তায় পড়ার মুখেই ঘোড়াগুলো কাদায় একদম বসে গেল—ঐ যে সেই সেতুটা যেটাকে আমার ভীষণ ভয়, তারই কাছে। দিনটা ছিল ভারী চমৎকার, ভাবলাম হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তা পর্যন্ত যাই, ইতিমধ্যে ওরা ক্যালাসটা টেনে তুলুক। ছোট্ট গির্জেটায় পৌঁছেই বসে পড়তে হল, এত ক্লান্ত লাগল। এদিকে এভাবে আধ ঘণ্টাখানেক কাটল ওদের লোক ডাকাডাকি করে গাড়ি তুলতে। বড্ড শীত লাগছিল, বিশেষ করে পায়ে—খুব পাতলা চামড়ার জুতো পরেছিলাম কিনা আর তাও ভিজে একেবারে জবজবে। ডিনারের পরে একটু জ্বরভাব মনে হল কিন্তু বিছানায় গেলাম না আর চা খাবার পর অভ্যেসমতন লিউবোচ্কার

সঙ্গে একসঙ্গে গান গাইতে বসে গেলাম (তুমি একেবারে চিনতেই পারবে না গানে ও এত এগিয়েছে)। কিন্তু কি আশ্চর্য ভাব একবার, দেখি তাল দিতে পারছি না। বারকয়েক চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাথাটা কেমন এলোমেলো, কানের কাছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। আমি শুনছি: এক, দুই, তিন—তার পরেই আট, পনের। সবচাইতে মজার হচ্ছে আমি বেশ বুঝতে পারছি আজেবাজে বকছি, কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারছি না। মিমি শেষপর্যন্ত আমার সাহায্যে আসে,—ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়, একরকম জোর করেই। আচ্ছা, এই হল আমার অসুস্থ হয়ে পড়ার বিবরণ আর এর জন্যে আমি নিজেই একমাত্র দায়ী। পরের দিন জ্বর বেশ বাড়ল, আমাদের বৃদ্ধ ইভান ভাসিলিচ্ এলেন। সেই থেকে তিনি আমাদের এখানেই আছেন, কথা দিয়েছেন শীগ্‌গিরই চাঙ্গা করে দেবেন আমাকে। কি চমৎকার মানুষ! আমি যখন জ্বরে অচৈতন্য, প্রলাপ বকছি, সারারাত তিনি একভাবে বসে থেকেছেন মাথার কাছে; এখন আমি লিখতে বসেছি, তাই মেয়েদের নিয়ে বসে জার্মানদের গল্প শোনাচ্ছেন—এ-ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে, হাসতে হাসতে মেয়েদের দম ফেটে যাচ্ছে।

"তুমি যাকে বলতে ফ্লেমান্দের, সুন্দরী মেয়েটি"—সেই মেয়েটি এসে রয়েছে আমার কাছে গত দুসপ্তাহ ধরে। ওর মা যেন দূরে কোথায় গেছেন কার সঙ্গে দেখা করতে। মেয়েটি খুব ভালবাসে আমায়, ভারী যত্ন করে। মনের সব কথা বিশ্বাস করে বলে আমায়। মেয়েটির সুন্দর মুখ, সাদা মন আর কাঁচা বয়েস—ভাল হাতে পড়লে চমৎকার একটা মেয়ে হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু যে সমাজে ও বাস করে, ওর কথা থেকেই যতদূর বুঝতে পারছি, সেই সমাজই ওকে নষ্ট করে ফেলবে একেবারে। আমার মনে হয়েছে আমার নিজের ছেলেমেয়ের সংখ্যা যদি একটু কম হত, ওকে নিয়ে মানুষ করতাম—একটা খুব ভাল কাজই করা হত তাহলে।

"লিউবোচ্‌কা নিজেই তোমাকে চিঠি লিখতে চেয়েছিল; তিনখানা কাগজ ইতিমধ্যেই ছেঁড়া হয়ে গেছে—তারপর বলল, "বাবা কি ভয়ানক ঠাট্টা করতে ভালবাসেন, আমি জানি। একটা যদি ভুল করি কোথাও, অমনি সেটা দেখিয়ে বেড়াবেন সবাইকে।" কাটেনকা আগের মতনই মিষ্টি, মিমিও চিরদিনের মতই ভাল কিন্তু একঘেয়ে।

"আচ্ছা, এবার দরকারী কথা বলব। তুমি লিখেছ, এ শীতে তোমার কাজকর্ম মোটেই ভাল হয়নি আর বাধ্য হয়েই তোমাকে খাবারোভ্‌কার আয়ের টাকায়

হাত দিতে হয়েছে···। আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে এতে তুমি আবার আমার মত চেয়েছ। আমার যা আছে, তাতে তো তোমারও পূর্ণ অধিকার।

"আমাকে কষ্ট দেবার ভয়ে, আসল সত্যটা তুমি গোপন করে গেছ, আমার সন্দেহ, তাসের জুয়ায় এবারে বেশ কিছু হেরেছ তুমি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি একটুও রাগ করিনি তাতে, কাজেই এবারকার মত সংকট যদি কাটিয়ে উঠতে পার তাহলে আর ও নিয়ে মিথ্যে ভেবে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। তোমার জুয়ায় রোজগারের টাকার ওপর বিশেষ কিছু গুরুত্ব না দিতেই আমি অভ্যস্ত—আমার ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে আমি ওর ওপর মোটেই নির্ভর করি না, এমনকি (ক্ষমা ক'রো) তোমার গোটা সম্পত্তির ওপরেও নয়। তোমার জেতাও আমাকে কোনো আনন্দ দেয় না, তেমনি হারলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। শুধু··· শুধু তোমার এই জুয়ার নেশাটাই আমাকে যা ব্যথা দেয়—এই খারাপ নেশাটা এমনকি তোমার ভালবাসাতে, কেবলমাত্র আমারই প্রাপ্য ভালবাসাতেও ভাগ বসিয়েছে। আর তাই তোমাকে আমার এইসব অপ্রিয় সত্য কথা লিখতে হয়, আজ যেমন লিখছি। ভগবানই একমাত্র জানেন, আমি কত কষ্ট পাই এতে। ঈশ্বরের কাছে নিয়ত শুধু এই প্রার্থনাই জানাব যে তিনি যেন সে বিপদের হাত থেকে বাঁচান—দারিদ্র্যের কথা বলছি না—কিন্তু সে ভয়ঙ্কর অবস্থা যখন আমার ছেলেমেয়েদের স্বার্থ, যা রক্ষা করতে আমি একান্তই বাধ্য, তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধতে পারে আমাদের নিজেদের স্বার্থের। এতদিন প্রভু আমার প্রার্থনা শুনেছেন—তুমি সে সীমা পার হয়ে যাওনি যার পরে গেলে আমাদের সম্পত্তিতে হাত দিতে হত, সে সম্পত্তি আসলে আমাদের ছেলেমেয়েদের, আমাদের তাতে কোনো অধিকার নেই; এই ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা এখনও আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে, এ কথাটা সব সময় মনে রাখা আরও বেশী কষ্টকর।

"ছেলেমেয়েদের কথা লিখেছ তুমি, আমাদের সেই পুরনো ঝগড়ার কথাও তুলেছ। ওদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে চাও, আমাকে মত দিতে বলেছ। তুমি তো জান এ-ধরনের শিক্ষার আমি বিশেষ বিরোধী।

"জানি না, তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে কিনা, তবুও অনুরোধ জানাব—অন্তত আমার কথা ভেবেও তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন এমনকি আমার মৃত্যুর পরেও, প্রভুর ইচ্ছেয় যদি আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হয় তবে তারপরেও এ কাজ কখনই করবে না।

"লিখেছ, তোমাকে সেণ্টপিটার্সবার্গে যেতে হচ্ছে কাজে। প্রভু যীশু তোমাকে

রক্ষা করুন, বন্ধু! তুমি যাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমাদের সকলেরই এত বিচ্ছিরি লাগে! বসন্ত চমৎকার সেজে এসেছে; ঝুল-বারান্দার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে; কাচে ঘেরা গাছপালার ঘরে যাবার পথটা শুকনো একদম খট্‌খটে হয়েছে, চারদিন আগেই পীচগাছগুলো ফুলে ছেয়ে গেছে, সামান্য দু'একটা জায়গাতেই মাত্র বরফ আছে, সোয়ালো পাখির ঝাঁক এসে গেছে, এইমাত্র লিউবোচকা আমাকে বসন্তের প্রথম ফোটা ফুল তুলে দিয়ে গেল। ডাক্তার বলেছেন আর দিন তিনেকের মধ্যেই ভাল হয়ে যাব, তারপর খোলা বাতাসে আর এপ্রিলের সূর্যের আলোয় ঝরঝরে করে নেব শরীরটা। এখন বিদায়, আমার অসুখ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করো না, লক্ষ্মীটি, আর তোমার ক্ষতি নিয়েও নয়। কাজকর্ম সেরে ফেলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারপর ছেলেদের নিয়ে চলে এসো, গোটা গ্রীষ্মকালটা কাটিয়ে যাও। গ্রীষ্মকালটা কাটাবার জন্যে কত চমৎকার সব পরিকল্পনা করেছি কিন্তু সেগুলো কাজে লাগাতে পারছি না কেবল তোমারই অভাবে।"

বাকীটুকু ফরাসী ভাষায় লেখা, আরেক টুকরো কাগজে আঁকাবাঁকা কাঁপা কাঁপা অক্ষরে। হুবহু অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"আমার অসুখের কথা যা বলেছি, তা বিশ্বাস করো না। কেউ জানে না আমার অসুখটা কত মারাত্মক। আমিই কেবল জানি, আমি আর বিছানা ছেড়ে উঠব না জীবনে। একটা মুহূর্তও নষ্ট করো না, চলে এস, শীগ্‌গির এস, আমার ছেলেদের নিয়ে এস। হয়তো এখনও আমি একবার শেষবারের মত ওদের বুকে নিতে পারব, আশীর্বাদ করতে পারব—এই আমার জীবনের শেষ ইচ্ছে। আমি জানি তোমার আঘাত কত মর্মান্তিক হবে কিন্তু আজ কিংবা কাল এ আঘাত তোমাকে পেতেই হত আমার কাছ থেকেই হোক কি অন্যদের কাছ থেকেই হোক। এস, এ দুর্ভাগ্যকে আমরা জয় করতে চেষ্টা করি নিজের মনের শক্তি দিয়ে, ঈশ্বরে যেন বিশ্বাস রাখি। প্রভুর ইচ্ছার কাছে যেন আমরা মাথা নত করি।

"ভেবো না, লিখছি তা আমার অসুস্থ মনের কল্পনা, বিকারের প্রলাপ। বরঞ্চ এই মুহূর্তে আমার চিন্তাধারা বেশ স্বচ্ছ, মাথাও বেশ পরিষ্কার। এ-গুলোকে একটি ভীরু মনের অলীক ভয় বলে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না। না, আমি বেশ বুঝতে পারছি—প্রভুই দয়া করে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন—যে আমি আর বেশীদিন নেই।

"তোমার আর ছেলেমেয়েদের ওপর আমার যে ভালবাসা, তার কি তবে এখানেই শেষ? না, তা হতে পারে না, তা অসম্ভব, আমি জানি। আজ এই মুহূর্তে ভালবাসায় আমার মন কানায় কানায় ভরা, একে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বই কল্পনা করতে পারিনে—এর সমাপ্তি ঘটতে পারে না, ঘটবে না কোনদিন। তোমার ওপর আমার যে প্রেম তা ছাড়া আমার আত্মা বাঁচতে পারে না কখনো কিন্তু আমি জানি আমার আত্মা অমর—চিরকালীন হবার বিধিলিপি না থাকলে, এর মত প্রেমের জন্মই হত না কখনো।

"আমি তোমার কাছে থাকব না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার প্রেম চিরদিন থাকবে তোমার পাশে পাশে। এই চিন্তাই আমার কাছে এত মধুর যে মৃত্যুকেও আমি তো প্রতীক্ষা করছি, শান্তিতে, নির্ভয়ে।

"মন আমার শান্ত। ভগবান জানেন, মৃত্যুকে আমি চিরদিন মনে করতাম এবং আজও করি—আরও সুন্দর, আরও মহৎ একটি জীবনে চলে যাওয়া মাত্র, তবুও···তবুও চোখের জল আমার বাধা মানছে না কেন? কেন আমার সন্তানেরা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে? কেন তুমি এতবড় নিষ্ঠুর আঘাত পাবে? কেন আমি মরব, তোমার প্রেমে যখন আমি সুখী, পরিপূর্ণ সুখী, তখন কেন ফুরিয়ে যাব আমি?

"প্রভু, পূর্ণ হোক্, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক্। আর লিখতে পারছি না, চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো তোমাকে আর দেখতে পাব না। তোমাকে ধন্যবাদ বন্ধু, যত কিছু সুখ, যত কিছু আনন্দ দিয়ে আমার এ জীবন তুমি ভরে দিয়েছ, তার সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাব, তিনি যেন তোমাকে পুরস্কৃত করেন। বিদায়, প্রিয়তম বিদায়—মনে রেখো, আমি যখন থাকব না, আমার প্রেম তোমাকে পরিত্যাগ করবে না কোনদিনই, যেখানেই থাকি না কেন। বিদায় ভলোদিয়া, মানিক সোনা আমার, বিদায় আমার ছোট বেঞ্জমিন, নিকোলেঙ্কা—ওরা কি আমাকে ভুলে যাবে?"

চিঠির সঙ্গে আর একটা চিরকুট, মিমির হাতের লেখা ফরাসীতে:

"যে ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা উনি লিখেছেন চিঠিতে—ডাক্তারেরও মত তাই। কাল রাতে এই চিঠিটা আমাকে দিয়ে তক্ষুনি ডাকে ফেলে দিতে বললেন। প্রলাপের ঘোরে আছেন মনে করে আমি চিঠিটা সকাল পর্যন্ত আটকে রাখলাম তারপর মনস্থির করে চিঠিটা খুলে পড়লাম। পড়া

হতে না হতেই নাতালিয়া সাভিশনা এসে চিঠিটার কথা জিজ্ঞেস করল, বলল, যদি ডাকে না ফেলে দিয়ে থাকি তো এক্ষুণি যেন পুড়িয়ে ফেলি। এই চিঠিটার কথাই খালি উনি বলছেন, বলছেন এ চিঠিটা আপনাকে মেরে ফেলবে। শীগ্‌গির চলে আসুন, এক মুহূর্তও দেরি করবেন না, যদি ওঁকে শেষবারের মত দেখতে চান, চিরবিদায়ের আগে। হিজিবিজি লেখার জন্য ক্ষমা করবেন। আমি তিনরাত ঘুমোইনি। আপনি জানেন আমি কত ভালবাসি ওঁকে।"

এগারোই এপ্রিলের গোটা রাত্তটা নাতালিয়া সাভিশনা মায়ের ঘরে কাটিয়েছিল; তার কাছে শুনেছি মা-মণি চিঠির প্রথম অংশটা লিখে সেটা বিছানার পাশে একটা টেবিলে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

"সত্যিসত্যিই", নাতালিয়া সাভিশনা বলে, "আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, ইজিচেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিলাম, হাত থেকে মোজা খুলে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাত যখন প্রায় একটা, স্বপ্নেই কেমন যেন শুনলাম কার সঙ্গে কথা বলছে ও। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, মানিক আমার বিছানার ওপর উঠে বসেছে, ছোট্ট হাত দুটি কোলের ওপর এমনি করে ভাঁজ করা, চোখ দিয়ে জল পড়ছে অঝোর ঝরে। "তাহলে সব শেষ?" বলে দুহাতের ভিতর ও মুখ লুকলো। আমি লাফিয়ে উঠলাম, "কি হয়েছে? কি হয়েছে তোমার?"

"ও, নাতালিয়া, তুমি যদি কেবল জানতে, কি দেখলাম আমি এই মুহূর্তে!"

কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর যতই মিনতি করলাম, যতই বারবার জানতে চাইলাম জিনিসটা কি—ও আর মুখ খুলল না। কেবল আমাকে বললে ছোট টেবিলটা বিছানার কাছে এনে দিতে, চিঠিতে কি যেন আরও একটু লিখল, তারপর সেটা আটকে তক্ষুণি ডাকে পাঠিয়ে দিতে দিল। তারপর থেকে ওর অবস্থা ক্রমেই আরো খারাপের দিকে যেতে থাকে।"

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

গ্রামে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছিল

১৮ই এপ্রিল পেত্রোভ্স্কয়ে বাড়ির সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল। সারাটা পথ বাবা গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, ভলোদিয়া মা-মণির অসুখ হয়েছে কিনা জানতে চাইলে একবার শুধু তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। পথে আসতে আসতে তিনি একটু শান্ত হয়েছেন মনে হল কিন্তু যতই বাড়ির দিকে এগোচ্ছে তাঁর মুখেও শোকের ছায়া ততই যেন বেশী গভীর করে আঁকা হয়ে যাচ্ছে আর ক্যালাস থেকে নামতে ফোকা যখন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল, বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "নাতালিয়া নিকোলায়েভ্না কোথায় ?"—তাঁর গলায় তখন আর একটুও জোর নেই, চোখেও জল এসে গেছে।

বুড়ো ফোকা আমাদের দিকে একটিবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল, ছোট্ট ঘরটার দরজা খুলে দিয়ে পেছন ফিরে জবাব দিল, "আজ নিয়ে ছদিন হল তিনি ঘর থেকে বেরোননি।"

মিলকা (পরে শুনেছি মা-মণি যেদিন থেকে অসুখে পড়েছে সেদিন থেকে ওর গোঙানি আর থামেনি) বাবাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে, গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দ করে হাত চাটতে লাগল—কিন্তু বাবা একটু ঠেলে ওকে সরিয়ে দিয়ে সোজা বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে গিয়ে চললেন মায়ের নিজস্ব ছোট্ট ঘরটিতে, ওখান থেকে একটা দরজা দিয়ে শোবার ঘরে যাওয়া যায়। ঘরের দিকে যেতে যেতে তিনি যে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, প্রতিটি পদক্ষেপে তা বোঝা যাচ্ছে। ছোট্ট ঘরটাতে বাবা পা টিপে টিপে ঢুকলেন, নিঃশ্বাস বন্ধ করে, বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন তারপর মনস্থির করে···সন্তর্পণে বন্ধ দরজার হাতল ধরলেন। সেই মুহূর্তে মিমি বারান্দা দিয়ে দৌড়ে এসে ঢুকল, চুল উস্কোখুস্কো সারা মুখে চোখের জলের দাগ। গভীর দুঃখ আর হতাশায় সে শুধু ফিসফিস করে বলল, "ওঃ পিয়ত্র আলেক-

জাব্রাভিচ্"। তারপর বাবা দরজার হাতল ঘোরাচ্ছেন দেখে জড়ানো অস্পষ্ট গলায় কোনমতে বলল, "এদিকে নয়। এ দরজায় তালাবন্ধ। ঝিদের ঘরের ভেতর দিয়ে ঢোকবার রাস্তা।"

আমার শিশু-মনের পটে কী গভীর দুঃখের ছাপ ফেলল এসব ঘটনা কি ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্কে মন ছেয়ে গেল।

আমরা ঝিদের ঘরে চললাম। বারান্দায় আকিমের সঙ্গে দেখা, সে বোবা গোছের লোকটা নানা মুখভঙ্গি করে চিরদিন আমাদের আমোদ দিয়েছে—আজ কিন্তু ওর অর্থহীন নির্বিকার মুখে, মজা পেলাম না একটুও, বরঞ্চ দুঃখের কাঁটাটাই খচ করে উঠল আরেক বার আরও জোরে। ঝিদের ঘরে ঢুকতে দেখা গেল দুজন ঝি বসে সেলাই করছে, তারা এমনি শোকাচ্ছন্ন ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের নমস্কার জানাল যে আতঙ্কে আমার মন কেঁপে উঠল। পরের ঘরটা মিমির, সেটা পার হয়ে শোবার ঘরের দরজা খুললেন বাবা, সবাই ঢুকলাম আমরা।

দরজার ডানদিকে দুটো জানালা, শাল দিয়ে ঢাকা; একটার নীচে নাতালিয়া সাভিশনা—চশমাটা নাকের ওপর নেমে গেছে, বসে বসে মোজা বুনছে। অন্য দিনের মত এগিয়ে এসে সে আমাদের চুমু খেল না শুধু আস্তে একটু উঠে দাঁড়াল, আর চশমার ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে তাকাতে চোখে তার জলের ধারা বইল। যারা স্বভাবত শান্ত আর সংযত তারা সবাই আমাদের দেখেই কেঁদে ফেলে দিচ্ছে—ভীষণ দমে গেল আমার মন!

বাঁদিকে একটা পর্দা টাঙ্গানো, তার আড়ালে একটা খাট, ছোট একটা টেবিল, ছোট্ট আলমারী ওষুধে বোঝাই আর একটা বড় ইজিচেয়ার, তাতে বসে ঝিমোচ্ছেন ডাক্তারবাবু; বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী, ভারী সুন্দরী দেখতে, চুলগুলো চমৎকার সোনালী রঙের। তাঁর সাদা পোশাকের হাতা গুটনো, মায়ের মাথায় বরফ দিচ্ছিলেন—কিন্তু মাকে দেখতে পেলাম না। এই মেয়েটির কথাই মা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, ভবিষ্যতে এই মেয়েটিই আমাদের পারিবারিক জীবনে বিশেষ অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি মার মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, মার বুকের ওপরকার গাউনের ভাজ ঠিক করে দিয়ে, আমাদের দিকে ফিরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "জ্ঞান নেই।"

দুঃখে তখন আমি মুহ্যমান কিন্তু তাহলেও কি করে যেন ঘরটার খুঁটিনাটি কোনো ব্যাপারই আমার চোখ এড়াল না। ঘরটা প্রায় অন্ধকার; বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে, ইউ-ডি কলোন, ওষুধ, ওষুধ তৈরির অনুপান একরকম তিক্ত গাছ আর পুদিনা—এইসব মেশানো একটা কেমন কটু কটু গন্ধ। এই বিশেষ গন্ধটা আমার মনে এমনি দাগ কেটেছিল যে আজও যদি কখনো ওই গন্ধটা পাই কিংবা শুধু মনে পড়ে যায় তাহলেও তখনি এতগুলো বছর পার হয়ে ফিরে চলে যাই সেদিনের সেই অন্ধকার ঘরটায়—আর সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটার খুঁটিনাটি সব ভেসে ওঠে আমার মনে জলজ্বল করে।

মার চোখদুটি খোলা, কিন্তু তাতে দৃষ্টি নেই। সে মর্মান্তিক দৃশ্য আমি জীবনে ভুলব না, চোখ দুটিতে অসহ্য যন্ত্রণার ছায়া।

ওরা আমাদের ধরে বাইরে নিয়ে গেল।

পরে যখন মায়ের শেষ মুহূর্তকটির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম নাতালিয়া সাভিশ্‌নাকে, সে বলেছিল।

"তোমরা চলে আসার পর মা আমার অনেকক্ষণ ধরে এপাশওপাশ আর ছটফট করল বিছানায় যেন একটা ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কোথাও; তারপর একসময় একটু তন্দ্রা এল, নিঃঝুম মেরে বালিসে মাথা রেখে পড়ে রইল শান্তিতে—যেন স্বর্গের দেবী! ওরা কেন রুগীর খাবার আনছে না দেখতে আমি একটিবার বাইরে গেলাম। ফিরে আসতেই দেখি ও জেগেছে, স্বামীকে ডাকছে। তোমার বাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল কিন্তু ও যা বলতে চেয়েছিল তা বলবার আর শক্তি রইল না, গোঙাতে গোঙাতে শুধু বলতে পারল, "ও, ভগবান! প্রভু! ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা।" আমি দৌড়ে তোমাদের নিতে আসছিলাম, কিন্তু ইভান ভানিলিচ্ বাধা দিলেন, বললেন: "রুগী আরও উত্তেজিত হবে, ওদের না ডাকাই ভাল।" এরপরে একবার শুধু সে হাতটা ওপর দিকে তুলে ধপ্ করে ফেলে দিল; কি বোঝাতে চাইল, ভগবানই জানেন। আমার বিশ্বাস তোমাদের সে আশীর্বাদ জানাল। প্রভু তাকে মৃত্যুর আগে কোলের সন্তানদের শেষ দেখা দেখতে দিলেন না। এবার আমার মালিক অনেক চেষ্টা করে একটুখানি উঁচু হয়ে উঠল তারপর হাতটা একটু নেড়ে হঠাৎ বিদীর্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "ও যীশুমাতা ওদের পরিত্যাগ ক'রো না।" ততক্ষণে ওর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম কি অসহ্য কষ্টই না পাচ্ছে; বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়ে বিছানার চাদরটা দাঁত

দিয়ে কামড়ে টেনে তুলল, আর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, সমানেই গড়াচ্ছে।

"তারপর ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

কিন্তু নাতালিয়া সাভিশ্না আর বলতে পারে না, মুখ ফিরিয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে।

মর্মান্তিক যন্ত্রণা পেয়ে মা মারা গেলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দুঃখ

পরের দিন সন্ধ্যের পর মাকে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করল। না চাইলেও একটা অজানা আতঙ্কে আমার মন ভরে ছিল। সেটাকে কোনমতে জয় করে আস্তে আস্তে দরজাটা খুললাম, পা টিপে টিপে ঢুকলাম জল ঘরে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে টেবিলের ওপর কফিনটা বসানো, চারধার ঘিরে মোমবাতি জ্বলছে লম্বা লম্বা রূপোর বাতিদানে। দূরে একটা কোণে নীচু গলায় একঘেয়ে সুরে মন্ত্র পড়ছে।

দরজার কাছ থেকে তাকালাম; কিন্তু অনবরত কান্নার ফলে চোখের দৃষ্টি দুর্বল, স্নায়ু বিকল—সবকিছুই ঝাপসা মনে হল। সব মিশে চোখের সামনে একাকার হয়ে যাচ্ছে অদ্ভুতভাবে—ঐ যে আলো, ব্রোকেড, ভেলভেট, কারুকার্য করা বড় বাতিদানটা, গোলাপী রঙের বালিশ, লেসের ঝালর দেওয়া, টুপিতে রিবন-বসানো আর কি যেন একটা জিনিস মোমের মত স্বচ্ছ। একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালাম মুখখানা দেখব বলে কিন্তু তবুও মুখের জায়গায়, সেই মোমের মত স্বচ্ছ কি জিনিস যেন। ওটা যে মায়েরই মুখ; বিশ্বাসই হচ্ছে না। কিন্তু খানিকটা দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে এবার চোখের সামনে ওঠে আমার মা-মণিরই চিরপরিচিত সেই প্রিয় মুখখানা। ওই আমার মা বুঝতে পেরে সারা শরীরটাই কেঁপে উঠল। কিন্তু চোখদুটি অমন বসা কেন? এত বিচ্ছিরী সাদা ফ্যাকাসে কেন? আর একদিকে গালের চামড়ার নীচে ওই কালচে দাগটাই বা কিসের? সমস্ত মুখখানারই ভাব এমনি কঠিন, ঠাণ্ডা কেন? ঠোঁটদুটি এত ফ্যাকাসে অথচ ওর গড়নটি কেন এত নিটোল, নিখুঁত? ওতে যেন কেমন একটা অপার্থিব শান্তি তাই সেদিকে তাকাতেই আমার চুল আর পিঠ বেয়ে একটা ভয়ের শিরশিরানি নেমে গেল।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করি একটা অভাবনীয় অমোঘ শক্তি যেন আমার চোখদুটিকে আকর্ষণ করছে ঐ জীবনহীন মুখখানার দিকে।

চোখ ফেরাতে পারছি না কিন্তু কল্পনায় রঙীন ছবি আঁকতে থাকি সেই পুরনো সুখ আর আনন্দের। ভুলেই গেলাম সামনে যে মৃতদেহটি রয়েছে, যার দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছি তার আমার কল্পনার সঙ্গে যার বিন্দুমাত্রও যোগ নেই—সে আমারই মা। আমি সেই মাকে দেখলাম, যাকে আমি এতদিন দেখেছি···জীবন্ত, সুখী আর ঠোঁটে হাসি। হঠাৎ এ-সময় সামনের মুখখানাতে যেন নতুন করে চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সম্বিত ফিরে এল আমার; ভয়ঙ্কর সত্যটা মুহূর্তে মনে ঘা মারল, সারা শরীরে শিহরণ জাগল কিন্তু তবুও দৃষ্টিটা সরাতে পারলাম না একচুলও। আবার কল্পনা এসে বাস্তবের স্থান নিল, আবার বাস্তব এসে কল্পনাকে উড়িয়ে দিল। এমনি করে ক্রমে আস্তে আস্তে কল্পনার জোর গেল কমে আর আমাকে সে ভুল বোঝাতে পারছে না, তেমনি আবার সেই সঙ্গে বাস্তবের বোধটাও গেল নষ্ট হয়ে। আমি সংজ্ঞা হারালাম। কতক্ষণ এ ভাবে ছিলাম জানি না, এ ভাবটা আসলে কি, তাও জানি না—শুধু জানি কিছুক্ষণের জন্য নিজের অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিলাম, মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম একটা অপার্থিব মধুর কিন্তু শোকাচ্ছন্ন অনুভূতির আনন্দে।

বোধহয় নতুন জীবনে উড়ে যেতে যেতে আমার কোমল আত্মা দুঃখের সঙ্গে ফিরে তাকিয়েছিল এই দুনিয়ার দিকে, যেখানে পড়ে রইলাম আমরা; তাই আমাকে দেখে আমার বেদনায় অভিভূত হয়ে ভালবাসার পাখায় ভর দিয়ে নেমে এলেন এখানে মুখে স্বর্গীয় করুণ হাসি নিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে, আশীর্বাদ জানাতে।

ক্যাচ্ করে দরজায় একটু শব্দ হল; প্রথমজনকে বিদায় দিয়ে দ্বিতীয়জন ঢুকলেন মন্ত্র আওড়াতে। সে শব্দে আমি জেগে উঠলাম, আর জেগে উঠেই প্রথমেই মনে হল আমি কাঁদছি না একফোঁটাও অথচ একটা চেয়ারে উঠে এমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছি যাতে শোকের চিহ্নমাত্রও নেই—নিশ্চয় ঐ লোকটি আমাকে দেখলে ভাববে দুঃখ নেই, অনুভূতি নেই শুধু কৌতূহল মেটাতে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছি। আমি মাথা নত করলাম, ক্রুশচিহ্ন আঁকলাম, তারপর কাঁদতে শুরু করলাম।

আজকে যখন সেদিনের স্মৃতি মনে আসে, দেখি সেই একটি মুহূর্তে যখন আমি নিজেকে ভুলে সম্বিত হারিয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই একটি মুহূর্তই ছিল আমার প্রকৃত দুঃখের—প্রকৃত শোকের। সমাধির আগে বা পরে কান্নার আমার বিরাম ছিল না, শোকেরও অন্ত ছিল না, কিন্তু সে দুঃখের সে

শোকের কথা মনে পড়লে আজ লজ্জা পাই—তাতে সবসময়ই মেশানো থাকত একটা আত্মপ্রীতির ভাব, একটা আত্মচেতনার ভাব। কোন সময়ে মনের গহনে থাকত সবাই যেন মনে করে আমিই কষ্ট পাচ্ছি সবচাইতে বেশী, কোন সময় বা একটা দুশ্চিন্তা সবার না জানি কি ধারণা হচ্ছে আমার সম্বন্ধে, আবার কোন সময় বা একটা অর্থহীন কৌতূহল নিয়ে চারিদিক লক্ষ্য করতাম, দেখতাম মিস্রির টুপিতে কি আছে ; উপস্থিত লোকগুলোর মুখগুলোই বা কিরকম ইত্যাদি। আমার নিজের ওপর ঘৃণা হত—কারণ আমার সে-সময়কার মনোভাবটা অবিমিশ্র দুঃখের ছিল না, অথচ সবসময়ই চেষ্টা ছিল মনের অন্য ভাবগুলো লুকিয়ে রাখা তাই আমার শোকটাই ছিল আসলে অভিনয়। তাছাড়া, মনে মনে দুঃখকে লালন করতেও যেন একটা আনন্দ পেতাম, তাই সবসময়ই চেষ্টা করতাম, মনে এই বিষাদের ভাবটা জাগিয়ে রাখতে, আর এই আত্মসচেতন ভাবটাই গলা টিপে ধরত আমার আসল ব্যথা ও বেদনার।

গভীর দুঃখের পর গভীর ক্লান্তি আসে—আমিও তাই সে রাতটা শান্তিতে গভীর ঘুমে কাটিয়ে দিয়ে যখন উঠলাম, তখন আমার চোখের জল শুকিয়েছে, উত্তেজনাও কেটেছে। বেলা দশটায় আমাদের ডাক পড়ল, মৃতদেহ নিয়ে যাবার আগে একটা অনুষ্ঠানে সবাই এসেছে। ঘরভর্তি চাকরবাকর আর চাষীমজুরের দল কাঁদছে, তারা প্রভুপত্নীকে বিদায় দিতে এসেছে। অনুষ্ঠানের সময় আমি কতবার কাঁদলাম, ক্রুশচিহ্ন আঁকলাম, মাটিতে বসলাম হাঁটু গেড়ে···কিন্তু তবুও··· তবুও আমি জানি সে প্রার্থনা আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়নি, মন আমার আসলে ছিল উদাসীন। আমি বরঞ্চ ভাবছিলাম, নতুন যে কোটটা ওরা আমাকে পরিয়েছে, সেটা কি ভারী আঁট হয়ে বসেছে হাতের তলায়। প্যাণ্টের হাঁটুটা যেন বেশী নোংরা না হয়ে যায় সেদিকেও খেয়াল ছিল আর বেশ করে লক্ষ্য করছিলাম, মিটমিটে শয়তানের মত, আশেপাশে যারা আছে তাদের সব্বাইকে। কফিনের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আমার বাবা। হাতের রুমালখানার মতই সাদা তার মুখ, অতিকষ্টে চোখের জল চেপে রেখেছেন। দীর্ঘ, সুঠাম চেহারা বাবার, কালো কোট পরা : ফ্যাকাসে শোকাচ্ছন্ন ভাব, চলাফেরায় আগের মতই আত্মপ্রত্যয়, চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে—এই হয়তো ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন, এই মাথা নত করে মাটি স্পর্শ করলেন, যাজকের হাত থেকে মোমবাতিটা নিলেন বা ধীর পায়ে কফিনের কাছে গেলেন, প্রতিটি পদক্ষেপই তাঁর হৃদয়গ্রাহী মনে হচ্ছে। কিন্তু, কি জানি কেন, বাবার এই

সবেতেই মানিয়ে যাওয়া ভাবটাই ঠিক আমার মনঃপুত হচ্ছিল না। মিমি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, যেন সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই। পোশাক অবিন্যস্ত, টুপিটা এক পাশে হেলানো ; ফোলা ফোলা চোখ দুটি লাল, মাথা অল্প অল্প নড়ছে। সে অনবরত ফোঁপাচ্ছে আর দুহাতে বা রুমালে মুখ ঢাকা দিচ্ছে—দেখলে সত্যি হৃদয় স্পর্শ করে। আমার কিন্তু মনে হল ওটা আর কিছু নয় কপট কান্নার পরিশ্রমের পর হাতের আড়ালে মুখ লুকিয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়া মাত্র। এই পরশুদিনই বাবাকে মিমি মা-মণির মৃত্যুটা নাকি এত কঠিন আঘাত হয়েছে ওর পক্ষে যে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে, আশাই করে নি। ওর জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, আর সেই দেবদূত (মাকে ঐ নামেই সে ডাকত) মৃত্যুর পূর্বেও তার কথা ভোলেনি, তাই ওর আর কাটেনকার চিরজীবনের সংস্থান করে দেবেন বলেছিলেন। বলতে বলতে মিমি আকুল হয়ে কেঁদেছিল। তার সে দুঃখ হয়তো প্রকৃতই ছিল—তবুও তা নির্মল ছিল না, তাতে খাদ ছিল, স্বার্থের গন্ধ ছিল। লিউবোচ্‌কা শোকের চিহ্নস্বরূপ কালো ফিতে বসানো কালো ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে আছে, চোখের জলে মুখ ভাসছে—কি রকম একটা ছেলেমানুষী আতঙ্ক নিয়ে কফিনের দিকে তাকাচ্ছে বারে বারে। কাটেনকা মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে, মুখখানায় বিষাদের ভাব থাকলেও স্বাভাবিক গোলাপী রং চাপা পড়েনি। ভলোদিয়া যেমনটি তেমনটিই আছে। সে একদৃষ্টে কোনো একদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে, একমনে তারপর হঠাৎ তার ঠোঁটদুটি কুঁচকে যেতে লাগল, সে তাড়াতাড়ি ক্রুশচিহ্ন এঁকে মাথা নত করল। বাইরের যে সব লোক ছিল ঘরে তাদের একেবারে অসহ্য লাগছিল আমার। বাবাকে নানা সান্ত্বনার কথা বলছিল তারা। এই যেমন মা-মণি আরেক জগতে গিয়ে বেশ সুখেই আছে, তাঁকে ভগবান এ পৃথিবীর জন্যে সৃষ্টি করেন নি, এমনিতর সব কথা—সব শুনছিলাম আর মনে একটা বিদ্বেষের ভাব ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল !

ওদের কি অধিকার আছে, আমার মা-মণির কথা বলার, তাঁর জন্যে দুঃখ করার ? অনেকে আবার আমাদের মাতৃহীন বলে উল্লেখ করছিল যেন ওঁদের সাহায্য ছাড়া আমরা একটুকুও জানতে পারব না যে যাদের মা মারা যায় তাদের ঐ 'নামে' ডাকা হয় ! আসল কথা, আমাদের এই নামটায় প্রথম ডাকতে পারাতেই ওদের আনন্দ,—এই আনন্দ পেতেই বোধহয় ওরা কোন নববিবাহিত

মেয়েকে পেলে পাল্লা দেয় কে আগে গিয়ে তাকে সর্বপ্রথমে 'ম্যাডাম' বলে ডাকবে।

দূরে হলের এক কোণে ভাড়ার ঘরের দরজার আড়ালে প্রায় লুকিয়ে বসেছিল একজন তার পাকাচুলে ভরা মাথাটি নত করে হাঁটু গেড়ে। এবার হাতদুটি জোড় করে আকাশ পানে তাকিয়ে রইল—সে কাঁদছে না, প্রার্থনা করছে। তার আত্মা ভগবানের কাছে আকুল মিনতি জানাচ্ছে: পৃথিবীতে সবচাইতে যে বেশী প্রিয় ছিল, ভগবান যেন করুণা করে তার সঙ্গেই মিলিত হতে দেন তাকে—তার সরল প্রাণের একান্ত বিশ্বাস সে দিনেরও আর দেরি নেই প্রায় সমাগত।

"ঐ যে, এই সত্যি সত্যিই ভালবাসত আমার মাকে", আমি ভাবলাম, নিজের কথা ভেবে মনে মনে একটু লজ্জাও পেলাম। অনুষ্ঠান শেষ হল: মৃতের মুখের আবরণ খুলে দেওয়া হল, উপস্থিত সবাই—আমরা বাদে, একে একে কফিনের কাছে গিয়ে চুম্বন করতে লাগলেন।

সবচেয়ে শেষে বিদায় নিতে গেল একটি চাষী মেয়ে, সঙ্গে একটি বছর পাঁচেকের ছোট্ট বাচ্চা: ওকে যে কেন এখানে এনেছে ঈশ্বরই জানেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাত থেকে ঘামে ভেজা রুমালটা টুক করে মাটিতে খসে পড়ায়, আমি নীচু হলাম সেটা কুড়োতে। আমিও সবে নীচু হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ন, তীব্র একটা আর্তনাদে ভীষণ চমকে উঠলাম; ভয়ের সেই অমানুষিক চীৎকারটা এখনও কানে বাজে, একশ বছরও যদি বাঁচি, কোনদিন সে স্বর ভুলতে পারব না। আর সে স্বর যখনি মনে পড়ে, হিমের মত ঠাণ্ডা একটা স্রোত শিরশির করে নেমে যায় পিঠ বেয়ে। মাথা তুলে তাকালাম; কফিনের পাশে একটি ছোট টুলে দাঁড়িয়ে সেই চাষী মেয়েটি অতিকষ্টে ধরে রেখেছে ছোট্ট মেয়েটিকে—ছোট্ট মেয়েটি এদিকে বাতাসে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভয়ার্ত মুখে পাগলের মত তাকিয়ে আছে আমার মা-মণির মুখের দিকে আর সমানে করে চলেছে চীৎকারের পর চীৎকার। হঠাৎ আমিও চীৎকার করে উঠলাম বিদীর্ণ স্বরে, বোধহয় ওই মেয়েটির চাইতেও জোরে, তারপরেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সেই মুহূর্তেই আমি সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম কোথা থেকে আসছে ঐ কটু গন্ধটা যেটা ধূপের গন্ধের সঙ্গে মিশে ঘরে ছেয়ে আছে; আর ঐ

যে মুখখানা কদিন আগেও যা ছিল সুন্দর, কোমল, যা ছিল পৃথিবীতে, আমার সবচাইতে প্রিয়—সেই মুখখানাই আজ অন্যের মনে ভয় জাগাতে পারে, এই তিক্ত বাস্তব সত্যটা অনুভব করে মনটা দুঃখে, হতাশায় মুসড়ে পড়ল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বেদনার স্মৃতি

মা-মণি আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু আমাদের জীবন বয়ে চলেছে সেই পুরনো খাতে। ঘুমোতে যাই, জেগে উঠি সেই একই ঘরে, একই সময়ে; সকালে বিকেলে চা, দুপুরের, রাতের খাওয়া সবই চলেছে সেই একই নিয়ম-মাফিক, টেবিল চেয়ারগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেই একই জায়গায়; আমাদের বাড়িতে বা আমাদের জীবনে কোথাও একতিলও পরিবর্তন নেই, কেবল—নেই, আমাদের মা-মণি নেই, কোথাও নেই।

আমার ধারণা ছিল এতবড় শোকের পর নিশ্চয় সব কিছুই বদলে যাবে, আমাদের জীবনের তালই যাবে কেটে—তাই এই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মা-মণির স্মৃতিকেই অপমান বলে মনে হত, আর প্রতিক্ষণেই কাঁটা হয়ে বিঁধত তার অভাবটা।

সমাধির আগের দিন রাত্রে খাবার পরে আমার ঘুম পেয়ে গেল; নাতালিয়া সাভিশ্‌নার ঘরে গেলাম তার নরম পালকের গদিওলা বিছানায় নরম-নরম গরম লেপের তলায় বেশ আরাম করে শোব বলে। যখন ঢুকলাম নাতালিয়া সাভিশ্‌না তার বিছানায় হয়তো ঘুমিয়েছিল: আমার পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে বসল, মাছির তাড়নায় মাথায় বাঁধা পশমের চাদরটা খুলে টুপিটা ঠিক করে নিয়ে বিছানার একপাশে বসল।

মাঝে মাঝেই খাবার পরে এক চটকা ঘুম লাগাতে ওর ঘরে যেতাম তাই আমাকে দেখেই নাতালিয়া বুঝে ফেললে, উদ্দেশ্যখানা কী।

"তা, খোকন—তা, তুমি একটু বিশ্রাম করতে এসেছ, না? শুয়ে পড় তাহলে, কেমন?"

"না, না, নাতালিয়া সাভিশ্‌না", ওর হাতখানা ধরে আমি বলি, "মোটেই তার জন্যে নয়। এই মনে হল একটু আসি, তাই। তুমি নিজে পরিশ্রান্ত, তুমিই বরং শুয়ে পড়।"

"না, মানিক, আমি অনেক ঘুমিয়েছি (আমি জানি তিনদিন ধরে সে

একফোঁটাও ঘুমোয় নি), তাছাড়া, ঘুমের কথা কে আর এখন ভাবতে পারে বল ?" গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে।

আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা নিয়ে নাতালিয়ার সঙ্গে আলোচনা করতেই চাইছিলাম। জানি মা-মণিকে ও কি ভয়ঙ্কর ভালবাসত। ওর সঙ্গে কাঁদতে পারলে আমারও মনটা হাল্কা হবে।

বিছানার ওপর বসে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি, "নাতালিয়া সাভিশ্‌না, তুমি এটা আশা করেছিলে ?" বুড়ী আমার দিকে কেমন একরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—বিস্ময় আর কৌতূহল মেশানো সে দৃষ্টি ; বোধহয় ঠিকমত বুঝতে পারছে না, এই অদ্ভুত প্রশ্নটা কেন করলাম।

"কে আর আশা করে ?" আমি নিজেই আবার বলি।

"ওঃ খোকন," অসীম মমতাভরা সমবেদনার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নাতালিয়া বলে, "আমার এখনও ঠিক বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমি একটা তিনকেলে বুড়ী, কবেই আমার বুড়ো হাড়কখানার গতি হবার কথা, তা না হয়ে আমার পুরনো মনিব প্রিন্স নিকোলাই মিখাইলোভিচ্, তোমার দাদু (ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন), তারপর আমার দুই ভাই, বোন আন্নুসকা, সবাই আমার চেয়ে ছোট—তারা কিনা সবাই কবরে চলে গেছে কবেই, আর আমি কি পাপই করেছিলাম, কপালে আছে তোমার মা চলে যাবার পরেও বেঁচে থাকবার। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তিনি তাঁর স্বর্গে ভাল আত্মা চান, ও যোগ্য ছিল তাই তিনি ওকে নিয়ে গেছেন সেখানে।"

এই সামান্য কথাটুকুই আমার মনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিল, নাতালিয়ার আরও একটু কাছে সরে বসলাম। হাতদুখানা বুকের ওপর ভাঁজ করে সে ওপর দিকে তাকালে ; তার কোটরে বসে যাওয়া জলে ভেজা চোখদুটি দেখলে বোঝা যায়, কি গভীর কষ্টে তার বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু নীরবে তাই সহ্য করছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এ পৃথিবীতে একমাত্র তার ভালবাসার লক্ষ্য ছিল, একমাত্র যাকে ঘিরে তার ভালবাসা প্রাণ পেয়েছিল, ভগবান কখনোই বেশী দিন ওকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না।

এই তো সবে সেদিন আমি ওকে মানুষ করতাম—খাওয়ানো, শোওয়ানো, সাজানো সব, আর ও আমাকে ডাকত 'নাশা'। দৌড়ে আসত আমার কাছে ; ছোট্ট ছোট্ট হাত বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেত আর বলত, "আমার নাশিক, আমার সুন্দর, আমার মিষ্টি।"

দুষ্টুমি করে বলতাম, "না খুকুরানী, তুমি ভালবাস না আমায়। দাঁড়াও না, আগে বড় হও, বিয়ে কর, দেখবে তখন ভুলে যাবে নাশাকে।"

"তাই তো", ভারী চিন্তায় পড়ে যেত সে, বলত, "না, আমি তাহলে বরঞ্চ বিয়েই করব না, যদি নাশাকে আমার সঙ্গে নিয়ে না যেতে পারি। নাশাকে ছেড়ে কখনো যাব না আমি।" আর আজ কিনা সেই আমাকে ফেলে চলে গেল, একটুও তর সইল না আমার জন্যে! কত ভালই না বাসত আমাকে। আর সত্যি কথা, কাকেই বা ও ভাল না বাসত? খোকন, তোমার মা-মণিকে ভুলো না কখনো। সে সাধারণ মানুষ ছিল না। ছিল স্বর্গের দেবদূত। তার আত্মা যখন স্বর্গরাজ্যে পৌছে যাবে, তখন সেখান থেকে তোমাকে ভালবাসবে তোমার কথা মনে করে আনন্দ করবে।"

"আচ্ছা, নাতালিয়া সাভিশনা," আমি জিজ্ঞেস করি "তুমি কেন বললে, 'আত্মা যখন স্বর্গে যাবে?' সে তো চলেই গেছে।"

"না খোকন", আমার কাছ ঘেঁসে বসে চাপা গলায় বলে নাতালিয়া, "ওর আত্মা এখন এখানে আছে", বলে ওপর দিকে তাকিয়ে ইসারা করে। নাতালিয়া কথা বলে ফিসফিস্ করে—এমনি আবেগ আর বিশ্বাসের সুর বাজে সে গলায় যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমারও চোখদুটো ওপর দিকে চলে যায়, কি যেন খোঁজে কার্নিশের খাঁজে খাঁজে। "মুক্তি পাবার আগে আত্মার চল্লিশবার পরিবর্তন হয়, সেই চল্লিশ দিন সে নিজের বাড়িতেই থাকতে পারে।"

এমনি ধরনের আরও কত কথা বলে নাতালিয়া—এমনি সরল বিশ্বাসে, এমনি ভঙ্গিমায় বলে যেন প্রতিদিনকার কোনো ঘটনা, যা সে নিজের চোখে দেখেছে, তারই হুবহু বর্ণনা দিচ্ছে, এর কোনো প্রতিবাদ করা কারুর মাথাতেই আসতে পারে না। আমি নিঃশ্বাস রোধ করে সব শুনলাম, সবটা ভাল বুঝতে পারলাম না, কিন্তু বিশ্বাস করলাম পরিপূর্ণভাবে।

"হ্যাঁ খোকন সোনা, ও এখন এখানেই আছে। আমাদের দেখছে। হয়তো আমরা যা বলছি, সব শুনতেও পাচ্ছে।" নাতালিয়া তার কথা শেষ করল। মাথা নত করে চুপ করে বসে থাকে নাতালিয়া। চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে অবিরল ধারায়। এবার উঠে দাঁড়িয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলল, "এই দুঃখের ভেতর দিয়ে ভগবান আমাকে তার অনেকটা

কাছে টেনে নিয়েছেন। আমার জীবনে বাকী আর কি রইল? কার জন্যে বাঁচব? কাকে ভালবাসব?"

"তুমি কি আমাদের একটুও ভালবাস না?" রাগ করে বলে উঠি অতি কষ্টে চোখের জল চেপে।

"ভগবানই জানেন তোমাদের কত ভালবাসি মানিক আমার! তবুও ওকে যেমনটি ভালবাসতাম ঠিক তেমনটি আর কাউকে বাসিনি, আর বাসতে পারবও না কোনদিন।"

কাঁপতে কাঁপতে তার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়, মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে জোরে জোরে।

ঘুমের কথা আর আমার মনে নেই—মুখোমুখি বসে দুজনে প্রাণ ভরে কাঁদলাম।

ফোকা এসে ঘরে ঢুকল। আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে একবার শুধু তাকিয়ে আমাদের বিরক্ত না করে ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে।

"কি চাও তুমি ফোকা?" চোখের জল মুছে নাতালিয়া জিজ্ঞেস করে।

"কুতিয়ার* জন্যে চাই দেড় পাউণ্ড কিসমিস, চার পাউণ্ড চিনি আর তিন পাউণ্ড চাল।"

"আচ্ছা, এই দিচ্ছি যে, এক মিনিট।" নাতালিয়া সাভিশ্‌না এক চিমটি নস্যি নেয়, তারপর তাড়াতাড়ি যায় তার ভাঁড়ারের আলমারির কাছে। সামনে এখন তার কর্তব্য—তাই একটু আগেই আলাপ-আলোচনায় শোকের যে জোয়ার বাঁধ ভেঙে নেমেছিল এখন আর তার বাষ্পটুকুও নেই। কাজটা খুবই জরুরী তার কাছে।

"চার পাউণ্ড নিয়ে কি হবে? নাতালিযা গজগজ করে দাঁড়িপাল্লায় চিনি ওজন করতে করতে। "তিন পাউণ্ডই যথেষ্ট।" পাল্লা থেকে কয়েক টুকরো চিনি তুলে রাখে, "আরও চাল চাও কি হিসেবে? গত কালই তো আমি আট পাউণ্ড দিয়েছি। রাগ করো না ফোকা দেমিদিচ্, কিন্তু আমি তোমাকে আর চাল দিতে পারি না। ঐ ভান্‌কা বড় খুশী হয়েছে বাড়িতে সব ওলট-পালট হয়ে যাওয়ায়। ভাবছে কেউ কিচ্ছু লক্ষ্য করবে না। কিন্তু না, আমার মনিবের জিনিসে কোন গোলমাল আমি সইব না। আট পাউণ্ড! কে কবে শুনেছে এমন কথা?"

---

* রাশিয়ার মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় শোকার্তরা একটি বিশেষ খাবার খায়।

"কি করা যাবে, ও বলছে সব ফুরিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা বেশ নাও, এই যে, ওকে নিতে দাও।" আমার সঙ্গে যে ভাবাবেগের পালা চলছিল, তা থেকে ছিটকে হঠাৎ একেবারে তুচ্ছ হিসেবের মধ্যে চলে যাওয়া—আমাকে খুবই বিস্মিত করল। পরে যখন এ নিয়ে ভেবেছি তখন বুঝেছি নাতালিয়ার হৃদয়ে অবিশ্রাম যে শোকের ঝড় বইছিল, তাকে দমন করে নিজেকে কর্তব্যে ডুবিয়ে রাখার মত মনের জোর তার ছিল ; এতদিনকার অভ্যেসই তাকে তার দৈনন্দিন কাজে নিয়ে যেত। তার দুঃখ ছিল এত গভীর, এতই অকৃত্রিম যে তাকে প্রকাশের জন্য কাজ করতে না পারার ভানের কোনো দরকার ছিল না। এরকমটা যে কেউ ভাবতে পারে, তাই ওর মাথায় আসবে না।

প্রকৃত শোকের মাঝে দম্ভের কোনো স্থান নেই—কিন্তু তবুও অনেকের চরিত্রেই এটা এমনি ভাবে মিশে একাত্ম হয়ে যায়—যে গভীরতম দুঃখও তাকে সহজে দূর করতে পারে না। এই অহঙ্কার কেবলি আত্মপ্রকাশ করতে চায়, দুঃখ পেলে তারা কেবলি নিজেদের জাহির করতে চায়, লোককে দেখাতে চায়, তারা শোকমগ্ন, তারা অসুখী বা দৃঢ়, কঠিন ; এই ধরনের নীচ মনোবৃত্তিগুলো সম্বন্ধে আমরা সাধারণত সচেতন থাকি না অথচ এগুলো অহরহ আমাদের ঘিরে থাকে, এমন কি গভীর শোকেও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে না—এর ফলে দুঃখ তার সৌন্দর্য হারায়, তার নিহিত সত্য শক্তি আর মর্যাদা নষ্ট হয়। কিন্তু নাতালিয়া সাভিশ্‌নার দুঃখ তার মর্মে গিয়ে পৌঁছেছে। তাই মনে তার কোনো ইচ্ছেরই অস্তিত্ব নেই, সে যে বেঁচে আছে সে শুধুই অভ্যেসের জোরে।

ফোকাকে তার প্রয়োজনমত জিনিসপত্র দিয়ে অনুষ্ঠানের পুরোহিতের জন্য যে মাংসের পুর দেওয়া বিশেষ পিঠে বানাতে হয় সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে নাতালিয়া তাকে বিদায় করল, তারপর মোজা হাতে করে এসে বসল আমার পাশে।

আবার সেই পুরনো আলোচনায় ফিরে গেলাম, আবার কাঁদলাম দুজনে মিলে। এরপর থেকে রোজই নাতালিয়া সাভিশ্‌নার সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা বলি, ওর নীরব কান্না, ওর ভগবদ্‌ভক্তি আমার মনেও সান্ত্বনা আনে।

কিন্তু অবশেষে বিদায়ের পালা এল। গোর দেবার তিনদিন পরেই আমাদের গোটা পরিবারটাই মস্কো চলে গেল—নাতালিয়ার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হল না কোনোদিন।

দিদিমা এ খবর পেলেন আমরা এসে মস্কো পৌঁছুতে। শোকে তিনি ভেঙে পড়লেন। আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল না, গোটা একটা সপ্তাহ তিনি অজ্ঞান হয়ে রইলেন, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তিনি যে শুধু ওষুধ খেলেন না তাই নয়, ঘুমোলেন না, কারুর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বললেন না, পথ্যও কিছু নিলেন না। মাঝে মাঝে যখন ওঁর নিজের ঘরে একলা ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন, হঠাৎ হেসে উঠতেন জোরে, তারপর ফোঁপাতে থাকতেন শুকনো চোখে, অথবা প্রলাপ বকতেন আর অস্পষ্ট জড়ানো গলায় কি সব যেন বলে আর্তনাদ করে করে উঠতেন। জীবনে এই প্রথম তিনি সত্যিকারের দুঃখ পেলেন,—শোকের হতাশার আর সীমা রইল না তাই। তার মন চাইত কাউকে ভীষণ দোষারোপ করতে এ দুর্ভাগ্যের জন্য, তাই অদৃশ্য কাকে যেন লক্ষ্য করে উৎসাহের সঙ্গে ভয়ঙ্কর গালাগালি করেন, লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দ্রুতপায়ে ঘরময় পায়চারী করে বেড়ান, তারপরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন।

একবার ওঁর ঘরে ঢুকেছিলাম। ইজিচেয়ারে যথারীতি বসে আছেন হাবেভাবে দেখতে শান্ত কিন্তু তবুও চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। বড় বড় চোখদুটি সম্পূর্ণ খোলা কিন্তু দৃষ্টিটা ঘোলা অর্থহীন। উনি সোজা আমার দিকে তাকালেন কিন্তু আমাকে দেখলেন না। খুব আস্তে আস্তে ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা গেল তারপর কোমল কণ্ঠে বললেন, "এস এখানে এস, মানিক আমার এখানে এস।" এক মুহূর্তের জন্য ভাবলাম বুঝি আমাকেই বলছেন—কাছে সরেও গেলাম একটু। কিন্তু দিদিমা আমাকে দেখলেন না। একই ভাবে বলতে লাগলেন, সোনা আমার যদি জানতে কত কষ্ট পেয়েছি আমি। এখন কত খুশী হলাম তুমি এসেছ বলে। এবারে আমি বুঝতে পারলাম মা-মণির সঙ্গে কথা বলছেন, থমকে দাঁড়ালাম। ভুরু কুঁচকে দিদিমা বলতে লাগলেন, "ওরা বলে তুমি নাকি নেই। কি মিথ্যেবাদী! তুমি কি আমার আগে কখনো মরতে পার?" তার পরেই পাগলের মত হাহা করে হেসে উঠলেন।

যারা গভীর ভাবে ভালবাসতে জানে গভীর আঘাতও তারাই পায়, আবার এই ভালবাসবার আকাঙ্ক্ষাই তাকে শক্তি দেয় আঘাতকে জয় করতে, দুঃখকে ভুলে যেতে। এইজন্যেই শারীরিক শক্তির তুলনায় মানুষের মনের ক্ষমতা বেশী তাই দুঃখ কখনো মানুষকে মরতে দেয় না।

সপ্তাহখানেক বাদে দিদিমা কাঁদতে পারলেন, তাঁর অবস্থারও উন্নতি হল।

সুস্থ হতে প্রথম চিন্তাই হল আমাদের জন্য, আর আমাদের ওপর স্নেহ তাঁর বেড়ে গেল শতগুণে। আমরা তাঁর ইজিচেয়ার ঘিরেই থাকতাম, দিদিমা চুপিচুপি কাঁদতেন, মা-মণির কথা বলতেন আর আমাদের আদর করতেন।

দিদিমার দিকে তাকালে কারুর মনে করার জো নেই যে তাঁর দুঃখে কোনো খাদ আছে। শোকে মুহ্যমান সে চেহারাটা দেখলেই মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু তবুও, কেন জানি না, আমার বেশী সমবেদনা ছিল নাতালিয়া শাভিশ্‌নার দিকে—আজ পর্যন্তও আমার দৃঢ় ধারণা, যে সেই সরল স্নেহশীলা নারীই সবচাইতে বেশী ভালবেসেছিল আমার মাকে, তার সেই নির্মল, প্রাণভরা ভালবাসার কোনই তুলনা মেলে না। ছেলেবেলার আনন্দভরা দিনগুলো শেষ হয়ে গেল আমার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। তারপর শুরু হল আরেক অধ্যায়—কৈশোর। কিন্তু নাতালিয়া সাভিশ্‌না যার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হল না কিন্তু যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর, আমার মানসিক সংবেদনশীলতার ওপর কল্যাণীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল—তার স্মৃতি আমার শৈশবের সম্পদ, তার আর তার মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে এর যবনিকা টানি।

পরে শুনেছি, আমরা চলে আসার পর নাতালিয়া দেশের বাড়িতেই থেকে গেল কিন্তু কাজের অভাবে সময় আর তার কাটে না। যদিও কাপড়-চোপড়ের বাক্সগুলো সব তখনো তারই ঘরে, সেগুলো সে খোলে, ঝাড়ে, একবার সে পোশাক-আশাকগুলো খুলে টানিয়ে রাখে তো আবার পরমুহূর্তেই বেঁধেছেঁদে তুলে সরিয়ে রাখে—তবুও একা বাড়িতে মন হাঁপিয়ে ওঠে; মনিব বাড়িতে না থাকায় চিরাভ্যস্ত সাড়া শব্দ গোলমাল কিছুই নেই, দম যেন তার বন্ধ হয়ে আসতে চায়। শোকের আঘাত, এতদিনকার জীবন-যাত্রার আমূল পরিবর্তন, কর্তব্যের অভাব—সবে মিলে ওর শরীর ভেঙে পড়ল, বহুদিনকার পুরনো একটা রোগ সময় বুঝে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল। মায়ের মৃত্যুর ঠিক এক বছর পরে নাতালিয়া উদরীরোগে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়ল।

নাতালিয়া সাভিশ্‌নার পক্ষে বেঁচে থাকাটা কষ্টকর ছিল, কিন্তু আমার মনে হয়, পেত্রোভস্কয়ের ঐ নির্মল বাড়িটায় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনবিহীন অবস্থায় মরাটা বোধহয় আরও কষ্টকর ছিল। বাড়িতে যারা ছিল, তারা সবাই নাতালিয়াকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত; কিন্তু নাতালিয়া নিজে কারুর সঙ্গেই

বন্ধুত্ব পাতায় নি, আর তাই নিয়েই তার গর্বও ছিল। সে ভাবত তার ওপর যখন সংসার তত্ত্বাবধানের ভার, তার ঘরে হরেকরকমের কত বাক্স, তাতে বোঝাই মনিবের রকমারি কত সম্পত্তি, বিশ্বাস করে সব ছেড়ে দিয়েছে তাকে—তখন বিশেষ কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেই পক্ষপাতিত্বের দোষ এসে বর্তাবে। এই কারণে আর তাছাড়া ওর সঙ্গে বাড়ির অন্য চাকরবাকরদের কারুর বিন্দুমাত্র মিল নেই, বোধ হয় সে কারণেও সে সবার কাছ থেকে নিজেকে একটু বিচ্ছিন্ন করেই রাখত আর বলত,—"আমার বাপু আত্মীয়স্বজনও নেই, বন্ধুবান্ধবও নেই, কাজেই মনিবের জিনিসপত্রের ব্যাপারে সব্বাই সমান আমার কাছে।"

ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে নাতালিয়া মন প্রাণ হাল্‌কা করে কিন্তু তবুও······তবুও সে নিঃসঙ্গ জীবনে মাঝে মাঝে এমনি দুর্বল মুহূর্তও এসে পড়ে যা প্রতিটি মানুষের জীবনেই আসে, যখন মন চায় জীবন্ত কোনো প্রাণের অশ্রু, তার সমবেদনা—এমনি মুহূর্তে নাতালিয়া তার ছোট্ট কুকুরটাকে বিছানায় তুলে নেয়, কথা বলে আদর করে আর চাপা গলায় কাঁদে (ওটা নাতালিয়ার হাত চাটে আর হলদেটে চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে)। ছোট্ট পুড্‌ল কুকুরটা যখন করুণস্বরে চেঁচায় তখন আল্‌গা হাতে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে নাতালিয়া তাকে ঠাণ্ডা করে আর বলে, "হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে; তুমি না বললেও আমি জানি যে আমার আর বেশী দিন নেই।"

মৃত্যুর এক মাস আগে নাতালিয়া তার বাক্স থেকে বার করল খানিকটা সাদা ক্যালিকো কাপড়, কিছুটা সাদা মস্‌লিন আর গোলাপী রিবন—তার ঝিয়ের সাহায্যে এ দিয়ে তৈরি করল একটি সাদা পোশাক আর টুপি আর তা ছাড়া ঠিক করে রাখে গোর দিতে যা যা দরকার হবে খুঁটিনাটি সব কিছু। মনিবের বাক্সগুলোও নেড়ে চেড়ে দেখে, তার ভেতরকার জিনিসপত্রের একটা নিখুঁত তালিকা তৈরি করে বাবুর্চির হাতে দেয়। নিজের বলতে রাখে শুধু দুটি সিল্কের পোশাক, একটি পুরনো শাল দিদিমা দিয়েছিলেন আর ঠাকুর্দার একটি সামরিক পোশাক যেটা তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। কি চমৎকার যত্ন নাতালিয়ার, পোশাকটির শিল্পকাজ এমনকি ফিতেগুলো পর্যন্ত একদম নতুনের মত রয়েছে!

মরবার আগে সে শেষ ইচ্ছে জানাল। এই পোশাক দুটির মধ্যে যেটি

গোলাপী রঙের সেটি যেন ভলোদিয়াকে দেওয়া হয়, একটি ড্রেসিং গাউন বা জ্যাকেট তৈরি করে নিতে, আর বাদামী রঙের ডোরকাটা আমাকে ঐ একই উদ্দেশ্যে, আর শালটা লিউবোচ্‌কাকে। সামরিক পোশাকটা দেওয়া হবে আমাদের দুজনের মধ্যে যে আগে অফিসার হবে তাকে। বাকী সব জিনিসপত্র আর টাকা পাবে তার ভাই—তা থেকে কেবল চল্লিশটি রুবল সরিয়ে রাখে তার কবরের আর শেষ অনুষ্ঠানের খরচের জন্য। ওর ভাই মুক্তি পেয়েছে অনেক দিন আগেই, দূরের কোনো গ্রামে খুবই অভাবে দিন কাটায় সে; তাই জীবদ্দশায় নাতালিয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কোন সুযোগই ছিল না তার।

মৃত্যুর পরে ওর ভাই যখন এল তার প্রাপ্য সম্পত্তি বুঝে নিতে—তখন দেখা গেল যা আছে তা মোটমাট পঁচিশটি রুবল মাত্র। যে দীর্ঘ ষাট বছর কাটাল ধনী মনিবের বাড়িতে গোটা সংসারটা চালাবার ভার নিয়ে, নিজে যে জীবন কাটাল অতি কৃপনের মতো, একটুকরো জিনিসের অপচয় না করে—তার কিনা সারা জীবনের সঞ্চয় এই! ওর ভাই তো বিশ্বাসই করতে চায় না! কিন্তু ঘটনা আসলে তাই!

নাতালিয়া সাভিশ্‌না মাস দুয়েক রোগের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল আর সে কষ্ট সে ভোগ করেছিল খাঁটি খৃষ্টানের মত, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। কাউকে কোনো অভিযোগ জানায়নি খালি অনবরত প্রার্থনা করেছে। সব শেষ হয়ে যাবার এক ঘণ্টা আগে সে পাপস্খালন করল আর পরম শান্তিতে শেষের অনুষ্ঠানগুলো পালন করল।

বাড়ির ঝি চাকর প্রত্যেকের কাছে সে ক্ষমা ভিক্ষা করে যদি কোনোদিন কোনোকারণে কারুর মনে ব্যথা দিয়ে থাকে সে জন্যে ওর গুরু 'ফাদার ভ্যাসিলি'কে অনুরোধ জানায়, আমাদের যেন উনি জানান আমরা ওর জন্যে যা করেছি তার জন্যে নাতালিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে আমাদের সবাইকে। আর ওর বোকামি দিয়ে যদি ও কোনোদিন আমাদের কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকে তবে তার জন্যে যেন আমরা ক্ষমা করি ওকে। "কিন্তু আমি চোর ছিলাম না, মনিবের একটি সুতোও কোনোদিন নিই নি।" চরিত্রের এই একটিমাত্র গুণেরই বোধহয় কদর ছিল ওর নিজের কাছে।

নিজের তৈরি সাদা পোশাক আর টুপিটি পরে বালিসে ঠেসান দিয়ে ফাদারের সঙ্গে কথা বলে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত। মনে পড়ল গরীবদের তো

কিছু দান করা হল না—তখন দশটি কম্বল নিয়ে ফাদারকে দিল গরীবদের দিতে। এবারে সে ক্রুশচিহ্ন এঁকে শুয়ে পড়ে, শেষবারের মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল স্বরে ভগবানের নাম নেয়।

এ জীবন ছেড়ে সে চলে গেল, মনে কোনো ক্ষোভ, কোনো অনুতাপ না রেখে। মরণে তার কোনো ভয় ছিল না, একে সে জানত ভগবানেরই পরম আশীর্বাদ বলে। এ কথাটা কত সময়েই তো বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য হয় কজনের জীবনে? নাতালিয়া সাভিশ্‌নার মৃত্যুতে ভয় কি? তার আছে ঈশ্বরে অটল ভক্তি, সে জীবন কাটিয়েছে শাস্ত্রের লেখা ন্যায়নীতির পথ ধরে। তার জীবন ছিল নির্মল, হৃদয়ে ছিল প্রাণভরা নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর ছিল আত্মত্যাগের প্রেরণা।

এর জীবন উচ্চস্তরের নয়, জীবনের লক্ষ্যও কিছু মহান নয়, কিন্তু তাতে কি? তাতে কি এই সরল নির্মল চরিত্রের ভালবাসা বা প্রশংসা পাবার যোগ্যতা কিছুমাত্র কমে যায়?

এ জগতের সবচাইতে প্রশংসনীয় কাজ সে করেছে—ভয় বা অনুতাপ না করে এ জীবন ছেড়ে চলে গেছে।

ওর নিজেরই অন্তিম ইচ্ছে অনুযায়ী ওকে কবর দেওয়া হয় মা-মণির স্মৃতি-স্তম্ভের খুব কাছে। ছোট্ট মাটির স্তূপটি যার ওপরটা ছেয়ে আছে বিছুটি আর কাঁটাগাছে আর নীচে শান্তিতে শুয়ে আছে নাতালিয়া—কালো রঙের রেলিং দিয়ে ঘেরা সে জায়গাটি। আমি সব সময় মায়ের সমাধি থেকে বেরিয়ে ঐ রেলিংয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াই আর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

কখনও কখনও সেই বেদী আর কালো রেলিংটার মাঝখানে আমি চুপচাপ বসে থাকি। কত কী বেদনাদায়ক স্মৃতি আমার মনে আসে। আমি ভাবতে থাকি: বিধাতা আমাকে এদের সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে রেখেছেন সে কি শুধু চিরদিন চোখের জল ফেলবার জন্যেই?

কৈশোর

প্রথম অধ্যায়

একই গাড়িতে

আবার দুটি গাড়ি এসে দাঁড়াল পেত্রোভস্কয়ের বাড়ির গাড়িবারান্দায়। একটি চার-চাকার বন্ধ গাড়ি—তাতে বসে মিমি, কাটেন্‌কা, লিউবোচ্‌কা আর ঝি, সঙ্গে আমাদের কেরানি ইয়াকভ কোচোয়ানের বাক্সে বসে। অপরটা ব্রিচ্‌কা, তাতে যাব আমি আর ভলোদিয়া ফুটম্যান ভ্যাসিলিকে নিয়ে।

বাবা মস্কো যাবেন দিন কয়েক পরে—তিনি খালি মাথায় গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়িদুটোর জানালায় ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিচ্ছেন।

"প্রভু যীশু তোমাদের রক্ষা করুন! যাও রওনা হও।" ইয়াকভ আর কোচোয়ানেরা (আমরা নিজেদের গাড়িতেই যাচ্ছিলাম) মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলে ক্রুশচিহ্ন আঁকে, "প্রভু আমাদের রক্ষা করুন! গি-আপ্‌ গি-আপ্‌।"

গাড়ি আর ব্রিচ্‌কা হেলেদুলে চলতে থাকে অমসৃণ পথ ধরে আর বার্চের সারি ছুটে ছুটে একে একে পিছনে সরে যায় গাড়ির পাশ দিয়ে। আমার মনে একটুও দুঃখ নেই ; পিছনে যা ফেলে যাচ্ছি মনে তার কোনো ছায়া নেই—ভাবছি সামনে যা অপেক্ষা করছে তারই কথা। যে জিনিসগুলো এতক্ষণ আমার মনে বহু বেদনাদায়ক স্মৃতি বহন করে আনছিল, সেগুলো দূরে সরে যেতেই স্মৃতির ভার ক্রমশ হাল্‌কা হয়ে এল। আর সে জায়গায় এক অপরূপ চেতনা ক্রমেই মনের মধ্যে জুড়ে বসতে লাগল। জীবন আমার কাছে বলিষ্ঠতায়, তারুণ্যে আর আশায় ভরপুর হয়ে দেখা দিল।

এই পথ-চলার চারটে দিন যে কি আনন্দ বলব না, কারণ আনন্দ করায় তখনও আমার বিবেকের বাধা ছিল—কিন্তু যে আরাম আর স্বস্তিতে কাটিয়েছিলাম, জীবনে ঠিক তেমনটি খুব কমই পেয়েছি।

আমার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে মায়ের ঘরের সেই বন্ধ দরজাটা, যেটা পার হতে গেলেই গা একবার কেঁপে উঠত, আর সেই পিয়ানোটা যেটা খোলা দূরে থাকুক, কেউ একটিবার নির্ভয়ে তাকিয়েও দেখতে পারত না ;

শোকের পোশাকও নেই (আমরা সাদাসিধে ভ্রমণের পোশাকে ছিলাম) আর নেই সেই সব অসংখ্য জিনিস যা আমাকে প্রতিমুহূর্তে খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দিত আমার অপূরণীয় ক্ষতির কথা। সে কথা মনে পড়লেই মনটা কুঁকড়ে সরে আসত হাসি আর আনন্দ থেকে ; জীবনের পরিচয় আছে এমন সবকিছু থেকে দূরে, পাছে কোনরকমে আমার মায়ের স্মৃতিকে অপমান করা হয় সেই ভয়ে। আর এখানে আমার চারিদিকেই চোখে পড়ছে খালি ছবির মত সুন্দর সাজানো দৃশ্য আর জিনিস,—ক্লিষ্ট ভারাক্রান্ত মনটা আকৃষ্ট হচ্ছে, তাতে বসন্তের হাওয়া অনেকদিন পরে মনে একটা আনন্দের পরশ বুলিয়ে দিল, মনে সঞ্চার করে দিল বর্তমানের জন্যে পরিতৃপ্তি আর ভবিষ্যতের জন্যে আশা।

ভোরে, খুব ভোরে, নিষ্ঠুর ভ্যাসিলিটা আমাদের কম্বল ধরে টানাটানি করে জানিয়ে দেয় যাত্রার জন্য সবকিছু তৈরি আর দেরি করা চলে না। লোকটা আবার অতি উৎসাহী, নতুন চাকরিতে বহাল হয়েছে কিনা!

যতই না কেন রাগ কর, কম্বল টানাটানি করে ভোর বেলাকার তন্দ্রার মধুর আবেশটুকু আর একটুক্ষণ ধরে রাখতে চাও—ভ্যাসিলি একেবারে নাছোড়বান্দা, প্রতিজ্ঞা করেছে তোমাকে আর কিছুতেই শুতে দেবে না, দরকার হলে অন্তত-পক্ষে কুড়িবার কম্বলটা টেনে নেবে গা থেকে। কাজেই লাফিয়ে উঠে দৌড়ে মুখ ধুতে চলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

পাশের ছোট্ট ঘরটায় সামোভার ফুটছে, আর মিট্কা—ও আমাদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলে ঘোড়ায় চেপে—সে প্রাণপণে হাওয়া দিচ্ছে, দিতে দিতে আগুনের তাতে তার মুখখানার রং হয়েছে ঠিক যেন একটা মস্ত গলদা চিংড়ি। বাইরে স্যাঁতসেঁতে কুয়াশা ছাওয়া—যেন একটা মস্ত নোংরার স্তূপে আগুন দিয়েছে আর তা থেকে ধোঁয়া উঠছে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ; ভোরের সূর্য সোনালী আলোয় রাঙিয়ে দিচ্ছে পুব দিগন্ত আর আঙিনার চারিদিকে শিশিরে ভেজা খড়ের চালাগুলো চিকচিক করছে সে আলোয়। নীচে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ঘোড়াগুলো, খাবারের গামলার সঙ্গে বাঁধা, হ্রেষা-ধ্বনি করছে।

জমির সারের শুকনো একটা স্তূপের ওপর কালো লোমওয়ালা একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, এবার উঠে আস্তে আস্তে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে ধীরে ধীরে আঙিনার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় লেজ নেড়ে নেড়ে। সবে ঘুম-ভাঙা ঝি ক্যাচক্যাচ শব্দ করে দরজা খুলে চোখ মুছতে মুছতে গরুগুলোকে ধরে ধরে রাস্তায় বার করে দেয়—সেখানে ইতিমধ্যেই গরু-ভেড়ার পাল এসে

জুটে গেছে, চারদিকে ব্যা ব্যা আর হাম্বা হাম্বা; হয়তো দুচারটে কথা বলল চোখে ঘুম-ঘুম ভাব লেগে-থাকা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে। ফিলিপ শার্টের হাতাদুটো গুটিয়ে গভীর একটা কুয়ো থেকে ঝপঝপ শব্দ করে বালতি বালতি জল তুলছে, সূর্যের আলো-লাগা চিকচিকে সে জল ঢেলে দিচ্ছে ওক কাঠের একটা পাত্রে—আর চারপাশে ভিড় করে হাঁসেরা টুপ্‌টাপ্ করে সেই ছোট্ট পুকুরে নেমে সবাই সকালের স্নান সেরে নিচ্ছে। আমি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ফিলিপের দিকে—কি সুন্দর মুখ, ঘন চাপ দাড়ি, সুগঠিত পেশীবহুল হাতদুটি, কাজ করার সময় শক্তি যেন ফুটে ফুটে বেরোয়।

ঘরের আর এক দিকে দেওয়ালের আড়াল থেকে চলাফেরার আভাস পাওয়া যাচ্ছে,—ওদিকটায় শোয় মিমি আর মেয়েরা, কাল সন্ধ্যেতে ওই দেয়ালের ওপর দিকে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। ওদের ঝি মাশা বার বার যাতায়াত করে নানা জিনিসপত্র নিয়ে—জিনিসগুলো আবার ফ্রকের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, আমরা যেন দেখতে না পাই। শেষ পর্যন্ত সে দরজা খুলে দিয়ে চা খেতে ডাকে আমাদের।

ভ্যাসিলি অতি উৎসাহের চোটে খালি দৌড়দৌড়ি করছে ঘরে আর বাইরে; ঘরে এসে আমাদের দিকে আড়চোখে তাকায় আর একেকটা করে লটবহর বয়ে নিয়ে যায় বাইরে আর খালি তাগাদা দেয় মারিয়া আইভানোভনাকে ঝটপট বেরিয়ে পড়তে। ঘোড়াগুলো জোতা হয়েছে, অসহিষ্ণু হয়ে বারে বারে মাথা দুলিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিচ্ছে: বাক্স-প্যাঁট্‌রা, কাস্কেট, পোশাকের সুটকেশ ইত্যাদি সব ঠেসেঠুসে রেখে আমরা আবার যে যার জায়গায় বসলাম। প্রতিদিনই ব্রিচ্‌কাতে উঠে আকাশ-প্রমাণ লটবহর দেখে ভাবি, এগুলোকে গুঁজে বসবার জায়গাই বা কোথায় আর আগের দিন এগুলোকে ঠাসাই বা হয়েছিল কি করে? বিশেষ করে একটা আখরোট কাঠের তৈরি চায়ের বাক্স, সেটা আবার রেখেছে আমার ঠিক নীচে, আমি তো ভীষণ রেগে গেলাম। ভ্যাসিলি বলল ওটা নাকি ঠিক বসে যাবে—কি আর করি, বাধ্য হয়েই মানতে হল।

ঘন সাদা মেঘে পুব-আকাশ ঢেকে আছে, সূর্য সবে তাকে ছাড়িয়ে একটু ওপরে উঠল—আশেপাশের গ্রামগুলো সে আলো গায়ে মেখে খুশিতে ঝলমল করে উঠছে। আমার চারপাশে সবকিছু এত সুন্দর, আমার মনটাও ঝরঝরে হালকা! পথটা সামনের দিকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে, চওড়া খোলামেলা পথ—মাঠের ওপর শিশিরে ভেজা চিকচিকে ঘাস আর ফসল-কাটা মরা শুকনো

গাছের ভেতর দিয়ে দিয়ে। এখানে-ওখানে পথের ধারে এক-আধটা উইলো গাছ; অথবা সবুজ কচি পাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি বার্চ গাছ নিশ্চল ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপরের নীচু নীচু ঘাস আর গাড়ির চাকার দাগে। গাড়ির একঘেয়ে চাকার আর ঘণ্টার শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে লার্ক পাখির মিষ্টি গান; উড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে পথের আশেপাশে। পোকায় কাটা কাপড়ের গন্ধ, ধুলো আর গাড়ির ভেতরের কটু গন্ধ—সব চাপা পড়ে গেছে চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া ভোরের একটা মিষ্টি গন্ধে। আমার প্রাণে কেমন একটা অস্বস্তিভরা আনন্দ—কি যেন করতে চায় মনটা!

পথে রাত কাটাবার জায়গায় সেদিন আমি প্রার্থনা করে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি যেদিনই এই ভুলটা করেছি সেদিনই কোন না কোন বিপদ ঘটেছে আমার—তাই তাড়াতাড়ি সে ত্রুটি শোধরাতে লেগে গেলাম। টুপিটা খুলে ব্রিচকার এক কোণে মুখ ঘুরিয়ে প্রার্থনা করলাম, জামার তলায় হাত ঢুকিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ক্রুশ আঁকলাম। তবুও পথে যেতে যেতে হাজারটা জিনিস আমার চোখে পড়ে, আমার মনোযোগ কেড়ে নেয়, আর আমিও অন্যমনস্কভাবে প্রার্থনার একই কথা বারবার আওড়াতে থাকি।

রাস্তার দুধারে চোখে পড়ে পায়ে-চলা পথে দুচারটি লোক ধীর পায়ে চলেছে—এরা তীর্থযাত্রী। মাথায় নিজের রুমাল বাঁধা, পিঠে ঝোলান বার্চগাছের ছালের ছোট্ট একটি করে ঝুলি, পায়ে পরা মোটা গাছের ছালের জুতো আর ওপরদিকে জড়ানো নোংরা, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো। আমাদের দিকে প্রায় না তাকিয়েই ওরা নিজের মনে চলতে থাকে একজনের পর একজন। ভেবে অবাক হই, ওরা কোথায় যাচ্ছে আর কেনই বা? ওদের কি অনেক দিন ধরে পথ চলতে হবে? ওদের দেহের ছায়ার সঙ্গে কি উইলো গাছের ছায়া মিশে যাবে? ওদিক থেকে চার ঘোড়ায় জোতা একটা ক্যালাস দ্রুতগতিতে আসছে; দুটি সেকেণ্ড মাত্র—তারপরেই জানালার বাইরে বার-করা কৌতূহলী হাসিমুখগুলো বিদ্যুতের মত ছিটকে বেরিয়ে গেল আমাদের গাড়ির মাত্র এক হাত দূর দিয়ে। বিশ্বাসই হয় না যে এই মুখগুলো সম্পূর্ণ অপরিচিত, জীবনে হয়তো আর দেখাই হবে না কোনদিন।

এবার আসছে রাস্তার ধার ঘেঁসে টকাটক্ টকাটক্ শব্দ করে একজোড়া ঘোড়া, গলায় দড়ি বাঁধা, ঘাম ঝরছে সর্বাঙ্গে—পিছনে ঘোড়ায় চড়ে আসছে একটি ছেলে ডাক-হরকরা। একঘেয়ে একটা করুণ সুরে ধিকিয়ে ধিকিয়ে

গাইছে ছেলেটা, ওর ভেড়ার লোমের টুপিটা একপাশে হেলে পড়েছে, মস্ত বুট পায়ে, পা দুটো লম্বা হয়ে ঝুলছে দুপাশে, মাঝে মাঝে ঘণ্টাটা বাজছে টুংটাং করে। ওর সমস্ত ভঙ্গীটাতেই এমনি একটা কুঁড়েমি, একটা নিশ্চিন্ত আর তৃপ্তির ভাব যে আমার মনে হল ওর মত ডাক-বওয়া ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া আর করুণ সুরে গান করা—এর চাইতে বেশী সুখ বোধহয় জীবনে আর নেই। ঐ দূরে পাহাড়ের গায়ে ঝকঝকে নীল আকাশের পটভূমিকায় কোনো গ্রামের একটি গীর্জার গম্বুজ, এধারে একটি ছোট গ্রাম, কোন ভদ্রলোকের বাড়ির লাল রঙের ছাদ আর সবুজ বাগান। আচ্ছা কে থাকে ঐ বাড়িটায়? আমাদের মত সব ছেলেপুলে আছে? বাবা মা আর মাস্টারমশাই? আমরা কেন গাড়িতে চড়ে ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি না? এই যে, এদিক দিয়ে আবার আসছে এক সারি মাল-বইবার গাড়ি—বেশ নধর চেহারা, মোটা মোটা পা-ওয়ালা ঘোড়াজোতা ট্রয়কার সঙ্গে জোড়া দেওয়া। বাধ্য হয়ে আমাদের সরে যেতে হল ওদের পথ ছেড়ে দিয়ে। "কি নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?" ভ্যাসিলি প্রথম গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল।

লোকটা ঠ্যাংদুটো দোলাতে দোলাতে অর্থহীন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল আমাদের দিকে তারপর চাবুকটা নেড়ে কি যেন একটা জবাব দিল—কিন্তু গাড়িটা ততক্ষণে অনেক দূরে, শুনতে পাওয়া গেল না।

"তোমাদের মালটা কি?" ভ্যাসিলি আরেক সারির দিকে ফেরে। সামনের দিকে রেলিং-ঘেরা খোপের ভেতর খড়ের গদির তলায় আরেকজন গাড়োয়ান। প্রশ্ন শুনে গদির তলা থেকে ক্ষণেকের জন্য একটি সোনালী মাথা উঁকি মারল, তার মুখখানা লাল, লালচে দাড়ি—আমাদের দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মাথাটি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার একবার মনে হল এই গাড়োয়ানগুলো নিশ্চয়ই জানে না আমরা কে আর যাচ্ছিই বা কোথায়!

এইসব নানা জিনিস নিয়ে এমনি মেতেছিলাম যে ঘণ্টা দেড়েক পার হয়ে গেছে, পথের মাপ লেখা পাথরটার ওপর বাঁকা অক্ষরে কি লেখা আছে তা খেয়ালই করি নি। কিন্তু এখন রোদে আমার মাথা আর পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, রাস্তাতেও ধুলো উড়ছে বেশী, চায়ের বাক্সটাতে অসুবিধা হচ্ছে ভীষণ, কয়েকবার নড়ে-চড়ে জায়গাও বদল করে নিলাম। এতক্ষণে বিচ্ছিরি লাগতে আরম্ভ করেছে—গরম, অস্বস্তি আর একঘেয়ে। আবার কতক্ষণ পরে থামবার জায়গা আসবে, নানা অঙ্ক কষে তার হিসেব করি।

"বার ভার্সটি, ছত্রিশের তিনভাগের এক ভাগ। পিপেত্ত পৌঁছতে একচল্লিশ।" আমরা তাহলে এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি পথ এসেছি।...

ভ্যাসিলি গাড়োয়ানের জায়গায় বসে ঢুলছে দেখে আমি ডেকে বলি, "ভ্যাসিলি, আমাকে একটু তোমাদের বাক্সে বসতে দেবে, খুব মজা হবে তাহলে ?" ও রাজী হয়, আমরা জায়গা বদল করে নিই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাসিলির নাক ডাকতে শুরু করে আর এমনি বিচ্ছিরিভাবে হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে যে ব্রিচকাতে আর জায়গা থাকে না। নতুন আসনে বসে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে ; সামনেই চমৎকার দৃশ্য—আমাদের চারটে ঘোড়া, নেরুশিনস্কায়া, ডিকন, লিয়েভায়া, আর আশোথেকারী—ওদের খুঁটিনাটি সব আমি জানি।

"আচ্ছা, ফিলিপ ডিকনকে বাঁদিকে দিয়েছ কেন, ডানদিকে না দিয়ে ?" আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি।

"ডিকন ?"

"আর নেরুশিনস্কায়াও আজ দৌড়চ্ছে না মোটে।"

"ডিকনকে তুমি কক্ষনো ডানদিকে জুততে পার না"—ফিলিপ বলল আমার শেষ কথাটায় কান না দিয়ে। "ওদিকে দরকার, এই মানে যাকে বলে, একটা সত্যিকারের ঘোড়া আর ডিকন সেরকমটি মোটেই নয়।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ফিলিপ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প্রাণপণ শক্তিতে রাশ টেনে ধরে বেচারা ডিকনের লেজে আর গায়ে জোর চাবুক মারতে থাকে। যদিও ডিকন তার শরীরের সমস্ত পেশীগুলো এমনি টানটান করেছে যে ব্রিচকাটা এপাশে একটু হেলে পড়েছে, তবুও ফিলিপ সমানে চাবকাতে থাকে যতক্ষণ না তার নিজেরই একটু বিশ্রামের আর টুপিটাকে মাথার ওপর চেপে বসিয়ে নেবার দরকার হয়। আমি এই সুযোগটা হারালাম না, ফিলিপকে অনুরোধ করলাম আমাকে একটু চালাতে দিতে। ফিলিপ প্রথমে আমাকে একটা রাশ দিল, তারপর আরেকটা, এরপর একে একে ছটাই আর চাবুকটাও। আমি তো মহাখুশী —যথাসাধ্য চেষ্টা করি ফিলিপকে অনুকরণ করতে তারপর জিজ্ঞেস করি ঠিকমত হচ্ছে কিনা। ফিলিপ কিন্তু সন্তুষ্ট নয় ; বলে এটা খুব জোরে চলছে ; ওটা মোটেই টানছে না, তারপর ঝুঁকে পড়ে রাশগুলো নিয়ে নেয় আমার হাত থেকে। রোদের তেজ ক্রমশ বাড়ছে। সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলো আকাশে ওপরে আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে, সাবানের বুদ্বুদের মত রঙেও ঘন ধূসরতার ছোঁয়াচ লাগছে। গাড়ির জানালা দিয়ে একটা হাত ঢোকে—সে হাতে

ধরা একটা বোতল আর একটা ছোট প্যাকেট। চলন্ত গাড়িতেই কায়দা করে কোচোয়ানের বাক্স থেকে নেমে ভ্যাসিলি আমাদের মদ আর কেক দিয়ে যায়।

খাড়া উতরাইতে নামবার সময় আমরা সবাই নেমে পড়ি, আর ভ্যাসিলি ইয়াকভ দুজনে গাড়িটাকে দুপাশ থেকে চেপে ধরে আস্তে আস্তে চালাতে থাকে—আহা! গাড়িটা যদি হঠাৎ উল্টেই যায়, ওরা যেন তাকে আটকাতে পারবে! তারপর মিমির অনুমতি নিয়ে আমি কিংবা ভলোদিয়া ওদের গাড়িতে বসি—আর ওদের মধ্যে কেউ লিউবোচ্‌কা বা কাটেনকা আমাদের ব্রিচ্‌কাতে এসে বসে। এই জায়গা বদলে মেয়েরা খুব খুশী; কারণ ওদের ধারণা ব্রিচ্‌কা চড়ে যেতে অনেক বেশী মজা—ওদের ধারণাটা অবশ্য ঠিকই! কোন সময় হয়তো রোদে পুড়িয়ে মারছে আর আমরা যাচ্ছি একটা বনের ভেতর দিয়ে—আমাদের ব্রিচ্‌কাটা একটু পিছিয়ে পড়ে ওদের গাড়ির চাইতে আর আমরা সবুজ ডালপালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ব্রিচ্‌কার চারপাশে ঝুলিয়ে দিয়ে ছায়া বানিয়ে নিই। এবারে এই চলন্ত ছায়া ঘরটা যখন মেয়েদের গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়—লিউবোচ্‌কা দেখতে পেয়েই মিহি গলায় খুব জোরে শিস দিয়ে ওঠে। খুশী হলেই ও অমনি শিস দেয় ওটা ওর অভ্যেস।

যাক্ বাঁচা গেল, গ্রাম এসে গেছে—এবারে খাওয়াদাওয়া, বিশ্রামের পালা। গ্রামটার গন্ধ নাকে আসে—ধোঁয়া, আলকাতরা আর রুটি সেঁকার গন্ধ। শুনতে পেয়েছি গলার স্বর, চলাফেরা আর গাড়ির চাকার শব্দ। মাঠের মত অত জোরে আর ঘোড়ার গলার ঘণ্টাগুলো বাজছে না—আর আমাদের দুপাশ দিয়ে আস্তে আস্তে পার হয়ে যাচ্ছে খড়ে ছাওয়া কুটির, গোল করা কাঠের গাড়িবারান্দা, ছোট ছোট লাল সবুজ জানালা, ভেতর থেকে হয়তো উঁকি মারছে একটি কৌতূহলী মুখ। ছোট্ট ছোট্ট চাষী ছেলে-মেয়েরা শুধু একটা লম্বা জামা গায়ে, বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে হাতদুটো ছড়িয়ে এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে; আবার কেউবা খালি পায়ে ধুলোর ভেতর ছুটোছুটি করে গাড়ির পেছনে-রাখা ট্রাঙ্কের ওপর উঠে বসতে চেষ্টা করছে—ফিলিপের যথেষ্ট তাড়না সত্ত্বেও। চারিদিক থেকে সরাইখানার মালিকেরা ছুটে আসে তারপর নানা প্রলোভন দেখিয়ে চেষ্টা করে একে অন্যের কাছ থেকে ভাঙিয়ে খদ্দের নিতে। ওঃহো, ক্যাচ্ করে শব্দ হয়ে ফটকটা খুলে যায়—আর আমরাও আঙিনায় ঢুকে পড়ি। বাব্বাঃ, এবারে চার ঘণ্টার মত বিশ্রাম আর মুক্তি!

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঝড়

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে, তার বাঁকা রশ্মিতে পুড়ে যাচ্ছে আমার পিঠ আর গলা। ব্রিচ্‌কার জ্বলন্ত ধারগুলোকে ছোঁবার যো নেই। রাস্তা থেকে ধুলোর ঝড় উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটু হাওয়া নেই যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের ঠিক সামনে যত সমান দূরে দূরে একই তালে দুলতে দুলতে চলেছে বন্ধ গাড়িটার ধুলোয় ধুলোময় লম্বা দেহটা। গাড়ির মাথা ছাড়িয়ে হঠাৎ এক একবার বিদ্যুতের মত লক্‌লক করে উঠছে গাড়োয়ানের হাতের চাবুকটা, আর দেখা যাচ্ছে তার আর ইয়াকভের টুপি দুটো। আমি নিজেকে নিয়ে কি করি ভেবে পাচ্ছি না; ধুলোয় কালো ভলোদিয়া আমার পাশে ঝিমুচ্ছে, ফিলিপের পিঠটা উঠছে নামছে, বাঁকানো ছায়া ফেলে আমাদের ব্রিচ্‌কা ছুটে চলেছে—এসব কিছু দেখেই আমার একঘেয়েমি আর কাটতে চাইছে না। আমার মনটা পড়ে রয়েছে ঐ পথের হিসেব লেখা পাথরটায়, ঐ যে দূরে দেখতে পাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে-পড়া মেঘের রাশি আস্তে আস্তে এক জায়গায় জড় হয়ে কালো ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। দূরে দূরে হঠাৎ এক একবার মেঘের গুরু গুরু ডাকও শোনা যাচ্ছে। এই শেষের কারণেই বোধহয় বেশী মনটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সরাইখানায় পৌঁছতে। বাজের ডাক কানে এলে কেমন একটা বিপদ আর ভয়ের ভাব শক্ত করে চেপে ধরে আমার মনটাকে।

সব চাইতে কাছের গ্রামটা তখনও দশ ভার্স্ট দূরে—কিন্তু ঘন ধোঁয়াটে রঙের মেঘগুলো, কোথা থেকে আসছে জানি না, একফোঁটা হাওয়া নেই কোথাও—ক্রমেই তাড়া করে আসছে আমাদের। সূর্য এখনও চাপা পড়েনি তাই তার আলোয় মেঘের একপাশটা জ্বলজ্বল করছে আর লম্বা লম্বা রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিগন্ত জুড়ে। দূরে মাঝে মাঝে বিদ্যুত চমকাচ্ছে আর মেঘের গুরুগুরু শব্দ আস্তে আস্তে জোরদার হয়ে গম্ভীর গুমগুম শব্দ হয়ে

দিগ্‌বিদিক্‌ কাঁপাতে থাকে। ভ্যাসিলি কোচোয়ানের বাক্সে উঠে ব্রিচ্‌কার ওপরের ঢাকাটা তুলে দেয়। গাড়োয়ানেরা তাদের লম্বা কোট পরে নেয় আর প্রত্যেকবার বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টুপি খুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকে। ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে জোরে জোরে নাক টানে যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রাণভরে টেনে নিচ্ছে ঝোড়ো মেঘের সঙ্গে বয়ে আসা পরিষ্কার বাতাস; আর ধুলো-ওড়া পথ বেয়ে সজোরে ছুটে চলে ব্রিচ্‌কা। আমার মনে কেমন একটা অজানা আতঙ্ক; বুঝতে পারলাম শিরাগুলো দপদপ্‌ করছে। এবারে মেঘ ছুটে এসে সূর্যকে ঢেকে দিল—সূর্য মেঘের ফাঁক দিয়ে শেষবারের মত উঁকি মেরে দিগন্তের দিকে আলো ছুঁড়ে মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আশে-পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য একদম বদলে গেল, চারিদিকেই কেমন একটা থমথমে ভাব। গাছের বনে কাঁপন লেগেছে; পাতাগুলোয় ধূসর রঙের আভাস, ধোঁয়াটে আকাশের পটভূমিতে ছড়ানো ডালপালাগুলোয় মর্মর জেগেছে। লম্বা বার্চ গাছের মাথাগুলো দুলছে এদিক-ওদিক, শুকনো ঘাসপাতার ঘূর্ণি উড়ছে রাস্তার ওপরে। দ্রুতগতি বুকের কাছটাতে সাদা ছিট্‌ওয়ালা সোয়ালো পাখির ঝাঁক আমাদের ব্রিচ্‌কাটার চারপাশে চক্রাকারে উড়তে থাকে, চলন্ত ঘোড়াগুলোর বুকের নীচে গিয়ে ডানা ঝাপটায় যেন ওদের থামিয়ে দিতে চায়—আবার বেরিয়ে এসে একপাশে কাত হয়ে ডানা মেলে দেয় বাতাসের সঙ্গে। ব্রিচ্‌কার মাথার চামড়ার ঢাকাটা পতপত করে উড়ছে আর তার ভিতর দিয়ে বৃষ্টি-ভেজা ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে গাড়ির গায়ে আছড়ে পড়ছে। বিদ্যুত ঝলসে উঠল, যেন আমাদের গাড়িরই মধ্যে—মুহূর্তের জন্য চমক মেরে উঠল ধূসর রঙের গাড়ির ঢাকনাটা আর গাড়ির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসা ভলোদিয়া। সেই মুহূর্তেই ঠিক আমাদের মাথার ওপর গম্ভীর গুমগুম আওয়াজ উঠল, সে ডাক যেন পাক খেয়ে খেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যতই ছড়াচ্ছে তার শক্তিও ততই বাড়ছে—শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা গর্জন যেন আমাদের মাথার ওপরেই ভেঙে পড়ল! আমরা সারা শরীরে কেঁপে উঠলাম, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ভগবানের ক্রোধ! সাধারণ চলতি এই বিশ্বাসটায় কাব্য কতটা?

গাড়ির চাকাগুলো ঘুরছে, জোরে, আরও জোরে। ভ্যাসিলি আর ফিলিপের পিঠ দেখতে পাচ্ছি, ওরা প্রাণপণে রাশ টানছে—স্পষ্টই ওরা ভয় পেয়েছে! ব্রিচকা বিদ্যুতের মত পাহাড় থেকে নেমে, হুড়মুড় করে কাঠের

সেতু পার হচ্ছে। আমি আতঙ্কে একেবারে শক্ত হয়ে গেছি, ধ্বংস অনিবার্য, যে কোন মুহূর্তেই তা নেমে আসবে!

এই আঃ, গেল গেল, ছিঁড়ে গেল……যে চামড়ার পটি দিয়ে ঘোড়া গাড়িতে জোতা থাকে, সে পটিটা ছিঁড়ে গেল! মাথার ওপর কানে তালা লাগানো বাজের হুঙ্কার, আর আমরা বাধ্য হয়ে চুপচাপ সেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে!

আমি গাড়ির গায়ে মাথা হেলিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি—ফিলিপের কালো মোটা মোটা আঙুলগুলোর নড়াচড়া দেখছি, আর হতাশায় মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে। ধীরেসুস্থে সে একটা ফাঁস লাগায়, তারপর টেনেটুনে চামড়ার পটিটা সোজা করে নিয়ে পাশের ঘোড়াটার গায়ে একবার চাপড় মারে, চাবুকের বাঁটটা দিয়ে একটা ঘা কষায়।

ঝড়ও ক্রমে উত্তাল হয়ে উঠছে, আমার মনের বিষাদ আর আতঙ্কও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে; বাজ পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সাধারণত প্রকৃতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়—সেই নিশ্চল, নিস্তব্ধ সময়টুকুতে আমার মনের ভাবটাও একেবারে চরমে ওঠে। এই অবস্থা যদি আর পনের মিনিট থাকত, উত্তেজনার চোটে বোধহয় মরেই যেতাম! ঠিক সেই মুহূর্তে সেতুর তলা থেকে একটা মানুষের মূর্তি উঠে এল, ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা একটা শার্ট গায়ে, ফোলা-ফোলা মুখে একটা খ্যাপাটে ভাব, মাথাটা খালি, পুরো কামান, অল্প অল্প নড়ছে আঁকাবাঁকা শক্তিহীন দুখানা পা, একখানা হাতের জায়গায় একটা লাল লম্বা লাঠি—সেটাকে সে সোজা আমাদের ব্রিচকার ভিতর ঢুকিয়ে দিল।

"প্রভু যীশুর দোহাই, একটা খঞ্জকে সাহায্য করুন।" কাঁপা কাঁপা গলায় ভিখিরিটা বলে, প্রতিটি কথার শেষে ক্রুশচিহ্ন আঁকে মাথা নত করে।

আমার সেই মুহূর্তের আতঙ্ক বর্ণনা করতে পারব না। চুলের ডগাগুলো পর্যন্ত শিরশির করে উঠল, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ভিখিরিটার দিকে মোহ-গ্রস্তের মত তাকিয়ে রইলাম।

পথে যেতে যেতে ভিক্ষেসিক্ষে দেবার ভার ভ্যাসিলির ওপর। সে তখন ফিলিপকে উপদেশ দিচ্ছিল কি করে ছেঁড়া চামড়ার পটিটা আরও শক্ত করা যায়। সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ফিলিপ রাশগুলো হাতে করে কোচোয়ানের বাক্সে উঠে বসল, তবে গিয়ে সে পাশের পকেটটা হাতড়ায়। আমরাও সবে রওনা হয়েছি আর অমনি বিদ্যুৎ চমকে উঠল, দিগবিদিকে আলোর ফুলকি ছুটে গেল আর মুহূর্তের মধ্যে গোটা প্রান্তরটা যেন ঝলসে উঠল—আমাদের

চোখ একেবারে ধেঁধে গেল, ভীষণ চমকে ঘোড়াগুলো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এর সঙ্গে সঙ্গেই, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল—সে হুঙ্কারে মনে হল গোটা আকাশটাই বুঝি খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল আমাদের মাথায়। হু হু করে বাতাস ছুটছে, ঝোড়ো হাওয়ায় ঘোড়াগুলোর লেজ আর কেশর, ভ্যাসিলির ক্লোক, চাদর সব একই দিকে পতপত করে উড়ছে। টপ করে মস্ত এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ল ব্রিচকার চামড়ার ঢাকাটায়, তারপর আর এক ফোঁটা, তারপর অরেকটা; এর পরে পটাপট যেন আমাদের মাথার ওপর বাজনা বেজে চলল আর মাঠঘাট চারদিক মুখর হয়ে উঠল সে অবিরাম বৃষ্টির আওয়াজে। ভ্যাসিলির কনুইটা দেখে বুঝতে পারলাম সে পয়সার ব্যাগটা খুলছে; ভিখিরিটাও ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে গাড়ির চাকার পায়ে পায়ে দৌড়চ্ছে, ভয় হচ্ছে এই বুঝি পিষে গেল চাকার তলায়। শেষ পর্যন্ত ভ্যাসিলি একটা তামার পয়সা ছুঁড়ে ফেলে। আর বেচারা বুড়ো ভিখিরিটা মাঝ রাস্তায় থেমে পড়ল—দেখতে পাচ্ছি, ঝড়ে ওকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, ছেঁড়া-খোঁড়া জামাটা ভিজে জবজবে হয়ে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে—তারপর আর দেখা গেল না, অস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল।

ঝড়ের মাতামাতি আর তার সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট, বাঁকা হয়ে এসে পড়ছে অবিরল ধারায়; ভ্যাসিলির কোটের ভেতর দিয়ে স্রোত নামছে; বেয়ে এসে পড়ছে চামড়ার পা-ঢাকার ওপর যেখানে ঘোলা জল জমা হয়ে রয়েছে। রাস্তার ধুলো প্রথমে ডেলা পাকাল, এখন একেবারে প্যাচপেচে কাদা—তার ভেতর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে চাকা; ঝাঁকুনি একটু কমেছে, গাড়ির চাকার রেখা ধরে ধরে ঘোলা জলের নদী বইছে। বিদ্যুতের চমকে আলোর ঝলসানি একটু কম, বাজের আওয়াজও বৃষ্টির পটাপট আওয়াজকে ছাপিয়ে খুব বেশী ওপরে উঠছে না।

এখন বৃষ্টির জোর একটু কমেছে, ঝ'ড়ো মেঘেরাও এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; যে দিকটায় সূর্য থাকবার কথা, সেদিকটায় খানিকটা আলোর আভাস, ইতিমধ্যেই পাঁশুটে সাদা মেঘের কোল ছিঁড়ে সেখানে এক টুকরো নীলাকাশ প্রায় বেরিয়ে পড়ছে। আর একটি মুহূর্ত: তার পরেই সূর্যের হালকা আলো ছড়িয়ে পড়ে সব কিছুতে—পথের ওপারে ছোট্ট ছোট্ট পুকুরগুলোয় অল্প অল্প ছাঁটে বৃষ্টি পড়ছে, এত মিহি যেন ছাঁকুনির ভিতর দিয়ে আসছে, তার গায়ে

আলো পড়ে মনে হচ্ছে হাল্কা সোনালী ঝরণা। আর আলো ঝরছে পথের দুধারে বৃষ্টি-ধোয়া সতেজ শ্যামল ঘাসে।

আকাশের অপর পারে ঝড়ো কালো মেঘ তখনও জমাট বেঁধে ছিল,—কিন্তু আমার আর আতঙ্ক ছিল না। ভয়কে দূরে সরিয়ে ফেলে জীবনের একটা নতুন আশা তার অব্যক্ত আনন্দ নিয়ে মন ভরে দিল। প্রকৃতির মত আমার মনও হেসে উঠল সতেজ ঝরঝরে হয়ে।

ভ্যাসিলি কোটের কলারটা নামিয়ে দিয়ে টুপি খুলে নিয়ে ঝাড়ছে। ভলোদিয়া ছুঁড়ে ফেলে দিল চামড়ার পা-জামাটা। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ফুরফুরে সুগন্ধী হাওয়া বুক ভরে টেনে নিলাম। সামনেই দুলতে দুলতে চলেছে বন্ধ গাড়িটা, বৃষ্টির জলে ধোয়া ঝকঝকে ; ঘোড়ার পিঠের আর সাজের কতক অংশ আর চাকার টায়ার—সব বৃষ্টিতে স্নান করে চিক্‌চিক্ করছে, যেন মোম মাখান। রাস্তার একপাশে মাঠে ছেয়ে আছে শীতের গম, দূরে, আরও দূরে ছড়িয়ে গেছে সে মাঠ, মাঝে মাঝে জল আবার পথ, ভিজে মাটি আর সবুজ গাছপালায় খেলা করছে সোনালী আলো—নানা রঙের একখানা গাল্‌চে যেন বিস্তৃত হয়ে রয়েছে ঐ দূর দিগন্ত পর্যন্ত। আর একপাশে অ্যাস্‌প গাছের কুঞ্জ, তলায় বাদাম আর বন্য চেরীর ঝোপ—দাঁড়িয়ে আছে অবিচল শান্তিতে, বৃষ্টিতে ধোয়া ডালপালা থেকে পরিষ্কার জলের ফোঁটা ঝরছে, নীচে শুকনো পাতার রাশিতে। লার্ক পাখির দল মনের আনন্দে মিষ্টি সুরে গান করতে করতে চারপাশ থেকে উড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে আবার পরমুহূর্তেই ডানা মুড়ে নেমে পড়ছে ঝুপ করে, ভিজে বাসায় বসে কিচিরমিচির করছে ছোট্ট ছানার দল। ওদিকে বনের ভিতর থেকে ভেসে আসছে কোকিলের পরিষ্কার মিঠে সুর। বসন্তের এই এক পশলা বৃষ্টির পর গন্ধে ভুরভুর করে গোটা বনটাই—বার্চ, ভায়োলেট, শুকনো মরা পাতা, আগাছা, আর বুনো চেরী, এই সবে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ! আমি আর গাড়িতে বসে থাকতে পারলাম না, নেমে ছুটে গেলাম ঝোপের কাছে। নাড়া পেয়ে গাছ ঝরঝর করে ঝরিয়ে দিল তার জমানো বৃষ্টির জল আমার হাতে, মাথায়, মুখে তবুও দুহাত ভরে তুলে নিলাম চেরীর নতুন ফোটা কচি ডালপালা, বুকে জড়িয়ে ধরে গন্ধ নিলাম প্রাণ ভরে। আঃ কি মিষ্টি!

আমার জুতো কাদাতে মাখামাখি, মোজা তো কখন থেকেই ভিজে জবজবে—সে সব গ্রাহ্য না করেই প্যাচপেচে কাদার ভিতর দৌড়তে দৌড়তে হাজির হই বন্ধ গাড়িটার জানালায়।

"লিউবোচ্‌কা কাটেনকা," হাত বাড়িয়ে চেরীর কিছু ফুলপাতা ওদের দিতে দিতে বলি, "দেখ কি সুন্দর।" মেয়েরা এক মুহূর্ত থ মেরে থেকে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। মিমি চীৎকার করে আমাকে সরে যেতে বলে, চাপা পড়ব ভয়ে।

"কিন্তু দেখ, শুঁকে দেখ, কি মিষ্টি গন্ধ!"

তৃতীয় অধ্যায়

নতুন সংবাদ

ব্রিচ্‌কার মধ্যে কাটেনকা আমার পাশে বসে। সুন্দর মাথাটি নীচু করে চিন্তামগ্ন ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। ধুলোভরা রাস্তাটা চাকার তলায় কেবলি পিছ্‌লে সরে সরে যাচ্ছে। আমি চুপ করে একদৃষ্টে ওকে দেখছি। এই প্রথম আমার চোখে পড়ল তার গোলাপী মুখে কেমন একটা বিষাদের ভাব, যা শিশুর পক্ষে অস্বাভাবিক।

"মস্কো পৌঁছতে আর বেশী দেরি নেই", আমি বললাম। "আচ্ছা, মস্কোটা কি রকম বলে তোমার মনে হয়?"

"আমি জানি না।" ও একটু অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দেয়।

"কিন্তু তোমার কি মনে হয়? সেরপুখভের চাইতে বড় না ছোট?"

"কি?"

"না, কিছু না।"

কিন্তু যে সহজাত বৃত্তি দিয়ে মানুষ অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে সেই চেতনা দিয়েই কাটেনকা বুঝতে পারল যে ওর উদাসীনতায় আমি ব্যথা পাচ্ছি। মাথা তুলে ও আমার দিকে ঘুরে বসল।

"তোমার বাবা কি বলেছেন আমরা সবাই দিদিমার বাড়িতে থাকব?"

"হ্যাঁ, দিদিমা কিছুতেই ছাড়ছেন না।"

"আমরা···আমরা সব্বাই থাকব সেখানে?"

"নিশ্চয়; ওপরের আদ্দেকটায় আমরা থাকব, বাকি আদ্দেকটায় তোমরা। বাবা থাকবেন পাশের দিকটায়। কিন্তু খাওয়াদাওয়া হবে সবাই একসঙ্গে—নীচে দিদিমার কাছে।"

"মা বলেন তোমার দিদিমার নাকি বড্ড রাশভারী আর নাকি সাংঘাতিক মেজাজ!"

"না না, দিদিমা মোটেই সে রকমের নন। গোড়ায় গোড়ায় অবশ্য ঐ রকম

মনে হয়। রাশভারী বটে, তবে বদমেজাজী নন। বরং উল্টো। ওঁর মন খুব নরম। হাসতেও জানেন। ওঃ, দিদিমার নামকরণের তিথিতে তুমি যদি থাকতে—সেদিন আমাদের কী বলনাচের ধুম!"

"যাই বল, ওঁকে আমার খুব ভয়। তা ছাড়া, ভগবানই জানেন, আমরা……"

বলতে বলতে কাটেনকা আচম্‌কা থেমে গিয়ে আবার তেমনি ভাবনার মধ্যে পড়ে যায়।

"কী হল?" একটু অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি।

"কিছু হয়নি।"

"কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। তুমি যে বললে, 'ভগবানই জানেন—'।"

"তুমিও তো বললে, কি চমৎকার বলনাচ হল সেদিন…"

"ওঃ, সত্যি, তুমি যদি থাকতে! কম লোক আসেনি, কয়েক শো তো বটেই। আর গান, আর বাজনা। আমি নেচেছিলাম।" বর্ণনা দিতে দিতে আমি থেমে গেলাম, "কাটেনকা, তুমি শুনছ না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি বৈকি। তুমি নেচেছিলে, তারপর?"

"তুমি অমন মনমরা হয়ে আছ কেন?"

"মানুষ সব সময় হাসতে পারে না।"

"মস্কো থেকে এসে অবধি দেখছি তুমি অনেক বদলে গেছ। সত্যি করে বল তো," ওর দিকে ফিরে থমথমে মুখ করে বললাম, "তুমি এমন অদ্ভুত হয়ে গেছ কেন?"

"অদ্ভুত হয়েছি? মোটেই না, মোটেই না।" ওর ব্যগ্রতা দেখে বোঝা গেল আমার মন্তব্যে ও মজা পেয়েছে।

"মোটেই অদ্ভুত হইনি, মোটেই না।"

"তুমি আগে যেমনটি ছিলে, তেমনটি আর নেই", আমি বলতে থাকি, "আগে এটা স্পষ্ট ছিল যে তুমিও ঠিক আমাদের মতই চিন্তা কর, আমাদের আপনার লোক বলে মনে কর, আমাদের ভালবাস, যেমন আমরাও তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু এখন তুমি বড্ড গম্ভীর তোমার মধ্যে কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব—"

"না, না, তা নয়…"

"আমাকে শেষ করতে দাও", বাধা দিয়ে বলি। বেশ বুঝতে পারি আমার নাকের মধ্যেটা কেমন সুড়সুড় করছে,—অর্থাৎ এবার চোখে জল আসবে।

কোন গভীর চাপা ভাব প্রকাশ করতে গেলেই চোখে আমার জল এসে যায়।

"তুমি আমাদের ছায়া মাড়াও না; এক মিমির সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে তুমি কথাই বল না। দেখে মনে হয়, আমাদের তুমি আমল দিতে চাও না।"

"দেখ, মানুষ কখনও চিরদিন এক থাকে না। কোনদিন না কোনদিন তাকে বদলাতেই হয়।"

কাটেনকা জবাব দেয়। ওর স্বভাবই হল, যখন ও ঠিক করতে পারে না কী বলবে তখন 'এ না হয়ে যায় না' গোছের যুক্তি দিয়ে সব কিছুর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বসে।

মনে আছে লিউবোচ্‌কার সঙ্গে একদিন ঝগড়া হওয়াতে লিউবোচ্‌কা রাগ করে ওকে বলেছিল, "বোকা কোথাকার!" ও তার জবাবে বলল, "বেশতো, সবাই তো আর চালাক হতে পারে না, কাউকে কাউকে বোকা হতে হয়।"

কিন্তু সবাইকেই বদলাতে হয়, তার এই যুক্তিতে আমি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলাম না, তাই আবার প্রশ্ন করলাম—

"বদলাতেই বা হবে কেন?"

"বা রে, আমরা তো আর চিরদিন একসঙ্গে থাকব না।" কাটেনকা যেন একটু লাল হয়ে উঠে ফিলিপের পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মা তোমার মা-মণির সঙ্গে থাকতে পারতেন কেননা, ওঁরা দুজনে বন্ধু ছিলেন। কিন্তু কাউনটেসের সঙ্গে মায়ের বনিবনা হবে কিনা কে জানে। লোকে তো বলে কাউনটেসের মেজাজটা খুবই বিচ্ছিরী। আর তা ছাড়া সব ছেড়ে দিলেও কোন না কোনদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি তো হবেই। তোমাদের টাকা আছে, তোমরা হলে পেত্রোভস্কয়ের জমিদার। আর আমরা হলাম গরীব, আমার মার কাণাকড়িটিও নেই।"

তোমরা বড়লোক, আমরা গরীব! এই কথাগুলো আর এর সঙ্গে জড়ানো ভাবধারাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার কাছে। ভিখিরি আর চাষাভুষো ছাড়া আর যে কেউ গরীব হতে পারে—এ আমার তখন ধারণায় ছিল না। তাই আমার মনে দারিদ্র্যের এই মূর্তির পাশে কেটিয়ার সুন্দর কমনীয় চেহারা কিছুতেই ঠাঁই পেত না। আমি ভাবতাম, মিমি আর কেটিয়া যখন আমাদের কাছে আছে, তখন চিরদিনই থাকবে, আর আমাদের সব কিছুতেই ওদেরও ভাগ। এর কোন নড়চড় হতে পারে—ভাবতেই পারতাম না। কিন্তু ওদের অসহায়তার

সূত্র ধরে হাজার রকমের এলোমেলো নতুন চিন্তা এখন আমার মনে এল। আমরা বড়লোক, ওরা গরীব। আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম, কাটেনকার মুখের দিকে তাকাতেই পারলাম না।

আমি ভাবলাম, "আমরা বড়লোক, আর ওরা গরীব, কথাটার মানে কি? আর এ থেকে এটাই বা কি করে আসে যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হতেই হবে? আমরা কেন সব জিনিস সমান ভাগ করে নিতে পারি না?" কিন্তু আমি এটুকু বুঝলাম যে এসব কথা কাটেনকাকে বলা যায় না। আমার স্বাভাবিক সহজাত বাস্তববুদ্ধি, যার সঙ্গে এ সব যুক্তিতর্কের কোনো মিল ছিল না, সেই বুদ্ধিই আমাকে বলে দিল, কাটেনকাই ঠিক কথা বলেছে আর আমার এ মনোভাব ওর কাছে ব্যাখ্যা করার কোনই মানে নেই।

"সত্যি সত্যিই তোমরা আমাদের ছেড়ে যাবে?" জিজ্ঞেস করলাম, "পরস্পরকে ছেড়ে আমরা থাকব কি করে?"

"উপায় কি? আমারও খুব কষ্ট হবে। তবে সে সময় যখন আসবে তখন আমি কি করব আগেই ভেবে রেখেছি।"

ওর কথার মধ্যে বলে উঠলাম, "তুমি তো অভিনেত্রী হবে। কিন্তু এর কোন মানে হয় না।" আমি জানতাম কাটেনকা স্বপ্ন দেখত, একদিন অভিনেত্রী হবে।

"না, না; ওটা বলেছিলাম যখন আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলাম।"

"কি করবে, তাহলে?"

"আমি সন্ন্যাসিনী হয়ে একটা মঠে থাকব। কালো গাউন আর মাথায় মখমলের হুড পরে ঘুরে বেড়াব।" কাটেনকা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে।

পাঠক, তোমার জীবনে কোন সময় কি এমনি ঘটেছে যে হঠাৎ একদিন তুমি দেখলে তোমার এতদিনকার ধারণাগুলো একদম পাল্টে গেছে? যেন বহুবার দেখা জিনিসগুলো তাদের অন্য দিকটা মেলে ধরল তোমার সামনে, যার সঙ্গে তোমার কোন পরিচয়ই নেই, যার অস্তিত্বই তুমি জানতে না। এমনি ধরনেরই একটা মানসিক বিপ্লব ঘটে গেল আমার জীবনে—এই মস্কো যাওয়ার পথে। তাই আমার হিসেবে এ দিনটি থেকেই আমার কৈশোর শুরু।

সেই কেবল প্রথম বুঝতে পারি যে এই দুনিয়ায় আমরা, আমাদের পরিবারই একমাত্র সত্য নয়, কেবলমাত্র আমাদের কেন্দ্র করেই সব কিছু ঘুরছে না। পৃথিবীতে আরও একটা জীবনের অস্তিত্ব আছে—সেই সব মানুষের জীবন

যাদের আমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, আমাদের জন্য যাদের কিছুমাত্র মাথা-ব্যথা নেই, এমন কি আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যাদের কোন ধারণা নেই। এগুলো আমি আগেও জানতাম তা সত্যি কিন্তু তবুও আজ যেমন করে বুঝলাম তেমনটি আগে বুঝিনি, তেমন করে অনুভব করিনি এর আগে।

মানুষের ধারণা ক্রমে একদিন বিশ্বাসে পরিণত হয়—কিন্তু এই বিশ্বাসে পৌছুবার পথটা প্রায় প্রতিটি মানুষের জীবনেই আলাদা। কাটেনকার সঙ্গে আলোচনাটা আমার মনে গভীর দাগ কাটল, ওর ভবিষ্যত জীবন নিয়ে চিন্তা করলাম ; এতদিনে একটা রাস্তা পেলাম। যেতে যেতে কত গ্রাম, শহর পার হলাম, চোখে পড়ল কত ঘরবাড়ি, এর প্রত্যেকটিতে বাস করে অন্ততঃপক্ষে আমাদের মতন একটি করে পরিবার, সেখানে বাচ্চারা, মেয়েরা মুহূর্তের কৌতূহল নিয়ে আমাদের গাড়ির দিকে একবারমাত্র তাকিয়েই চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দেখলাম, দোকানদার আর চাষীরা, তারা আমাদের নমস্কার জানানো দূরে থাক একটিবার চোখ তুলে তাকিয়েও দেখল না। অথচ পেত্রোভস্কয়ের লোকেরা আমাদের কী খাতিরই না করত! আমার মনে সেই প্রথম প্রশ্ন জাগল: "ওরা যদি আমাদের কোনরকম পরোয়া না করে তবে ওদের দিন কাটে কি নিয়ে?" এ থেকেই এল আরও নানা প্রশ্ন। ওরা কি করে বাঁচে? কি করে ছেলেমেয়ে মানুষ করে? শাসন করে, না খেলাধুলো করতে দেয়? কেমন করে ওদের শাস্তি দেয়? এই রকম আরও অনেক প্রশ্ন।

চতুর্থ অধ্যায়

মস্কোতে

মানুষ আর পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, এ সম্বন্ধে আমার নতুন ধারণাটা আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠল মস্কোতে এসে। প্রথম যখন দিদিমাকে দেখলাম ; দেখলাম তাঁর শীর্ণ বলীরেখাঙ্কিত মুখ আর স্তিমিত চোখ দুটি—আমার এতদিনকার আতঙ্কমেশানো শ্রদ্ধার ভাবটা বদলে গিয়ে সমবেদনাই জাগল। লিউবোচ্‌কার মাথায় নিজের মুখখানা চেপে ধরে যখন দিদিমা আকুল হয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকলেন, যেন চোখের সামনে তাঁর স্নেহের দুলালী মৃত মেয়েকেই দেখছেন—আমার সমবেদনা তখন ভালবাসায় পরিণত হল। আমাদের দেখবামাত্রই দিদিমাকে শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়তে দেখে খুবই অস্বস্তি হল। ওঁর চোখে তখনকার মত আমাদের কোনই অস্তিত্ব নেই। চুমু খেয়ে তিনি আমার মুখ ভরিয়ে দিলেন, কিন্তু আমার মনে হল, তার প্রতিটি চুমুই নীরবে বলছে, "সে নেই, সে চলে গেছে, তাকে আর দেখতে পাব না।"

মস্কোতে এসে বাবার সঙ্গে প্রায় দেখাই হত না, কেবল খাবার সময় আসতেন কালো রঙের কোট অথবা ড্রেস-স্যুট পরে, মুখে সবসময়েই একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে। দিদিমা কার্ল ইভানিচ্‌কে বলতেন—"দ্যাডকা",* ভগবান জানেন তার মাথায় আবার কি ঢুকল, এতদিনকার টাক মাথার বদলে তিনি আবার হঠাৎ লাল রঙের একটা পরচুলা পরতে লাগলেন, মাথার ঠিক মাঝখানে সিঁথি-কাটা—ভীষণ মজার, আমার দেখলেই হাসি পেত।

মেয়েদের আর আমাদের মধ্যেও একটা অদৃশ্য পর্দা পড়ে গেল। ওদের গোপন কথা ছিল, আমাদেরও তাই। ওদের পেটিকোটের ঝুল বাড়ছে, তাই নিয়ে ওদেরও বেশ একটু চালমারা ভাব, আমাদেরও আছে পায়ের দিকে চামড়ার পটি-বাঁধা প্যাণ্ট, তাই নিয়ে গর্ব। প্রথম রবিবার ডিনারে মিমি এল কি চমৎকার গাউন পরে, সুন্দর সুন্দর রিবন বসানো—তাই দেখেই চট্ করে আমার মনে পড়ল আমরা আর গ্রামে নেই, এবার থেকে সবকিছুই বদলে যাবে আমাদের জীবনে।

* দ্যাডকা—বাচ্চা ছেলেদের চাকর।

পঞ্চম অধ্যায়

বড় ভাই

ভলোদিয়ার চাইতে আমি মোটে এক বছর কয়েক মাসের ছোট ; দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছি, কখনোই ছাড়াছাড়ি হয় না আমাদের। পড়াশুনা, খেলা—সব একসঙ্গে। এতদিন আমাতে আর ওতে বড়-ছোটর কোন পার্থক্যও করা হত না। কিন্তু যে সময়টার কথা বলছি : তখন হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, আমি ভলোদিয়ার সমকক্ষ নই, কোনদিকেই নয়, না বয়সে, না প্রবৃত্তিতে, না সমতায়। এমন কথাও ভাবতাম যে ভলোদিয়া নিজে এ কথা জানে, তাই নিয়ে ওর খুব গর্ব। এ থেকেই জন্মাল নিজের প্রতি একটা মমতা, একটা ভালবাসা—আর এ ভাবটাকে যতই বাইরের আঘাত থেকে বাচিয়ে চলতে চাই ততই প্রতি পদে বাইরের ঘা খেয়ে আহত হতে থাকে। ভলোদিয়া সবেতেই আমার চেয়ে বড়—খেলাধূলায়, পড়াশুনোয়, ঝগড়ায়, সহবতে, সব কিছুতে ; এর ফলে ওর সঙ্গে আমার মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে গেল, আর তাই নিয়ে মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করতাম কেন বুঝতে পারতাম না। প্রথম যেদিন ভলোদিয়া একটা লিনেনের কুঁচি দেওয়া শার্ট পরল, আমি যদি পরিষ্কার খোলাখুলি বলে দিতে পারতাম যে ঠিক ওইরকম একটা না পেয়ে আমার ভীষণ বিরক্তি লাগছে, তবে বোধহয় ব্যাপারটা সহজ হয়ে যেত আমার পক্ষে আর তাহলে ভলোদিয়া যতবার কলার ওলটাচ্ছিল, ততবারই মনে হত না যে ও ইচ্ছে করেই ওরকমটা করছে, খালি আমাকে আঘাত দিতে।

ভলোদিয়া সবসময় আমাকে লক্ষ্য করত খুব মন দিয়ে যেন আমাকে একেবারে পড়ে নিত, কিন্তু সেটা যেন আবার লুকোচ্ছে আমার কাছ থেকে, মনে হত মাঝে মাঝে—এটাই সবচেয়ে বেশী জ্বালাত আমাকে।

দিনরাত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে,—ভাই, বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী বা প্রভু-ভৃত্য এদের মধ্যে, বিশেষ করে তারা যদি সব ব্যাপারে সরল না হয়—তবে তাদের মধ্যে দূরে দূরে থাকা, কথাবার্তা না বলা রহস্যময় ব্যবহার—কি না লক্ষ্য করেছে ?

আমার মধ্যে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতা এবং চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের ভাব থাকায় বোধহয় এ ব্যাপারে আমি ভুলই করেছিলাম। খুব সম্ভব, ভলোদিয়া আমার মত করে ভাবতই না। ও ছিল প্রাণবন্ত সরল, ওর হঠাৎ আবেগ, হঠাৎ ঝোঁকের কোন সঙ্গতি থাকত না। নানা ধরনের জিনিসের দিকে ও ঝুঁকে পড়ত, আর যখন যেটার দিকে ঝুঁকত তাতেই একেবারে মনপ্রাণ ঢেলে দিত।

এক সময়ে খেয়াল চাপল ছবির; নিজে আঁকতে শুরু করল, নিজের কাছে যা থাকত সব খরচ করত তাতে, টাকা চাইত ড্রইং-মাস্টারমশাইর কাছে, বাবার কাছে, দিদিমার কাছে, সব্বাইর কাছে। তারপর এল নানারকমের জিনিস সংগ্রহ করে বোতল সাজিয়ে রাখা,—সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে সে সব সংগ্রহ করে আনত; তারপর শুরু হল নভেল পড়া—কোথা থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে বই এনে দিনরাত তাই মুখে করে আছে! ওর এইসব খেয়াল-খুশিগুলো দেখে মনে মনে আমিও মেতে উঠতাম—কিন্তু ওর পায়ে পায়ে চলতে অহঙ্কারে বাধত, আবার বয়েসেও এত কম আর সবেতেই অন্যের অধীন যে নিজের জন্য আলাদা কোন পথ বার করব, সে ক্ষমতাও নেই। কিন্তু সবচাইতে বেশী হিংসে হত ভলোদিয়ার হাসিখুশি, খোলামেলা প্রকৃতিতে ওর মনের উদারতায় যেটা বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করে ধরা পড়ত আমাদের মধ্যে ঝগড়ার সময়ে। মনে মনে স্বীকার করতাম ওর ব্যবহারটা খুবই চমৎকার—তবুও কিছুতেই অনুকরণ করতে পারতাম না।

এই জিনিস-সংগ্রহের বাতিকটা যখন ওর মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, একদিন আমার হাত লেগে ওর টেবিলে রাখা একটা রঙীন কাঁচের গন্ধদানি হঠাৎ পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল।

"কে তোমাকে আমার জিনিসে হাত দিতে বলেছে?" ঘরে ঢুকেই ভলোদিয়া চেঁচিয়ে ওঠে টেবিলের ওপরের সাজানো-গুছোনো জিনিসগুলোর ছত্রখান অবস্থা দেখে, "আর সেই ছোট্ট গন্ধ-শিশিটা কোথায়?"

"আমার হাত ফস্‌কে পড়ে সেটা ভেঙে গেছে।"

ভাঙা শিশিটার টুক্‌রোগুলো পাশে পাশে সাজিয়ে লক্ষ্য করতে করতে খুব দুঃখের সঙ্গে ও বলল, "তুমি দয়া করে কখনো আমার জিনিসে হাত দিতে সাহস করো না, বুঝলে?"

"আর তুমিও দয়া করে আমাকে হুকুম করো না, বুঝতে পারলে?" আমি

তেড়েমেড়ে উঠি। "শিশিটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে···ব্যাস্, এই তো? এ নিয়ে আর অত ঢঙের কি আছে?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাসলাম, যদিও হাসার কোনরকম ইচ্ছে ছিল না আমার।

"ওঃ, তোমার কাছে ওটা কিছু না, কিন্তু আমার কাছে ওটা অনেকখানি।" ভলোদিয়া বলে চলে কাঁধে একটা ঝাকুনি দিয়ে—ও অভ্যেসটা ও বাবার কাছ থেকে পেয়েছে।

"আমার জিনিস ভেঙে তচ্‌নচ্ করে আবার হাসা হচ্ছে। অসভ্য পুঁচকে ছেলে কোথাকার!"

"আমি ছোট ছেলে হতে পারি, কিন্তু তুমি যত বড় ততই মূর্খ।"

"তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না আমি", আমাকে সামান্য একটু ধাক্কা মেরে ভলোদিয়া বলে, "যাও, এখান থেকে চলে যাও।"

"ধাক্কা দিয়ো না।"

"চলে যাও।"

"খবর্দার, ধাক্কা দিয়ো না বলছি।"

ভলোদিয়া আমার হাত ধরে টান মেরে সরিয়ে দিতে চাইল: কিন্তু আমি তখন রাগে কাঁপছি। টেবিলের একটা পায়া শক্ত করে চেপে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম, আর ঝাঁকুনি খেয়ে টেবিলের পোর্সিলিন আর বেলোয়ারী কাঁচের সুন্দর সব জিনিসগুলো মাটিতে পড়ে গেল ঝনঝন করে, চুরমার হয়ে। "দেখ, হল তো, এইবার?"

"হতভাগা, বদমাস কোথাকার!" ভলোদিয়া অর্তনাদ করে উঠে দুচারটে জিনিস বাঁচাবার চেষ্টা করে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবি, "এই শেষ। আজ থেকে জন্মের মত দুজনের আড়ি।"

সন্ধ্যে পর্যন্ত কেউ কারুর সঙ্গে কথা বললাম না। আমিই দোষী, বুঝতে পারছিলাম, তাই ভয়ে ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না, সারাদিন কোনো কাজে মনও বসাতে পারলাম না। ভলোদিয়া ওদিকে বেশ লেখাপড়া করল, তারপর খাওয়া-দাওয়ার শেষে দিব্যি আড্ডা জুড়ে দিল মেয়েদের সঙ্গে।

সেদিন একটা করে পড়া শেষ হয় আর আমিও চট্ করে বেরিয়ে যাই ঘর থেকে। ভয়, অস্বস্তি আর বিবেকের তাড়নায় ওর সঙ্গে আমি একঘরে থাকতে পারছিলাম না। সন্ধ্যেবেলায় ইতিহাস পড়া শেষ হতে না হতেই খাতাখানা

তুলে নিয়ে আমি দরজার দিকে এগোলাম। ভলোদিয়ার কাছে গিয়ে একটা মিটমাট করে নেবারই ইচ্ছে ছিল মনে মনে কিন্তু আসলে কাজের বেলা ভলোদিয়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় ভুরুটুরু কুঁচকে মুখে খুব রাগের ভাব দেখিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ভলোদিয়া মাথা তুলল, নির্দোষ দুষ্টুমির ফিকে একটুকরো হাসি হেসে। সোজাসুজি আমার দিকে তাকাল। আমাদের চোখে চোখ পড়ল, দেখলাম ও আমাকে বুঝতে পেরেছে, আবার আমি যে সেটা ধরতে পেরেছি, সেটাও ও বুঝেছে। তবুও ভেতর থেকে আসা একটা প্রবল বাধায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

"নিকোলেঙ্কা!" এবার সোজাসুজি সরলভাবে ভলোদিয়া ডাকে; তার গলায় কোনরকম আবেগের আভাসটুকুও নেই।

"অনেকক্ষণ হল, তুমি ভারী রেগে রয়েছ। যদি অন্যায় করে থাকি, আমায় ক্ষমা কর।"

হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল।

হঠাৎ আমার বুক ঠেলে বেয়ে বেয়ে কি যেন একটা ওপর দিকে উঠতে থাকে, দম যেন একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সে একটি মুহূর্তের জন্য, তারপরেই চোখে আমার জল এসে গেল, একটু সুস্থবোধ করলাম।

"আমি···খুব দুঃখিত, ভলোদিয়া," ওর হাতখানা জড়িয়ে ধরি।

কিন্তু ভলোদিয়া এমনিভাবে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে যেন কিছুতেই বুঝতে পারছে না, আর যাই হোক আমার চোখে জল এল কেন!

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাশা

আমার মনোভাবের সবচাইতে বিস্ময়কর পরিবর্তন হল আমাদের একজন ঝিয়ের সম্বন্ধে—সেই প্রথম আমি মনে করলাম সে একজন ঝি এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়, তার আরেকটা পরিচয় সে নারী, তার উপর আমার সুখশান্তি নির্ভর করতে পারে অনেকটা।

যতদূর পেছনে তাকাই, মাশাকে দেখতে পাই। কিন্তু সেদিনের আগে কোনদিন বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দিইনি ওর দিকে। মাশার যখন পঁচিশ, আমার তখন চোদ্দ; দেখতে খুবই ও সুন্দরী। ওর রূপের বর্ণনা করতে ভয় পাচ্ছি; পাছে ওর যে মোহিনী রূপের মায়ায় সে-সময়টায় দিনকতক ডুবে ছিলাম, কল্পনা আবার সে প্রলোভনের চেহারাটা ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিছু ভুল না করে শুধু এইটুকু বলতে পারি, ওর গায়ের রং ভীষণ ফর্সা, পুরন্ত গড়ন ও একটি মেয়ে, আর আমি……আমার বয়স তখন চোদ্দ।

ধরুন, পড়তে পড়তে উঠে বইটা হাতে করে পায়চারি করছেন, মেঝের দাগের সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে; অথবা অন্যমনস্ক ভাবে অস্পষ্ট গলায় কোন একটা সুর ভাঁজছেন, কিংবা টেবিলের ধারটায় কালি ঘসে ঘসে কালো করছেন, একঘেয়ে সুরে কোন একটা কথা বলছেন…বার বার—অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে যে সময়টায় মস্তিষ্ক কাজ করতে চায় না, আর কল্পনা সুবিধে পেয়ে ইচ্ছেমত খেলা শুরু করে—তেমনি একটা মুহূর্তে আমি পায়ে পায়ে পড়ার ঘর ছেড়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াই। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই। হালকা পায়ে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। চেষ্টা করলাম দেখতে সে কে, কিন্তু পায়ের শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল, তারপরেই মাশার গলার স্বর:

"পালাও এখান থেকে শীগগির, এখুনি। মারিয়া আইভানোভনা দেখলে কি ভাববেন?"

"না, দেখতে পাবে না," ফিস্‌ফিস করে ভলোদিয়ার স্বর বলে। তারপর একটু নড়াচড়া, যেন ভলোদিয়া ওকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে।

"এই হাত সরাও, বদমাস কোথাকার"—মাশা আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল, রুমালটা একপাশে সরানো, ফর্সা গোল গলা—উঁকি মারছে তলা দিয়ে।

এই হঠাৎ আবিষ্কারে কি ভীষণ যে অবাক হলাম তা আর বলবার নয়। কিন্তু একটু পরেই বিস্ময় থেকে এল সহানুভূতি, ভলোদিয়ার এই আজগুবি ব্যাপারে। ও যা করেছে তার জন্যে নয়, কিন্তু এটা করলে ভাল লাগবে, এ ধারণাটা ওর মাথায় ঢুকল কি করে,—অবাক হলাম সেই কথা ভেবে। আর সেই সঙ্গে অবচেতন মনে আমারও ইচ্ছে জাগল ওকে অনুকরণ করতে।

সেই থেকে কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি সিঁড়ির সেই মুখে বসে, একটা কান খাড়া করে রেখেছি, ওপরের টুঁ শব্দটি পর্যন্ত শুনতে—তবু সাহস করে ভলোদিয়ার মত এগোতে পারিনি। যদিও ওই সাহসটুকুই সেই সময়ে দুনিয়ায় একমাত্র কাম্য ছিল! কোন কোন সময় একটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে চুপি চুপি শুনতাম ঝিয়েদের ঘরের সাড়াশব্দ, হিংসে হত মনে মনে আবার অন্যায় বোধও জাগত। মনে হত, আচ্ছা, কেমন হয় আমি যদি এখন ওপরে উঠে গিয়ে ভলোদিয়ার মত মাশাকে চুমু খেতে চেষ্টা করি? এই আমি একটা মস্ত চওড়া নাক, আর একমাথা এলোমেলো চুল নিয়ে কি জবাব দেব যদি ও জিজ্ঞাসা করে কি চাই আমার? মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম, মাশা বলছে, "আঃ, কি বিপদ। কেন এমনি করে জ্বালাচ্ছ আমাকে? যাও, যাও বদমাস কোথাকার! নিকোলাই পেত্রোভিচ্ তো এখানে এসে যা তা করে না?" মাশা তো জানত না, নিকোলাই পেত্রোভিচ্ ঠিক সে মুহূর্তে সিঁড়ির মুখে বসে আছে আর ঐ বদমাস ভলোদিয়াটার স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য সে তখন দুনিয়ার সবকিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত!

আমি স্বভাবের দিক থেকে ছিলাম একটু মুখচোরা। কিন্তু আমি ভয়ানক কুৎসিত, এই বিশ্বাসই আমার বিনীত ভাব হাজারো গুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার ধারণা, জীবনের পথ ঠিক করার ব্যাপারে মানুষের ব্যক্তিগত সৌন্দর্যের একটা বিশেষ দাম আছে—আবার তার চাইতেও বেশী প্রভাব হচ্ছে এ সম্বন্ধে তার নিজের ধারণাটার অর্থাৎ তার চেহারা মানুষকে আকর্ষণ করে, কি করে না এ সম্বন্ধে সে কি ভাবে।

যা আছে তাই নিয়ে খুশী থাকতে আমার অহঙ্কারে বাধত, তাই মনকে

সান্ত্বনা দিতাম, "আঙুরফলগুলো টক" বলে ; অর্থাৎ সুন্দর চেহারা থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায়, আমার চোখে ভলোদিয়া সেটা পুরোমাত্রায় উপভোগ করত, আর হিংসায় মনে মনে আমি জ্বলতাম—সে সব আনন্দকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম আর অহঙ্কারের সঙ্গে একটু দূরে দূরে নির্জনে সরে থাকাতেই সান্ত্বনা পেতাম।

সপ্তম অধ্যায়

পটকা

"কি সর্বনাশ, বারুদ!" মিমি আতঙ্কে চোখ কপালে তুলে চেঁচামেচি করে ওঠে, "করছ কি? বাড়িশুদ্ধ সব্বাইকে পুড়িয়ে মারতে চাও?"

মিমি এক অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে হুকুম করে আমাদের সবাইকে সরে যেতে, তারপর নিজে শক্ত হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পটকার টুকরোগুলোর কাছে যায়। হঠাৎ কেটে গিয়ে বিপদ ঘটাতে পারে, এ কথা জেনেও মিমি পা দিয়ে চেপে চেপে দিতে থাকে। যখন মনে করল আর ভয়ের কারণ নেই, তখন সে মিখেইকে ডেকে হুকুম দিল বারুদগুলো যতদূরে সম্ভব ফেলে দিতে, সম্ভব হলে একেবারে জলের ভেতর।

তারপর চালের সঙ্গে টুপিটা ঠিকঠাক করতে করতে ড্রইংরুমে চলে গেল। যাবার সময় তাকে গজগজ করতে শোনা গেল, "ছেলেদুটো খুব মানুষ হচ্ছে যা হোক!"

সেদিন বাবা নেমে এলে সবাই মিলে যখন দিদিমার ঘরে গেলাম, মিমি তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। দেখলাম, জানালার কাছে বেশ মাতব্বরী কায়দায় বসে ঘন ঘন চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে দরজার দিকে। ওর হাতে একটা কাগজের মোড়ক। অনুমান করলাম, ওটা সেই পটকাটা। তাহলে দিদিমা ইতিমধ্যেই সব জেনে ফেলেছেন।

মিমির পাশে গাশা, দিদিমার ঝি, লাল মুখ আর রাগত ভাব দেখে মনে হল ভীষণ চটেছে কোন কারণে আর এদিকে বেঁটেখাটো ডাঃ ব্লুমেনথল, মুখে বসন্তের দাগ—তিনি আবার চোখ আর মাথার নানা ভঙ্গি করে ইশারায় প্রাণপণে চেষ্টা করছেন গাশাকে ঠাণ্ডা করতে।

দিদিমা নিজে বসেছেন সামান্য একটু পাশ ফিরে অর্থাৎ তাঁরও মেজাজটা যতদূর সম্ভব তিরিক্ষে।

"আজকে কেমন আছেন, মা-মণির বেশ ভাল ঘুম হয়েছিল তো?" ঠোঁট দিয়ে দিদিমার করস্পর্শ করে বাবা সশ্রদ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

"বেশ ভাল। আশা করি, তুমি জান, আমি সবসময় ভালই থাকি।" দিদিমার গলার স্বর বুঝিয়ে দিল বাবার প্রশ্নটা সাংঘাতিক বেমানান এবং রূঢ় হয়েছে। তারপর গাশার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, "তা, তুমি কি আমাকে একখানা ফর্সা রুমাল দেবে?" এবার গাশার দিকে ফিরে বললেন।

"আপনাকে দিয়েছি।" গাশা আঙুল দিয়ে চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা বরফের মত সাদা একখানা রুমাল দেখাল।

"ও নোংরাখানা সরিয়ে নিয়ে, ফর্সা একখানা দাও, বুঝলে?"

গাশা আলমারীর কাছে গিয়ে হ্যাচ্‌কা টানে দেরাজ খুলে আবার তক্ষুনি সেটা থ্যাচ্ করে বন্ধ করে দিল—সে ধাক্কায় ঘরের সব কাঁচের জিনিসপত্রগুলো ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। দিদিমা ভয়ঙ্কর মুখ করে চারিদিকে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের সব্বাইকে দেখলেন তারপর খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলেন তাঁর ঝির হাবভাব। গাশা একটা রুমাল এনে দিতে—আমার মনে হল আগের সেইটাই—দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, "বলি, আমার নস্যিটা কখন গুঁড়ো করা হবে?"

"হাত খালি হলে করব।"

"কি? কি বললে?"

"করব'খন আজ।"

"তোমার যদি আমার এখানে কাজ করতে ভাল না লাগে, সে কথা বললেই পারতে। অনেক আগেই তাহলে তোমায় ছাড়িয়ে দিতাম।"

"আপনি ছাড়িয়ে দিলে আমি একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দেব না"—চাপা গলায় বিড়বিড় করল গাশা।

এই সময়ে ডাক্তার আর একবার গাশার দিকে তাকিয়ে একটু চোখ টিপতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু গাশা এমনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল যে ডাক্তারের চোখে চোখ পড়তেই তিনি চট্ করে চোখ নামিয়ে নিয়ে কব্জীর ঘড়িটার দম দেবার চাবিটা নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গাশা আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। দিদিমা তখন বাবার দিকে ফিরে বললেন, "দেখেছ তো, আমার নিজেরই বাড়িতে আমার সঙ্গে লোকেরা কি রকম সমান উত্তর করে?"

"আপনি যদি অনুমতি দেন, মা, তবে আমিই আপনার নস্যি গুঁড়িয়ে দেব।"

বোঝা গেল বাবা ভারী অস্বস্তি বোধ করছেন এমনি একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ে।

"না ; ধন্যবাদ। ও জানে আমার পছন্দ মত নস্যি আর কেউ গুঁড়োতে পারবে না, তাই ওর এত আস্পর্ধা। ভাল কথা, তুমি কি জান," সামান্য একটু দম নিয়ে দিদিমা আবার বলতে থাকেন, "তোমার ছেলেরা আজ বাড়িতে প্রায়ই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ?" নম্র ভাবে বাবা তাকিয়ে রইলেন জিজ্ঞাসু চোখে।

"হ্যাঁ। ঐ যে, ঐ নিয়ে ওরা খেলা করে। "দেখাও তো," মিমির দিকে তাকিয়ে দিদিমা বলেন। বাবা পট্‌কাটা হাতে নিয়ে হাসি চাপতে পারলেন না। "সে কি, এটা তো সামান্য একটা পট্‌কা। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।"

"থাক, খুব হয়েছে, এই বয়েসে আর আমাকে শিক্ষা দিতে হবে না।"

"ডাক্তার ফিস্‌ফিস্ করে বলেন, "উঁহু, উত্তেজিত হবেন না।"

বাবা তৎক্ষণাৎ আমাদের দিকে ফিরে বলেন, "কী সর্বনাশ। ও জিনিস তোরা কোথায় পেলি ? এই সব জিনিস নিয়ে কেউ কখনও খেলে ? তোদের সাহস তো কম নয় !"

"বলে কী হবে, চাকরটাকে ডেকে ওদের জিজ্ঞেস কর।" দিদিমা চাকর শব্দটা বিশেষ ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। "কি রকম দেখাশোনা করে সে ?"

"ভলদেমার বলছিল, কার্ল ইভানিচ্ নিজেই ওদের বাজি এনে দিয়েছেন।" মিমি বলে ওঠে।

"দেখ, কেমন চমৎকার লোক ?" দিদিমা বলতে থাকেন "কোথায় সেই চাকরটা ? কি নাম তার ? তাকে পাঠিয়ে দাও এখেনে।"

"আমি তাকে একটু ছুটি দিয়েছি, কার সঙ্গে যেন দেখা করতে গিয়েছে।" বাবা এতক্ষণে কথা বলেন।

"ওসব চলবে না মোটেই। তার সব সময়ই এখানে থাকা উচিত। অবশ্য ছেলেপুলেরা তোমার, আমার না, আর তোমাকে উপদেশ দেওয়ারও আমার কোন অধিকার নেই, কেননা আমার চাইতে তুমি অনেক বেশী জ্ঞানী। তবে আমার মতে, এখনই একজন মাস্টার রাখা হোক—চাকর নয়। আর কী ছিরির চাকর ! একে জার্মান, তায় অজ্ঞ চাষা—ওর কাছ থেকে ছেলেরা যত সব ছোটলোকোমি আর টাইরলী গান ছাড়া কীই বা শিখবে ? আচ্ছা বলতে পার, ছেলেদের টাইরলী গান কি না শেখালেই নয় ? অবশ্য বলেই বা কী

লাভ! ওদের কথা এখন ভাববার আর কেই বা আছে? তা বাপু, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

"এখন" কথাটার মানে হল ওদের তো আর এখন মা নেই। সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার মন স্মৃতিভারাতুর হয়ে উঠল : নস্যির ডিবের ওপরকার ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তিনি চিন্তার অতলে ডুবে গেলেন।

"আমিও অনেকদিন ধরেই ভাবছি এ সম্বন্ধে", বাবা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "আর আপনার উপদেশও চাইব ভাবছিলুম, মা। আচ্ছা, তাহলে কি সেণ্ট জেরোমকে একবার বলে দেখব? উনি তো ওদের দিনের বেলায় পড়াচ্ছেন।"

"তাহলে তো খুবই ভাল হয়!" দিদিমার কথায় আর আগের মতন অসন্তোষের সুর নেই, "সেণ্ট জেরোম আর যাই হোক একজন শিক্ষক, বড় ঘরের ছেলে-মেয়েদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, তা তিনি জানেন। উনি তো আর সামান্য একজন বাচ্চা-রাখা চাকর নন, ছেলেদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া যার আর কোন মুরোদ নেই!"

"আমি কালই ওঁর সঙ্গে কথা বলব।" বাবা বলেন। সত্যি সত্যিই এই কথাবার্তার ঠিক দু দিন পরেই কার্ল ইভানিচ্‌কে চলে যেতে হয় আর তার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসলেন কচি বয়সের ফরাসী ফুলবাবুটি।

অষ্টম অধ্যায়

কার্ল ইভানিচের ইতিহাস

কার্ল ইভানিচের বিদায়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা। কার্ল ইভানিচ্ তাঁর তুলোভরা ওভারকোট আর লালটুপি পরে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে ট্রাঙ্কের ভেতর সাবধানে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলেন।

সম্প্রতি কার্ল ইভানিচের ব্যবহারটা হয়ে পড়েছিল একটু আড়ষ্ট—আমাদের সঙ্গে মেলামেশাটাই যেন তিনি এড়িয়ে চলছিলেন: আজকেও যখন আমি ঘরে ঢুকলাম, ম্রিয়মাণ ভাবে একবার মাত্র আমার দিকে তাকিয়েই আবার নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগলেন। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম, যদিও আগে হলে কার্ল ইভানিচ্ ব'কে একশেষ করতেন। আজকে কিন্তু তিনি কিচ্ছুই বললেন না। আর কোনদিন আমাদের আর উনি শাসন করবেন না, আমাদের ওপর ওঁর আর কোনই অধিকার থাকবে না—এ কথা মনে হতেই ওঁর আসন্ন বিদায়ের কথা মনে পড়ে গেল। আর উনি আমাদের ভালবাসেন না—এ কথা মনে হতেই বুকটা টনটন করে উঠল। কথাটা তাঁকে মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছে করল। তাই ওঁর কাছে উঠে গিয়ে বললাম, "কার্ল ইভানিচ আমাকে একটু সাহায্য করতে দিন।" এক লহমা আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন কার্ল ইভানিচ্। আমাদের সঙ্গে ওঁর সাম্প্রতিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনে ভেবেছিলাম উনি আমাদের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত—কিন্তু এখন এই একটি নিমেষের দৃষ্টিপাতে দেখতে পেলাম, না, উদাসীনতা নয়, গভীর চাপা দুঃখের আবেগে ওঁর মুখচোখ ভার।

"ভগবান সব কিছুই দেখছেন, সবই জানেন। সব কাজে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক," কার্ল ইভানিচ্ সোজা টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। ব্যথিত চোখে সমবেদনা নিয়ে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি আবার বলেন, "হ্যাঁ, নিকোলেঙ্কা, আমার ভাগ্যই এই, খালি দুঃখ পাওয়া—সেই জন্ম থেকে শুরু করে কবরে যাওয়া অবধি। মানুষের উপকার করে তার পরিবর্তে

সব সময়ই পেয়েছি অন্যায় ব্যবহার। আমার পুরস্কার এখানে কোথাও মিলবে না, পরে ওখানে”—ইঙ্গিতে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলেন, “তুমি যদি কেবল আমার ইতিহাস জানতে, জানতে সারাটা জীবন কি না সহ্য করলাম! মুচির কাজ করেছি, সৈন্য হয়েছি, সেখান থেকে পালিয়েছি, কারখানার মজুর হয়েছি, শিক্ষকতা করেছি, আর এখন আমি কিছুই নই···ভগবানের পুত্রের মত আমারও আজ মাথা রাখবার ঠাঁই নেই”—কথা শেষ করে কার্ল ইভানিচ্ চোখ মুদে একটা চেয়ারে বসে পড়েন।

কার্ল ইভানিচের মনের এখন সেই অবস্থা, যখন মানুষ কোন একজন শ্রোতাকে উপলক্ষ্য করে প্রাণের আবেগ মুক্ত করে দেয় কেবল নিজেরই তৃপ্তির জন্যে, আসল শ্রোতাকে খেয়াল না করেই—তা বুঝতে পেরে আমি বিছানার ওপর চুপটি করে বসে রইলাম, কার্ল ইভানিচের ব্যথিত মুখ থেকে সে দৃষ্টি না সরিয়ে।

“তুমি আর এখন শিশু নও, কাজেই বুঝতে পারবে। আমার জীবনের কথা তোমাকে বলব, সব বলব, সারা জীবন ধরে যতকিছু সহ্য করেছি। একদিন তোমাদের মনে পড়বে এই পুরনো বন্ধুর কথা—যে তোমাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসত।”

পাশের একটা টেবিলের ওপর কার্ল ইভানিচ কনুইয়ের ভর দিলেন, তারপর এক টিপ নস্যি নিয়ে তার নিজস্ব ভঙ্গী সেই অদ্ভুত এক সমান স্বরে, যে স্বরে তিনি রোজ আমাদের ডিকটেশান দিতেন, সেই স্বরে নিজের কথা বলতে শুরু করলেন।

“আমার দুঃখ শুরু হয়েছে জন্মের আগে থেকেই,” ভারী গলায় বলতে থাকেন কার্ল ইভানিচ্।

জীবন-কাহিনী বলতে বলতে কার্ল ইভানিচ একই ঘটনার বারবার উল্লেখ করেছিলেন একই কথায়; একই স্বরে, একই ঢঙে—তাই আশা করি, তাঁর কথার আমি পুনরাবৃত্তি করতে পারব, একটি শব্দেরও অদলবদল না করে, কেবল তাঁর রুশ ভাষার ভুলচুক বাদ দিয়ে। এটা সত্যিই তাঁর নিজের জীবন-কাহিনী, অথবা আমাদের বাড়িতে নির্জন বাসের সৃষ্টি নিছক কল্পনা কিংবা প্রকৃত ঘটনার ওপর অনেকখানি রং চড়ানো—সে কথা আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। একদিকে তাঁর বর্ণনা ছিল যেমনি জীবন্ত তেমনি সাজানো ঘটনা পরম্পরায়। সত্যনিষ্ঠার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, আবার তেমনি সে বর্ণনা এমনি কবিত্বময়, ঘটনাবহুল যে সহজেই মনে সন্দেহ জাগায়।

"আমার শিরায় বইছে কাউণ্ট অব্ সমারব্লাডের নীল রক্ত। আমি জন্মাই মায়ের বিয়ের ঠিক ছ'সপ্তাহ পরে। আমার মায়ের স্বামী (আমি তাকে বাবা-ই বলতাম) কাউণ্ট সমারব্লাডের অধীনে চাষবাস করতেন। তিনি আমার মায়ের কলঙ্কের কথা কোনদিন ভোলেননি, আমাকেও একটুও ভালবাসতে পারেন নি। আমার একটি ছোট ভাই ছিল জোহান আর দুটি বোন। কিন্তু নিজের বাড়িতেই আমি যেন চোর হয়ে থাকতাম। জোহান বোকার মত কোন কাজ করলে বাবা বলতেন, "ঐ কার্ল ছেলেটাকে নিয়ে আমার এক মুহূর্তেরও শান্তি নেই।" আমাকে বকাঝকা করতেন, শাস্তি দিতেন। বোনেরা হয়তো দুজনে মিলে ঝগড়াঝাঁটি করল, বাবা অমনি বলে উঠলেন, 'এই কার্ল ছেলেটা কোনদিনই শান্তশিষ্ট, বাধ্য হবে না।' ফলে আমার লাভ হল আবার বকুনি আর শাস্তি।

"মা কিন্তু আমাকে খুব ভাল বাসতেন, আদর করতেন। মাঝে মাঝেই আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আদর করতেন, বলতেন, "বেচারা, বেচারা আমার কার্ল। কেউ তোমাকে ভালবাসে না, কিন্তু আমি আছি··· তোমার বদলে আমি অন্য কাউকেই চাই না। একটা জিনিস শুধু তোমার মা-মণি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছে: ভাল করে পড়াশুনো করো, আর সব সময় সৎপথে থেকো। তাহলে ভগবান তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না।" আমি সেই চেষ্টাই করতাম। আমার বয়স যখন চোদ্দ হল, মা একদিন বললেন বাবাকে, "কার্ল তো বেশ বড়সড় হয়ে উঠল, গুস্তাভ, ওকে নিয়ে কি করা যায় বল তো?" বাবার একেবারে সাফ জবাব, "আমি জানি না।" মা আবার বলেন, "ওকে বরং আমরা শহরে হের্ স্থণ্টদের কাছে পাঠিয়ে দিই, জুতো তৈরির কাজ শিখুক।" "বেশ, ভাল কথা" বাবা বললেন। পুরো ছ বছর সাত মাস আমার কাটল শহরে, জুতো তৈরির কারখানায়। ওস্তাগর আমাকে খুবই ভালবাসতেন, বলতেন, "কার্ল খুব ভাল কাজ শিখেছে, শীগ্‌গিরই আমার জায়গায় বসতে পারবে।" কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ১৭৯৬ সালে লড়াইয়ের জন্য সৈন্য যোগাড়ের হিড়িক পড়ল—আঠার থেকে একুশ বছরের সব জোয়ান ছেলেদের শহরে যেতে হল পরীক্ষা দিতে।

"বাবা আর জোহান শহরে এল, আমরা সবাই মিলে চললাম ভাগ্যপরীক্ষা করতে। জোহান খুব কম নম্বর পেল, ওকে সৈন্য হতেই হবে; আমার নম্বর বেশ ভাল, আমি যেতে বাধ্য নই। বাবা বললেন, "আমার একটাই মোটে ছেলে তা সেটাকেও বিদায় দিতে হবে।"

"বাবার হাত ধরে আমি বললাম, "তুমি কেন ওকথা বললে বাবা? আমার সঙ্গে এস, তোমাকে একটা কথা বলব।" বাবা এল, সবাই মিলে একটা হোটেলে গিয়ে বসলাম। বললাম, "দু'বোতল বীয়ার নিয়ে এস।" বীয়ার এলে আমরা দুজনে একটা বোতল শেষ করে ফেললাম। জোহানও তাতে ভাগ বসাল।

"বাবা," এবার আমি বললাম, "আর কখনো বলো না যে তোমার একটাই ছেলে ছিল, তাকেও হারাতে হচ্ছে। ও কথা শুনলে আমার বুক ফেটে যায়। ভাই জোহানকে পল্টন হতে হবে না; ওর বদলে আমিই হব। এখানে কার্লকে কেউ চায় না; সে পল্টন হয়ে চলে যাবে।"

"তুমি খুব সাচ্চা মানুষ, কার্ল।" বলে বাবা আমাকে চুমো খেলেন।

"তারপর আমি পল্টনে নাম লেখালাম।"

নবম অধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

"সে এক নিদারুণ সময় গেছে, নিকোলেঙ্কা," কার্ল ইভানিচ্ বলতে থাকেন, "নেপোলিয়ন তখন বেঁচে। তিনি চেয়েছিলেন জার্মানী দখল করে নিতে আর আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে নিজের দেশকে রক্ষা করেছি।"

"আমি উল্‌মে ছিলাম, আউস্টারলিট্‌জে ছিলাম, ওয়াগ্রামে ছিলাম।"

"আপনি লড়াইও করেছিলেন?" অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, "মানুষও মেরেছিলেন?"

কার্ল ইভানিচ্ তক্ষুনি আমাকে আশ্বস্ত করেন।

"একবার এক ফরাসী বোমারু দলছাড়া হয়ে রাস্তায় পিছিয়ে পড়তেই বন্দুক হাতে নিয়ে আমি ছুটে গেলাম। তাকে মারতে যাব এমন সময় লোকটা তার হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'আমাকে মেরো না'।"

"ওয়াগ্রামে দ্বীপ বরাবর নেপোলিয়ন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেলন। কোনদিকে পালাবার পথ নেই। তিনদিন আমাদের খাবার কিছু ছিল না, আর হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবে থাকতে হয়েছিল।"

"চার দিনের দিন কপালগুণে আমরা ধরা পড়ে গেলাম, একটা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। আমি পরেছিলাম একটা নীল রঙের প্যাণ্ট, একটা ভাল কাপড়ের উর্দি, পনেরোটা জার্মান টাকা আর বাবার দেওয়া একটা রুপোর ঘড়ি। একজন ফরাসী সৈন্য সে সবই আমার কাছ থেকে কেড়েকুড়ে নিল। ভাগ্যিস্, তিনটে মোহর মা আমার ভেতরের জামার মধ্যে রেখে সেলাই করে দিয়েছিলেন। তাই কেউ আর সেগুলোর খোঁজ পায়নি।

"দুর্গে বন্দী হয়ে বেশীদিন থাকার মতলব ছিল না। ঠিক করলাম পালাব। একদিন একটা বড় রকমের পরবের দিনে আমাদের পাহারাদার সার্জেণ্টকে ডেকে আমি বললাম, 'হের্ সার্জেণ্ট, আজ খুব বড় পরব; আমি দিনটা পালন করতে চাই। দয়া করে দু'বোতল মাদেইরা আন, দুজনে মিলে খাওয়া যাক।'"

মদ এল, দুজনেই এক বোতল করে শেষ করলাম। তারপর ওর হাতটা ধরে ফেলে বলি, 'সার্জেণ্ট, তোমার কি মা-বাবা আছেন?' 'আছেন, হের্ মউয়ার'—সে জবাব দেয়। আমি বলি, 'আমার বাবা-মা আমাকে আট বছর হল দেখেন নি। আমি বেঁচে আছি, কি আমার হাড় কখানা মাটিতে মিশেছে—তাও তাঁরা জানেন না। হের্ সার্জেণ্ট! আমার ভেতরের জামায় সেলাই করা দুটি মোহর আছে। সেগুলো নিয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। দোহাই তোমার আমার এই উপকারটুকু কর, আমার মা তোমার জন্য সারা জীবন ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন।'

"সার্জেণ্ট এক গ্লাস মাদেইরা শেষ করল, তারপর বলল, 'হের্ মউয়ার, তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমার জন্যে খুব দুঃখ্যও হয়। কিন্তু তুমি বন্দী, আমি একজন প্রহরী।' আমি ওর হাতখানা চেপে ধরে কাতর মিনতি জানাতে থাকি। খানিকটা পরে সার্জেণ্ট বলে, 'তুমি গরীব মানুষ, তোমার টাকা আমি নেব না। কিন্তু সাহায্য করব। আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ব, এক জালা ব্র্যাণ্ডি কিনে অন্য সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দাও—ওরাও তাহলে ঘুমিয়ে পড়বে। আমি তোমার দিকে কোন নজর দেব না।'

"লোকটা সত্যিই ভাল ছিল। মদ আনালাম আর সৈন্যেরা যখন সবাই মদ খেয়ে চুর হয়ে রইল আমি সেই ফাঁকে জুতো পায়ে দিয়ে মস্ত ওভারকোটটা মুড়িসুড়ি মেরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দেওয়ালের কাছে গেলাম লাফিয়ে পার হব বলে। কিন্তু সেখানে জল: অবশিষ্ট একটি মাত্র পোশাক ভিজিয়ে ফেললে চলবে না। কাজেই ফটকের দিকে চললাম।

"ফটকে পাহারা; প্রহরী বন্দুক হাতে পায়চারী করছে সামনে, পেছনে। তাকাল আমার দিকে। 'কে যায়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ওঠে। কোন জবাব দিলাম না। 'কে যায়?' আবার জিজ্ঞেস করল দ্বিতীয়বার। তৃতীয়বার 'কে যায়' বলতেই আমি দৌড় লাগালাম। জলের ভিতর লাফিয়ে পড়ে দেয়াল বেয়ে উল্টো দিকে পড়ে দে ছুট।

"সারাটা রাত আমি রাস্তা ধরে তাড়া খাওয়া জন্তুর মত ছুটলাম, কেবল ছুটলাম। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতেই ভয় হল ওরা হয়তো চিনে ফেলবে—তাই মাঠে নেমে সর্ষের ক্ষেতে লুকিয়ে পড়লাম। হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে কত প্রার্থনা করলাম, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে, তারপর শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"সন্ধ্যেবেলা ঘুম ভাঙতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটো কালো ঘোড়া জোতা একটা জার্মান মালটানা গাড়ি আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িতে বসে একজন ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক পাইপ মুখে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখছিলেন। আমি আস্তে হাঁটতে লাগলাম যাতে গাড়িটা পেরিয়ে চলে যায়; কিন্তু গাড়িটারও গতি মন্থর হয়ে গেল, ভদ্রলোক তাকিয়েই রইলেন একদৃষ্টে। জোরে হাঁটলাম, গাড়িও জোরে চলল, ভদ্রলোকেরও সেই একই ভাব। এবারে পথের ধারে বসে পড়লাম, ভদ্রলোক তখন ঘোড়া থামিয়ে আমায় ডাকলেন 'ওহে, শোন, শোন, এত রাতে কোথায় চলেছ তুমি?' 'আমি ফ্রাঙ্কফোর্টে যাচ্ছি।' জবাব দিলাম। 'এস, আমার গাড়িতে ওঠ, অনেক জায়গা আছে। আমি তোমাকে পৌঁছে দেব'খন।' উঠে গিয়ে পাশে বসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? সঙ্গে কিছু আননি? একমুখ দাঁড়ি কেন? তোমার কাপড়চোপড় কাদামাখা কেন?' 'আমি নিতান্তই গরীব। কোথাও কাজ পাই কি না দেখতে যাচ্ছি। রাস্তায় পড়ে গিয়ে কাপড়ে কাদা লেগেছে,' আমি জবাব দিই। 'না, তুমি ঠিক বলছ না। রাস্তা তো এখন শুকনো খটখটে।'

"শুনে আমি চুপ করে রইলাম।"

"আমার কাছে লুকিও না। খুলে বল তো, ব্যাপারটা কি? তুমি কে, কোথা থেকেই বা আসছ? তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছে। যদি সত্যিই ভাল লোক হও, আমার সাহায্য পাবে।"

"এবার সব কথা খুলে বললাম। শুনে বললেন, 'সাবাস। তুমি আমাদের দড়ি বানাবার কারখানায় চল। কাজ দেব, কাপড়চোপড় টাকাপয়সা পাবে, আমার সঙ্গেই থাকবে'।

"'ভাল কথা,' আমি বললাম।

"আমরা ওঁর সেই কারখানায় গেলাম। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'দেখ, এই ছেলেটি দেশের জন্য লড়াই করেছে, বন্দী হয়েছিল, সেখান থেকে পালিয়েছে। ও আমাদের এখানেই থাকবে। ওকে কিছু ফর্সা কাপড়চোপড় দাও আর খেতে দাও।"

"আমি সেই কারখানায় ছিলাম দেড় বছর। মনিব এত ভালবাসতেন যে, কোথাও যেতে দিতেন না। আমি তখন একজন সুদর্শন তরুণ, লম্বা সুঠাম চেহারা, নীল চোখ আর রোমান নাক আর মনিবের স্ত্রী ম্যাডাম এল (নামোল্লেখ করব না) ছিলেন সুন্দরী তরুণী—তিনি প্রেমে পড়লেন আমার।

"আমাকে ডেকে একদিন বললেন, 'হের্ মউয়ার, তোমার মা তোমাকে কী বলে ডাকেন ?' আমি বললাম, 'কার্লচেন'।"

"কার্লচেন, আমার পাশে বস।"

"পাশে বসলে বললেন, কার্লচেন, আমাকে চুমু খাও'।

"চুমু খেলাম। তিনি বললেন, 'কার্লচেন, আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে আর সহ্য করতে পারছি না।' তাঁর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল।"

এই পর্যন্ত বলে কার্ল ইভানিচ্ নীরব হলেন ; অনেকক্ষণ চুপ করে একভাবে বসে থাকলেন। নীল সকরুণ দুটো চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে মাথাটা দোলাতে লাগলেন, মুখে স্মিত হাসি—যেন কোন স্মৃতির আবেশে ডুবে গেছেন।

"হ্যাঁ," চেয়ারে নড়েচড়ে বসে ড্রেসিং গাউনটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন, "জীবনে অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি, ভাল, মন্দ দুইই। কিন্তু ঐ উনিই আমার একমাত্র সাক্ষী," ক্যানভাসের ওপর এমব্রয়ডারী করা ত্রাণকর্তা যীশুর একটা ছবি দেখিয়ে বলেন, "কেউ বলতে পারবে না, কার্ল ইভানিচ্ কখনও কোন অন্যায় করেছে। হের এল্-এর সদয় ব্যবহারের ঋণ এমনি হীন অকৃতজ্ঞতা দিয়ে শোধ করতে পারলাম না, কাজেই ঠিক করলাম পালাব। সন্ধ্যেবেলায় সবাই যখন শুতে গেল, হের এল্-এর নামে একখানা চিঠি লিখে আমার বিছানার ওপর রেখে দিলাম, কাপড়চোপড় আর সামান্য কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কেউ আমাকে দেখতে পেল না। রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম।"

দশম অধ্যায়

জের

"পুরো ন বছর হল, মাকে একটিবার চোখের দেখাও দেখিনি।" আজও বেঁচে আছেন, না হাড় কখানা মাটিতে মিশেছে, জানি না। দেশে ফিরে এলাম। শহরে পৌছে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম 'কাউণ্ট সমারব্লাডের জমি চাষ করতেন গুস্তাভে মউয়ার—তিনি এখন কোথায় থাকেন?' লোকে বলল, 'কাউণ্ট সমারব্লাড মারা গেছেন আর গুস্তাভ্ মউয়ার থাকেন বড় রাস্তায়, একটা মদের দোকান খুলেছেন।' আমি নতুন ভেস্টটা গায়ে চড়িয়ে চুলটা বেশ করে আঁচড়ে বাবার মদের দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। আমার বোন মিরিয়োচেন বসেছিল দোকানে, জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই!' 'এক গ্লাস মদ পেতে পারি কি?' আমি বলি। ও ডেকে বলে, 'বাবা, একটি ছেলে এক গ্লাস মদ চাইছে।' বাবা জবাব দিলেন, 'দাও, এক গ্লাস।' আমি টেবিলে বসে মদের গ্লাসটি শেষ করলাম, পাইপ টানতে টানতে সবাইকে লক্ষ্য করতে লাগলাম; বাবা, মিরিয়োচেন—জোহানও ইতিমধ্যে দোকানে এসে ঢুকেছে। কথায় কথায় বাবা আমাকে বলে বসলেন, 'তুমি বলতে পার, বাবা, আমাদের পল্টনের দল এখন কোথায় আছে?' উত্তরে বললাম, 'আমিও ঐ পল্টন থেকে আসছি। ওরা আছে এখন ভিয়েনার কাছে-পিঠে।' শুনে বাবা বললেন, 'আমার ছেলে পল্টনে ছিল। ন বছর আগে তার শেষ চিঠি পেয়েছি। জানি না বেঁচে আছে, কি মারা গেছে। আমার স্ত্রী সবসময়ই কান্নাকাটি করে।' পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা করি, 'তার নাম কি? কোন দলে আছে, বলতে পারেন? হয়তো আমি চিনতেও পারি।' বাবা বললেন, 'তার নাম ছিল কার্ল মউয়ার, ভর্তি হয়েছিল অস্ট্রিয়ান জাগার্স্ দলে।' 'তোমার মতই লম্বা, সুন্দর দেখতে ছিল,' বোন মিরিয়োচেন বলে উঠল।

"তোমাদের কার্লকে আমি চিনি", বললাম। হঠাৎ বাবা হেঁকে উঠলেন, "আমালিয়া", শীগ্‌গির এস, এখানে একটি ছেলে এসেছে, আমাদের কার্লকে

চেনে।" সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়ে আমার মা-মণি ঘরে এসে হাজির। দেখেই আমি চিনতে পারলাম। 'আমাদের কার্লকে তুমি চেন?' দেখি বলতে বলতে মার শরীর কাঁপছে, মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি।' মার মুখের দিকে তাকাতে ভরসা হল না। আমার বুক তখন ফেটে যাচ্ছে। 'আমার কার্ল তাহলে বেঁচে আছে? অশেষ দয়া তাঁর! তুমি কি জান সে কোথায় আছে? আমার কার্ল? আমার মানিককে যদি একটিবার শেষ দেখা দেখতে পেতাম, তবে শান্তিতে মরতে পারতাম। কিন্তু ভগবানের তা ইচ্ছে নয়।' কথার শেষে মা কাঁদতে শুরু করলেন। আমি আর পারলাম না, বলে উঠলাম, "মা, মা-মনি, আমিই তোমার সেই কার্ল।" আমার কোলের মধ্যে মা ভেঙে পড়লেন।

কার্ল ইভানিচ্ চোখ বন্ধ করলেন, ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল থরথর করে। একটু পরে বাবা নিজেকে খানিকটা সামলে নিলেন। তারপর গালের ওপর গড়িয়ে-পড়া চোখের জলের বড় বড় ফোঁটাগুলো মুছে ফেললেন।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে ছিল না যে আমার শেষ জীবনটা নিজের দেশে ঘরে কাটে। আমার কপালে সুখ লেখেনি। নিজের দেশে আমি বাস করলাম মোটে তিনটা মাস। এক রবিবারে কফি হাউসে গিয়েছি। একপাত্র বীয়ার কিনে বসে বসে পাইপ টানছি আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রাজনীতি চর্চা করছি। কখনও সম্রাট ফ্রান্জ্, কখনও নেপোলিয়ন আর যুদ্ধের বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। সবাই যে যার মত বলছে। আমাদের কাছেই পাঁশুটে পোশাক-পরা এক অচেনা ভদ্রলোক একটাও কথা না বলে চুপচাপ কফি খাচ্ছিলেন আর পাইপ টানছিলেন। চৌকিদারের মুখে রাত দশটা বেজেছে শুনে আমি টুপি তুলে নিয়ে দাম চুকিয়ে বাড়ি রওনা হলাম। মাঝরাতে আমার দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?' উত্তর এল, 'দরজা' খোল।' 'কে তুমি, না বললে খুলব না।' জবাব এল, 'পরোয়ানা আছে, দরজা খোল।' দরজা খুলতেই দেখি সামনে বন্দুক হাতে দুজন সৈন্য। তাদের সঙ্গে কফি হাউসের সেই অপরিচিত লোকটা ঘরে এসে ঢুকল। সে গুপ্তচর! বলল, "আমার সঙ্গে আসুন।" "বেশ, ভাল কথা," বলে বুট পায়ে দিলাম, প্যাণ্ট পরলাম, ঘরের ভেতর এদিক-সেদিক একটু ঘুরে বেড়ালাম। মনে মনে রাগে ফুঁসছি। যে দেয়ালে আমার তলোয়ারটা ঝোলান ছিল, ঘুরতে ঘুরতে সেখানে পৌঁছেই চট্ করে তরোয়ালটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি, 'তুমি একটা ঘৃণ্য গুপ্তচর,

এবার নিজেকে সামলাও।' সঙ্গে সঙ্গেই আঘাত করলাম তাকে। ডাইনে, বাঁয়ে, মাথায়। লোকটা পড়ে গেল। আমিও হাত বাড়িয়ে স্যুটকেশ আর টাকার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়েই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লাম। সোজা গেলাম এম্‌স্‌-এ, সেখানে পরিচয় ঘটল জেনারেল সাজিনের সঙ্গে। তাঁর কেমন সুনজরে পড়ে গেলাম—রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে অনুমতিপত্র জোগাড় করে আমাকে রাশিয়ায় নিয়ে এলেন ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্যে। জেনারেল সাজিন মারা যেতে তোমার মা আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কার্ল ইভানিচ্‌, আমার ছেলেদের ভার দিলাম আপনার ওপর। ওদের খুব ভালবাসবেন, আমি কখনো ছাড়িয়ে দেব না আপনাকে। বুড়ো বয়সে স্বস্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দেব।' এখন তিনি মারা গেছেন, এসব কথা আর কারই বা মনে আছে? কুড়ি বছর চাকরির পর আজ রাস্তায় গিয়ে দাড়াচ্ছি এই বুড়ো বয়সে এক টুকরো শুকনো রুটির খোঁজে। ভগবান সবই দেখছেন, সবই জানেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে; খালি দুঃখ হয় তোমাদের জন্যে।" কার্ল ইভানিচ্‌ কথা শেষ করে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে আমার মাথায় চুমু খেলেন।

একাদশ অধ্যায়

খারাপ নম্বর

শোকের বছর পার হল; দিদিমাও একটু সামলে উঠলেন। মাঝে মাঝে অতিথি অভ্যাগত আসতে লাগল বিশেষ করে আমাদের বয়সী ছোট ছেলেমেয়েরা।

তেরই ডিসেম্বর লিউবোচ্‌কার জন্মতিথি উৎসবে প্রিন্সেস কর্নাকোভা তার মেয়েদের নিয়ে ভালাখিনা আর সোনেচ্‌কা, ইলেন্‌কা গ্রাপ আর আইভিনদের ছোট দুভাই—সবাই এসে পৌঁছলেন ডিনারের আগেই।

নীচের ড্রইংরুম থেকে ওদের কথা, হাসি, দৌড়দৌড়ির আওয়াজ ভেসে আসছিল—কিন্তু সকালের পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের হুকুম নেই ওদের কাছে যাবার! পড়ার ঘরের সময়-তালিকায় লেখা ছিল: সোমবার, দুটো থেকে তিনটে, ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক; আর এই ইতিহাসের শিক্ষকের জন্যই আমরা হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। তিনি আসবেন, পড়াবেন, পড়াশেষে বিদায় নেবেন, তবে হবে আমাদের ছুটি। দুটো বেজে কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত রাস্তাতেও তাঁর চিহ্নমাত্র নেই—আমি সেদিকে চোখ পেতেই রেখেছি, মনে মনে প্রার্থনা করছি ওঁর চেহারাটি যেন দেখতে না হয়।

"আজকে আর লিবোদভ আসবেন বলে মনে হচ্ছে না," স্মারাগডোভের বই থেকে পড়া তৈরি করতে করতে এক মিনিটের জন্য মুখ তুলে ভলোদিয়া বলে।

"হে ভগবান তাই যেন হয় উনি যেন না আসেন! আমার একদম পড়া হয়নি। হায় হায়, বলতে বলতেই উনি এসে গেছেন!" হতাশ হয়ে একেবারে বসে পড়লাম।

ভলোদিয়া উঠে জানালার কাছে গেল।

"না: উনি নন, অন্য কে একজন ভদ্রলোক যেন। আমরা আড়াইটে পর্যন্ত অপেক্ষা করব।" ভলোদিয়া হাত পা ছড়িয়ে টানটান হয়ে মাথা চুলকাতে

চুলকাতে বলে। কাজ করতে করতে একটু বিশ্রাম নিতে হলে ওমনি করাই ওর স্বভাব। "যদি আড়াইটের মধ্যে উনি এসে না পৌছান তবে সেণ্ট জেরোমকে বলব আমাদের বই খাতাগুলো নিয়ে যেতে।"

"আমি বুঝছি না, তাঁর আসবার দরকারটাই বা কী"—আমিও হাত পা টানটান করে কেইদানোভের বইটা তুলে মাথার ওপর দুহাত দিয়ে ধরে বলি।

হাতে কোন কাজ না থাকায়, বইটা খুলে পড়ার জায়গাটাই পড়তে থাকি। পড়াটা যেমনি লম্বা তেমনি শক্ত। পড়াটা আমার একেবারেই তৈরি হয়নি। যতই মনে হচ্ছে কিচ্ছু মনে করে বলতে পারব না ততই ভীষণ ঘাবড়ে যাচ্ছি, আর এই উত্তেজিত অবস্থায় পড়ায় মনই বসাতে পারছি না।

ইতিহাস পড়াবার দিন (বরাবরই ইতিহাস আমার কাছে সব চেয়ে অর্থহীন এবং নীরস বিষয় বলে মনে হত) পড়ার শেষে লিবেদভ সেণ্ট জেরোমের কাছে আমার নামে নালিশ করেছিলেন আর আমার রিপোর্টে দুই চিহ্ন দিয়েছিলেন, অর্থাৎ খুব খারাপ নম্বর। সেণ্ট জেরোম তক্ষুনি শাসিয়েছেন আসছে দিন যদি তিনের কমে নম্বর পাই তবে ভীষণ শাস্তি দেবেন। আজ সেই পড়া ধরবার দিন। কাজেই বেজায় ঘাবড়ে ছিলাম তাতে সন্দেহ নেই।

অপ্রস্তুত পড়াটা নিয়ে আমি এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম যে, পাশের ঘরে বুটের ওপরের রবারের জুতো খোলবার শব্দে হঠাৎ চমকে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে তাকাতে না তাকাতেই সেই বসন্তের দাগে ভরা মুখখানা যা দেখলে আমার ভীষণ বিরক্তি লাগে, আর পণ্ডিতী ভাব দেখান বোতাম বসান নীল কোট পরা মাস্টারমশাইর সেই চিরপরিচিত দেহটি দরজায় দেখতে পেলাম। ধীরেসুস্থেই তিনি জানালার ওপর টুপিটি রাখলেন। হাতের খাতাটি টেবিলের ওপর রেখে তারপর কোটের লেজটি একপাশে সরিয়ে (যেন ওটাও একটা বিশেষ জরুরী ব্যাপার) একটু ফুঁ দিয়ে নিজের চেয়ারটাতে বসে পড়লেন।

"এবারে মশাইরা"—ঘামে ভিজা হাতদুটো ঘসতে ঘসতে শুরু করেন, "তাহলে একটু আলোচনা করে দেখা যাক, আগের দিন আমরা কী কী শিখলাম। তারপর চেষ্টা করব মধ্যযুগের ও তার পরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে।"

তার মানে হল : 'পড়া বল'।

ভলোদিয়া খুব সহজে আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পড়া বলে যায়, বিষয়বস্তুটি

বেশ ভালভাবে জানা থাকলেই একমাত্র যা সম্ভব—আমি তখন এদিকে লক্ষ্যহীন ভাবে এক পা এক পা করে হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির কাছে গেলাম। নীচে যাবার হুকুম নেই, কাজেই আমার পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক যে নিজের অজান্তেই সিঁড়ির মুখের সেই বিশেষ জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছব। আর হলও ঠিক তাই ; সবে আমি দরজার আড়ালে একটু সুবিধে মতন দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, অমনি একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ল মিমি—এই মিমিই হচ্ছে সব সময় আমার কাল। "তুমি এখানে ?" মিমি চোখ ট্যারা করে একবার আমার দিকে আরেকবার ঝি-দের ঘরের দিকে তাকায়।

আমারও নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হল—একে আমি পড়ার ঘরে নেই তার ওপর এমন একটা জায়গায় এসেছি যেখানে আমার থাকা উচিত নয়। কাজেই আমি একটিও কথা না বলে, মাথা নিচু করে গোটা চেহারায় বিশেষ অনুতপ্তের একটা ভাব ফুটিয়ে তুলি।

"ছি ছি," মিমি বলে, "এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ ?" আমি চুপ করে থাকি। সিঁড়ির রেলিংয়ে আঙুলের গাঁটগুলো ঠুকে মিমি বলে, "এসব কথা আমি কাউন্টেসের কানে না তুলে ছাড়ছি না।"

পড়ার ঘরে যখন ফিরলাম, তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। মাস্টার-মশাই ভলোদিয়াকে নতুন পড়া বোঝাচ্ছেন। আমি এতক্ষণ ছিলাম না তা তিনি খেয়ালই করেননি। পড়ানো শেষ করে মাস্টারমশাই খাতা-পত্র গোছাতে লাগলেন, ভলোদিয়া পাশের ঘরে গেল নম্বরের টিকিট আনতে—আমারও মনে খুশীর আমেজ লাগল, যাক্ বাবা, বাঁচা গেল, আজকের মত পড়ানো শেষ। মাস্টারমশাই, আমার পড়া ধরতে ভুলেই গিয়েছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাস্টারমশাই আমার দিকে ফিরলেন, এক টুকরো বিষের মত হাসি হেসে বললেন, "তোমার পড়া নিশ্চয় তৈরি হয়েছে কি বল ?" হাত ঘসতে ঘসতে জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ, স্যার" জবাব দিই।

"বেশ। আচ্ছা, সেণ্ট লুইসের ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান, বল তো"—মাস্টার-মশাই চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। "প্রথমে বল সেই কারণ, যার জন্য ফরাসী সম্রাট ক্রুশ নিলেন।" ভ্রূ তুলে কালির বোতলের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইসারা করে বলেন, "তারপর সেই অভিযানের সাধারণ বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে পার"—হাতের কব্জি ঘুরিয়ে কি যেন

একটা ধরবার ভঙ্গী করলেন: "আর সব শেষে বলবে এই ধর্মযুদ্ধের কতখানি প্রভাব ইউরোপীয় দেশগুলির ওপর।" এবার হাতের খাতাখানা দিয়ে টেবিলের বাঁদিকে একটা ঘা মেরে বলেন, "আর বিশেষ করে ফরাসী সাম্রাজ্যের ওপর।" শেষ পর্যন্ত তিনি থামলেন টেবিলের ডানপাশে একটা ঘা মেরে ডানদিকে মাথাটা একটু হেলিয়ে।

আমি বার কয়েক ঢোঁক গিললাম, কাশলাম, ঘাড়টা একদিকে কাত করে চুপ করে থাকলাম। টেবিলের ওপর একটা ছোট্ট পালকের কলম ছিল, সেটাকে তুলে নিয়ে পালকের দিকটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না।

"দয়া করে আমাকে দাও ওটা। ওটা কাজে লাগে।" মাস্টারমশাই হাত বাড়িয়ে পাখাটা নিতে নিতে বলেন, "তারপর বল—"

"লুই···এই রাজা—মানে সেণ্ট লুই—ছিলেন—এই একজন বিচক্ষণ জার ছিলেন।"

"কি বললে?"

"একজন জার। তিনি ধর্মযুদ্ধে যেতে মনস্থ করলেন আর রাজ্যের শাসনভার দিলেন তাঁর মার হাতে।"

"তাঁর নাম কি ছিল?"

"ব—ব—লান্‌কা।"

"কি? বুলানকা?" (ঘিয়ে-রঙের ঘোড়াকে বলে) জোর করে মুখে একটু শুকনো হাসি টেনে আনি।

"হুঁঃ। তুমি আর কিছু জান?"

ব্যস, আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। কাজেই একটু কেশে আমি এবার নির্ভয়ে মাথামুণ্ডু যা মনে আসে বলে যেতে লাগলাম। মাস্টারমশাই একদম চুপ করে বসে, পালকের কলমটা দিয়ে টেবিলের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সোজা আমার কানের পাশ দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বলছেন, "বাঃ, চমৎকার, চমৎকার।" বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার কিছু জানা নেই, যা বলতে চাইছি তা গুছিয়ে বলতেও পারছি না, তবুও উনি আমায় থামিয়ে দিচ্ছেন না, বা ভুল সংশোধন করে দিচ্ছেন না দেখে মনে মনে ভীষণ আতঙ্ক হল।

"তিনি জেরুজালেমে যাবেন বলে ঠিক করলেন কেন?" মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

"কারণ—তিনি ভাবলেন,—যাতে তিনি—" হাবুডুবু খেতে খেতে থেমে পড়লাম, আর একটা শব্দও যোগাল না। মনে হল ওই বিশ্রী, ঘৃণ্য লোকটা যদি চুপচাপ একটা বছর ধরেও এমনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে তাহলেও একটা শব্দ বেরবে না আমার মুখ থেকে। মিনিট তিনেক মাস্টারমশাই আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলেন তারপরেই তাঁর মুখেচোখে একটা আন্তরিক দুঃখের ভাব ছড়িয়ে পড়ল ; ভলোদিয়া সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকছিল, তার দিকে তাকিয়ে গভীর স্বরে বললেন, "রেকর্ডের খাতাটা আমাকে দাও।"

ভলোদিয়া খাতাটা তাঁকে দিয়ে টিকিটগুলো সাবধানে পাশে রেখে দেয়।

মাস্টারমশাই খাতাখানা খুলে সাবধানে কলমটা ডুবিয়ে, মুক্তোর মতন সুন্দর অক্ষরে ভলোদিয়ার নামের পাশে 'আবৃত্তি' আর 'আচরণের' ঘরে লিখলেন পাঁচ। তারপর আমার ঘরে কলমটা বাগিয়ে ধরে আমার দিকে একবার তাকালেন, কলম থেকে কালি ঝাড়লেন, তারপর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

হঠাৎ একসময় তার হাতটা খুব সামান্য একটু নড়ে উঠল, তারপর খাতায় খুব সুন্দর করে একটা এক নম্বর লেখা হল তারপর দাঁড়ি। আবার হাতটা একটু নড়ল, 'আচরণের' ঘরে আবার একটা এক বসল।

সাবধানে আস্তে আস্তে নম্বরের খাতাটি বন্ধ করে মাস্টারমশাই উঠলেন ; আমি তখন দুচোখে হতাশা, মিনতি আর ভর্ৎসনা ভরে নিয়ে তাকিয়ে আছি তাই বোধ হয় আমার দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি চুপচাপ দরজার দিকে এগোলেন।

"মিখাইল ইল্লারিওনোভিচ্", পেছন থেকে ডাকি।

"না," তখুনি জবাব দিলেন। ডাক শুনেই ঠিক বুঝতে পেরেছেন আমি কি চাই। "এরকম পড়া চলবে না। এমনি এমনি আমাকে মাইনে দেবে না।"

মাস্টারমশাই বুটের ওপরে রবারের জুতো পরলেন, পশমের ক্লোক গায়ে চড়ালেন, অতি সন্তর্পণে গলাবন্ধ বাঁধলেন। আমার এমন একটা অঘটনের পরেও কিনা মানুষ এমনি সব তুচ্ছ জিনিসে মন দিতে পারে! ওঁর কাছে কলমের একটি খোঁচা কিন্তু তাতে যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

"পড়া শেষ হল ?" ঘরে ঢুকে সেণ্ট জেরোম জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ।"

"মাস্টারমশাই সন্তুষ্ট হয়েছেন তো ?"

"হ্যাঁ," ভলোদিয়া বলে।

"কত নম্বর পেয়েছ ?"

"পাঁচ।"

"আর নিকোলাস ?"

চুপ করে রইলাম।

"চার, বোধহয় !"—ভলোদিয়া বলে।

ও বোধহয় ভাবল অন্ততঃ আজকের দিনটার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে দেওয়াই উচিত। শাস্তি যদি পেতেই হয় তো অন্যদিন হোক আজকে বাড়িতে সব অতিথিরা রয়েছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

একটা ছোট্ট চাবি

আমরা নীচে গিয়ে একটু এর ওর তার সঙ্গে দেখা করতে না করতেই ডিনারের ঘণ্টা পড়ল। বাবার খুব খোশমেজাজ (একটু আগেই তাসের খেলায় জিতেছেন)—লিউবোচ্‌কাকে সুন্দর একপ্রস্থ রূপোর কাঁটাচামচ উপহার দিলেন আর ডিনারের পরে মনে পড়ল ওঁর নিজের বাড়িতে বনবনের একটা বাক্স আছে, সেটাও তিনি দিতে চান ওকে।

"চাকর পাঠাব কেন? তার চাইতে তুমিই গিয়ে নিয়ে এস কোকো।" বাবা আমাকে বল্লেন, "বড় দেরাজে চাবির গোছা থাকে, তুমি তো জান। সেটা নিয়ে সব চাইতে বড় চাবিটা দিয়ে ডানদিকের দ্বিতীয় দেরাজটা খুলো। বাক্সটা দেখবে। আর কাগজে মোড়া কিছু মিষ্টি; সব নিয়ে এস।"

"তোমার সিগার আনব না, বাবা?" আমি জিজ্ঞেস করি, জানি ডিনারের পরে রোজই বাবার সিগার চাই।

"হ্যাঁ, এনো কিন্তু আর কোন জিনিসে হাত দিয়ো না যেন।" বাবা পেছন থেকে ডেকে বলেন। ঠিক জায়গাতেই চাবির গোছাটা পেলাম; তুলে নিয়ে দেরাজটা খুলতে যাচ্ছি হঠাৎ গোছাটার ভেতর একটা খুব ছোট্ট চাবির ওপর চোখ পড়াতে থম্‌কে গেলাম, ভীষণ কৌতূহল হল জানতে ঐ ছোট্ট চাবিটা কোন্‌টার।

দেরাজে হরেক রকমের জিনিসপত্রের ভেতর ধার ঘেঁসে একটি বড় গোছের কাগজপত্র রাখার ব্যাগ, বেশ কারুকার্য করা—আমার মাথায় কি খেয়াল চাপল, দেখি তো ছোট্ট চাবিটা এতে লাগে কিনা! চেষ্টা সফল হল, চাবিটা লাগিয়ে ঘোরাতেই ব্যাগটা একদম খুলে গেল, ভিতরে ঠাসা কাগজপত্র। ঐ কাগজপত্রগুলোয় কি আছে জানবার জন্যে কৌতুক এমনি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যে বিবেকও মানল না—ব্যাগের ভেতরকার জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে লেগে গেলাম।

গুরুজনদের বিশেষ করে আমার বাবার প্রতি আমার মনে শিশুসুলভ যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার ভাব ছিল, যে শ্রদ্ধা সম্বন্ধে কোনদিন কোন প্রশ্নের কোন সন্দেহের অবকাশ ঘটেনি—সেই অনুভূতিই আমাকে বাধা দিল ব্যাগের ভেতর যা দেখেছি তা থেকে বাবার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতে; আমার ধারণা বাবা বাস করেন সম্পূর্ণ একটা আলাদা জগতে, সে জগত্ সুন্দর, লোভনীয়, কিন্তু সেখানে ঢোকবার রাস্তা আমার জানা নেই। মর্মও বুঝি না তার—এর রহস্যের ভেতর নাক গলাবার কোন চেষ্টা করলে আমার পক্ষে তা মহাপাপ।

তাই নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে রহস্য সেদিন আবিষ্কার করেছিলাম বাবার সেই ব্যাগ থেকে—আমার শিশুমনে তা কোন সুস্পষ্ট দাগ কাটেনি, কেবল মনে পড়ে, একটা অন্যায় বোধ নিজেকে পীড়িত করেছিল। আমার যেমনি লজ্জা হল তেমনি হল অস্বস্তি।

এরই ফলে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা বন্ধ করে রেখে দিতে গেলাম কিন্তু ভাগ্যে লেখা ওই বিশেষ দিনটিতে যত রকমের সম্ভব আমার সর্বনাশ হবে। চাবিটা তালার গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে মোচড় দিলাম, ঠিক উল্টো দিকে। তারপর তালাটা আটকে গেছে মনে করে একটানে চাবিটা খুলে নিলাম।—ওঃ, ভগবান! চাবির মাথাটা ভেঙে চলে এল আমার হাতে! তারপর বৃথাই চেষ্টা করতে লাগলাম চাবিটা তালার ভেতর ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জোড়া লাগাতে —যদি কোন মন্ত্রবলে চাবিটা গোটাই আমার হাতে উঠে আসে এই আশায়। শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছাড়লাম; আর একটা ভীষণ অপরাধ যোগ হল আমার আজকের অপরাধের তালিকায় আর সেটা জানাজানি হয়ে যাবে বাবা এসে পড়ার ঘরে ঢোকামাত্র।

মিমির নালিশ, খারাপ নম্বর আর সেই ছোট্ট চাবিটা! এর চাইতে সর্বনাশ আর কি ঘটতে পারে? দিদিমা মিমির কাছে সেই নালিশ শুনে, সেণ্ট জেরোম নম্বরের কথা জানতে পেরে আর বাবা চাবির জন্যে—এরা তিনজনেই লাফিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে আমায় আজকেই, এই সন্ধ্যেবেলাতেই।

আমার কি হবে? হায়, হায়, আমি কি করলাম! পড়ার ঘরের নরম কার্পেট মাড়িয়ে মাড়িয়ে অশান্ত মনে পায়চারী করতে থাকি। মিষ্টি আর সিগারের প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে নিজের উদ্দেশ্যে আর একবার চেঁচিয়ে

বলি, "যাক্, যাক্, যা হবার, তা হোক্", তারপর এক দৌড়ে একেবারে উৎসবের ঘরে চলে আসি।

এই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গীসূচক কথাটা আমি ছোটবেলায় শুনেছি নিকোলাইয়ের কাছে আর আমার জীবনের সংকট মুহূর্তের সব সময়ই তা আমাকে সাময়িকভাবে একটু সান্ত্বনাও দিয়েছে। হলে যখন ঢুকলাম তখন মনে আমার অস্বাভাবিক উত্তেজনা কিন্তু বাইরে তার চিহ্নটুকুও নেই। হাবে-ভাবে একেবারে খুশির ফোয়ারা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশ্বাসহন্ত্রী

ডিনারের শেষে খেলাধুলো শুরু হল, আমি খুব খুশী হয়ে তাতে মেতে গেলাম। একটা কোণে আমরা বেড়াল-বেড়াল খেলছিলাম, করনাকোভ্‌দের গভর্নেসও খেলছিলেন আমাদের সঙ্গে। খেলতে খেলতে একবার তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়তে গিয়ে দৈবাৎ তাঁর গাউন মাড়িয়ে ফেললাম, ফ্যাঁস্‌ করে সেটা বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেল। ভদ্রমহিলা পেঁচার মত মুখ করে ঝিদের ঘরে গেলেন ছেঁড়া গাউন সেলাই করতে, তাই না দেখে মেয়েদের বিশেষ করে সোনেচ্‌কার ভীষণ ফুর্তি! আমিও মনে মনে ঠিক করলাম আরেকবার ওদের অমনি মজা দিতে হবে। অতএব এই চমৎকার উদ্দেশ্যটির ফলেই গভর্নেস ভদ্রমহিলা হলে এসে ঢুকতে না ঢুকতেই আমি তাকে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে লাফাতে শুরু করলাম, তারপর একসময় একটু সুযোগ পেতেই জুতোর গোড়ালিটা গাউনে আটকে আবার ফ্যাঁস্‌ করে সেই জায়গাই ছিঁড়ে দিলাম। সোনেচ্‌কা আর করনাকোভা রাজকুমারীরা হাসি আর চাপতে পারে না, আর তাই না দেখে আমার সে কি তৃপ্তি! কিন্তু সেণ্ট জেরোম বোধ হয় বসে বসে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, এবার তিনি আমার কাছে এসে ভুরু কুঁচকে বললেন (এই চাউনিটা আমার একদম সহ্য হয় না), আমার অতি আনন্দটা নাকি তাঁর কাছে নিতান্ত দুর্লক্ষণ বলেই মনে হচ্ছে, এবার থেকে যদি ভদ্র ব্যবহার না করি তবে তিনি আমাকে ভীষণ শাস্তি দেবেন আজকে উৎসবের দিন হলেও।

কিন্তু আমার অবস্থা তখন ঠিক এমন একজন জুয়াড়ীর মত যে খেলতে বসে পকেটে যা আছে, তার চাইতেও বেশী হেরে এখন আর পকেটের হিসেব করবার সাহসও নেই, ক্রমাগত পাগলের মত বাজী ধরেই চলেছে, নিজেকে উদ্ধারের কোনই আশা নেই জেনেও। একমাত্র চেষ্টা বর্তমানকে কোনমতে ভুলে থাকা। তাই আমিও উদ্ধতভাবে একটু হেসে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম।

বেড়াল খেলার পর একজন কেউ একটা খেলা শুরু করল তার নাম "নাকেশ্বর"। চেয়ারগুলো মুখোমুখি সাজান হল, ভদ্রলোক আর ভদ্র-মহিলারা সবাই যে যার সঙ্গী বেছে নিয়ে বসলেন মুখোমুখি।

সবচাইতে ছোট রাজকুমারী বারেবারেই তার সঙ্গী হিসেবে বেছে নিচ্ছে আইভিনদের ছোট ভাইকে; কাটেনকা নিচ্ছে হয় ভলোদিয়া নয় ইলেন্‌কাকে; সোনেচ্‌কা প্রতিবারেই পছন্দ করছে সেরিওঝাকে। আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম দেখে সেরিওঝা সোজা গিয়ে একেবারে মুখোমুখি ওর চেয়ারে বসছে আর ও একটুও লজ্জা পাচ্ছে না তাতে! বরঞ্চ মিষ্টি রিনরিনে গলায় জোরে হেসে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে আবার ইশারা করছে যে সেরিওঝা ঠিকই অনুমান করেছে। আমাকে কিন্তু কেউই নিচ্ছে না। আমার অভিমানে ভীষণ লাগল, আমিই তাহলে এদের মধ্যে একমাত্র ফালতু যাকে কারো দরকার নেই। প্রতিবারেই ওদের বলতে হচ্ছে: "কে এখনও পড়ে আছে? ও, হ্যাঁ নিকোলেঙ্কা। বেশ ওকে নাও।"

কাজেই এর পরে আমাকে যখনই বলতে বলা হল কে আমাকে সঙ্গী বেছেছে, আমি সোজা বুক ফুলিয়ে চলে যেতাম হয় আমার বোন না হয় ঐ কুৎসিত রাজকুমারীদের কারুর কাছে আর এমনি দুর্ভাগ্য যে ভুল হত না একটিবারও। সোনেচ্‌কা তো এমনি মগ্ন সেরিওঝা ও আইভিনকে নিয়ে যে আমি তার চোখেই পড়ি না। নিজের মনেই কেন যে আমি ওকে বারবার বিশ্বাসহন্ত্রী বলছিলাম জানি না। কেননা, ও তো এমন কোন কথা দেয়নি যে খেলার জুড়ি ও আমাকেই বাছবে, সেরিওঝাকে নয়; তবুও তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে সোনেচ্‌কার ব্যবহার একেবারে অস্বাভাবিক আর অসহ্য।

খেলার শেষে লক্ষ্য করলাম বিশ্বাসঘাতক সোনেচ্‌কা—যাকে আমি ঘৃণা করছি অথচ এক নিমেষের জন্যও তার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছি না—সেই মেয়েটা সেরিওঝা আর কাটেনকাকে সঙ্গে নিয়ে একটা কোণের দিকে সরে রহস্যময়ভাবে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন গুপ্ত আলোচনা করছে। ওদের গোপন কথা আড়ি পেতে শোনার জন্যে আমি গুঁড়িসুড়ি মেরে পিয়ানোর পেছনে লুকোলাম তাতে যা জানলাম তা এই: কাটেনকা একটা কেমব্রিক রুমালের দুটো কোণ ধরে রেখেছে,—সোনেচ্‌কা আর সেরিওঝার মাথার মাঝখানে পর্দা হয়েছে। "না; তুমি হেরে গিয়েছ, নিশ্চয় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তোমাকে।" সেরিওঝা বলে উঠল। সোনেচ্‌কা অপরাধীর মত একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, হাত

ছুটো দুপাশে ঝুলছে তারপর লজ্জায় একটু লাল হয়ে গিয়ে বলে, "না, কক্ষনো হারিনি আমি। হেরেছি, ক্যাথেরিন? খেলায় আমি মিথ্যে ভালবাসি না,"

কাটেনকা জবাব দেয়, "ভাই সোনেচ্‌কা তুমিই হেরেছ।"

কাটেনকার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সেরিওঝা নীচু হয়ে চুমু খায় সোনেচ্‌কাকে। ওর গোলাপী ঠোঁট-দুটো একেবারে ভরে দিল চুমোয় আর সোনেচ্‌কাও হেসে উঠল খিলখিল করে যেন এটা একটা কিছুই না। ভারী মজার ব্যাপার! কি ভয়ঙ্কর! উঃ, কি ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক!

চতুর্দশ অধ্যায়

রাহুর গ্রাস

হঠাৎ আমার মনে গোটা মেয়েজাতটা সম্বন্ধেই কেমন বিতৃষ্ণা জাগল, বিশেষ করে ঐ সোনেচ্‌কা সম্বন্ধে। নিজের মনকে খালি বোঝাতে লাগলাম ওসব খেলায় কোনই মজা নেই। ও খেলা মেয়েদেরই পোষায়। আমার ইচ্ছে হল এমন একটা হল্লা বাধাই, এমন একটা ভয়ঙ্কর সাহসের কাজ করি, যাতে সকলের একেবারে তাক লেগে যায়। একটা সুযোগ আসতেও খুব বেশী দেরি হল না। মিমিকে কি সব বলে-টলে সেণ্ট জেরোম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পায়ের শব্দে বুঝলাম তিনি ওপরতলায় উঠছেন। আমাদের মাথার ঠিক ওপর দিয়ে পড়ার ঘরের দিকে গেলেন। আমার মনে হল মিমি নিশ্চয় ওঁকে বলেছে পড়ার সময় আমাকে কোথায় দেখতে পেয়েছিল আর, তাই উনি চলেছেন নাম-ডাকের খাতাটা পরীক্ষা করে দেখতে। একমাত্র আমাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া সেণ্ট জেরোমের জীবনে আর যে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে তখন আমি ভাবতেই পারতাম না। কোথায় যেন পড়েছি এই বারো থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ঠিক বাল্য আর কৈশোরের বয়ঃসন্ধিতে, কিশোরদের নাকি ঘরে আগুন লাগাবার, এমন কি খুন করবারও ঝোঁক হয়। আমার নিজের কৈশোরের কথা মনে পড়লে, বিশেষ করে সেই অলক্ষুণে দিনটিতে মনের যা অবস্থা ছিল,—তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারি সে অবস্থায় যে কেউ শুধু শুধু, কাউকে আঘাত করতে না চেয়েও নিছক খেলাচ্ছলে, কিছু একটা করবার প্রেরণায় সাংঘাতিক অপরাধ করে বসতে পারে। কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন ভবিষ্যতটা এতই কালো হয়ে দেখা দেয় যে, মানুষ সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে মনে মনে ভয় পায়, সমস্ত ভাবনাচিন্তা একেবারে রোধ করে দিয়ে সে তখন নিজেকে এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করে সামনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, পেছনে অতীত বলেও কিছু নেই। এমনি মুহূর্তে, যখন সবদিক ভেবেচিন্তে দেখবার আগেই প্রবৃত্তির বশে সিদ্ধান্তগুলো হয়ে যায়,

যখন শরীরের সহজাত প্রবৃত্তিই হয় প্রাণচাঞ্চল্যের একমাত্র উৎস—সে অবস্থায় বিশেষত একটি ছোট ছেলে অনভিজ্ঞতার দরুণ কি করে তেমন একটা মানসিকতায় এসে পৌঁছয়, আমি তা বেশ বুঝতে পারি। ভাই, বাবা, মা—তার অত্যন্ত প্রিয়জনেরা ঘুমিয়ে আছে জেনেও সে তখন বিনা দ্বিধায় কিছুর পরোয়া না করেই দিব্যি খেলাচ্ছলে হাসিমুখে সে ঘরে আগুন দিতে পারে। ঠিক এই একই ধরনের চিন্তাহীনতার ফলে, সতের বছরের একটা চাষী ছেলে একটা বেঞ্চির ওপর তার নতুন ধার দেওয়া চকচকে কুড়ুলের ধার পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ বেঞ্চির আরেক ধারে শোয়া বুড়ো বাপের গলায় অস্ত্রটা বসিয়ে দিয়ে নির্বোধ উৎসুক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে গলা দিয়ে কেমন ফোয়ারার মত রক্ত বেরোচ্ছে। পূর্বপর না ভেবে সেই একই সাময়িক খামখেয়ালের বশবর্তী হয়ে খুব উঁচু জায়গার একেবারে কিনারায় দাঁড়াতে মানুষের ভাল লাগে এবং ভাবতেও বেশ লাগে: "নীচে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়?" অথবা গুলিভরা একটা পিস্তল কপালের ওপর ধরে ভাবে, "যদি ঘোড়া টিপি, কি হয়?" কিংবা সমাজের একজন কেউকেটা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা, আমি যদি এখুনি কাছে গিয়ে ওঁর নাকটা ধরে বলি, 'এস হে, যাওয়া যাক—' তাহলে কেমন দাঁড়ায় ব্যাপারখানা?

সে সময় আমার ঠিক এমনি একটা মানসিক উত্তেজনার অবস্থা। আমার বোধ-শক্তি ছিল না।

তাই সেণ্ট জেরোম যখন নীচে নেমে এসে আমাকে বললেন যেহেতু আমি পড়ায় কম নম্বর পেয়েছি আর এখানেও নিতান্তই অভদ্র ব্যবহার করেছি তাই সেই উৎসব-সন্ধ্যায় নীচে আনন্দ করার আমার কোন অধিকার নেই, আমাকে ওপরে চলে যেতে হবে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে—আমি কিছুমাত্র না ভেবেই সেণ্ট জেরোমকে একটু ভেংচি কেটে জোর গলায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, যেখানে আছি সেখান থেকে এক পাও নড়ব না।

রাগে, বিস্ময়ে সেণ্ট জেরোম এক মুহূর্ত হতবাক্ হয়ে রইলেন।

তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "এতদিনে তোমাকে দুরন্ত করে ফেলতাম, তোমার দিদিমাই তোমাকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি লাঠিই হচ্ছে তোমার একমাত্র ওষুধ আর আজই তার উপযুক্ত সময়।"

উনি এত জোরে বললেন কথাগুলো যে আসরের সব্বাই প্রতিটি কথা শুনতে পেল। বুঝতে পারলাম শরীরের সব রক্ত তরতর করে আমার হৃদ্‌যন্ত্রে

উঠে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে একটা তাণ্ডব বাধিয়ে তুলছে, মুখে আর একফোঁটাও রক্ত নেই, অনিচ্ছে সত্ত্বেও ঠোঁটদুটি কাঁপছে। সেই মুহূর্তে আমার চেহারাটা নিশ্চয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল কারণ সেণ্ট জেরোমও আমার দৃষ্টি এড়িয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে ওঁর হাতটা এসে আমার হাতে স্পর্শ করল, আমি রাগে কাঁপতে কাঁপতে এক ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আমার ছেলেমানুষের হাতে যত জোর আছে তাই দিয়ে একটা চড় কষিয়ে দিলাম।

"তোমার হয়েছে কি?" ভলোদিয়া ভীষণ অবাক হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে।

"আমার কাছ থেকে সরে যাও", আমিও চীৎকার করে উঠি, চোখে তখন ধারা বইছে। "আমাকে তোমরা কেউ দেখতে পার না। আমার দুঃখু তোমরা কেউ বোঝ না। তোমরা সবাই পাজী, সবাই জঘন্য।" রাগে গরগর করতে করতে উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাগুলো বলি।

ইতিমধ্যে সেণ্ট জেরোম ফ্যাকাসে মুখে স্থির সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করার আগেই খপ্‌ করে আমার দুহাত ধরে ফেলে টেনে নিয়ে চলেন আমাকে। রাগে আমার মাথাটা যেন ফেটে পড়ছে। শুধু মনে পড়ে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মাথা আর হাঁটুর জোরে পাগলের মত বাধা দিয়েছিলাম। আমার নাকটা যেন কার কোমরে খালি ঘসা খাচ্ছিল, কার কোট যেন আমার মুখে এসে পড়ছিল, আমার শরীরের চারদিকে কার যেন পা। আর নাকে আসছে ধুলো আর সেণ্ট জেরোমের গায়ের সেণ্টের গন্ধ।

পাঁচ মিনিট পরে আমার পিছনে চিলেকোঠার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

"ভ্যাসিলী", ভয়ঙ্কর গলায় তার হুঙ্কার শোনা গেল, "বেত নিয়ে এস"……

পঞ্চদশ অধ্যায়

দিবাস্বপ্ন

সে সময় কি আমি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম যে এত দুরদৃষ্টের পরেও আমি বেঁচে থাকব আবার একদিন মৌজ করে বসে সেদিনের সেইসব ঘটনা স্মরণ করব ?

কৃতকর্মের কথা যখন মনে পড়ল অদৃষ্টে যে কী আছে কিছু ভাবতে পারছিলাম না কেবল কেমন যেন মনে হতে লাগল আমার সর্বনাশ আসন্ন।

প্রথমটাতে নিচের তলায় আর আমার চারিদিকে শুধু একটানা নিথর নিস্তব্ধতা। অন্তত আমার তাই মনে হল, হয়তো আমার নিজেরই মনের নিদারুণ উত্তেজনায়। তারপর আস্তে আস্তে আলাদা আলাদা করে কানে ধরা পড়তে লাগল টুকটাক শব্দ। ভ্যাসিলী ওপরে এল, জানালার কছে ঝাঁটার মত কি যেন একটা ছুঁড়ে ফেলে, মস্ত একটা হাই তুলে লম্বা বাক্সের ওপর শুয়ে পড়ল। নীচে সেণ্ট জেরোমের গলার জোর আওয়াজ (নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে বলছিলেন) তারপর ছেলেদের গলা। তারপর হাসি, দৌড়দৌড়ি; কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির আবহাওয়া আবার পুরনো খাতে বইতে লাগল। যেন কেউ জানে না, কারুর মনেও পড়ছে না যে আমি একলাটি পড়ে আছি এই অন্ধকার চিলেকুঠরীতে।

আমি কাঁদিনি কিন্তু বুকের ওপর পাষাণের মত কি যেন চেপে রয়েছে। আমার অস্থির মানসপটে টুকরো টুকরো চিন্তা আর স্বপ্ন দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আমাকে গ্রাস করেছে তার চিন্তায় মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলছি আর অদৃষ্টে না জানি কি আছে ভেবে আতঙ্ক আর হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি।

হঠাৎ আমার মনে হল : লোকে এই যে আমাকে দেখতে পারে না, বরং ঘৃণা করে—নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে। (সেই সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দিদিমা থেকে শুরু করে ঐ গাড়োয়ান ফিলিপটা পর্যন্ত আমাকে ঘৃণা করে। আমার দুঃখে আনন্দ পায়)। হয়তো···হয়তো আসলে আমি

আমার মা-বাবার ছেলেই নই, ভলোদিয়ার ভাই নই। নিতান্তই একটা মা-বাপ মরা হতভাগা রাস্তার কুড়নো ছেলে, যাকে দয়া করে মানুষ করা হচ্ছে। উত্তপ্ত মস্তিকের এই কল্পনাতে আমার মন যেন একটা অদ্ভুত সান্ত্বনা পেল, এমনকি এটাকে নিতান্তই স্বাভাবিক বলে মনে হল। এই ধারণাতে মনে আনন্দ পেলাম যে আমার দুঃখের কারণ আমি নিজে নই আজন্ম অসুখী হওয়াই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। ঠিক কার্ল ইভানিচের মত।

"কিন্তু এই সত্যটা আমার কাছে ধরা যখন পড়েইছে, তখন আর লুকিয়ে রাখা কেন?" আপন মনে বলি। কালই আমি বাবার কাছে গিয়ে বলব, "বাবা, আমার কাছে আমার জন্মের ব্যাপারটা গোপন করবার আর কোন মানেই হয় না। আমি জেনে ফেলেছি।" বাবা অমনি বলবেন, "দেখ—তুমি যখন জেনেই ফেলেছ—অবশ্য আজই হোক আর কালই হোক একদিন না একদিন তুমি জানতেই। সত্যি তুমি আমার নিজের ছেলে নও, কিন্তু আমি তোমাকে পুষ্যি নিয়েছি আর আমার ভালবাসার যোগ্য যদি হও, কখনো পরিত্যাগ করব না।" আমি তার জবাবে বলব "বাবা! যদিও ওনামে ডাকবার আমার কোন অধিকার নেই তবুও শেষ বারের মত ডাকছি—আমি তোমাকে সব সময়েই ভালবেসেছি, চিরদিন বাসবও—জীবনে কোনদিন ভুলব না তুমি আমার উপকারী বন্ধু, কিন্তু এর পরে তোমার বাড়িতে আর আমি বাস করতে পারব না। এখানে কেউ আমাকে ভালবাসে না। সেণ্ট জেরোম আমাকে শেষ না করে ছাড়বেন না। হয় তাঁকে নয় আমাকে, একজনকে এ বাড়ি ছাড়তেই হবে নইলে এমন কিছু করে বসতে পারি যার জন্যে পরে আমাকে দায়ী করা চলবে না। ও লোকটাকে আমি এত বেশী ঘৃণা করি যে কিছু করতেই আমার আটকাবে না। আমি ওকে খুন করব···হ্যাঁ, আমি এই কথাই বলব, "বাবা, আমি খুন করব ওকে।" বাবা আমাকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। আমি সরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলব, "না বন্ধু, না; ঢের উপকার করেছেন আমার, এবার ছেড়ে দিন—আমাদের আর একসঙ্গে থাকা চলবে না।" তারপর উঠে আলিঙ্গন করে ফরাসীতে বলব, "হে পিতা, হে উপকারী বন্ধু! শেষবারের মত আমায় আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!" এই দৃশ্য কল্পনা করে সেই অন্ধকার চিলেকোঠায় বাক্সের ওপর বসে আমি শোকে বিহ্বল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। হঠাৎ জেগে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গেই

মনে পড়ে গেল ভয়ঙ্কর আসন্ন শাস্তির কথা। এতক্ষণে জলজ্যান্ত বা বাস্তব নজরে এল। স্বপ্ন তখন পালাবার পথ পেল না।

তারপর কল্পনা করতে লাগলাম একা একা আমি বাড়ি ছেড়ে যেন অনেক দূরে চলে গিয়েছি! অশ্বারোহী দলে নাম লিখে গেলাম যুদ্ধে। চারদিক থেকে শত্রুসৈন্য ঘিরে ফেলেছে; আমি খোলা তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে একটাকে মারলাম, তারপর আরেকটা, তারপর আরও একটা। শেষ পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবসাদে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে উঠলাম, "জয়"। জেনারেল এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "যাঁর দরুন আমরা বাঁচলাম, তিনি কোথায়?" সবাই আমার দিকে দেখিয়ে দিলে, তিনি আমার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে করতে চীৎকার করেন, "জয়"। আস্তে আস্তে আমি সেরে উঠলাম। কালো কাপড়ে হাত ঝুলিয়ে ভেরস্কয় বুলেভারে একটু পায়চারি করি। আমি এখন জেনারেল! সম্রাটের সঙ্গে দেখা হল তিনি জানতে চাইলেন, "এই আহত যুবকটি কে?" সবাই বলল, "ইনি হচ্ছেন নিকোলাই, একজন মস্ত বীর।" সম্রাট আমার কাছে এগিয়ে এসে বলেন, "ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার কী চাই বল। যা চাইবে তাই দেব।" তরবারির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে বলি, "মহামান্য সম্রাট, নিজের জন্মভূমির জন্যে রক্ত দিতে পেরেছি, তাতেই আমি ধন্য। দেশের জন্য প্রাণ দিতেও আমি তৈরি। তবু, আপনার যখন এতই দয়া, আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনাটা রাখছি—আমার এক শত্রু আছে, তার নাম সেণ্ট জেরোম, আমাকে যদি অনুমতি দেন আমি ওকে মেরে ফেলতে পারি।" তারপর সেণ্ট জেরোমের কাছে গিয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে বলি, "তুমি আমার অনেক দুর্দশা করেছ, এবার গড় হয়ে বস।" হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল সত্যিকারের সেণ্ট জেরোম কিন্তু একটি বেত হাতে যে কোন মুহূর্তেই এসে ঢুকতে পারেন। তখন দেখতে পেলাম আমি আর দেশের ত্রাণকর্তা জেনারেল নই—ক্রন্দনরত নিতান্ত হতভাগ্য একটি প্রাণী।

ভগবানের নাম মনে পড়াতে উদ্ধতভাবে বারবার তাকে জিজ্ঞাসা করি, কেন সে আমাকে এভাবে শাস্তি দিচ্ছে? "সকালে, সন্ধ্যেয় কোনদিন প্রার্থনা করতে ভুলিনি, তবে কেন, কেন এভাবে আমি কষ্ট পাব?" আজ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি গোটা শৈশবকালটাই যে আমার কেটেছিল ভগবানের

অস্তিত্বে সন্দেহের বিষ বুকে নিয়ে—তার সূচনা ঐ দিনটিতে। দুঃখ আমার মনে সেদিন অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল বলেই নয়—আসলে সেদিন গোটা দিনটা নির্জনে বসে থেকে, মনে নানা চিন্তার জাল বুনতে বুনতে ভগবানের অন্যায় ব্যবহার সম্বন্ধে একটা ধারণা মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, সেটাই ভবিষ্যতে ফলেফুলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল ঠিক যেমন একটা আগাছার বীজ খুব সহজেই ডালপালা বিস্তার করে সতেজ হয়ে ওঠে, বৃষ্টির পরে নরম তৈরি মাটিতে যদি সে বীজ পড়ে। এরপর কল্পনা করলাম যেন মরে গেছি আর কল্পনায় স্পষ্ট দেখলাম চিলেকোঠায় আমার বদলে একটা প্রাণহীন দেহ দেখতে পেয়ে সেণ্ট জেরোমের সে কি হতবুদ্ধি, বিভ্রান্ত অবস্থা! মৃত্যুর পরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আত্মা নাকি নিজের বাড়িতেই ঘুরে বেড়ায়, নাতালিয়া সাভিশ্‌নার সে কথা মনে করে কল্পনা করলাম আমার বিদ্রোহী আত্মা দিদিমার এই বাড়িটারই ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখছে লিউবোচ্‌কার কান্না, দিদিমার দুঃখ, শুনছে সেণ্ট জেরোমের সঙ্গে বাবার কথাবার্তা। "চমৎকার ছেলে ছিল আমার," চোখে জল নিয়ে বাবা বলছেন। "হ্যাঁ," সেণ্ট জেরোম জবাব দেয়, "কিন্তু শয়তানের একশেষ।" বাবা বলেন, "তুমিই ওর মৃত্যুর কারণ; তুমি ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। যেভাবে তুমি ওর মাথা হেঁট করবার ব্যবস্থা করেছিলে, ও সহ্য করতে পারেনি। দূর হয়ে যাও, বদমাস্ কোথাকার!"

এবারে সেণ্ট জেরোম হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন। চল্লিশ দিন পার হতে আমার আত্মা উড়ে চলে গেল স্বর্গে—সেখানে দেখতে পেলাম কি সুন্দর, শুভ্র, স্বচ্ছ আর লম্বা একটি ছায়ামূর্তি। আমার মা-মণি বলে বোধ হল। সাদা ছায়ামূর্তিটা আমায় চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে; আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু আমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছে, স্পষ্ট-ভাবে ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। "যদি সত্যিসত্যিই তুমি হও, তাহলে আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দাও, আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরি।" এবার মা-মণির গলা শোনা গেল, "এখানে সবাই আমরা এই রকম। আমিও তোমাকে এর চাইতে ভাল করে আদর করতে পারি না। তোমার কি এতেই আনন্দ হচ্ছে না?" "হ্যাঁ, তা হচ্ছে বটে। তবে তুমি আমাকে সুড়সুড়ি দিতে পারছ না, আমিও তোমার হাতে চুমু খেতে পারছি না।" "তার কিছু দরকারও নেই, এমনিতেই এখানে সব কি সুন্দর!" মা-মণি বলতে আমিও অনুভব করলাম সত্যিই সব কি চমৎকার। তারপরে আমরা দুজনে উড়ে ওপরে ভেসে যেতে

লাগলাম, উঁচুতে আরও উঁচুতে। এরপর হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল, জেগে দেখলাম সেই অন্ধকার চিলেকোঠার বাক্সের ওপর শুয়ে আছি, চোখের জলে গাল ভেজা, মনটা একদম ফাঁকা, অর্থহীনভাবে বারবার আবৃত্তি করছি, "আমরা উড়ে চলে গেলাম, উঁচুতে আরও উঁচুতে।" অনেকক্ষণ ধরে একমনে চেষ্টা করলাম আমার অবস্থাটা বুঝতে ; কিন্তু কল্পনায় ধরা পড়ল কেবল অসীম, বিরাট একটা শূন্যতা, দুঃখের অনুভূতিতে অন্ধকার, অপ্রবেশ্য। বাস্তবচেতনা এসে যে শান্তিময় মধুর স্বপ্ন ছিঁড়ে দিল, চেষ্টা করলাম আবার তার জোড়া লাগাতে ; কিন্তু সে পথে চলতে শুরু করেই দেখলাম আর এগুনো অসম্ভব আর সব চাইতে অবাক লাগল যখন দেখলাম—সে স্বপ্ন আর আগের মত আনন্দ দিতে পারছে না।

ষোড়শ অধ্যায়

গম ভাঙলে তবে খাওয়া

সারারাত আমার চিলেকোঠায় কাটল, কেউ একটি বারের জন্যও কাছে এল না। পরের দিন অর্থাৎ রবিবার পড়ার ঘরের লাগোয়া ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকিয়ে আবার তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। আমার আশা হতে লাগল, বুঝি এই বন্দীদশা দিয়েই শাস্তির পালা শেষ হবে। রাতের ঘুমটা, শরীর মনকে অনেকটা হাল্কা, ঝরঝরে করে দিয়েছে—তাই এখন জানালার জাফ্‌রীতে সূর্যের আলোর ঝিলিমিলি দেখে আর রাস্তায় দিনের শুরুতে যে স্বাভাবিক সাড়াশব্দ জাগে, তা শুনে মনটা খানিকটা সুস্থির হয়ে এল। কিন্তু তবুও.....

তবুও এই নির্জনে একা একা থাকাটা কি কষ্টকর! ইচ্ছে হচ্ছিল চলাফেরা করি, কাউকে অন্তত জানাই আমার মনে কি ভাবের জোয়ার খেলছে,—কিন্তু আমার আশেপাশে ধারেকাছে একটি জীবন্ত প্রাণীর চিহ্নমাত্রও নেই। আরও বিশেষ খারাপ লাগছিল কারণ সেণ্ট জেরোম তাঁর নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে নির্বিকারভাবে শিস্‌ দিচ্ছিলেন, যতই জঘন্য লাগুক না কেন, আমার কানে ঠিক ভেসে আসছিল তা। আমার দৃঢ় ধারণা হল, শিস্‌ দিতে যে তাঁর খুব ভাল লাগছে তা মোটেই নয়। আসলে আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবার জন্যেই শিস্‌ দেওয়ায় ওঁর এত উৎসাহ। বেলা দুটো বাজতে সেণ্ট জেরোম আর ভলোদিয়া নীচে নেমে গেলেন আর নিকোলাই আমার খাবার নিয়ে এল। আমি কি করেছি আর কি শাস্তি আমার হবে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলে : "শ-শ্‌-শ্‌, দুঃখ করো না। গম ভাঙলে তবেই খাওয়া জোটে।"

এই প্রবাদ বাক্যটা পরে বহুবার, আমাকে চরিত্রের দৃঢ়তা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে—সেদিনও অনেকটা সান্ত্বনা দিল। কিন্তু ওরা আমাকে শুধু রুটি আর জল না দিয়ে একটা পুরো ডিনার পাঠিয়েছে এমন কি দামী কেক পর্যন্ত—এতেই আমার চিন্তার কারণ ঘটল। যদি কেক-টেক না পাঠাত তাহলে আশা করতে পারতাম যে এই তালা বন্ধ করে রাখাটাই আমার শাস্তি কিন্তু

এখন দেখছি শাস্তি আমার তোলাই রয়েছে,—বন্ধ করে রাখাটা শুধুমাত্র আমার কুপ্রভাব থেকে অন্যদের বাঁচানো। আমি যখন নিজের মনে এইসব সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে একসময় আমার বন্দীশালার দরজার তালায় চাবি ঘুরল—সেণ্ট জেরোম কঠিন মুখ করে ঘরে এসে ঢুকলেন।

"নীচে চল, তোমার দিদিমার কাছে।" আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন।

জামার হাতায় চকের গুঁড়ো ভর্তি ছিল ঘর থেকে বেরুবার আগে সেগুলো একটু পরিষ্কার করে নিতে চাইলাম। সেণ্ট জেরোম বাধা দিলেন, বললেন: "যার এমন শোচনীয় নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে বাইরের চেহারায় তার কিছু যায় আসে না।"

সেণ্ট জেরোম আমার হাত ধরে হলের ভেতর দিয়ে নিয়ে চললেন—কাটেনকা, লিউবোচ্‌কা আর ভলোদিয়া আমার দিকে তাকিয়ে রইল—ঠিক যেভাবে আমাদের জানালার তলা দিয়ে প্রতি সোমবার বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার সময় আমরা সবাই তাকিয়ে থাকতাম। দিদিমার ঘরে পৌঁছে হাতে চুমু খাব বলে, তাঁর চেয়ারের দিকে যখন এগোলাম তিনি তখন আমার দিক থেকে ঘুরে বসে ওড়নার মধ্যে হাত লুকিয়ে রাখলেন।

দিদিমা বেশ বহুক্ষণ ধরে আমার আপাদমস্তক বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন—সে কঠিন দৃষ্টির সামনে আমি মহাবিব্রত, কোন দিকেই বা তাকাই, কিংবা আমার হাত দুটো নিয়েই বা কি করি, তা বুঝেই উঠতে পারি না। বেশ খানিকক্ষণ পরে দিদিমা সুর করে করে বলেন, "আমার ভালবাসার তো মূল্য দিয়ে আর রাখছ না, তোমাকে নিয়ে আমার তো খুব শান্তি! মঁসিয়ে সেণ্ট জেরোম আমার অনুরোধে," দিদিমা এখানে প্রতিটি কথার ওপর থেমে থেমে জোর দিয়ে বলতে থাকেন, "হ্যাঁ, আমারই অনুরোধে তোমাদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন, এখন উনি আর এ বাড়িতে থাকতে রাজী নন। কেন? সে কেবল তোমারি জন্যে, বুঝলে? আমি আশা করেছিলাম যে ওঁর যত্ন আর পরিশ্রমের জন্য তুমি কৃতজ্ঞবোধ করবে।" দিদিমা খানিক থেমে তারপর এমন ভাবে গড়গড় করে বলে গেলেন যে, তা থেকে বোঝা গেল বক্তৃতাটা আগে থেকেই তিনি শানিয়ে রেখেছিলেন; "আর ভেবেছিলাম ওঁর কাজের মূল্য বুঝবে। কিন্তু তুমি, এতটুকু ছেলে, তুমি কিনা সাহস কর ওঁর গায়ে হাত তুলতে! বাঃ চমৎকার, অতি চমৎকার! আমিও ভাবতে শুরু করেছি, যে ভাল

ব্যবহারের মর্ম বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, তোমার জন্য বোধহয় শক্ত কোন শাসনেরই দরকার। ওঁর কাছে ক্ষমা চাও। এখুনি, এই মুহূর্তে।" কঠিন আদেশের সুরে সেণ্ট জেরোমকে দেখিয়ে দিদিমা বলেন, "কথা কানে যাচ্ছে ?"

দিদিমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা লক্ষ্য করে তাকালাম, কিন্তু সেণ্ট জেরোমের কোটটা চোখে পড়তেই নিমেষের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ালাম আর নিজের জায়গা থেকে এক পাও নড়লাম না। আবার আমার ভেতরটা ঠাণ্ডা হিম হয়ে আসছে !

"কি, তুমি শুনতে পাচ্ছ না, আমি কি বলছি ?" আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল, তবুও নড়লাম না।

"কোকো", দিদিমা বোধহয় আমার ভেতরের যন্ত্রণাটা বুঝতে পারলেন। তাই এবার আদেশের বদলে মোলায়েম সুরে ডাক্‌লেন, "কোকো, ছিঃ, তুমি এমন নও ?"

"দিদিমা, আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে পারব না, কিছুতেই না," বলতে বলতে আমার কথা আটকে গেল। বুঝতে পারলাম কান্নায় গলা বুঁজে আসছে আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে গেলেই ভেতরের সব কান্না বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

"আমি তোমাকে বলছি। আমার কথা শোন। ক্ষমা চাও।"

"না, না—ক্ষমা আমি চাইব না, আমি পারব না"—হাঁপাতে হাঁপাতে বলি। এতক্ষণের চেপে রাখা চোখের জল এবারে উপচে ঝরঝর করে পড়তে থাকে।

সেণ্ট জেরোম সকরুণ সুরে ফরাসীতে বলে উঠলেন, "উনি তোমার মায়ের মা হন না ? এইভাবে কখনও ওঁকে অমান্য করতে হয় ? ওঁর স্নেহের কি এই প্রতিদান ?"

"হা ঈশ্বর, ওর মা যদি আজ থাকত !" দিদিমা আমার দিকে পেছন ফিরে চোখের জল মুছলেন ; "উঃ, সে যদি থাকত ! ভগবান যা করেন ভালর জন্যে। নইলে, বেঁচে থাকলে তার আর এ দুঃখ রাখার জায়গা থাকত না।"

দিদিমা একেবারে বিহ্বল হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আমিও কাঁদছিলাম। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না আমার।

সেণ্ট জেরোম দিদিমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন, "দোহাই, আপনি শান্ত হোন।"

কিন্তু দিদিমা তাঁর কথায় কান না দিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সমানে কাঁদতেই থাকেন—ফোঁপানি বাড়তে বাড়তে ক্রমে হেঁচকি টানে দাঁড়ায়, তারপর মূর্ছার মত হয়। মিমি আর গাশা ভীত মুখে দৌড়ে এসে তাড়াতাড়ি দিদিমাকে ধরে ফেলে ওষুধ শোঁকায়—বাড়ির চারিদিকে হাল্‌কা পায়ে দৌড়দৌড়ি আর ফিসফিসানি শুরু হয়।

"হ্যাঁ, একটা কাজের মত কাজ করেছ বটে।" সেণ্ট জেরোম আমাকে ওপরে নিয়ে যেতে যেতে বলেন।

"হে ভগবান, আমি এ কি করলাম? কি নচ্ছার ছেলে আমি!"

সেণ্ট জেরোম আমাকে ঘরে ঢুকতে বলে দিদিমার কাছে ফিরে যেতেই আমি যন্ত্রচালিতের মত সোজা সিঁড়ি দিয়ে ছুট লাগালাম নীচে।

এখন আর মনে নেই সেদিন কী ভেবেছিলাম—পালিয়ে যাবার কথা, না ডুবে মরবার কথা। শুধু মনে আছে, কাউকে যাতে দেখতে না হয় তাই দুহাতে মুখ ঢেকে অন্ধের মত ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম।

"কোথায় যাচ্ছ?" হঠাৎ একটা চেনা গলা কানে বাজল, "ওহে, তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

আমি পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বাবা আমার হাতখানা ধরে ফেলে কঠোরভাবে বললেন, "একবার এদিকে এস। বলি, কোন্ সাহসে তুমি আমার পড়ার ঘরে ব্যাগে হাত দিয়েছিলে?" বাবা আমার হাত ধরে ছোট বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন, "কি, জবাব দিচ্ছ না কেন?" এবারে আমার কানে টান পড়ল।

"আমি দুঃখিত।" আমি বলি, "জানি না, তখন আমার মাথায় কী ভূত চেপেছিল।"

"ওঃ, তুমি জান না, না? তুমি জান না, কেমন? সত্যিই তুমি জান না।" প্রতিটি কথার সঙ্গে বাবা একবার করে কানে মোচড় লাগাচ্ছেন, "ভবিষ্যতে আর কখনো সব জিনিসে নাক লগাবে? গলাবে? গলাবে?"

কানে অসহ্য যন্ত্রণা লাগছে, তবুও কাঁদছি না, আর মনের ক্ষতেও যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগছে। বাবা আমার কান থেকে হাত সরিয়ে নিতে না নিতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতখানা টেনে নিয়ে চোখের জলে আর চুমোয় ভরে দিলাম।

"মার, আমাকে মার," চোখের জলের ভেতরে বলি, "আরও জোরে মার যেন ব্যথা লাগে। আমি একটা পাজী, নচ্ছার, হতভাগা ছেলে।"

"আরে, হল' কি তোমার?" সামান্য একটু ধাক্কা মেরে বাবা জিজ্ঞাসা করেন।

"না আমি যাব না।" আমি বাবার কোট ধরে ঝুলে পড়ি, "এখানে আমাকে কেউ দেখতে পারে না আমি তা জানি। দোহাই, আমার কথা শোন, আমাকে বাঁচাও, নয়তো তাড়িয়ে দাও বাড়ি থেকে। আমি ও লোকটার সঙ্গে এক জায়গায় বাস করব না। আমাকে অন্যের চোখে ছোট করবার জন্যে সব সময় ওর চেষ্টা। ও আমাকে হাঁটু গেড়ে সামনে বসিয়ে রাখে; আমাকে পিটিয়ে লাশ করতে চায়—কিছুতেই আমি তা সহ্য করব না, আমি আর ছোটটি নেই। আর, আর সহ্য করতে পারছি না; ঠিক মরে যাব আমি, আমি আত্মহত্যা করব। দিদিমাকে ও বলেছে আমি খুব খারাপ ছেলে; দিদিমার তাতে অসুখ হয়ে পড়ল, এবার উনি মারা যাবেন, সে আমারই জন্যে। আমি···দোহাই তোমার মার আমাকে মার। কেন ওরা সবাই আমাকে এমন নির্যাতন করে?"

কান্নায় আমার গলা ধরে আসছিল; সোফায় বসে বাবার হাঁটুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি—মনে হয় যেন এখুনি এই মুহূর্তেই মরে যাব আমি।

"কি, হয়েছে কি, কাঁদছ কেন? খোকন", বাবা আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে মমতার সঙ্গে বলেন।

"ও লোকটা আস্ত যমদূত। আমাকে খালি কষ্ট দেয়। আমি মরে যাব, কেউ আমাকে ভালবাসে না।" কথা বলতে পারছিলাম না, শেষ পর্যন্ত কেমন যেন খিঁচুনি ধরে গেল।

বাবা হাত বাড়িয়ে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে গেলেন। ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম, বেশ রাত হয়ে গেছে। আমাদের পারিবারিক ডাক্তার মিমি আর লিউবোচ্‌কা বসে আছে কাছে। ওদের মুখে দারুণ উদ্বেগ, ভীষণ অসুখ হয়েছে—ভাবছে বোধহয়। আমি নিজে কিন্তু বার ঘণ্টা গভীর ঘুমের পর ভীষণ হাল্‌কা আর ঝরঝরে বোধ করছি—লাফিয়েই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতাম, কিন্তু উঠলাম না, আমি ভীষণ অসুস্থ, ওদের এই ধারণাটা ভেঙে দিতে চাই না।

সপ্তদশ অধ্যায়

ঘৃণা

হ্যাঁ, সত্যিকারের একটা ঘৃণার মনোভাব! নাটক নভেলে যে ধরনের ঘৃণার কথা লেখা থাকে, সে ঘৃণা তো মানুষকে কেবলি অসৎ কাজে প্রবৃত্তি দেয়; তেমন ঘৃণায় আমার আস্থা নেই। এ ঘৃণা অন্য জাতের। যাকে সাধারণ হিসেবে সম্মান করা উচিত, তার সম্বন্ধে এ ঘৃণা মনে মনে অনুক্ষণ একটা আকাশ-ছোঁয়া বিরূপ মনোভাব জাগিয়ে রাখে। তার চুল, তার গ্রীবা, তার চলাফেরা, তার গলার স্বর, এমন কি তার দেহের প্রতি অঙ্গই মনের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বালে অথচ কি একটা দুর্নিরীক্ষ্য শক্তি প্রতিনিয়ত ওরই দিকে টানে, প্রতিমুহূর্তে ওর প্রতিটি ভঙ্গী লক্ষ্য না করেও তুমি পার না—ঠিক এই মনোভাব, এই ঘৃণার মনোভাবই আমি সেই সময় সেণ্ট জেরোম সম্বন্ধে অনুভব করতাম।

সেণ্ট জেরোম আমাদের সঙ্গে আছেন প্রায় বছর দেড়েক হল। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেখতে পাই এই ফরাসী ভদ্রলোক মানুষ হিসেবে চমৎকার ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একদম খাঁটি ফরাসী। মূর্খ ছিলেন না, মোটামুটি ভালই শিক্ষিত ছিলেন, আর আমাদের সম্বন্ধেও নিষ্ঠার সঙ্গেই কর্তব্য পালন করতেন। কিন্তু তাঁর স্বজাতির বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরিই ছিল তাঁর চরিত্রে, সেগুলো আমাদের রাশিয়ানদের চরিত্রের একেবারে বিপরীত—তা হচ্ছে একটা হীন আত্মম্ভরিতার ভাব, দম্ভ, উদ্ধত ভঙ্গির, আর নিজের ওপর অতিবিশ্বাস। এই কারণেই আমি ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট ছিলাম।

অবশ্য দিদিমা ওঁকে শারীরিক শাস্তি সম্বন্ধে নিজের মতামত জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আমাদের বেত মারতে ওঁর সাহস হত না; কিন্তু তাহলেও মাঝে মাঝেই উনি আমাদের শাসাতেন বেত হাতে নিয়ে বিশেষত আমাকে। আর "বেত মারা" শব্দটাও সে সময় ব্যবহার করতেন এমনি ভঙ্গিতে, এমনি স্বরে যে মনে হত আমাকে বেত মারতে পারলে বোধহয় ওর সুখ আর ধরত না।

শাস্তির যাতনাকে ভয় করতাম না, কারণ তার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না,

কিন্তু সেণ্ট জেরোম আমাকে মারতে পারে এই চিন্তাতেই আমি চাপা রাগ আর হতাশায় দিশেহারা হয়ে যেতাম। কার্ল ইভানিচ্‌ই কি আর কোন সময়ে বিরক্ত হয়ে রুলার দিয়ে ভয় দেখাননি আমাদের? কিন্তু সেকথা মনে পড়লে রাগ হয় না একটুও। এমন কি যে সময়কার কথা বলছি (তখন আমার চোদ্দ) সেই সময়েও যদি কার্ল ইভানিচ্‌ আমাকে ধরে মারতেন, তাহলেও আমি তা মুখ বুঁজে সহ্য করতে পারতাম। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তাঁকে দেখতাম আর আমাদের পরিবারেরই একজন হিসেবে বরাবর তাঁকে দেখে এসেছি। কিন্তু সেণ্ট জেরোম ছিলেন যেমন উদ্ধত তেমনি অহঙ্কারী; গুরুজনমাত্রকেই বাধ্য হয়ে যেটুকু শ্রদ্ধা করতে হয়, সেই শ্রদ্ধাটুকু ছাড়া সেণ্ট জেরোমের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র হৃদয়ের টান ছিল না। কার্ল ইভানিচ্‌ ছিলেন একজন মজাদার বুড়োমানুষ, পুরনো চাকর গোছের, যাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম কিন্তু আমার মত ছেলেমানুষের চোখে তিনি ছিলেন সামাজিক মর্যাদায় আমার চাইতে নীচু স্তরের লোক।

আর সেণ্ট জেরোম ছিলেন সেদিক থেকে এর উল্টো। দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি সুশিক্ষিত, তরুণ ফুলবাবু। সকলের সঙ্গে মাথা তুলে সমান তালে চলবার তিনি চেষ্টা করতেন।

কার্ল ইভানিচ্‌ আমাদের বকতেন বা শাস্তি দিতেন, খুব ঠাণ্ডা মাথায়। বেশ বোঝা যেত এটাকে তিনি নিতান্তই দরকারী অথচ কষ্টদায়ক কর্তব্য বলেই মনে করতেন। সেণ্ট জেরোম কিন্তু সব সময় নিজের পদমর্যাদা জাহির করতে ব্যস্ত। এটা স্পষ্ট বোঝা যেত তাঁর শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল যতটা না আমাদের ভাল করা; তার চাইতেও বেশী নিজে খুশী হওয়া। যত সব লম্বা লম্বা জাঁকালো ফরাসী শব্দ সেগুলোকে কায়দা করে শেষের দিকে জোর দিয়ে আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উচ্চারণ করেন—আর আমার পিত্তি জ্বলে যায়। কার্ল ইভানিচ্‌ চটলে বলতেন 'সাক্ষীগোপাল', 'দুষ্টু ছেলে', 'মাকাল ফল' ইত্যাদি, আর সেণ্ট জেরোম বলেন 'পাজি', 'বজ্জাত', 'হতভাগা' ইত্যাদি—যে নামগুলো আমার অহঙ্কারে ঘা দিত।

কার্ল ইভানিচের সময়ে আমাদের এক কোণে গিয়ে হাঁটু গেড়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে থাকতে হত, অর্থাৎ শারীরিক কষ্টটাই ছিল একমাত্র শাস্তি। আর সেণ্ট জেরোম বুক ফুলিয়ে হাত নেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে আমাদের ঐ বিশেষ সম্বোধনগুলো করেন তারপর তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাপ চাইতে হয়। এখানে আসল শাস্তিটা হল অপমানে।

আমি শাস্তি পেলাম না, এ নিয়ে কেউ আর কোন কথাও তুলল না—কিন্তু তবুও ঐ দুটি দিনে যে হতাশা, লজ্জা, আতঙ্ক আর ঘৃণা ভোগ করেছিলাম, তা জীবনে ভোলবার না! যদিও এর পর থেকে সেণ্ট জেরোম আমার সম্বন্ধে সব আশাই ছেড়ে দিলেন, আমাকে নিয়ে মোটে মাথাই ঘামাতেন না আর তবুও আমি তাঁর সঙ্গে নির্লিপ্ত ব্যবহার করতে পারতাম না কিছুতেই। কোন সময় চোখোচোখি হওয়া মাত্রই স্পষ্ট বুঝতে পারতাম যে আমার চোখে একটা শত্রুতার ছায়া ঘনিয়ে আসছে—

তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতাম মুখে একটা উদাসীনতার ভাব টেনে আনতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারতাম আমার এই ভণ্ডামি ওঁর চোখে ধরা পড়ে গেছে তখন লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিতাম।

এক কথায় বলতে পারি, ওঁর কোনরকম সংস্পর্শে আসতেই আমি যে কি ভয়ঙ্কর ঘৃণা বোধ করতাম তা বর্ণনা করা আমার অসাধ্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিচারিকার ঘর

এরপর থেকে নিজেকে ভয়ানক একা লাগত আর তাই চুপচাপ বসে নির্জনে চিন্তা করা আর চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সবকিছু লক্ষ্য করাই আমার প্রধান আনন্দ হয়ে পড়ল। প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল অবশ্য ঝিয়েদের ঘরটা, ওখানে ধীরে ধীরে বেশ একটা নাটক গড়ে উঠছিল—তাতে আমি যেমনি উৎসাহ তেমনি আনন্দ পেতাম। নাটকের নায়িকা হল মাশা। ভ্যাসিলীকে ভালবাসে সে—অনেক দিন আগে থেকেই বাসে, তখন ও চাকরি করত না আর ভ্যাসিলী ওকে তখন বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল। পাঁচবছর বিচ্ছেদের পর ভগবান আবার ওদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন এই দিদিমার বাড়িতে।—কিন্তু ভাগ্য এতই নির্মম যে এখানে আবার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিকোলাই, মাশার কাকা—ভ্যাসিলীর সঙ্গে মাশার বিয়ের কথাটা সে কানেই তুলছে না ভ্যাসিলী নাকি ওর মতে নেহাতই একটা উজবুক, লোচ্চা।

বাধা দেবার ফল এই দাঁড়াল যে নিতান্তই নির্লিপ্ত স্বভাবের আর ঠাণ্ডা মাথার লোক ভ্যাসিলী—সে একেবারে মাশার প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। ওর মতন একজন দাস, যে দর্জীর কাজ করে, গোলাপী রঙের শার্ট গায়ে দেয় আর চুলে পমেটম মাখে জবজবে করে—কেবল ওর পক্ষেই বোধহয় এমনি পাগলের মত ভালবাসা সম্ভব।

যদিও ওর ভালবাসা প্রকাশের রীতি ছিল অদ্ভুত, সময় অসময় মানত না (যেমন মাশাকে দেখলেই ও সবসময় তাকে ব্যথা দিতে চেষ্টা করে, হয় জোরসে চিম্‌টি কাটে, নয় চড় মারে, নয়তো এমনি করে জড়িয়ে ধরে যে চাপে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়)—কিন্তু তবুও ওর প্রেম ছিল সত্যি, তাতে কোনও খাদ ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন নিকোলাইয়ের প্রত্যাখ্যানে মনের খেদে ভ্যাসিলী ভীষণ মদ খেতে শুরু করল আর শুঁড়িখানায় গিয়ে বিচ্ছিরী এমনি সব হাঙ্গামা বাধাতে লাগল, এক কথায় ওর হাবভাব এতই লজ্জাজনক হয়ে

উঠল যে বেশ বারকয়েক পুলিশের হাতে ধাতানি খেতে হল। কিন্তু ওর এই অসঙ্গত আচরণ আর তার ফলাফলে মাশার চোখে ওর দাম আরও বাড়িয়ে দিল, মাশার প্রেম একেবারে উথলে উঠল ওর জন্যে। যে কদিন ভ্যাসিলী আটক ছিল, সে কদিন মাশা দিনরাত কেঁদেছে : চোখের জল তার একমিনিটের জন্যও শুকোয়নি ; গাশার কাছে বসে বসে খালি হাহুতাশ করেছে (গাশা আবার এই অসুখী প্রেমিকদের সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিল) আর কাকার গালাগালি, মারধোর উপেক্ষা করে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে।

পাঠক, যে সমাজের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করাচ্ছি, তাকে ঘৃণা করো না। তোমার মন যদি প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি এসবের সুর হারিয়ে ফেলে না থাকে, তবে সে সুরের মূর্ছনা তুমি পাবে এই দাসীদের ঘরে। আমাকে অনুসরণ করতে তোমার ভাল লাগুক কিংবা না লাগুক, আমি নিজেকে নিয়ে যাচ্ছি সিঁড়ির সেই মুখে সেখান থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাব ওদের ঘরে কি ঘটছে না ঘটছে। ওখানে একটা বেঞ্চি, তার ওপরে আছে ইস্ত্রি, পিস্‌বোর্ডের নাকভাঙা একটা পুতুল, কাপড় কাচার ছোট গামলা আর হাতমুখ ধোবার পাত্র ; পাশে একটা জানালার তাক, তাতে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো একপিণ্ড মোম, এক ফেটি সিল্কের সুতো, একটা আধখাওয়া কচি শশা আর বনবন। আর আছে বড় লাল টেবিলটা, তার ওপরে অসমাপ্ত একটা ছুঁচের কাজের ওপর চাপা দেওয়া ক্যালিকো জড়ানো একটা ঢিল—আর তার পেছনে টেবিলের ধারে বসে আছে সে, পরনে আমার প্রিয় গোলাপী লিনেনের পোশাক আর নীল রঙের রুমাল, যা দেখলে আমি বিশেষ করে আকৃষ্ট হই। সেলাই করছে, মাঝে মাঝে একটু থেমে ছুঁচ দিয়ে মাথাটা একটু চুলকে নিচ্ছে অথবা মোমবাতির শলতের পোড়া অংশটা কেটে দিচ্ছে। আমি দেখি আর ভাবি, আচ্ছা ও কেন বেশ ভদ্রঘরে জন্মাল না ? অমন সুন্দর ঝক্‌ঝকে নীল চোখ, সোনালী চুলের বিনুনী আর অমন পুরন্ত বুক ! কেমন মজা হত ও যদি এখন কোন ড্রইংরুমে বসে থাকত মাথায় টুপিতে গোলাপী রিবন লাগানো আর লাল টুকটুকে গাউন পরে—মিমির মতন নয় কিন্তু ভারস্কয় বুলেভারে যেমনটি দেখেছিলাম তেমনি ? ও তাহলে ফ্রেমে আটকে ছুঁচের কাজ করত, আর আমি আয়নার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম ! ও যা চাইত আমি তাই করতাম, আমি নিজে ওর খাবার, ওর পোশাক এগিয়ে দিতাম।

আর এর তুলনায় কি বিশ্রী দেখায় ওই ভ্যাসিলীটার মাতাল মুখ আর

বেঢপ দেহটা আঁট একটা কোট গায়ে, তলা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সেই গোলাপী রঙের নোংরা শার্টটা। ওর দেহের প্রতিটি ভঙ্গিতে ওর পিঠের শিরদাঁড়ার প্রতিটি খাঁজে যেন লেখা ওর ভয়ঙ্কর শাস্তির কাহিনী।

"ওঃ, ভাসিয়া! আবার"—মাশা বলে ওঠে হাতের ছুঁচটা কুশনে ফুটিয়ে রেখে, কিন্তু মাথা তোলে না ভ্যাসিলীকে অভ্যর্থনা জানাতে।

"হ্যাঁ, তা হয়েছে কি? ওই লোকটার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কি তুমি আশা কর?" ভ্যাসিলী জ্বলে ওঠে, "কোনরকমে ও যদি ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে পারত! কিন্তু আমার কোন চেষ্টাই কাজে এল না, আর তা কেবল ওরি জন্যে।"

"একটু চা খাবে?" আরেকটি ঝি নাদেঝদা জিজ্ঞেস করে।

"ধন্যবাদ। কিন্তু কেন তোমার ঐ শয়তান কাকাটি আমাকে দেখতে পারে না? আমাকে দেখতে পারে না—আমি কারো কাছ থেকে চেয়েচিন্তে পোশাক পরি না বলে, আমি মাথা উঁচু করে চলি বলে, আমার চালচলনের জন্যে। আমার তাতে ভারি বয়েই গেল।" ভ্যাসিলী হাত নেড়ে দিয়ে কথাটা শেষ করে।

"এ গুরুজনের কথা শোনা উচিত"—মাশা দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে বলে, "কিন্তু তুমি এত—"

"আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, তাই।" ঠিক সেইক্ষণে দিদিমার ঘরের দরজাটা খুলে গেল দড়াম করে আর গজগজ করতে করতে গাশা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে শোনা গেল।

"দেখ না! যতই কেন না খুশি করতে চেষ্টা করি, বুড়ী কি চায়, নিজেই জানে না। ওঃ, কি কপাল নিয়ে জন্মেছি, খেটে খেটে হাড় কালি হল। ইচ্ছে হয়—ও, প্রভু আমাকে ক্ষমা কর!" গাশা বিড়বিড় করতে থাকে হাত নেড়ে নেড়ে।

"নমস্কার, আগাফিয়া, মিখাইলোভ্না।" ভ্যাসিলী উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

"ওঃ, আর পারি না। যাও, দূর হও। আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। বুঝলে?" গাশা থমথমে মুখ করে ভ্যাসিলীর দিকে তাকিয়ে থাকে, "তুমি এখানে আস কেন? ঝিয়েদের ঘরটা কি পুরুষমানুষদের জন্যে?"

"এই একটু দেখতে এসেছিলাম তোমরা সব কে কেমন আছ?" ভ্যাসিলী মিনমিন করে বলে।

"কেমন আছি? শীগগিরই শিঙে ফুঁকব।" আগাফিয়া মিখাইলোভ্‌না আরও চটেমটে জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে।

ভ্যাসিলী হেসে ফেলে।

"হাসবার কিছু হয়নি। আর আমি যদি বলি তোমাকে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, তবে তোমাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে, বুঝলে? দেখ একবার ওকে। মাশাকে বিয়ে করবে! নোংরা বদ্‌মাস কোথাকার! এই বেরোও, শীগ্‌গিরই বেরিয়ে যাও।"

আগাফিয়া মিখাইলোভ্‌না পা ঠুকতে ঠুকতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল, এমনি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করল যে জানালাগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল।

কিছুক্ষণ ধরে পার্টিশনের ওধার থেকে তার গলা শোনা গেল—অবিশ্রাম বকছে, গালাগালি দিচ্ছে সব্বাইকে, সব জিনিসকে, নিজেকে শাপান্ত করছে, চারধারে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলছে, পোষা বেড়ালটার কানে অনবরত মোচড় লাগাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে বেড়ালটাকে লেজ ধরে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল—বেচারা বেড়ালটা আর্তনাদ করতে করতে ছিট্‌কে এসে পড়ল।

"মনে হচ্ছে অন্য সময় এসে চা খাওয়াটাই বুদ্ধির কাজ হবে।" ফিসফিস করে বলে ভ্যাসিলী, "এখন চলি, পরে এক সময় আসব।"

"দাঁড়াও না, জল গরম হয়েছে কিনা দেখে আসি।" আড়চোখে তাকিয়ে নাদেঝদা বলে।

নাদেঝদা বেরিয়ে যেতেই ভ্যাসিলী মাশার খুব কাছে বসে পড়ে বলে, "আমি ঠিক করেছি এটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব! হয়তো কাউন্টেসের কাছে গিয়ে সোজা সব কথা বলব,—এই দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা, না হয়তো—সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যাব পৃথিবীর আর এক প্রান্তে, যাই কিনা দেখে নিও।"

"আর আমি কি করে একা একা থাকব এখানে?"

"তোমার জন্যই তো একমাত্র দুঃখ। তোমার জন্যে না হলে কবেই আমি পালিয়ে যেতাম, একেবারে তিনসত্যি করছি।"

"তোমার শার্টগুলো আমার কাছে আর কাচতে আন না কেন ভাসিয়া?" একটুক্ষণ বিরতির পর মাশা বলে, "দেখ তো এটা কি ভয়ঙ্কর নোংরা হয়েছে?" মাশা ওর শার্টের কলারটা হাত দিয়ে দেখায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে নীচে থেকে দিদিমার ছোট ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল, গাশাও তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"এই বদমাস, কি চাও তুমি ওর কাছে?" ভ্যাসিলী ওকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে, ধাক্কা মেরে দরজার দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে, "ওর এই অবস্থা করেছ, তারপরেও ওর পেছনে লেগে আছ। ওকে কাঁদতে দেখলে খুশী হও না? হতভাগা নির্লজ্জ কোথাকার! দূর হও, দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে। তুইই বা কি দেখেছিলি ওর মধ্যে, শুনি?" এবার মাশার দিকে ফিরে সে, "আজকেই কাকার কাছে মার খেয়েছিস না ওর জন্যে? তবু কিছুতে নিজের গোঁ ছাড়বি না! ভ্যাসিলী গ্রুসকভকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না! গাধা কোথাকার!"

মাশা এবার হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে ওঠে, "কক্ষনো করব না, কক্ষনো না, আর কাউকেই আমি ভালবাসি না, ওর জন্যে যদি মার খেয়ে মরেও যাই তবুও আর কাউকে বিয়ে করব না।"

আমি বহুক্ষণ ধরে মাশার দিকে তাকিয়ে রইলাম—ও বাক্সের ওপর শুয়ে পড়ে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছছে; আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ভ্যাসিলী সম্বন্ধে আমার মতামত পাল্টে ফেলতে, খুঁজে-পেতে দেখতে লাগলাম, কি আছে ওর যাতে মাশার কাছে ওকে এতটা লোভনীয় করে তুলেছে। কিন্তু ওর দুঃখের প্রতি আমার নিখাদ সমবেদনা সত্ত্বেও এটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকল না যে মাশার মত সুন্দরী মেয়ে কি করে ভ্যাসিলীকে ভালবাসতে পারে।

"আমি যখন বড় হব", সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে নিজের এলাকায় যেতে যেতে ভাবি, পেত্রোভস্কয়ে আমার সম্পত্তি হবে আর মাশা আর ভ্যাসিলী হবে আমার দাসদাসী। আমি পড়ার ঘরে বসে বসে পাইপ টানব আর মাশা রান্নাঘরে ইস্ত্রি নিয়ে যাবে। কাউকে বলব মাশাকে ডেকে দাও আমার কাছে। মাশা আসবে, সে সময় ঘরে কেউ নেই। হঠাৎ ভ্যাসিলী এসে ঢুকবে, মাশাকে দেখেই বলবে, "ওঃ, আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না।" মাশা কাঁদবে শুনে। আমি তখন বলব, "ভ্যাসিলী, আমি জানি মাশাকে তুমি ভালবাস, ও ভালবাসে তোমাকে। এই নাও, এক হাজার রুবল দিলাম তোমাকে। যাও বিয়ে কর গিয়ে। ভগবান তোমাদের সুখী করুন।" তারপর আমি বসবার ঘরে চলে যাব। হাজারো কল্পনা, হাজারো স্বপ্ন মানুষের মনে খেলা করে বেড়ায়; মনের পটে কোন দাগ না কেটেই তারা মিলিয়ে যায়। আবার এরই ভেতর কিছু স্বপ্ন

কিছু কল্পনা মনপ্রাণ জুড়ে থাকে, তার দাগ জীবনে মেলায় না : বহুদিন পরেও সে স্মৃতির আবেশ ঘুরে ফিরে বেড়ায়, ঠিক কি ঘটনাটা মনে পড়ে না, শুধু মনে পড়ে স্মৃতিটা বড় মধুর, মন বারবার সেই অনুভূতিগুলো ফিরে পেতে চায়। এই বিশেষ ঘটনাটাও আমার জীবনে তাই : ভ্যাসিলীকে বিয়ে করে মাশা যে আনন্দ পাবে তার কাছে আমার নিজের ইচ্ছেকে বলি দিয়ে স্বার্থত্যাগের যে স্বপ্ন সেদিন আমি দেখেছিলাম, তার প্রভাব, তার রেশ আমার মনে ঝঙ্কার তুলেছে বহুদিন পরেও।

উনবিংশ অধ্যায়

কৈশোর

সেই কৈশোরে আমার সব সময়কার চিন্তা কি ছিল, কোন চিন্তাই বা সব চাইতে আমার প্রিয় ছিল তা বললে লোকে বোধ হয় বিশ্বাস করবে না—আমার বয়সের সঙ্গে সে চিন্তাধারার এতই অমিল। কিন্তু আমার মতে মানুষের অবস্থা আর তার মনের গতি যখন পা মিলিয়ে চলে না, তখন সেটাই তার আন্তরিকতার চরম প্রমাণ।

সেই সময় গোটা একটা বছর আমি নিজের মনে একা একা কাটিয়েছিলাম, নিজেকে শামুকের মতন ভিতরে গুটিয়ে নিয়ে দিনরাত চিন্তায় ডুবে থাকতাম—মনে নানা প্রশ্ন আসত মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে, ভবিষ্যত জীবন, আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে। আমি আমার অপরিণত অনভিজ্ঞ মনের আকুল উৎসাহ দিয়ে সেই সব সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করতাম।

আমার মনে হয় গোটা মানব-জাতিরই যে ধারায় জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, একটি বিশেষ মানুষের মানসিক জ্ঞানও সেই একই কাজে পরিণতির দিকে এগোয়; যে ভাবনা-চিন্তাগুলো নানা দার্শনিক তথ্যের ভিত্তি, সেগুলো মানুষের মনের ধর্মস্বরূপ আর প্রতিটি মানুষই দার্শনিক তথ্যের জন্মের আগে থেকেই এগুলো সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

এই সব ভাবনাগুলো আমার চিন্তাজগতে উদয় হল এমনি উজ্জ্বল হয়ে, স্পষ্ট হয়ে যে আমি কল্পনা করলাম জীবনের এই পরম সত্যগুলোর আবিষ্কারক বুঝি বা আমিই আর তাই চেষ্টা করতাম এ সত্যগুলোকে জীবনে খাটাতে।

একসময়ে আমার মাথায় এ ধারণা এল যে মানুষের সুখ কোন জাগতিক জিনিসের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে তার ওপর। কাজেই সে কষ্ট করতে অভ্যস্ত সে কখনো অসুখী হয় না। অতএব আমিও সহ্যশক্তি বাড়াবার চেষ্টায় লেগে গেলাম—হাত বাড়িয়ে তার ওপর তাতিশেভের ভারী অভিধানখানা ধরে রাখতাম পাঁচ মিনিট, হাত দুটো ব্যথায় টনটন করত;

অথবা চিলেকোঠায় গিয়ে খালি পিঠের ওপর দড়ির বাড়ি লাগাতাম সপসপ্ করে, যন্ত্রণায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখে জল এসে যেত।

আরেকবার হঠাৎ মনে হল যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করতে পারে কাজেই সুখী হতে হলে ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বর্তমানেই সম্ভব আনন্দ ভোগ করে নাও! মানুষ এই সামান্য কথাটা কেন যে ধরতে পারেনি তা আমার মাথাতেই এল না। এই ধারণা যতটা নিয়ে পুরোপুরি তিনটে দিন আমি পড়াশুনা অবহেলা করলাম, কিছু না করে কেবল শুয়ে শুয়ে আরাম করে গল্পের বই পড়লাম আর আমার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত দিয়ে কেনা আদার রস দেয়া পিঠে আর মধু খেলাম।

একবার বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে চক দিয়ে নানারকম ছবি আঁকছিলাম, হঠাৎ মনে এল : আচ্ছা, সুসমঞ্জস জিনিস দেখতে চোখে ভাল লাগে কেন? সামঞ্জস্য জিনিসটা কি? "ওটা একটা সহজাত প্রবৃত্তি," নিজেই জবাব দিতাম। কিন্তু এর ভিত্তি কি? জীবনের সব কিছুতেই কি সামঞ্জস্য থাকে? বরঞ্চ ঠিক উল্টো। এই হল জীবন—আমি একটা ডিম আঁকলাম। জীবনের পর আত্মা অমরত্বে চলে যায়—অতএব ডিমের একধার থেকে একটা লাইন টেনে সোজা বোর্ডের ধার পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। কিন্তু আরেক দিকেও ঠিক এমনি আরেকটা লাইন নেই কেন? আর ভাব একবার, কিরকম অমরত্ব এটা আর মোটে একটা দিক? কারণ এ জগতে আসবার আগেও তো আমাদের জীবন ছিল, কেবল তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে এই যা।

এই যুক্তিটা আমার কাছে যেমন নতুন, তেমন চমৎকার ঠেকল—আজ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না, বহু চেষ্টা করলে তার সামান্য সূত্র ধরতে পারি মাত্র। এত ভাল লাগল যে তখুনি বসে পড়লাম লিখে ফেলতে কিন্তু কলম হাতে নিয়ে বসতেই হঠাৎ মাথার ভেতর এত রাজ্যের চিন্তা ভীড় করে আসতে লাগল যে বাধ্য হয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। জানালা দিয়ে তাকাতে দেখতে পেলাম একটা ঘোড়া, গাড়োয়ান তাকে গাড়িতে জুতছে। এবার আমার সব মনোযোগটা ঐদিকে গেল—আচ্ছা ঐ যে ঘোড়াটা ওর আত্মা মুক্তি পেলে কোথায় যাবে কোনও প্রাণীর না কোনও মানুষের মধ্যে? সেই সময় ভলোদিয়া একবার ঘরের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গেল, আমি বিশেষ কিছু একটা সমাধানের চেষ্টা করছি বুঝতে পেরে সামান্য একটু হেসে গেল। ঐ একটুকরো

হাসিই যথেষ্ট, ঐতেই আমার কাছে ধরা পড়ল যে আমি যা সব ভাবছি তা একেবারেই অর্থহীন হিজিবিজি।

এই বিশেষ ঘটনাটার উল্লেখ করলাম শুধু পাঠকদের একটা ধারণা দিতে, কি ধরনের ভাবনাচিন্তা আমার মাথায় দিনরাত গজগজ করত।

এই সব দার্শনিক চিন্তার ভেতর সবচাইতে বেশী মজেছিলাম একটা অহং ভাবে। এটাই* মারাত্মক হয়ে পড়েছিল—এক সময় সেই ঝোঁকে প্রায় পাগলামির সীমানায় পৌঁছেছিলাম। কল্পনা করতাম যেন আমি ছাড়া এ জগতে আর কারো কোন অস্তিত্বই নেই; জিনিসগুলো প্রকৃত জিনিস নয়, কতগুলো ছায়া মাত্র; আমি যখন নজর দিই তখন তারা এসে হাজির হয় এই যা। আমিও ওদের কথা ভুলে যাই—আর ওদেরও অস্তিত্ব মুছে যায়।

এক কথায় আমি শেলিং-এর কথা বিশ্বাস করতাম যে নিরপেক্ষভাবে বস্তুর আসল কোন অস্তিত্ব নেই, আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব। কোন কোন সময় এই ধারণা আমায় এমন পেয়ে বসত যে, পাগলামির ঝোঁকে হঠাৎ পেছনে আড়চোখে তাকিয়ে আমার অস্তিত্বহীন শূন্যতাকে চমকে দিতে চাইতাম।

মানুষের মনটা সত্যিই বড় হতভাগা, কত অর্থহীন চিন্তার জালই না বোনা হয় সেখানে!

অকূলে কূল পেত না আমার দুর্বল মন। কিন্তু ক্ষমতার অতিরিক্ত চেষ্টায় আমি একের পর এক মনের সেই সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম, নিজের সুখের দিকে তাকিয়ে যার গায়ে হাত দেবার সাহস আমার না করাই উচিত ছিল।

এই সব কঠিন মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা আসলে কিন্তু আমি মনের সূক্ষ্মতা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই লাভ করিনি। তাতে আমার সংকল্পের জোর কমে গিয়েছিল এবং সব সময় মনে মনে চুলচেরা বিচার করা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় অনুভূতির সজীবতা এবং দ্বিধাহীনভাবে বিচারের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে মানুষের মন তার আত্মার অবস্থা যতখানি অনুধাবন করতে পারে সেই অনুপাতেই তার মস্তিষ্কের অবাস্তব চিন্তাগুলো রূপ পরিগ্রহ করে তার স্মৃতির মণিকোঠায় আশ্রয় পায়। এই অবাস্তব চিন্তার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জাল বুনে চলা আমার এমনি অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আর সেই সঙ্গে আমার মানসিক অবস্থাটাও এমনি অস্বাভাবিক পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল যে, খুব আটপৌরে বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়েও নিজের ভাবনার অন্তহীন জালে

এমনভাবে জড়িয়ে পড়তাম যে, গোড়াকার বিষয়টা মন থেকে মুছে গিয়ে সে জায়গায় নিজের ভাবনাগুলোই একচ্ছত্র হয়ে দেখা দিত। নিজেকে যখন জিজ্ঞেস করতাম : কী করছি আমি ? জবাবে বলতাম : আমার ভাবনার কথাই আমি ভাবছি। আর এখন ? এখন কী ভাবছি ? আমার ধারণা, আমার ভাবনার কথা আমি ভাবছি। এইভাবে ক্রমান্বয়ে চলবে। আমি যুক্তির মধ্যে কারণ খুঁজে পেতাম না।

কবে আমার এই সব দার্শনিক আবিষ্কার আমার অহংকারকে পরিতৃপ্ত করত। অনেক সময়ই আমি নিজেকে এমন একজন কেউকেটা ঠাওরাতাম যিনি মানব সমাজের হিতার্থে নতুন নতুন সত্য আবিষ্কার করেছেন আর নিজের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম বলে মর জগতের মানুষদের একটু কৃপার চক্ষে দেখতাম। অথচ সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, এই সব সামান্য মানুষদের যে কারো সংস্পর্শে এলেই আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যেতাম। নিজের কাজে নিজেকে যতই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতাম, অন্যের কাছে নিজেকে জাহির করবার ক্ষমতা ততই কমে যেত। যত মামুলিই হোক, নিজের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি আচরণে আমি অপ্রতিভ না হয়ে পারতাম না।

বিংশ অধ্যায়

ভলোদিয়া

এই সময়কার বর্ণনায় যতই এগোচ্ছি, এটা ঠিক যে কাজটা আমার পক্ষে ততই কঠিন আর কষ্টকর হয়ে উঠছে। যে মধুর, উষ্ণ অনুভূতি আমার জীবনের প্রথম দিকটা আলোকিত করেছিল, এই কটি বছরের স্মৃতিতে তা খুব কমই মিলে। অচিরে কৈশোরের মরুভূমিটা ডিঙিয়ে আমি গিয়ে পড়তে চাই সেই সুখের দিনগুলোতে যখন বয়ঃসন্ধির সময়টা বন্ধুত্বের সুকুমার মহৎ অনুভূতিতে উজ্জ্বল, যার ভেতর দিয়ে হয় নতুন মাধুর্যমণ্ডিত এক কবিত্বময় যৌবনকালের উদ্বোধন।

আমি প্রহরের পর প্রহর ধরে স্মৃতির রোমন্থন করব না, কেবল সে সময়কার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো দেখিয়ে যাব—যতক্ষণ না সেই অসামান্য লোকটার কথায় এসে পৌঁছই, আমার চরিত্র গঠন আর মানসিক বিকাশের পথে যাঁর প্রভাব অসীম।

আর কয়েকটা দিন পরেই ভলোদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে। বিশেষভাবে নিযুক্ত মাস্টারমশাইরা আসতেন পড়াতে আর আমি ঈর্ষান্বিতভাবে, অনিচ্ছাকৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতাম ভলোদিয়া কেমন সাহসের সঙ্গে চক্ দিয়ে বোর্ডে টকাটক্ শব্দ করছে আর মুখে উচ্চারণ করছে কি সব অজানা শক্ত শক্ত শব্দ—আমার হিসেবে সেগুলো একেবারে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয়। অবশেষে এক রবিবারে, ডিনারের শেষে সব শিক্ষকেরা আর দুজন অধ্যাপক দিদিমার ঘরে জড় হলেন—বাবা ও আরও কয়েকজন অতিথির সামনে ভলোদিয়ার একটা নকল পরীক্ষা হল। তাতে ভলোদিয়া সব বিষয়েই যথেষ্ট গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিল—দিদিমা দেখে এত খুশী হলেন! নানা বিষয়ে আমাকেও প্রশ্ন করা হল, কিন্তু আমি প্রায় কিছুই পারলাম না। অধ্যাপকরা স্পষ্টই দিদিমার কাছে আমার অজ্ঞতা ঢাকবার চেষ্টা করছিলেন আর তাতেই আমার আরও বেশী করে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। যাহোক, আমার দিকে বিশেষ

মন দিল না কেউ, কেননা আমি মোটে পনের, এখনও পুরো এক বছর আমার হাতে আছে তৈরি করে নিতে। ভলোদিয়া কষে পড়াশুনা লাগিয়েছে, কেবল মাত্র খাবার সময়টুকুতে নীচে নামে, আর তাছাড়া বাকি সারাটা দিন এমনকি সন্ধ্যেটা পর্যন্ত ওপরে কাটায় পড়াশুনা নিয়ে। এত পড়ার যে দরকার আছে তা নয়, ও পড়ে ওর নিজের খুশীতে। ও আবার ভীষণ অহঙ্কারী, পরীক্ষায় শুধু কোনমতে পাশ করলেই চলবে না, বিশেষ ভাল নম্বর পাওয়া চাই।

শেষ পর্যন্ত প্রথম পরীক্ষার দিন এল। ভলোদিয়া পিতলের বোতাম বসান নীল কোট আর পেটেণ্ট লেদারের জুতো পরল সঙ্গে নিল সোনার ঘড়ি। বাবার ফিটন দরজায় এসে দাঁড়াল। নিকোলাই পা ঢেকে বসবার চামড়াটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল, ভলোদিয়া আর সেণ্ট জেরোম গাড়িতে চড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। ভলোদিয়া যখন গাড়িতে উঠছে ওর চমৎকার চেহারার দিকে মেয়েরা, বিশেষ করে কাটেনকা, আনন্দে উৎসাহে জলজ্বলে মুখ নিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল। বাবা বলতে লাগলেন, "শুভমস্তু", "শুভমস্তু"। দিদিমাও কোনমতে দেহটাকে টানা-হেঁচ্ড়া করে এনে জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন, যতক্ষণ ফিটন দেখা গেল ছলছল চোখে ভলোদিয়াকে আশীর্বাদ করলেন, তারপর গলির আড়ালে চলে গেলে ফিস্‌ফিস করে নিজের মনে কি যেন বললেন।

ভলোদিয়া ফিরে এল ; সবাই ঘিরে দাঁড়াল। কেমন হল ? ভাল ? কত নম্বর ; কিন্তু ওর জলজ্বলে মুখখানাই সব প্রশ্নের জবাব। পুরো নম্বর পেয়েছে ভলোদিয়া। পরের দিনও ঠিক তেমনি শুভেচ্ছা আর দুশ্চিন্তার ভেতর বেরিয়ে যায়, ফিরে এলে তেমনি আনন্দ ভরা আগ্রহের অভ্যর্থনা পায়। এভাবে ন দিন কাটল। দশম দিনে সব চাইতে কঠিন বিষয়—ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান। সেদিনও আমরা সবাই জানালার ধারে অধৈর্য হয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছি। দুটো বাজে, কিন্তু ভলোদিয়ার কোন চিহ্ন নেই।

"জয় ভগবান !" এসেছে, এসেছে, ওরা এসেছে ! জানালার সার্শীর গায়ে মুখখানা লেপ্টে রেখে লিউবোচ্‌কা চেঁচিয়ে ওঠে।

সত্যি ভলোদিয়াই বসে ফিটনের ভিতর সেণ্ট জেরোমের পাশে, সেই আগের নীল কোট আর ধূসর রঙের টুপি পরে নয়, একেবারে ছাত্রদের পুরো ইউনিফর্মে—নীল এমব্রয়ডারি করা কলার, তিনকোণা টুপি আর পাশে ঝোলান গিল্টি করা ছোরা।

"হা ভগবান, ওর মা যদি আজ বেঁচে থাকত!" ইউনিফর্ম পরা ভলোদিয়াকে দেখে দিদিমা চীৎকার করে উঠেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

ভলোদিয়া দৌড়ে এসে হাসিমুখে ঘরে ঢোকে, সবাইকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, আমাকে, লিউবোচ্‌কা, মিমি, কাটেনকা সবাইকে—কাটেনকার তো কানের ডগা অবধি লাল টুক্‌টুকে হয়ে ওঠে। ভলোদিয়ার আনন্দ আর ধরে না। আর ওকে যে কি চমৎকার দেখাচ্ছে ইউনিফর্ম পরে! সবে ওঠা গোঁফের রেখার সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে, নীল রঙের কলার। কি সুন্দর সরু লম্বা কোমর আর কি সাবলীল চলার ভঙ্গি! সেই স্মরণীয় দিনটিতে আমরা সবাই একসঙ্গে দিদিমার ঘরে খাওয়াদাওয়া করলাম। সকলের চোখে মুখে আনন্দ। ডিনারের শেষে বাবুর্চি বেশ আমিরী চালে অথচ বেশ খুশী খুশী মুখে বিনয়ের সঙ্গে তোয়ালে জড়িয়ে এক বোতল শ্যাম্পেন এনে হাজির করল। মা-মণির মৃত্যুর পর দিদিমা এই প্রথম শ্যাম্পেন পান করলেন; ভলোদিয়াকে অভিনন্দন জানাতে পুরো একটি গ্লাস খেলেন আর ওকে দেখতে দেখতে আনন্দে আবার কেঁদে ফেললেন। ভলোদিয়া এবার থেকে নিজের গাড়িতে নিজের অনুচরবর্গ নিয়ে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে ওর নিজস্ব অংশে বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা জানায়, সিগারেট ফোঁকে, বলনাচে যায়; এমন কি একবার ওর ঘরে কয়েকজন অতিথির সঙ্গে ভাগ করে দু বোতল শ্যাম্পেন পান করতেও দেখেছিলাম—রহস্যময় ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করে তাদের স্বাস্থ্য-পান করছিল। কিন্তু সে যথারীতি বাড়িতে খায়, আর আগের মতই বিকেল বেলাটা বসবার ঘরে কাটায় আর কাটেনকার সঙ্গে রহস্যময় কি সব বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। তবে যতদূর আমি শুনতে পেতাম—ওদের আলোচনায় আমি কখনও অংশ নিতাম না—দেখেছি ওদের সব আলোচনাই হচ্ছে নভেলের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে, প্রেম আর ঈর্ষা নিয়ে। এইসব আলোচনায় ওরা কি যে আনন্দ পায়, কেনই বা মাঝে মাঝে মিষ্টি করে হাসে বা গরম হয়ে তর্ক জুড়ে দেয়—এসব কিছুই আমার মাথায় ঢুকত না।

সাধারণভাবে এটাও আমি লক্ষ্য করেছি যে ভলোদিয়া আর কাটেনকার ভেতর ছোট বেলাকার সেই বন্ধুত্ব আর প্রীতির সম্পর্ক ছাড়াও নতুন অজানা একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল যেটা আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে ওদের দুজনকে কি একটা নতুন বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল।

একবিংশ অধ্যায়

কাটেন্‌কা ও লিউবোচ্‌কা

কাটেন্‌কার বয়স এখন ষোল। বেশ বড়সড় হয়েছে; শৈশব থেকে কৌমার্যে পা দেবার সময় মেয়েদের যে ছিপছিপে গড়ন, ব্রীড়ার ভাব আর চালচলনে কুণ্ঠা থাকে, তার বদলে কাটেন্‌কার মধ্যে এখন দেখা দিয়েছে সবে-ফোটা ফুলের প্রাণবন্ত সুষমা আর লাবণ্য। সেই ঝক্‌ঝকে নীল চোখ দুটি সব সময় যেন হাসছে, সেই ছোট্ট খাড়া নাকটি, ভুরুর সঙ্গে প্রায় সমান লাইনে বসান, একটু ফুলো নাকের পাটা দুটি, ছোট্ট মুখ তাতে মিষ্টি হাসি, গোলাপী স্বচ্ছ গালে টোল খাওয়া, সেই আগের ফর্সা ছোট দুটি হাত—সব মিলে 'ফুটফুটে মেয়ে' নামটি এখনও খুবই মানানসই ওর পক্ষে। নতুনত্বের মধ্যে কেবল ওর সোনালী চুলগুলো নতুনভাবে বিনুনি বাঁধে বড়দের ভঙ্গীতে আর ওর পুরন্ত ছোট্ট বুক, যাতে ওর লজ্জাও যত, আনন্দও তত।

লিউবোচ্‌কা যদিও ওরই সঙ্গে একসাথে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তবুও সে একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা।

লিউবোচ্‌কা দেখতে ছোটখাট, ছেলাবেলা রিকেট হওয়ার ফলে পা দুটো এখনও বাঁকা, দেখতে অতি কুশ্রী। মুখের মধ্যে সুন্দর বলতে কেবল চোখ দুটি; সত্যিই চমৎকার—বড়, কালো কুচকুচে—তাতে সরলতা আর আভিজাত্য মেশান এমন সুন্দর একটি ভাব যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই করবে। লিউবোচ্‌কা সব ব্যাপারেই সাধারণ আর স্বাভাবিক—কাটেনকা আবার যেন সব সময়েই অন্য কারো অনুকরণে নিজেকে তৈরি করতে ব্যস্ত। লিউবোচ্‌কা সব সময় তাকায় সোজাসুজি; একেকসময় বড় বড় কালো চোখ দুটি মেলে এতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে কোন একজনের দিকে যে পরে ও তারজন্যে বকুনি খায়, ওটা নাকি অসভ্যতা!

কাটেনকা এদিকে তাড়াতাড়ি চোখের পাতা নামিয়ে নেয়, অপাঙ্গে তাকায়, মুখে বলে চোখে ভাল দেখতে পায় না—যদিও আমি জানি ওর দৃষ্টিশক্তি খুবই

ভাল। লিউবোচ্‌কা প্রসাধন পছন্দ করে না; আর পাঁচজনের মধ্যে কেউ যদি ওকে চুমু খায়, ও তবে ভুরুটুরু কুঁচকে বলে দেয় ওসব আবেগটাবেগ ও ভালবাসে না।

কাটেনকা আবার ঠিক উল্টো, অতিথিদের সামনে মিমির কাছে যত আদর আবদারের ঘটা তার, সে সব সময়েই ভালবাসে দুএকটি মেয়ের সঙ্গে হাত জড়াজড়ি করে হলের ভেতর ঘুরে বেড়াতে। লিউবোচ্‌কা খুব অল্পেতেই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়, কোন সময়ে হয়তো খুশির আবেগে হাত নাড়তে নাড়তে ঘরময় খানিক ছুটোছুটিই করে বেড়াল। কাটেনকা এদিকে যখন হাসতে শুরু করে, হাত অথবা রুমাল দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে নেয়। লিউবোচ্‌কা সোজা হয়ে বসে, হাঁটে দুপাশে হাত ঝুলিয়ে। কাটেনকা হাঁটে একপাশে মাথাটি একটু হেলিয়ে হাত দুটো জোড়া করে। বড়দের কারো সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেলে লিউবোচ্‌কার ফুর্তি আর ধরে না, ও সব সময়ই বলে ও বিয়ে করবে একজন অশ্বারোহী সৈন্যকে। কাটেনকার মতে পুরুষ মানুষ মাত্রেই অতি ভয়ঙ্কর আর ও বিয়েই করবে না কখনো। কোন ভদ্রলোক ওর সঙ্গে কথা বললে ওর ভাবভঙ্গী বদলে যায়, একজন, দেখলে মনে হয় যেন কোন কারণে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। লিউবোচ্‌কা সব সময়ই মিমির ওপর মহাবিরক্ত—ওরা নাকি এমনি শক্ত করে অন্তর্বাস পরিয়ে দেয় ওকে যে ভাল করে নিশ্বাসই নিতে পারে না আর ও আবার একটু খেতেটেতে ভালবাসে! কাটেনকা জামার ভেতর একটা আঙুল ঢুকিয়ে আমাদের দেখায় কত ঢিলে সেটা আর খায় নিতান্তই অল্প। লিউবোচ্‌কা ভালবাসে মুখ আঁকতে আর কাটেনকা খালি ফুল আর প্রজাপতি। লিউবোচ্‌কা ফিল্ডের কনসার্ট বাজায় খুব চমৎকার আর বিটোভেনের কিছু কিছু সোনাটাও। কাটেনকা বাজায় অন্য নানা সুর আর ওয়াল্‌জ্‌, সুরগুলোকে টেনে রাখে অনেকক্ষণ, চাবিগুলোকে টেপে খুব জোরে, পা চালায় ঘনঘন।

আমি তখন ভাবতাম, কাটেনকা অনেকটা বড়দের মতন, কাজেই ওকেই আমার ভাল লাগত বেশী।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বাবা

ভলোদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা অবধি বাবা যেন অতিরিক্ত খুশী, দিদিমার কাছে খাওয়া-দাওয়া করতেও আসেন আগের চাইতে ঘনঘন। আমি অবশ্য নিকোলাইয়ের কাছে শুনেছি যে তাঁর এই অতি আনন্দের কারণ হচ্ছে সম্প্রতি জুয়ায় জেতা একটা মোটা অঙ্কের টাকা। এক আধদিন সন্ধ্যেতে ক্লাবে যাবার আগে বাবা আমাদের কাছে আসেন, আমরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়াই আর বাবা পিয়ানোর সঙ্গে জিপ্‌সী গান করেন ; নরম জুতো ঠুকে ঠুকে তাল রাখেন। (উনি জুতোর হিল পছন্দ করেন না, কখনো পরেনও না) লিউবোচ্‌কা বাবার সব চাইতে প্রিয়, তাই তার সে সময়কার আনন্দ দেখবার মতন। কোন সময় হঠাৎ বাবা আমাদের পড়ার ঘরেও চলে আসেন, আমি পড়া বলি আর উনি গম্ভীর মুখে শোনেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-আধটা ভুল ঠিক করে দেবার চেষ্টা থেকে বুঝতে পারি আমি কি শিখছি না শিখছি সে বিষয়ে উনি বিশেষ কিছুই জানেন না। দিদিমা হয়তো হঠাৎ একদিন বিনাকারণে সবাইয়ের ওপর চটে গিয়ে গজগজ করতে থাকলেন বাবা তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে দুষ্টু ছেলেদের মতন চোখ টিপে ইশারা করেন। এক কথায় সব মিলিয়ে আমার শিশুমনের কল্পনায় বাবা যে এর আগে একটা আকাশছোঁয়া উঁচু আসনে বসে থাকতেন, তা থেকে যেন অনেকটাই নেমে এলেন। অবশ্য এখনও আগের মতই ভালবাসা তার শ্রদ্ধার সঙ্গেই ওঁর মস্তবড় ফর্সা হাতখানায় চুমু খাই। কিন্তু তবুও যেন মনে হয় এখন বাবার সম্বন্ধে চিন্তা করবার বা তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের একটা অধিকার পেয়েছি। এতে এমনি সব চিন্তা মনে জাগে যে এক এক সময় মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। একটা ঘটনার কথা জীবনে ভুলব না, যার ফলে আমার মানসিক যন্ত্রণার আর অন্ত ছিল না।

একদিন সন্ধ্যা পার হয়েছে, বাবা কালো ড্রেসকোট আর সাদা ওয়েস্ট-কোট পরে এসে বসবার ঘরে ঢুকলেন ভলোদিয়াকে বলনাচে নিয়ে যাবেন বলে।

ভলোদিয়া তখন নিজের ঘরে সাজপোশাক করছে, দিদিমা শোবার ঘরে অপেক্ষা করছেন ওর জন্যে (প্রত্যেক বলনাচের আগে দিদিমার অভ্যেস ছিল ভলোদিয়াকে কাছে ডেকে এনে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখা, তারপর আশীর্বাদ করে নানা উপদেশ দেওয়া)। মিমি আর কাটেনকা হলের ভেতর পায়চারী করছে, হলে সবে একটা মোমবাতি জ্বলেছে। আর লিউবোচ্‌কা পিয়ানোয় বসে মা-মণির প্রিয় ফিল্ডের সেকেণ্ড কনসার্ট শিখছে।

আমার মা আর বোনের ভেতর যেরকম মিল ছিল, কোন দুজন লোকের ভেতর তেমনি অদ্ভুত মিল আমি জীবনে দেখিনি। সে মিল মুখে নয়, দেহভঙ্গীতেও নয়, কিন্তু ওদের চরিত্রের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যে—হাত দুখানায়, হাঁটার ভঙ্গীতে, গলার স্বরের বিশেষত্বে আর বিশেষ কতগুলো কথা—সেগুলো হামেশা শোনা যেত ওদের দুজনেরই মুখ থেকে। লিউবোচ্‌কা যখন চটে গিয়ে বলত, "এটা করতে দেওয়া হবে না কোন জন্মে।" এই "কোন জন্মে" কথাটা ঠিক মা-মণির মতই এমনি করে টেনে সুর করে বলত যেন ওর গলার স্বরে সত্যি সত্যিই সময়ের হিসেবটা ফুটে বেরোত। সব চাইতে বেশী সাদৃশ্য দেখা যেত যখন ও বাজনা বাজাত—ঠিক মায়েরই মত ভঙ্গীতে। ঠিক তেমনি করে গাউন ঠিক করে বসত, বাঁ হাত দিয়ে ওপরের দিক থেকে বইয়ের পাতা ওল্টাত, শক্ত কোন সুর ঠিকমত বাজাতে না পারলে বিরক্ত হয়ে হাত মুঠো করে চাবিগুলোর ওপর দমাদম পিটোত আর মুখে বলত, "হা, ভগবান!" ঠিক মা-মণির মতই ওরও হাত ভারী মিঠে, সুরের সূক্ষ্ম কারুকাজ—ফিল্ডের সেই সুন্দর ধরন আজ পর্যন্তও যা মানুষের মনে গাঁথা আছে, আধুনিক হামবড়াই পিয়ানো বাজিয়েরাও যার স্মৃতি ম্লান করতে পারেনি।

বাবা হালকা পায়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেই লিউবোচ্‌কার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, লিউবোচ্‌কা ততক্ষণে বাবাকে দেখতে পেয়েই বাজনা থামিয়ে ফেলেছে।

"বাজাও, লিউবা বাজাও," বাবা ওকে আবার বসিয়ে দিলেন, "তুমি তো জান তোমার বাজনা শুনতে আমি কত ভালবাসি।"

লিউবোচ্‌কা বাজাতে লাগল, আর বাবা ঠিক ওর উল্টো দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন হাতের ওপর মাথা রেখে, তারপর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পায়চারী করতে শুরু করলেন। প্রতিবার পিয়ানোর কাছে পৌঁছতেই

বাবা গভীর মনোযোগের সঙ্গে লিউবোচ্‌কার দিকে তাকাচ্ছিলেন। বাবার পায়চারী করার ভঙ্গিতে বুঝতে পারলাম—মনে মনে উনি ভয়ানক বিচলিত। কয়েকবার চক্কর মারার পরে লিউবোচ্‌কার পেছনে দাঁড়িয়ে ওর কুচ্‌কুচে কালো থোপা-থোপা চুলে চুমু খেলেন, তারপর আবার পায়চারি শুরু করলেন। বাজনা শেষ করে লিউবোচ্‌কা উঠে গিয়ে বাবার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন, ভাল লাগল?" বাবা কথাটি না বলে দুহাত বাড়িয়ে ওর মাথাটা কাছে টেনে নিলেন, আকুল হয়ে ওর চোখে, ভুরুতে চুমু খেতে লাগলেন—বাবার এমনি আবেগ এর আগে কখনো দেখিনি!

"সে কি, তুমি কাঁদছ, বাবা!" লিউবোচ্‌কা হাত থেকে বাবার ঘড়ির চেন্‌টা ফেলে দিয়ে বড় বড় চোখ দুটি মেলে বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, "বাবা, বাবা-মণি, আমায় ক্ষমা কর। ভুলেই গিয়েছিলাম যে ওটা মা-মণির প্রিয় বাজনা!"

"না, লিউবা, না তুমি বাজাবে, সব সময় এটা বাজাবে, কেমন?" আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বাবা বলেন, "তুমি তো জান না, তোমার সঙ্গে কাঁদতে পারলে আমার মনটা কত ভাল হয়।"

নীচু হয়ে ওকে আরেকবার চুমু খেলেন, তারপর নিজেকে সামলাতে জোরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দা পার হয়ে সোজা ভলোদিয়ার ঘরের দিকে চললেন।

বারান্দার মাঝামাঝি থেমে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "ওয়াল্ডেমার, বেশী দেরি আছে?" ঠিক সেই মুহূর্তে মাশা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ মনিবকে দেখে চোখ নামিয়ে নিল, তাঁকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। বাবা ওকে থামালেন। তিনি ওর দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, "বাঃ, তুমি তো দেখছি দিনকে দিন ভারী সুন্দর হয়ে উঠছ!"

মাশা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, মাথাটা আরও নত করে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আমাকে যেতে দিন!"

মাশা হন্‌হন্ করে চলে গেল, বাবা কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু কেশে আবার হাঁকলেন, "ওয়াল্ডেমার, হল তোমার?" এদিকে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল।

বাবাকে আমি ভালবাসতাম; কিন্তু মানুষের মন সব সময় তার হৃদয়কে

অনুসরণ করে চলে না। কত সময় হয়তো এমনি সব চিন্তা আমাদের মনে উঁকি মারে যেগুলো আঘাত করে অপমান করে নিজেরই হৃদয়ের আকুলতাকে; আর এর কারণও সব সময় বুদ্ধি দিয়ে ধরাছোঁয়া যায় না। যতই কেন না চেষ্টা করি মন থেকে ও ভাবনাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে ততই সেগুলো কেবলি ঘুরেফিরে মনে এসে উঁকিঝুঁকি মারে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দিদিমা

দিদিমা দিনে দিনেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন ; তাঁর ঘর থেকে ঘণ্টার শব্দ, গাশার গজগজানি আর দরজা বন্ধ করার দুমদাম আওয়াজ ঘনঘন শোনা যায়। উনি আর এখন আগের মতন লাইব্রেরীতে মস্ত ইজিচেয়ারে বসে আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না, তার বদলে শোবার ঘরে লেসের ঝালর দেওয়া বালিশে শুয়ে শুয়েই কথাবার্তা বলেন। আমাদের যখন অভ্যর্থনা জানাতেন, লক্ষ্য করতাম হাতটা কেমন ফ্যাকাসে হল্‌দেটে অল্প অল্প ফোলা চক্‌চকে আর ঘরের ভেতর সেই একটা দম বন্ধ করা গন্ধ যে-রকমটা সেই পাঁচ বছর আগে পেয়েছিলাম মা-মণির ঘরে। কিন্তু বাড়ির সকলের সঙ্গে বিশেষত বাবার সঙ্গে ওঁর সেই উদ্ধত লৌকিক ব্যবহার, তাতে কোন পরিবর্তন নেই। ঠিক সেই আগের মতই কথাগুলোকে টেনে টেনে লম্বা করে বলেন, মাঝে মাঝেই ভুরু তুলে তাকান আর সেই কথায় কথায় "ডিয়ার" বলেন।

এরপর কয়েকটা দিন আমাদের দিদিমার কাছে যেতে দেওয়া হল না। হঠাৎ একদিন সকালে পড়ার সময় এসে সেণ্ট জেরোম বললেন আমি কাটেনকা আর লিউবোচ্‌কাকে নিয়ে যেন কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। গাড়িতে যখন উঠছি লক্ষ্য করলাম দিদিমার ঘরের সামনেকার রাস্তায় খড় বিছানো আর বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক নীল রঙের কোট গায়ে দিয়ে—কিন্তু তবুও ঠিক বুঝতে পারলাম না হঠাৎ অসময়ে আমাদের বেড়াতে পাঠাবার উদ্দেশ্যটা কি ? গোটা পথটা সেদিন আমরা হুল্লোড় করতে করতে গেলাম—সেদিন কেন যেন আমি আর লিউবোচ্‌কা দুজনেই ভীষণ ফুর্তিতে ছিলাম, যে কোন একটা সামান্য ঘটনা, কথা বা ভঙ্গিই আমাদের হাসির ফোয়ারা খুলে দিচ্ছিল। একজন ফেরিওয়ালা মাথায় বাক্স নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা হেসে কুটিকুটি। একজন কোচোমান ঘোড়ার চাবুক দোলাতে দোলাতে আমাদের পাশ দিয়ে একছুটে গাড়ি নিয়ে পার হয়ে গেল—আমরা জোরে চেঁচিয়ে হেসে

উঠলাম। ফিলিপের চাবুকটা গাড়ির পাদানিতে জড়িয়ে গেল, আমাদের দিকে ফিরে সে বলে, "ধ্যেৎ-তেরি ছাই"—আর হাসতে হাসতে আমাদের দম ফেটে যাবার যোগাড়। মিমি একবার আমাদের দিকে ভ্রূকুটি হেনে বলল, খালি আকাট মূর্খরাই এভাবে বিনা কারণে হাসে। লিউবোচ্‌কার মুখখানা চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে, আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতে না হতেই দুজনে আবার হাসিতে ফেটে পড়লাম, হাসির দমকে চোখে জল এসে গেল, ভেতরের চাপা খুশীটা দমবন্ধ করে মারছিল, সেটাকে আর আটকে রাখা গেল না। একটু শান্ত হয়ে বসতে না বসতেই আমি আবার লিউবোচ্‌কার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় একটা শব্দ উচ্চারণ করলাম; সেটা কিছুদিন ধরে কেবল মাত্র আমাদের মধ্যেই চলতি ছিল আবার একচোট হাসি।

বাড়ির কাছে পৌছতে পৌছতে আমি লিউবোচ্‌কার দিকে তাকিয়ে মজার একটা মুখভঙ্গি করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ একেবারে আপাদমস্তক চমকে উঠলাম—আমাদের দরজার সামনে একটা কফিনের কালো ঢাক্‌না! মুখভঙ্গিটা আমার ঠোঁটেই জমে শক্ত হয়ে গেল!

ফ্যাকাসে মুখে সেণ্ট জেরোম আমাদের কাছে এসে বললেন, "তোমাদের দিদিমা মারা গিয়েছেন।"

দিদিমার দেহটা যতক্ষণ বাড়িতে ছিল, অজানা একটা মৃত্যুভয়ে আমি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। খালি মনে হচ্ছিল দেহটা যেন মৃত নয় জীবিত; আর আমাকে খালি মনে করিয়ে দিচ্ছে ঠিক এমনি করে আমাকেও একদিন মরতে হবে—দুঃখের সঙ্গে সাধারণত এই অনুভূতিটাও কেমন যেন একভাবে জড়িয়ে থাকে। দিদিমার জন্যে আমার কোন দুঃখ ছিল না, আর সত্যি কথা বলতে কি বাড়িতে এত অতিথি এসেছেন শোক জানাতে তাদের মধ্যে কারুরই প্রকৃত দুঃখবোধ ছিল না দিদিমার জন্যে—কেবলমাত্র একজন ছাড়া। এর শোকের বিহ্বলতা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম—সে হচ্ছে গাশা, দিদিমার ঝি। গাশা চিলেকোঠার দরজা বন্ধ করে দিনরাত কাটাল, নিজেকে অভিশাপ দিল, চুল ছিঁড়ল, কোনমতেই প্রবোধ মানল না, আর বার বার বলতে লাগল, মনিব যখন মারা গেল, আর কি, ও নিজেও এখন মরলেই বাঁচে। আমি আরেকবার বলছি, সে হৃদয়াবেগের খেই খুঁজে পাওয়া যায় না, সে আবেগই নিখাদ।

দিদিমা আর আমাদের মধ্যে নেই, তবুও বাড়িতে সবসময়ই তাঁর স্মৃতির উল্লেখ চলে। বিশেষ করে আলোচনা হয় দিদিমার উইল নিয়ে। মরবার আগে করেছেন; এখন পর্যন্ত কেউই তার সম্বন্ধে কিছু জানে না, কেবলমাত্র সে দলিলের তত্ত্বাবধায়ক প্রিন্স ইভান ইভানিচ্ ছাড়া। দিদিমার আত্মীয়স্বজনের ভেতর মাঝে মাঝে বেশ উত্তেজনার সঙ্গে গবেষণা চলত কোন সম্পত্তিটা কার হবে সেই হিসেব নিয়ে। স্বীকার করছি, আমরাও কিছু অংশীদার হব মনে করতে খুবই ভাল লাগত।

নিকোলাই ছিল আমাদের বাড়ির দৈনিক খবরের কাগজ, ছ সপ্তাহ পরে সেই এসে আমাদের খবর দিল দিদিমা সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন লিউবোচ্‌কাকে আর তার বিয়ে পর্যন্ত অভিভাবক থাকবেন বাবা নন, প্রিন্স ইভান ইভানিচ্।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আমি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার আমার আর মাত্র মাসকয়েক বাকী। পড়াশুনা ভালই চলছে। মাস্টারমশাইদের দেখলে আর আতঙ্ক হয় না, এমন কি পড়াশুনায় মাঝে মাঝে বেশ আনন্দও পাই।

যে পড়াটা ভাল করে শিখেছি; স্পষ্ট মনে আছে, সেটা বলতে খুব ভাল লাগে। আমি গণিত বিভাগের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমি নিজেই এই বিভাগটা বেছে নিয়েছিলাম—সত্যি কথা বলতে কি এই শাস্ত্রটার কতগুলো দাঁতভাঙ্গা শব্দের ওপর আমার ভয়ঙ্কর মোহ ছিল, যেমন "সাইনাসেস্", "ট্যান্‌জেন্টস্", "ডিফারেন্সিয়েলস্", "ইন্‌টিগ্রেলস্" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি ভলোদিয়ার চাইতে মাথায় অনেকটা ছোট, চওড়া কাঁধ, আগের মতই নিতান্তই সাদামাটা আর তাই নিয়ে নিতান্তই মনোকষ্টে থাকি। সবেতেই তাই নতুন কিছু করতে চাই। আমার একমাত্র সান্ত্বনা বাবা একবার বলেছিলেন, আমার মুখের ভাবে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে, আর সেটা আমি বিশ্বাস করি একান্তভাবে।

সেণ্ট জেরোম আমার ওপর সন্তুষ্ট: আমিও আর ঘৃণা করি না ওঁকে। এমনকি মাঝে মাঝে যখন উনি মন্তব্য করেন যে আমার মত বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে এটা না করা খুবই লজ্জার কথা—তখন মাঝে মাঝে আমার ওঁকে ভালই লেগে যায়।

ঝিদের ঘরে উঁকিঝুঁকি মারা বন্ধ হয়েছে অনেকদিন। দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে এখন লজ্জা পাই আর তাছাড়া মাশা সত্যিসত্যিই ভ্যাসিলীকে ভালবাসে এটা জানতে পেরেই অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছি এটাও স্বীকার করছি। শেষ পর্যন্ত ভ্যাসিলীর অনুরোধে বাবার কাছ থেকে আমিই ওদের বিয়ের অনুমতি যোগাড় করে দিই আর এতেই এর ফলে আমিও এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার হাত থেকে মুক্তি পাই।

বিয়ের পরে নবদম্পতি এল একটা ট্রেতে মিষ্টি সাজিয়ে বাবাকে ধন্যবাদ জানাতে আর মাশা নীল রঙের রিবন লাগানো টুপি পরে সেজেগুজে এসে যখন আমাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে চুমু খেয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল—আমি তখন কেবল দেখলাম ওর চুলে গোলাপী পমেটম মাখানো, কোনরকম উচ্ছ্বাসের আভাসও মনে জাগেনি।

মোটামুটি ছোটবেলাকার দোষত্রুটিগুলো ক্রমে ক্রমে সেরে আসছিল ; অবশ্য একটি বাদে আর সেইটিই প্রধান, ভবিষ্যৎ জীবনে যা যথেষ্ট ক্ষতি করবে আমার—সেটি হচ্ছে সবকিছুরই একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা করার ঝোঁক।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভলোদিয়ার বন্ধুরা

ভলোদিয়ার বন্ধুবান্ধব মহলে আমি যেভাবে থাকতাম তাতে আমার অহঙ্কারে ঘা লাগত—তবুও আমি ভালবাসতাম ওর ঘরে বসে থাকতে, সে-ঘরে যখন অতিথি থাকত। আর বসে বসে নিঃশব্দে লক্ষ্য করতাম ওরা কি করে—খুঁটিনাটি সব।

ভলোদিয়ার অতিথিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আসত ডুবকভ্, সেনাদলের একজন কর্মচারী আর একজন ছাত্র, প্রিন্স নেখলুইদভ্। ডুবকভ্ দেখতে ছোট গাট্টাগোট্টা, রং ময়লা; প্রথম যৌবন পার হয়ে গেছে, কিন্তু তাহলেও দেখতে কুশ্রী নয় আর সবসময়েই খুব হাসিখুশী। এক জাতীয় মানুষ থাকে যাদের দোষক্রটিগুলোর জন্যই লোকে তাদের পছন্দ করে,—যারা কখনও চারদিক ভেবে কোন জিনিসের বিচার করতে পারে না আর সবসময়েই কোন না কোন উত্তেজনা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়—ডুবকভ্ হচ্ছেন সেই দলের! এঁদের বিচার সবসময়েই একচোখা আর ভুল, তাহলেও এদের মন খোলামেলা তাই সবাইকে আকৃষ্ট করে। কেন জানি এদের নীচ আত্মম্ভরিতাও মানুষ ক্ষমা করে নেয়, তাদের পছন্দ করে। আমার আর ভলোদিয়ার চোখে আবার ডুবকভ্ দুদিক দিয়ে সম্মানের যোগ্য—একদিকে সৈনিকের চেহারা, আর তার চাইতেও বেশী হচ্ছে তার বয়স, যে বয়সটাই তরুণদের সম্মান উদ্রেক করে। কেবলমাত্র একটা জিনিস আমি খুবই অপছন্দ করতাম, সেটা হচ্ছে যখন দেখতাম ওর উপস্থিতিতে ভলোদিয়া আমার নিতান্ত নির্দোষ কার্যকলাপের এমনকি আমি যে ছোট কেবলমাত্র সেই কারণেই লজ্জা পেত।

নেখলুইদভ্ দেখতে সুন্দর নয়; ক্ষুদে ক্ষুদে পাঁশুটে চোখ, নীচু কপাল, বেঢপ লম্বা হাত-পা—দেখতে সুশ্রী মোটেই বলা চলে না। সুন্দর বলতে কেবল বেশ

লম্বা দেহটি, মুখের কোমল রং আর পরিপাটি সাজানো মুক্তোর মত দাঁতের সারি। কিন্তু বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ঝকঝকে ছুটি চোখ আর ঠোঁটছুটির মিষ্টি হাসি, ক্ষণে ক্ষণে যার রূপ বদলায়, এই হয়তো কঠিন আবার এই হয়তো শিশুর মত নিষ্পাপ সরল—এর ফলেই সে-মুখে একটা অসামান্য উৎসাহের আলো যাতে সকলের চমক লাগে।

ওকে খুবই লাজুক প্রকৃতির বলে মনে হয়, অতি সামান্য কিছুতেই কান লাল হয়ে ওঠে—কিন্তু ওর লজ্জা আমার মতন নয়। যতই লাল হত, ততই কঠিন সংকল্পের ছাপ ফুটত ওর মুখে। তার দুর্বলতার জন্য নিজের ওপরেই চটে যেত।

ভলোদিয়া আর ডুবকভের সঙ্গে এমনিতে ওর খুবই বন্ধুত্ব তবুও এটা পরিষ্কারই মনে হয় যে নেহাতই দৈবাৎ ওরা কাছাকাছি এসে পড়েছে। ওদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও মিল নেই কোথাও। ভলোদিয়া আর ডুবকভ গম্ভীর কোন আলোচনা বা অনুভূতির ছায়া মাত্র দেখলেও ভয় পেয়ে যেত; নেখলুইদভ্ এদিকে খুবই উৎসাহী প্রকৃতির লোক—অনেক সময়ই নানা দার্শনিক তথ্য আর অনুভূতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠত, এমনকি ঠাট্টাবিদ্রূপ অগ্রাহ্য করেও। ভলোদিয়া আর ডুবকভ্ ভালবাসে তাদের প্রেমের গল্প করতে (হঠাৎ তারা অনেকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায়, কোন সময় আবার দুজনেই একজনের সঙ্গে); আর নেখলুইদভ্ আবার ভীষণ চটে যায় লালচুলওয়ালা কোন একটি মেয়ের সঙ্গে ওর প্রেমের সামান্য একটু ইঙ্গিত করলেও।

ভলোদিয়া আর ডুবকভ্ অনেক সময়ই নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে হাসি-মস্করা করে। কিন্তু এদিকে নেখলুইদভ্ একেবারে ক্ষেপে ওঠে যদি তার একজন বিশেষ আত্মীয় সম্বন্ধে কেউ কোনরকম অশোভন মন্তব্য করে—এঁর সম্বন্ধে নেখলুইদভের মনে এক ধরনের উচ্ছ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব! ভলোদিয়া আর ডুবকভ্ রোজ খাবারের পর নেখলুইদভকে না নিয়ে দুজনে কার কাছে যেন যায়, তাঁকে ওরা বলে, "সুরুচিসম্পন্না।"

কথাবার্তা আর চেহারা এই দুটো দিয়েই প্রিন্স নেখলুইদভ্ প্রথম দিন থেকেই আমায় আকৃষ্ট করেছিল। ওর ভেতরে কতকগুলো গুণ আছে, যেগুলো আমার সঙ্গে মেলে আর এই কারণেই বোধহয় প্রথম দিন ওকে দেখে ঠিক প্রীত হইনি।

ওর চটুল দৃষ্টি, দৃঢ় স্বর, উদ্ধত ভঙ্গী আর বিশেষ করে আমার ওপর ওর

উদাসীন মনোভাব—এগুলো ভীষণ অপছন্দ করতাম। কতসময় কথাবার্তার সময় আমি নিজের মনে জ্বলে পুড়ে মরেছি কি করে ওর কথার বেশ যুৎসই জবাব দিয়ে ওর গর্ব চূর্ণ করে দিতে পারি, দেখিয়ে দিতে পারি যে ও আমাকে অগ্রাহ্য করলেও আমিও বুদ্ধি রাখি। কিন্তু লজ্জা এসে আমাকে বাধা দিত।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

আলোচনা

সন্ধ্যাবেলা পড়াশুনোর শেষে যথারীতি ভলোদিয়ার ঘরে গিয়ে দেখলাম সে সোফার ওপর পা তুলে দিয়ে লম্বা হয়ে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একখানা ফরাসী উপন্যাস পড়ছে। আমার দিকে একচোখে তাকিয়েই আবার সে পড়তে থাকে ; নিতান্তই একটা স্বাভাবিক ঘটনা—কিন্তু আমার মুখে রক্ত ছুটে এল। ওর দৃষ্টিটা যেন আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি করতে এসেছ ; আর ঐ যে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেওয়া তার মানে হল দৃষ্টির ঐ অর্থটা লুকিয়ে ফেলা। (নিতান্ত সামান্য একটা ব্যাপারেও এরকম মানে খুঁজে বার করা আমার অভ্যেস ছিল সেই বয়সটায়) টেবিলের কাছে গিয়ে একটা বই তুলে নিলাম ; কিন্তু পড়তে শুরু করার মুখে মনে হল সারাদিন আমাদের দুজনের একটিবারও দেখা হয়নি আর এখন একটাও কথা না বলা কি বিশ্রী ! অগত্যা বললাম :

"তুমি কি আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে থাকবে ?"

"জানি না। কেন ?"

"না, এই ভাবছিলাম।" দেখলাম একটা আলাপ আলোচনা শুরু করে দিতে পারছি না, কাজেই বইটা খুলে পড়তে শুরু করি।

"ভলোদিয়া বাড়িতে আছে ?" বাড়িতে ঢোকবার মুখের ঘরটায় ডুবকভের গলা শোনা গেল।

"হ্যাঁ আছে।" পা দুটো নামিয়ে হাতের বইটা টেবিলে রেখে ভলোদিয়া ডেকে বলে।

ডুবকভ আর নেখলুইদভ কোট আর টুপি পরে ঘরে এসে ঢোকে।

"তুমি থিয়েটারে আসছ তো ?"

"না, আমার সময় হবে না," জবাব দিতে গিয়ে ভলোদিয়া লাল হয়ে ওঠে।

"আরে কি অদ্ভুত ! না, না এসো সত্যি !"

"তা ছাড়া আমার টিকিটও নেই।"

"তাতে কি ?"

"যতগুলো ইচ্ছে টিকিট কিনতে পাবে সেখানে।"

"দাঁড়াও, আমি আসছি এক্ষুনি।" আমৃতা আমৃতা করে বলে ভলোদিয়া কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি জানতাম ভলোদিয়ার থিয়েটারে যেতে খুবই ইচ্ছে, অস্বীকার করছে কেবল টাকা নেই বলে। এখন বেরিয়ে গেল বাবুর্চির কাছে—পাঁচটা রুবল ধার পাওয়া যায় কিনা দেখতে।

"এই যে ডিপ্লোম্যাট, কি খবর ?" ডুবকভ আমার হাতে ঝাঁকুনি দিল।

ভলোদিয়ার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে "ডিপ্লোম্যাট" বলে ডাকত কেননা ডিনারের পরে দিদিমা একদিন আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন ভলোদিয়া নিশ্চয় সৈন্য হবে আর আমাকে তিনি একজন কূট-রাজনীতিজ্ঞের ভূমিকায় দেখতে পেলেই খুশী হবেন—কালো ড্রেস-কোট গায়ে, চুলগুলো এলোমেলো, সেটা নাকি দিদিমার মতে একজন কূটনীতিজ্ঞের পক্ষে নিতান্তই দরকারী।

"ভলোদিয়া গেল কোথায় ?" নেখলুইদভ জিজ্ঞাসা করে।

"কি জানি, জানি না", বলতে বলতে আমারও মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, ভাবলাম ওরা হয়তো আন্দাজ করেছে ভলোদিয়া কোথায় গেল !

"বোধ হয় ওর কাছে টাকা নেই, না ? তাইতো ডিপ্লোম্যাট ! আমার হাসিটার মানে "হ্যাঁ" ধরে নিয়ে নেখলুইদভ আবার বলে, "আমার কাছেও নেই। ডুবকভ তুমি ?"

"দেখা যাক্", ডুবকভ মনিব্যাগটা উপুড় করে খুব সাবধানে মুদ্রাকটা গুনতে থাকে। "এই একটা পাঁচ কোপেক, আর এই একটা কুড়ি কোপেক, ফুঃ!" ডুবকভ, হাতটা উল্টে একটা মজার ভঙ্গি করে।

ভলোদিয়া সেই সময় ঘরে এসে ঢোকে।

"এই যে, আমরা কি যাব ?"

"না।"

"কি অদ্ভুত তুমি ! বললে না কেন যে হাতে টাকা নেই। যদি চাও, আমার *টিকিটটা* নাও।

"তারপর তোমার ব্যবস্থা ?"

"ও ওর ভাইয়ের বক্সে যেতে পারবে।" ডুবকভ বলে।

"না আমি আজ মোটে যাচ্ছিই না।

"কেন ?"

"কারণ তুমি তো জানই, আমি বক্সে বসতে পছন্দ করি না।"

"কেন ?"

"আমার ভাল লাগে না ; কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।"

"সেই পুরনো কথা। বুঝতে পার না যেখানে বসলে অন্যেরা খুশী হয়, আমার সেখানে অস্বস্তি লাগে কেন।"

"একেবারেই অর্থহীন, বুঝলে হে বন্ধুবর ?"

"আমি যদি লাজুক প্রকৃতির হই, তা আর কি করা যাবে বল। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, তুমি জীবনে কখনো লজ্জায় লাল হওনি, কিন্তু আমি অতি সামান্য ব্যাপারেও লাল হয়ে উঠি", বলতে বলতে সত্যি সত্যিই সে লাল হয়ে উঠল।

"জান, তোমার এই অতিরিক্ত লজ্জার কারণ কি ? তোমার অতি অহঙ্কার, বুঝলে হে বন্ধুবর ?" ডুবকভ বেশ একটু পিঠ চাপড়ানো ভঙ্গিতে বলে।

"আমার অতি অহঙ্কার, বটে !" নেখলুইদভ বিড়বিড় করে ওঠে, "বরঞ্চ ঠিক উল্টো, আমার একেবারেই অহঙ্কার নেই তাই। আমার সব সময়েই মনে হয় আমি যেন ভয়ঙ্কর বিশ্রী অপ্রীতিকর বিরক্তিভাজন…"

"জামাকাপড় পর, ভলোদিয়া," ডুবকভ ওর কাঁধে খাম্‌চা মেরে কোটটা খুলে দিতে থাকে।

"ইগনাট্‌, শীগ্‌গির তোমার মনিবকে তৈরি করে দাও।"

"…কাজেই অনেক সময়, আমার হয় কি…" নেখলুইদভ বলে চলে।

ডুবকভ কিন্তু আর শুনছে না, ততক্ষণে সে ট্রা-লা-লা-লা করে সুর ভাঁজছে বাতাসে।

"ওহে, ওসব করে এড়াতে পারবে না", নেখলুইদভ বলে, "আমি প্রমাণ করে দেব যে লাজুক ধরনটা কখনো আত্মপ্রীতি থেকে আসে না।"

"সেটার প্রমাণ পাওয়া যাবে যদি তুমি আমাদের সঙ্গে থাক।"

"আমি তো বলেছি, আমি যাচ্ছি না।"

"বেশ, তাহলে থাক। বসে বসে ডিপ্লোম্যাটের কাছে প্রমাণ কর, ফিরে এসে সব শুনব ওর কাছে।"

"তাই করব, নিশ্চয়।" নেখলুইদভের যেন ছেলেমানুষী জেদ চেপে গেছে, ..."যাও, তাড়াতাড়ি পালাও, আবার ফিরে এসো।"

"তোমার কি মনে হয়? আমি খুব অহঙ্কারী?" এবার আমার পাশে বসে জিজ্ঞেস করে।

যদিও এ সম্বন্ধে আমার একটা নিজস্ব মতামত ছিল, তবুও অতর্কিতে প্রশ্নটা করায় আমি একটু হতভম্ব হয়ে যাই, জবাব দিতেও বেশ খানিকটা দেরি হয়।

"হ্যাঁ আমি তাই মনে করি।" একটু পরে জবাব দিলাম। বেশ বুঝতে পারলাম আমার গলা অল্প অল্প কাঁপছে, মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে,—এই সুযোগে দেখিয়ে দিতে হবে আমারও ঘটে বুদ্ধি আছে! "আমার ধারণা মানুষ মাত্রেই অহঙ্কারী সে যা যা করে তা সবই ওই অহঙ্কার বোধ থেকেই করে।"

"অহঙ্কারটা কি জিনিস তোমার মতে?"

"অহঙ্কার হচ্ছে একটা বিশ্বাস যে সে নিজে আর সবাইকার চাইতে বেশী ভাল, বেশী জ্ঞানী।"

"কিন্তু সকলের মনেই কি ঐ একই বিশ্বাস থাকতে পারে?"

"জানি না সত্যি কি মিথ্যে, কিন্তু কেউই ওটা স্বীকার করে না। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমিই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞানী, আর আমি নিশ্চয় জানি তোমারও ঠিক ওই একই ধারণা।"

"না। অন্তত আমার কথা বলতে পারি, আমি এমন লোকের দেখা পেয়েছি যাকে নিঃসন্দেহে বেশী বুদ্ধিমান বলে মেনেছি", নেখলুইদভ বলল।

"অসম্ভব।" আমি জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করি।

"তুমি কি সত্যি সত্যিই তাই ভাব?" নেখলুইদভ বেশ গভীরভাবে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকে।

এবার আমার মাথায় একটা ধারণা এল সঙ্গে সঙ্গেই সেটা প্রকাশ করলাম।

"আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আমরা অন্যের চাইতে নিজেদের বেশী ভালবাসি কেন? কেননা, আমরা নিজেদের অন্যের চাইতে বেশী ভাল, বেশী ভালবাসার যোগ্য বলে মনে করি, তাই। অন্যদের যদি বেশী ভাল মনে করতাম, তবে তাদেরই বেশী ভাল বাসতাম নিজের চাইতে, কিন্তু তা কখনোই ঘটে না। যদি তা কখনো ঘটেও, তাহলেও আমার কথা ঠিকই থাকে।" কথাটা শেষ করে বেশ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে হাসলাম।

নেখলুইদভ এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। "আমি কখনও ভাবিনি যে তুমি এতটা চালাক", এমনি মিষ্টি একটু হেসে সরলভাবে সে বলে যে হঠাৎ আমার মনটা আনন্দে একেবারে যেন উপচে পড়ে।

শুধু অনুভূতিতেই মানুষের মনেও প্রশংসার কাজ করে এত বেশী যে এর মধুর প্রভাবে আমার মনে হল তখনকার মত আমি আরও বেশী বুদ্ধিমান হয়ে গেলাম, আর তড়িৎগতিতে মাথায় একটার পর একটা চিন্তা আসতে লাগল। অহঙ্কার থেকে নিজেদের অজান্তেই আমরা চলে গেলাম প্রেমে—তা নিয়ে যে আলোচনা শুরু হল তার যেন আর শেষ নেই! এ সম্বন্ধে আমাদের বিচার অবশ্য নির্বিকার একজন তৃতীয় পক্ষের কানে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ বলেই ঠেকবে—এতই এক-চোখো আর অবাস্তব ধোঁয়াটে মতামত এগুলো—তবুও আমাদের কাছে এর বিশেষত্ব ছিল উচ্চ পর্যায়ের। আমাদের দুজনের হৃদয় এমনি এক সুরে বাঁধা হয়েছিল যে একজনের কোন একটি তারে সামান্য মাত্র স্পর্শ লাগলেই আরেকজনের হৃদয়ে ঝন্‌ঝন করে সুর বেজে উঠছিল। এই একসুরে বাঁধা হৃদয় নিয়ে মশগুল হয়ে আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করে চলেছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল সময় আর ভাষা হার মেনে যাচ্ছে আমাদের মনের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বন্ধুত্বের সূচনা

সেই থেকে আমার আর দ্মিত্রি নেখলুইদভের মধ্যে একটু অদ্ভুত কিন্তু মধুর একটা সম্পর্কের সূত্রপাত। বাইরের লোকজনের সামনে দ্মিত্রি আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে কিন্তু যেই আমরা একলা হই, অমনি আমাদের নিজস্ব সেই নির্জন জায়গাটিতে বসে নানা আলোচনায় লেগে যাই—সময় আর পরিবেশের কথা সম্পূর্ণভাবে মন থেকে মুছে যায়।

আমরা আলোচনা করতাম ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে, শিল্পকলা, সরকারী চাকুরি, বিয়ে, শিশুশিক্ষা কোনটাই বাদ যেত না। এটা কখনো মাথায় ঢুকত না যে যা সব বলাবলি করছি, এগুলো নিতান্তই বিকারের প্রলাপ মাত্র। কথাগুলো শুনতে বিচক্ষণের মত, শ্রুতিমধুরও বটে, তাই এগুলো যে অর্থহীন সে কথা মনে পড়ত না। যৌবনে মানুষ বিচক্ষণতার মূল্য দেয়, তাকে বিশ্বাসও করে। সে সময় মনটা একাগ্র হয়ে তাকিয়ে থাকে ভবিষ্যতে আর সেই ভবিষ্যৎ আশার দীপ্তিতে ঝলমল করে কেবলি মোহ বিস্তার করে—সে আশা অতীতের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে জাগে না, জাগে ভবিষ্যতের একটা সম্ভাব্য সুখের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে। এই বয়সটাতে ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল চিত্রের কল্পনা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার আর তুলনা নেই। আমাদের আলোচনার ভেতর নানা বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করাটাই প্রধান ছিল; কি যে ভাল লাগত যখন কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে আমরা দুজনে আকাশে ডানা মেলে দিতাম, তড়িৎ গতিতে একটার পর একটা নতুন চিন্তা মনে আসত, চিন্তাধারাটা অবাস্তবমুখী হতে হতে এমন একটা স্তরে উঠে যেত যেখানে সবটাই একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে, তাকে প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছি না, যদিও মনে করছি যা ভাবছি, মুখেও তাই বলছি, আসলে কিন্তু যা বলছি, তা একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা! ভালবাসতাম সেই অবস্থাটা যখন ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ উপলব্ধি করতাম এর অসীমত্ব, বিরাটত্ব আর স্বীকার করতে বাধ্য হতাম যে আর এগুলো সত্যিই অসম্ভব।

একবার কার্নিভালের সময় নেখলুইদভ নানা আমোদ-প্রমোদে এত মেতে উঠেছিল যে বার কয়েক আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করলেও আমার দিকে একটিবারও নজর দিতে সময় পেল না। এত আঘাত লাগল তাতে মনে হল, নেখলুইদভ বোধহয় আবার সেই উদ্ধত অহঙ্কারী নেখলুইদভে ফিরে গেছে। কেবল অপেক্ষা করতে থাকি, একটা সুযোগ পেলেই হয়, দেখিয়ে দেব ওর সঙ্গ মোটেই কাম্য নয় আমার, ওর সম্বন্ধে এমন কিছু একটা দুর্বলতাও নেই মনে। কার্নিভালের শেষে প্রথম যেদিন নেখলুইদভ আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল, স্পষ্ট তাকে বলে দিলাম আমার পড়াশুনো আছে, গল্প করার সময় নেই—বলে সোজা চলে গেলাম ওপরে। কিন্তু মিনিট পনর পরেই পড়ার ঘরের দরজাটা আস্তে কে যেন খুলল, চেয়ে দেখি নেখলুইদভ এসে ঘরে ঢুকল।

"তোমাকে বিরক্ত করছি কি?" সে জিজ্ঞেস করল।

"না," বললাম বটে কিন্তু আসলে মনে মনে বলতে চাইছিলাম সত্যি আমি খুব ব্যস্ত।

"তাহলে তুমি ভলোদিয়ার ঘর ছেড়ে এলে কেন? কতদিন আমরা কথাবার্তা বলিনি আর আমার ওটা এমনি অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে যে মনে হয় কি যেন একটা হারাচ্ছি।"

আমার বিরক্তি এক নিমেষে অন্তর্হিত হল; দ্‌মিত্রি আবার সেই সুন্দর আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দিল।

"খুব সম্ভব তুমি জান আমি কেন চলে এসেছি।" আমি বলি।

"বোধহয়।" আমার পাশে বসতে বসতে নেখলুইদভ জবাব দেয়। "যদিও অনুমান করতে পারি, তাহলেও *সঠিক* বলতে পারি না। সেটা তুমি পার।"

"বলছি, আমি চলে এসেছি কেন না খুব চটেছিলাম তোমার ওপরে—ঠিক চটা নয়, বিরক্ত হয়েছিলাম। আসল কথা কি জান, আমার সব সময়েই ভয় পাছে বয়সে ছোট বলে তুমি আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কর।"

"জান, তোমার সঙ্গে আমি এতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছি কেন?" আমার স্বীকারোক্তিতে খুশী হয়ে মিষ্টি করে হেসে নেখলুইদভ বলে, "যাদের সঙ্গে আমার বেশী পরিচয়, বেশী মিল, তাদের চাইতেও তোমায় বেশী ভালবাসি কেন জান? সে জবাবটা আমি এইমাত্র খুঁজে পেলাম। সেটা হচ্ছে তোমার একটা অসাধারণ গুণ—সরলতা।"

"হ্যা, আমি মনে মনে যে কথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই, মুখে সব সময়ে

সে কথাটাই আগে বলে ফেলি।" আমি নেখলুইদভের কথাটাই স্বীকার করে নিলাম, "তবে হ্যাঁ, তাকেই বলি যাকে বিশ্বাস করি।"

"ঠিক। কিন্তু একজনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে হলে আগে তার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার। নিকোলাস, আমরা কিন্তু এখনও ঠিক বন্ধু নই। তোমার মনে পড়ে আমরা একদিন বন্ধুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছিলাম যে সত্যিকারের বন্ধু হতে হলে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থাকা দরকার।"

"হ্যাঁ", আমি বলি, "এ বিশ্বাস থাকা দরকার যে আমি তোমাকে যা বলব, তুমি সেগুলো আর কাউকে বলে দেবে না। কিন্তু সবচাইতে দরকারী, সব চাইতে মজার চিন্তা হল সেগুলো, যেগুলো কোন কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকেও বলতে পারব না।"

"নিকোলাস, জান আমার কি মনে হচ্ছে?" নেখলুইদভ এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঘসতে ঘসতে অল্প একটু হেসে বলে, "এস একটা কাজ করা যাক, আমাদের দুজনেরই উপকার হবে তাতে। এস, আমরা কথা দিই, আমরা পরস্পরের কাছে কিছু লুকোব না। পরস্পরকে খোলাখুলি জানব, কেউ কোনরকম লজ্জা পাব না। কিন্তু বাইরের লোককে ভয় করতে না হয় তার জন্যে আমরা কথা দেব, অন্য কাউকে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলব না। তাই ঠিক, সেই বেশ হবে।"

সত্যি সত্যিই আমরা তাই করলাম; এর ফল কি দাঁড়াল, সে বিবরণ পরে দেব।

'কার' বলেছেন যে কোন রকমের আকর্ষণেরই দুটো দিক; একজন ভালবাসে, আরেকজন সে ভালবাসা গ্রহণ করে; একজন চুমু খায়, আরেকজন গাল পেতে দেয়। এটা একদম খাঁটি; কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বে আমিই চুমু খেতাম আর নেখলুইদভ গাল বাড়িয়ে দিত—সেটা সত্যি হলেও নেখলুইদভও বদলে চুমু খেতে প্রস্তুত ছিল। আমরা দুজনেই সমান সমান ভালবাসতাম, কারণ পরস্পরকে আমরা জানতাম, তার মূল্যও দিতাম। কিন্তু তাহলেও এতে কোন বাধা ঘটেনি, নেখলুইদভ আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করত আমি তা মাথা পেতে নিতাম।

এটা ঠিক যে নেখলুইদভের প্রভাবে পড়ে আমি ধীরে ধীরে নিজের অজান্তেই নেখলুইদভের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছিলাম; এরই ফলে চরিত্রগত গুণকে

আদর্শ বলে মনে করে পরম উৎসাহভরে তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখি আর সেই সঙ্গে এই বিশ্বাসকে গ্রহণ করি যে মানুষকে প্রতিনিয়তই চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে তার আত্মোন্নতি ঘটে। গোটা মানব সমাজটারই পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে উন্নতি করা, মানুষের সব পাপ, সব দুঃখ চিরতরে দূর করা সম্ভব বলে মনে হত। তখন মনে হত এ তো খুবই সহজ; নিজের ভেতরের সৎবৃত্তিগুলোকে ফুটিয়ে তুলে মনটার আমূল পরিবর্তন এনে নিজেকে সুখী করা—এ তো জলের মত সহজ।

ভগবানই জানেন, যৌবনের এই উঁচু আদর্শগুলো হাস্যকর ছিল কিনা, আর কেই বা দায়ী ভবিষ্যৎ জীবনে এগুলো পূর্ণ করতে না পারার জন্যে।

যৌবন

প্রথম অধ্যায়

যৌবনের শুরু

আমি বলেছি দ্‌মিত্রিকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে জীবনের এক নতুন দিক আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল। জীবনের লক্ষ্য, জীবনের অর্থ আমি খুঁজে পেলাম। নৈতিক পরাকাষ্ঠার জন্যে মানুষকে অনন্যগতি হয়ে চেষ্টা করে যেতে হবে এবং সে পরাকাষ্ঠা সহজলভ্য, সম্ভবপর এবং শাশ্বত—জীবনকে দেখা বলতে তখন ছিল মুখ্যত এই বিশ্বাস। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই বিশ্বাস থেকে উৎসারিত নতুন নতুন ভাবনাগুলো নিয়েই আমি মত্ত। আমি মহানন্দে এঁকে চলেছি ন্যায়নিষ্ঠ কর্মময় এক ভবিষ্যতের রঙচঙে ছবি। কিন্তু শত হলেও আমার জীবন বয়ে চলেছিল তুচ্ছ, দিশেহারা অলস-মন্থর সেই এক গতিতে। এইসব উঁচু আদর্শ নিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু দ্‌মিত্রির সঙ্গে যখন আলাপ-আলোচনা করতাম, আমার মন ভরত, কিন্তু অনুভূতি তৃপ্ত হত না। ক্রমে একটা সময় এল যখন ভালমন্দ বোঝবার ক্ষমতা নিয়ে এইসব চিন্তা সদ্য সদ্য আমার মাথায় আসতে লাগল। আর তখন এই ভেবে মহা ভয় হল যে, এতদিন মিছিমিছি কী সময়ই নষ্ট করেছি। যাতে আমি কখনও নীতির উল্টো কোন কাজ করে না বসি, তার জন্যে আমি ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার নীতিগুলো জীবনে খাটাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

ঐ সময় থেকেই আমার গণনায় যৌবনের শুরু। আমার বয়স তখন প্রায় ষোল। মাস্টারমশাইরা পড়াতে আসেন। সেণ্ট জেরোম তখনও তদারক করেন পড়াশুনার, আর আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তৈরি হচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। পড়াশুনার বাইরে আমার কাজ বলতে ছিল একা বসে এলোমেলো দিবাস্বপ্ন দেখা, এক মনে ভাবা; নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পালোয়ান বানাবার জন্যে কসরত করা; সারা বাড়ি, বিশেষ করে ঝিদের ঘরের বারান্দার ওপর দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরঘুর করা; আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চেয়ে চেয়ে দেখা। অবশ্য আয়নায় নিজেকে দেখতে গিয়ে,

বরাবরই হতাশ মনে এমনকি বিতৃষ্ণার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে চলে আসতে হত। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না যে, আমাকে দেখতে ভাল নয়। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে লোকে যা ভেবে সান্ত্বনা পায়, আমার পক্ষে তা ভাবাও সম্ভব ছিল না। আমার মুখটা ভাবব্যঞ্জক, বুদ্ধিদীপ্ত কিংবা অভিজাতগোছের—এ বলে আমি নিজের মনকে চোখ ঠারতে পারতাম না। আমি দেখতে ছিলাম নেহাত আটপৌরে মামুলি ধরনের; ভাব-ব্যঞ্জনার কোন কথাই ওঠে না। আমার কুৎকুতে ফ্যাকাশে চোখে বুদ্ধির কোন পরিচয় তো ছিলই না। বরং একটা বোকামির ভাব ছিল; বিশেষ করে এটা মনে হত যখন আয়নায় নিজেকে দেখতাম। চেহারায় পুরুষালি ছাপ তখনও পড়েনি। যদিও মাথায় আমি বেশ লম্বা ছিলাম আর বয়সের আন্দাজে গায়ে খুব জোর ছিল, তাহলেও আমাকে দেখতে ছিল গোলগাল নাদুসনুদুস নাড়ুগোপালের মত। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ তো ছিলই না, বরং গড়নটা ছিল একেবারে চাষাড়ে—ঠিক তেমনি চ্যাটালো চ্যাটালো হাত পা। সে সময় এটা আমার কাছে ভয়ানক অপমান-জনক বলে মনে হত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বসন্ত

যে বছর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলাম সে বছর ঈস্টার এল অনেক দেরিতে, প্রায় এপ্রিলের শেষাশেষি। কাজেই ঈস্টারের আগের সপ্তাহে আমাকে আমাদের ধর্মানুষ্ঠান কমিউনিয়ানে যোগ দিতে হবে, তারপর পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ করতে হবে।

কয়েকদিন তুষারপাতের পর দিন তিনেক আবহাওয়াটা গেল বেশ ঝরঝরে, গরম আর পরিষ্কার—কার্ল ইভানিচ্ এরকম পরিবর্তনকে বলতেন, "বাপের পেছন পেছন এল ছেলে।" রাস্তার কোথাও ছোট্ট এক চাপড়া বরফও পড়ে নেই, বরফ গলে গলে প্যাচপেচে কাদার বদলে এখন ভিজে ঝক্‌ঝকে বাঁধানো পথ আর দ্রুতগতিতে বয়ে যাওয়া ছোট ছোট জলধারা। সূর্যের আলোয় ছাদের ওপর বরফের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত গলে গিয়ে ঝরে পড়ছে, সামনের বাগানে গাছে গাছে কুঁড়ি ফুটছে। আঙ্গিনার পথটা শুক্‌নো। জমে যাওয়া সারের গাদার ওধারে আস্তাবলটার সামনে আর গাড়িবারান্দার আশেপাশে পাথরের খাঁজে খাঁজে শ্যাওলার মত ঘাসগুলোয় সবে সবুজ রং ধরছে। বসন্তের এই সবে শুরু —মানুষের মনে। এই সময়টার প্রভাব খুবই বেশী। কুয়াশামুক্ত উজ্জ্বল ধারালো সূর্য—কিন্তু তাতে দাহ নেই, তুষার গিয়ে গলে ছোট ছোট নদীর ধারা হয়ে বয়ে চলেছে, আকাশ বাতাস যেন তাতে সিক্ত হয়ে স্নিগ্ধ সতেজ হয়ে উঠছে। আকাশ কোমল নীল, মাঝে মাঝে অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্বচ্ছ, হাল্কা মেঘের সমারোহ। কেন জানি না, আমার মনে হয় বসন্তের জন্মের এই সূচনায় মানুষের মনে যে ছায়া পড়ে তা আরও স্পষ্ট করে ধরা পড়ে বড় বড় শহরে—সেখানে মানুষ দেখে কম, কল্পনা করে বেশী। আমি দাঁড়িয়েছিলাম জানালার পাশে—জাফরি কাটা জানালা দিয়ে প্রভাত সূর্যের আলো এসে পড়ার ঘরের মেঝেতে ছক কেটে দিয়েছে। দেখতে দেখতে ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল, ব্ল্যাকবোর্ডে বীজগণিতের একটা মস্ত লম্বা সমীকরণের অঙ্ক কষছিলাম। এক হাতে ধরা একটা নরম ছেঁড়াখোড়া ফ্র্যাঙ্কারের বীজগণিত,

আরেক হাতে ছোট এক টুকরো খড়ি, আর এই খড়ির গুঁড়োয় ইতিমধ্যেই আমার দুটো হাত, মুখ আর কোটের কনুইগুলো একেবারে মাখামাখি। নিকোলাই একটা এ্যাপ্রন পরে হাতা গুটিয়ে বাগানের দিকে জানালাগুলো থেকে পুটিন কেটে টেনে টেনে পেরেক বার করার চেষ্টা করছে। ওই সব সাড়া-শব্দে আমার একাগ্রতা নষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া ও নিজেও সেইসময় একটা ভারী বিচ্ছিরি মেজাজে ছিল। আমারও কিছুই ঠিক মত হচ্ছে না, অঙ্কের গোড়াতেই একটা ভুল করলাম, ফলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হল। দুবার হাত থেকে খড়িটা পড়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার হাত মুখ বিচ্ছিরি নোংরা। বোর্ড মোছার স্পঞ্জটা কোথায় হারিয়েছে, নিকোলাইয়ের শব্দ যেন মাথায় হাতুড়ি পিটছে। তেড়েমেড়ে কাউকে কিছু বলে দিতে ইচ্ছে করছে। বীজগণিতের বই আর খড়িটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলাম। হঠাৎ মনে হল আজকে আমার অন্তরের সব গোপন পাপ ব্যক্ত করে তার জন্য মার্জনা চাইতে হবে, কাজেই আজকের দিনটার জন্য অন্তত নিজেকে সংযত রাখতে হবে কোন অন্যায় করা চলবে না। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মেজাজ একদম ঠাণ্ডা, ভদ্র হয়ে গেল, পায়চারি বন্ধ করে নিকোলাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"নিকোলাই তোমাকে একটু সাহায্য করতে দাও।" গলার স্বর যতদূর সম্ভব মিষ্টি করার চেষ্টা করে বললাম। মনের বিরক্তিটা চেপে রেখে দিয়ে বাইরে বেশ অমায়িক ব্যবহার দেখিয়ে একজনকে সাহায্য করছি—একথা মনে করে আমার মনের মেঘটা আরও কেটে গেল।

পুটিন কাটা হয়েছে, পেরেকগুলো বার করে ফেলা হয়েছে। আড়াআড়ি ফ্রেমটা ধরে নিকোলাই টানাটানি করছে, কিছুতেই সেটা খুলছে না।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম দুজনে মিলে টানতে যদি ফ্রেমটা তক্ষুনি খুলে আসে তাহলে বুঝব আজকের দিনে আর পড়াশুনা করাটা পাপ, অতএব আর পড়ব না। ফ্রেমে হাত লাগাতেই সেটা একদিকে খুলে উঠে এল।

"কোথায় রাখতে হবে এটাকে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি একাই ওটার ব্যবস্থা করতে পারব," খুবই অবাক হয়ে নিকোলাই বলে, বোঝা যায় আমার এই অতি উৎসাহে ও একটুও খুশী হতে পারেনি। "এসব জিনিস নম্বর মেরে ছাদের চিলেকুঠরীতে রেখে দেওয়া হয়।"

"আমি নম্বর লাগিয়ে দেব।" ফ্রেমটা আমি তুলে নিই। মনে হল চিলে-কোঠাটা যদি দু ভার্স্ট দূরে হত আর ফ্রেমটা এর চাইতে দুগুণ ভারী, তবে বোধ হয় আমি আরও বেশী খুশী হতাম। নিকোলাইয়ের জন্য এই কাজটা করে আমি হয়রান হয়ে যেতে চাই। যখন ফিরে এলাম ততক্ষণে জানালার কোণে কোণে টালি আর নুনের টুকরোগুলো* সাজিয়ে ফেলা হয়েছে আর ধুলো-বালি, মরা পোকামাকড় সব জানালা দিয়ে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিচ্ছে নিকোলাই। খোলা জানালা পথে স্নিগ্ধ ফুরফুরে হাওয়া ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যস্ত শহরের কলগুঞ্জন আর নীলকণ্ঠ পাখির কূজন।

সব কিছু যেন আলোর ঝরণাধারায় স্নান করে উঠেছে, ঘরটা হাসছে, হালকা হাওয়ায় বীজগণিতের পাতাগুলো ফুরফুর করে উড়ছে, নিকোলাইয়ের চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে। আমি জানালার ধারে গেলাম, পা ঝুলিয়ে বসে বাগানের দিকে ঝুঁকে পড়ে বসে বসে কি যেন সব ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ কী একটা নতুন আনন্দদায়ক অনুভূতি প্রবলভাবে আমাকে পেয়ে বসল। এই যে ভিজে মাটি যার গায়ে এখানে-সেখানে বর্শার মত হলুদ শীষ মাথায় নিয়ে সবুজ ঘাস ফুঁড়ে বেরিয়েছে ; ওই যে ছোট ছোট নদী ছলছল করে বয়ে চলেছে, ছোট মাটির ঢেলা আর কাঠের টুকরো ভেসে চলেছে জলের ঘুর্ণিতে, সবে ফুটন্ত কুঁড়ি নিয়ে লিল্যাকের লাল টুকটুকে ডাল জানালার ঠিক নীচে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে ; এই কুঞ্জ ঘিরে পাখিদের ব্যস্ত আনাগোনা আর কিচিরমিচির। কাল্‌চে রঙের আগাছার বেড়া গলা তুষারে সিক্ত কিন্তু বিশেষ করে ভিজে স্যাঁতসেঁতে সুগন্ধি বাতাস আর হাস্যোজ্জ্বল সূর্য—এরাই যেন স্পষ্ট আমাকে শোনাল সেই নতুন কিন্তু চমৎকার বার্তাটি। এর হুবহু বর্ণনা দেবার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু তবু চেষ্টা করব প্রকাশ করতে আমার হৃদয় কিভাবে গ্রহণ করেছিল সে সংবাদ। সবাই আমাকে শোনাল সৌন্দর্যের কথা, সুখ আর সদাচারের কথা। বলল : এগুলো খুবই সাধারণ, আমার পক্ষে এদের লাভ করা খুবই সম্ভব, এই গুণগুলো একটার বিহনে আরেকটা বাঁচে না, এই সৌন্দর্য, সুখ আর সদাচার এরা তিনে মিলে আসলে এক। "এ-কথা কেন এতদিন আমার মাথায় ঢোকেনি ? আমি কী শয়তান ছিলাম ! আগে বুঝলে

* জানালার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট নুনের টুক্‌রো রাখা হয় স্যাঁতসেঁতে ভাবটা টেনে নিতে। টালি বা ছোট স্টিলও রাখা হয় দেখতে সুন্দর করার জন্যে।

কত সুখী হতে পারতাম ভবিষ্যতেও কত সুখ পেতে পারি।" নিজেকে বলি আমি, "শীগ্গিরই আমি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে উঠব; তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই মুহূর্ত থেকেই বা নয় কেন? এর পর থেকে নতুন করে বাঁচব!"

এসব সত্ত্বেও কিছুই না করে কল্পনার রাজ্যে ডুবে থেকে ঠিক তেমনিভাবে জানলার ওপর অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলাম। কখনো কি আপনার এরকম হয়েছে যে কোন এক স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপ্সা বৃষ্টিঝরা গরমের দুপুরে আপনি ঘুমোলেন, সন্ধ্যেতে ঘুম ভেঙে তাকাতেই চোখে পড়ল মস্তবড় চৌকো জানালা —যার গায়ে লিনেনের পর্দা ফরফর করে উড়ে উড়ে ঝাপ্টা খেয়ে পড়ছে,—তার ভেতর দিয়ে ঐ দূরে দেখা যায়: লিণ্ডেনে ঘেরা বৃষ্টিভেজা ছোট পথটি, অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি গায়ে মেখে একটা দিক তার রক্তবর্ণ, আর দেখা যায় স্যাঁতসেঁতে বাগানের ছোট ছোট পথ, শেষ সূর্যের বাঁকা রেখায় আলোকিত? হঠাৎ শুনতে পেলেন বাগানের গাছে গাছে পাখিদের আনন্দ-কাকলি, দেখতে পেলেন জানালার সামনেকার স্বচ্ছ আলোয় পোকাদের ঘোরাফেরা। বৃষ্টি-ভেজা বাতাসের চিরপরিচিত সুগন্ধও যেন নাকে এল, মনে মনে ভাবলেন, "কি লজ্জার কথা, এমন চমৎকার সন্ধ্যেটা আমি কিনা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম!" তারপরেই লাফিয়ে উঠে ছুট লাগালেন বাগানের দিকে, কি আনন্দ! কখনো কি ঘটেছে এমন? যদি ঘটে থাকে তবে বুঝতে পারবেন: সেদিন সেই আনন্দ-ঘন মুহূর্তে কি অপূর্ব আনন্দের স্বাদ আমি পেয়েছিলাম!

তৃতীয় অধ্যায়

দিবাস্বপ্ন

"আজ আমার "পাপস্খালনের" দিন : এতদিনের জমানো সমস্ত পাপ থেকে আজ মুক্তি পাব।" আমি ভাবছিলাম, আর ভবিষ্যতে কোন অন্যায়, কোন পাপ করব না কোন দিন (যে পাপের স্মৃতিগুলো মনকে বেশী কষ্ট দেয়, সেগুলো সব মনে পড়তে লাগল একে একে)। প্রতি রবিবার গীর্জায় যাব, ভুলব না কিছুতেই আর তারপর পুরো একটি ঘণ্টা ধর্মগ্রন্থ পড়ব। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে প্রতি মাসে হাতখরচের জন্য যে পঁচিশ রুবল করে পাব, তা থেকে নিশ্চয় আড়াই রুবল (অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ) গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব, আর দেব এমনি ভাবে যাতে কেউ টেরটি না পায়। ভিখিরীদের নয়—খুঁজেপেতে গরীব লোক বার করব, হয়তো বাপ-মা-হারা কোনো বালক, নয়তো কেউ জানে না এমন কোন অনাথা বৃদ্ধা।

"আমার নিজস্ব একটা ঘর হবে (সম্ভবত যেন জেরোমেরটা), নিজেই সেটার যত্ন নেব, পরিষ্কার তকতকে করে রাখব; চাকরকে কোন কাজই করতে দেব না, কেননা সেও তো আমারি মতন একজন মানুষ! এরপর আমি পায়ে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব (আমাকে যদি গাড়ি দেয় তবে সেটাও বেচে দিয়ে টাকাটা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব) আর সব জিনিসেরই একেবারে খুঁটিনাটি দেখে করব (এই সব জিনিসটা যে কি, সে বিষয়ে তখন আমার কোন ধারণা ছিল না) কিন্তু একটি যুক্তিসঙ্গত নৈতিক, নিষ্কলঙ্ক জীবনে এই "সব জিনিস"-এর অস্তিত্ব আমি মর্মে মর্মে অনুভব করতাম। বক্তৃতাগুলো ভাল করে শিখে নেব, এমনকি ক্লাশে পড়াবার আগেই সেগুলো তৈরি করে ফেলব, কাজেই প্রথম বছরে আমি থাকব সবার ওপরে আর একটা বিস্তৃত প্রবন্ধও লিখে ফেলব। দ্বিতীয় বছরে সব জিনিসই আমার আগে-ভাগে জানা থাকবে, কাজেই ওরা আমাকে সোজা তৃতীয় ক্লাশে পাঠিয়ে দেবে। অতএব আঠার বছর বয়সে স্নাতক হয়ে বেরোব প্রথম হয়ে দুটো সোনার মেডেল পেয়ে। তারপর

মাস্টার ডিগ্রীর জন্ম পরীক্ষা দেব, তারপর ডক্টর—রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের মধ্যে একজন হব আমি। হয়তো ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলেও পরিচিত হতে পারি। কিন্তু, তারপর?" নিজেকে জিজ্ঞেস করি। এতক্ষণে আমার খেয়াল হয় এগুলো খালি দিবাস্বপ্ন অর্থাৎ অহঙ্কার, পাপ—যেগুলো সম্বন্ধে আজ সন্ধ্যেবেলাই পাদ্রীর কাছে স্বীকারোক্তি করতে হবে। কিন্তু হলে কি হবে, ক্ষণেকের মধ্যেই আবার আমি ফিরে গেলাম স্বপ্নের সেই গোড়ার দিকে। পড়া তৈরি করতে চলে যাব "স্প্যারো হিল"-এ, গাছের ছায়ায় নির্জন একটি জায়গা বেছে নিয়ে পড়াশুনা করব। কোন সময় হয়তো সঙ্গে কিছু খাবার নেব: পেদোতির দোকান থেকে চীজ্ কিংবা প্যাটি অথবা অন্য কিছু। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার হয় একটা ভাল বই পড়ব অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকব কিংবা কোন একটা বাজনা বাজাব (বাঁশী বাজান আমায় নিশ্চয় শিখতে হবে)। এদিকে "সে"-ও স্প্যারো হিলে বেড়াতে যায়—একদিন কাছে এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। আমি বিষাদের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম আমি একজন পাদ্রীর ছেলে; এখানে চুপচাপ একেবারে নির্জনে থাকতেই ভালবাসি। তখন সে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে কিছু বলবে, তারপর আমার পাশে বসে পড়বে। এরপর থেকে রোজই আমরা এখানে-ওখানে বেড়াতে যাব, দুজনে বন্ধু হব, ওকে আমি চুমু খাব। নাঃ, সেটা ঠিক হবে না; বরঞ্চ সেইদিন থেকে আমি আর কখনো কোন স্ত্রীলোকের দিকেই তাকাব না। ঝিদের ঘরে জীবনে কখনো ঢুকব না, ও ঘরের পাশ দিয়েও যাতে কখনো যেতে না হয়, তারই চেষ্টা করব। তিন বছর পরে সাবালক হব, বিয়েও করব নিশ্চয়। দিনে যতটা সম্ভব বেশী ব্যায়াম করব, যাতে কুড়ি বছর বয়সেই আমি "র‍্যাপোর" চাইতেও বেশী পালোয়ান হয়ে উঠতে পারি। প্রথম দিনে হাত মেলে ধরে একটা আধ পুড ওজন ধরে থাকব পাঁচ মিনিট ধরে, দ্বিতীয় দিনে একুশ পাউণ্ড, তৃতীয় দিনে বাইশ পাউণ্ড—এমনি করে বাড়বে যতদিন না আমি প্রত্যেক হাতে চার পুড ওজন বইতে পারি আর আমার পরিচিত যে কোন লোকের চাইতেই শক্তিশালী হয়ে উঠি। এরপরে কেউ যদি আমাকে কোনরকম অপমান করতে সাহস করে কিংবা "ওর" সম্বন্ধে অসম্মানজনক কোন কথা বলে আমি কেবল এক হাতে তার বুকটা খামচে ধরে মাটি থেকে টেনে খানিকটা ওপরে তুলে কিছুক্ষণ সেখানেই ধরে রাখব যাতে আমার কি ভয়ানক শক্তি তা মর্মে মর্মে বোঝে, তারপরে ছেড়ে দেব। কিন্তু এটাও বোধহয় খুব ঠিক নয়......

তা থাকগে, আমি তো আর কোন ক্ষতি করছি না তার, খালি দেখিয়ে দেব—"

আমার যৌবনের কল্পনাগুলোও শৈশব আর কৈশোরের মতই অর্থহীন ছিল—এর জন্যে কিন্তু কেউ আমাকে ভৎর্সনা করবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি বহু বছরও বাঁচি আর বছরের পর বছর এ কাহিনী লিখে যাই তাহলে দেখা যাবে সত্তর বছর বয়েসেও আমি আজকের মতই অসম্ভব, ছেলেমানুষী কল্পনায় মেতে আছি। তখনও আমি স্বপ্ন দেখব, কোন সুন্দরী মারিয়ার যে আমার মত দন্তহীন বুড়োর সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, যেমন সে ভালবেসেছিল মেঝাপ্পাকে* অথবা দেখব আমার দুর্বল চরিত্রের ছেলে হঠাৎ কোন অঘটনের ফলে একেবারে মন্ত্রীর গদী পেয়ে গেল, কিংবা মন্ত্রবলে হঠাৎ বিরাট একটা সম্পত্তি এসে গেল আমার হাতে। মধুর স্বপ্নের প্রাণে সান্ত্বনা দেবার কি অসীম ক্ষমতা—আমার বিশ্বাস কোন মানুষ কোন বয়সেই এ সুখ থেকে বঞ্চিত হয় না। তবুও প্রতিটি মানুষের ও তার বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ের স্বপ্নের বিশেষত্ব আলাদা-আলাদা—এদের মিল কেবল ঐ একটি ধর্মে, সেটি হচ্ছে সবগুলোই অবাস্তব, অসম্ভব কল্পনা, আর তাতেই আছে যাদু। আমার জীবনের ঐ অংশটুকুতে অর্থাৎ কৈশোরের শেষ আর যৌবনের শুরু এই কটা বছরে আমার স্বপ্নের ভিত্তি ছিল চারটি: কল্পিত একটি মেয়ের প্রতি প্রেম, যার সম্বন্ধে আমি সব সময়ে একই ধরনের ভাবতাম, আশা করতাম হঠাৎ যে কোন মুহূর্তেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এই মেয়েটি খানিকটা সোনেচকার মত, আর খানিকটা ভ্যাসিলীর বউ মাশার মত যখন সে টবের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাপড় ধোয় আর বাকিটা সেই ফর্সা টুকটুকে গলায় মুক্তোর হার পরা ভদ্রমহিলা যাঁকে বহুদিন আগে একদিন দেখেছিলাম থিয়েটারে আমার পাশের বক্সে। দ্বিতীয় হল, এই প্রেমের কল্পনাটার ওপর টান। আমি চাইতাম সবাই আমাকে জানবে, ভালবাসবে, ইচ্ছে হত যেন আমি আমার নামটা কেবল উচ্চারণ করব, "নিকোলাই এর্‌তেনিয়েভ" আর অমনি সবাই সচকিত হয়ে ছুটে এসে চারিদিকে ভীড় করে দাঁড়াবে আর কিছু-না কিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাবে। তৃতীয় কল্পনাটা হল পরিপূর্ণ, অনবদ্য এক সুখের—যে সুখ এত বিরাট, এত মহান যে তার আনন্দে প্রায় পাগল হয়ে যাব। অকস্মাৎ অত্যাশ্চর্য একটা কিছু ঘটবে, যার ফলে

* পুশ্‌কিনের কবিতা "পলতাভা"।

চট্ করে আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত, নামকরা লোক বলে পরিচিত হয়ে যাব। এটা আমি এমনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতাম যে প্রতিটি মুহূর্ত আমি রোমাঞ্চিত হয়ে ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম কোন একটি অচিন্তনীয় ঘটনার জন্যে। সব সময়েই মনে হত এই বুঝি শুরু হল সে পর্ব, একজন মানুষের যা কামনা—সব এসে যাবে আমার হাতের মুঠোয়। মুহূর্তে মুহূর্তে ছুটোছুটি করে বেড়াই এদিক-সেদিক বুঝি আমি যেখানে নেই সেখানেই শুরু হয়ে গেল সেই অভিনব কাহিনী। চতুর্থ কিন্তু সর্বপ্রধান অনুভূতি হল আমার নিজের সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণা একটা অনুশোচনার ভাব—কিন্তু সে অনুতাপের সঙ্গে মেশান আছে আনন্দেব আশা, তাই তা মোটেই দুঃখদায়ক নয়। জীবন থেকে অতীতকে ছেঁটে বাদ দেওয়া, অতীতের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা—আমার পক্ষে নিতান্তই সহজ আর স্বাভাবিক ছিল সে সময়; অতীতের কোন ভাবও ছিল না, বন্ধনও ছিল না। এমন কি অতীতকে ঘৃণা করতেও যেন মনে মনে আনন্দ পেতাম, অতীতের ছবি আঁকতাম মলিন রঙে—আসল বাস্তবের চাইতেও বেশী মলিন। অতীতের স্মৃতি যতই তমসাময় তার পটভূমিতে বর্তমানের আনন্দময় মুহূর্তগুলি ততই উজ্জ্বল, নির্মল, আর তারই সঙ্গে মানিয়ে রামধনু রঙে আঁকা ভবিষ্যতের ঝলমলে চিত্র। একদিকে মনে একটা আত্মগ্লানির ভাব আরেকদিকে জীবনের পরম উৎকর্ষ লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা—আমার সেই বয়সের মানসিক বিকাশে এই দুটি ভাবই বিশেষ প্রবল ছিল। অন্তরের এই সুরই আমার নিজেকে, মানুষকে আর ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবীকে বিচারের নতুন নীতি নিধারণ করে দিল। ভবিষ্যতের দুঃখময় দিনে আত্মা যখন নিঃশব্দে জীবনের অন্যায়, জীবনের পাপের ভারের কাছে হার স্বীকার করেছে, তখন আমার অন্তরের এই শুভ কল্যাণকামী ধ্বনিই একমাত্র প্রতিবাদ জানিয়েছে যে কোন রকমের অসত্যের বিরুদ্ধে, অতীতকে দেখিয়েছে অনাবৃত করে, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বর্তমানের উজ্জ্বল ক্ষেত্রের দিকে; তাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভবিষ্যতে সুখ ও আনন্দের! হে আমার শুভ শান্তিময় অন্তরধ্বনি, তুমি কি জীবনে কোনদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে?

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের পরিবার

সেই বসন্তে বাবাকে বাড়িতে প্রায় দেখাই যেত না। কিন্তু যতটুকুই থাকতেন ততটুকুই ভারী মনের ফুর্তিতে কাটাতেন ; পিয়ানোতে বসে প্রিয় গানের স্বর ভাঁজতেন, যখন তখন দুষ্টুমীভরা চোখে চাইতেন আমাদের দিকে আর মিমিকে নিয়ে, আমাদের সব্বাইকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতেন। মিমিকে হয়তো বললেন জর্জিয়ার রাজা নাকি তাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে তার প্রেমে পড়ে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন আর সংসদের কাছে ডাইভোর্সের জন্য দরখাস্ত করেছেন কিংবা পরম গম্ভীর মুখে একটি সংবাদ দিলেন যে আমি ভিয়েনার রাজদূতের সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হয়েছি, আবাব পরমুহূর্তেই লেগে গেলেন কাটেনকাকে ভয় দেখাতে মাকড়সা দেখিয়ে। আমাদের বন্ধু ডুব্‌কভ আর নেখলুইদভের সঙ্গে উনি খুব ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করতেন আর সব সময়েই আমাদের কিংবা অন্য অতিথি থাকলে তাঁদেরও জানাতেন আস্‌ছে বছরের জন্য তিনি কি কি সব পরিকল্পনা করেছেন। কল্পনাগুলো অবশ্য প্রতিদিনেই বদলাত আর বেশীর ভাগ সময়েই একটা আরেকটার বিরোধী ; তবুও সেগুলো এত মজার যে সবাই আমরা মন দিয়ে শুনতাম আর লিউবোচ্‌কা তো একেবারে অনিমেষ নয়নে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত পাছে একটা শব্দ এদিক-ওদিক হয়ে যায়। বর্তমানের পরিকল্পনা হচ্ছে আমাদের মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে লিউবোচ্‌কাকে নিয়ে বাবা দুবছরের জন্য ইতালী যাবেন তারপর ক্রিমিয়ায় জায়গাজমি কিনে রেখে আসবেন, প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে সেখানে বেড়াতে যাওয়া হবে অথবা গোটা পরিবারটা নিয়ে আবার সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে যাবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাবার এই হাসিখুশী ভাবটি ছাড়া আরও একটা পরিবর্তন ঘটেছে সেটা লক্ষ্য করে আমি খুবই অবাক হয়েছি। হঠাৎ বাবা কিছু ফ্যাশনসই জামাকাপড় কিনেছেন—একটা জলপাই রঙের কোট, সুন্দর কায়দার কতগুলো প্যাণ্ট আর একটা লম্বা ওভারকোট : সেটা ভারী চমৎকার মানিয়েছে ওঁকে।

কোথাও যেতে হলে বিশেষত একজন বিশেষ ভদ্রমহিলার কাছে যাবার সময়ে খুব করে সুগন্ধি ঢেলে নেন সারা গায়ে ; এই ভদ্রমহিলার কোনরকম উল্লেখ করতে গেলেই মিমি মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারে না, ওর দৃষ্টিতেও যেন একটা বিশেষ ভাব ফুটে ওঠে, যেন আমাদের বলতে চায়, "বেচারা মা-হারা সন্তানেরা ! এরকম অনুরাগ কি দুর্ভাগ্যের ! ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে এখন নেই, ইত্যাদি।" নিকোলাইয়ের কাছ থেকে আমি শুনেছি (বাবা কখনো তার জুয়া-খেলার কথা আমাদের কাছে বলেন না) সে বছর শীতে নাকি জুয়ায় বাবার কপাল খুলে গেছে, বেশ মোটা একটা টাকা জিতেছেন ; টাকাটা সব ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছেন, বসন্তে আর খেলবার মতলব নেই। সম্ভবত এই জন্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রামে পালিয়ে যেতে চাইছেন, পাছে শেষ পর্যন্ত আবার প্রলোভনে পড়ে যান। এমন কি তিনি ঠিক করেছেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা অবধিও অপেক্ষা করবেন না, ঈস্টারের ঠিক পরেই মেয়েদের নিয়ে তিনি পেত্রোভস্কায়ায় চলে যাবেন, আমি আর ভলোদিয়া পরে সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলব।

গোটা শীতটা বসন্তের শুরু পর্যন্ত ভলোদিয়া আর ডুবকভে একদম ছাড়াছাড়ি হয়নি (কিন্তু দ্মিত্রি সম্বন্ধে যেন ভলোদিয়া একটু নিরাসক্ত হয়ে এসেছে)। কথাবার্তা থেকে যতটা ধরতে পারতাম ওদের আসল আনন্দ ছিল অনবরত শ্যাম্পেন পান করা আর স্লেজ গাড়ি চড়ে মেয়েদের জানালার পাশ দিয়ে বেড়ান—এই সব মেয়েদের সঙ্গে নাকি ওরা দুজনেই প্রেমে পড়েছে—আর নাচা, ছোটদের সঙ্গে নয় একেবারে আসল বলনাচ। বিশেষ করে এই শেষেরটি আমার আর ভলোদিয়ার মধ্যে যথেষ্ট ভাব থাকা সত্ত্বেও সব সময়েই একটা বিরোধের কাঁটা হয়ে ফুটত। দুজনেই বেশ বুঝতে পারতাম যে একটি কিশোর যাকে এখনো মাস্টারমশাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয় আর একজন ভদ্রলোক যিনি বলনাচে যান—এদের দুজনের মধ্যে এতই পার্থক্য যে মনের কথা দেয়া-নেয়া চলে না। কাটেনকাও যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে, কত নাটক নভেল পড়েছে আর শীগ্‌গিরই ও বিয়ে করে ফেলতে পারে ; কথাটা এখন আর ঠাট্টা বলে মনে হয় না। ভলোদিয়াও তো বেশ বড় কিন্তু ওরা দুজনে বড় একটা মেলামেশা করে না, বরঞ্চ ওরা কেউই কাউকে দেখতে পারে না। সাধারণত যখন বাড়িতে থাকে, কাটেনকার আর কি, আছে কেবল উপন্যাস, তাই সব সময়ই ওর ভাবটা মনমরা একঘেয়ে ; কিন্তু কোন পুরুষমানুষ দেখা করতে

এলে ওর একেবারে আনন্দে আত্মহারা মনোহারিণী মূর্তি, হাসিখুশীর ঝরণা বইয়ে দেয়—কত রকমে যে ভ্রূভঙ্গি করে, আমি তো ছাই বুঝতেই পারি না এ সবের মানে কি। পরে যখন ওর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শুনেছি যে ওর বয়সী একটি মেয়ের নাকি ওই একটু চোখ-নাচান ছাড়া আর কোনরকম ছলাকলা করবারই অনুমতি মেলে না—তখনই কেবল বুঝতে পারলাম ওই সব অদ্ভুত অস্বাভাবিক চোখের ভঙ্গিগুলোর কিই বা মানে আর কেনই বা তাতে অন্য লোকেরা একটুও অবাক হয় না। লিউবোচ্‌কার গাউনের ঝুলও বেড়ে গেছে অনেকটা, তেড়াবাঁকা পা দুটো প্রায় দেখাই যায় না বলতে গেলে—কিন্তু তাহলেও তার সেই চেঁচামেচি কান্নাকাটি সেই আগের মতই আছে। কোন অশ্বারোহী সৈন্যকে স্বামী হিসেবে পাবার সাধ এখন তার চলে গিয়েছে ; এখন তার স্বামীর আদর্শ কোন গায়ক বা বাদক ; ফলে সে এখন গান-বাজনা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। সেণ্ট জেরোম জানেন আমার পরীক্ষা পর্যন্ত তাঁর এখানে মেয়াদ, কোন এক কাউণ্টের বাড়িতে নাকি তিনি চাকরিও ঠিক করেছেন, সেই থেকেই আমাদের বাড়ি সম্বন্ধে তাঁর একটু নাক-সিঁটকানো ভাব। বাড়িতে তিনি প্রায় থাকতেনই না, খালি সিগারেট ফুঁকতেন, সে সময় ওটা একটা চরম বাবুয়ানা ছিল, আর সব সময়ে শিস দিতেন মনের খুশিতে। মিমির মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়েছে, দিনরাত জানায় আমরা এখন সব বড় হয়ে উঠেছি, কাজেই এখন আর ভাল কোনকিছুরই প্রত্যাশা নেই আমাদের কারুর কাছে।

সেদিন যখন ডিনারে নেমে এলাম, খাবার ঘরে দেখলাম খালি মিমি, কাটেনকা, লিউবোচ্‌কা আর সেণ্ট জেরোম। বাবা বাড়িতে নেই, ভলোদিয়া নিজের ঘরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে, ওখানেই খাবার দিয়ে আসতে বলেছে। মিমিকে আমরা কেউই শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম না, সেই আজকাল খাবার টেবিলের মাথায় বসে আর আমাদেরও তাই খাবারের আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। দিদিমা আর মা-মণির সময়েই ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম—এই খাবার সময়টা ছিল যেন উৎসব, গোটা পরিবারের মিলন ঘটত এ সময়ে আর দিনটাকে যেন সমান দুটো ভাগে ভাগ করে দিত। কত সময় আমরা ইচ্ছে করে দেরি করে টেবিলে এসেছি, দ্বিতীয় কোর্সের সময়, সাধারণ গ্লাস থেকে পান করেছি (সেণ্ট জেরোম নিজেই এ নিয়মটা চালু করেছিলেন), চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে বসে সময় কাটিয়েছি,

ডিনার শেষ হবার আগেই ইচ্ছেমতন কত সময় উঠে চলে গিয়েছি, কত স্বাধীনতাই যে নিয়েছি! এরপর থেকেই আমাদের ডিনারের সেই দৈনিক হৃদয়গ্রাহী পারিবারিক অনুষ্ঠানের রূপ আর নেই।

সেই আগের দিনগুলোতে, পেত্রোভস্কয়ে, সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজেগুজে ডিনারে আসত; দুটো নাগাদ সবাই এসে ড্রইংরুমে জড় হয় আর গল্পগুজব করতে করতে অপেক্ষা করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। বাবুর্চিখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজার আগে ঘর্-র-র শব্দ শুরু হতে না হতেই ফোকা নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢোকে, হাতের ওপর একখানা তোয়ালে, মুখে অটল গাম্ভীর্য, জানায়, "ডিনার তৈরি।" খবরটা দেয় সে বেশ জোরে, গম্ভীরভাবে আর সবাই উঠে খাবার ঘরে চলেন, বড়রা সামনে, পেছনে ছোটরা; প্রসন্ন আনন্দোজ্জ্বল মুখ, গাউনের খস্‌খসানি আর জুতোর শব্দ—নীচু গলায় কথা বলতে বলতে যে যার পরিচিত জায়গায় গিয়ে বসে।

আবার মস্কোতে আমরা সবাই টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতাম দিদিমার প্রতীক্ষায়। গ্যাভরিলো চলে গেছে ওঁকে খবর দিতে, খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। এক্ষুনি দরজা খোলার একটু শব্দ হবে তারপর শিক্ষকের সামান্য একটু খস্‌খস্, ক্ষীণ একটু পায়ের শব্দ—দিদিমা তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন সেকেলে ধরনে লিল্যাকের ফুল বাঁধা একটি টুপি মাথায়, মুখখানা হাসিখুশী অথবা মনমরা (শরীরের অবস্থা যখন যেমন থাকে)। গ্যাভরিলো দৌড়ে দিদিমার চেয়ারের কাছে যাবে, অন্য সব চেয়ারগুলোরও একটু আধটু শব্দ হবে আর আমাদের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা ভাব নেমে যাবে—খিদের সূচনা। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শুকনো মড়মড়ে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে, দু এক টুকরো রুটি এগিয়ে নিয়ে টেবিলের তলায় হাত দুটো ঘস্‌তে ঘস্‌তে, লোভে চক্‌চকে দুটো চোখ নিয়ে আনন্দে অধীর হয়ে তাকিয়ে থাকি বাবুর্চির হাতের গরম ধোঁয়া ওঠা স্যুপের পাত্রের দিকে—বাবুর্চি তা থেকে পরিবেশন করে বিশেষ সাবধানে, বয়েস, ক্ষমতা আর দিদিমার প্রিয়পাত্র হিসেব করে।

আজকের ডিনারে আর সেদিনকার সেই আনন্দ, সেই উত্তেজনা, কিছুরই স্বাদ পাই না।

বর্তমানে এখন মিমি আর সেণ্ট জেরোমের আলোচনা, আর মেয়েদের ফিস্‌ফিসানি অমুক রুশ মাস্টারের জুতোটা কি বিশ্রী কিংবা প্রিন্সেস কর্নাকোভার পোশাকটা কি জাঁকালো ইত্যাদি ইত্যাদি—শুনতে শুনতে আগে আমার

একেবারে ঘেন্না ধরত—কাটেনকা, লিউবোচ্‌কাকে কথা শোনাতেও ছাড়তাম না এ নিয়ে, কিন্তু আজকের দিনে আমার দার্শনিক মনে তা কোনই তরঙ্গ তুলল না। আমার ব্যবহার অস্বাভাবিক নম্র; খুব অমায়িক হাসির সঙ্গে ওদের সব কথাবার্তা শুনলাম, বিনয়ের সঙ্গে পানীয়টা এগিয়ে দিতে বললাম, সেণ্ট জেরোম আমার কথার একটা ফরাসী শব্দ শুধরে দিলেন, সেটা আমি এর আগেও ডিনারে বসে ব্যবহার করেছি, সেটাও মেনে নিলাম বিনা দ্বিধায়। তবুও এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে যে মনে মনে আমার বিষম রাগ হচ্ছিল, কেউ আমার বিশেষ নম্র, অমায়িক ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করছে না বলে। খাবার পরে লিউবোচ্‌কা আমাকে একাখনা কাগজ দেখাল, তাতে সে তার সব পাপ লিখে রেখেছে। আমি বললাম যে এ ভাবে লিখে রাখা ভাল, তবে কিনা আরও ভাল হয় যদি মানুষ তার অন্যায়ের কথা নিজের মনে খোদাই করে রাখে, সে যা করেছে, এটা ঠিক সে জিনিস নয়।

"কেন নয়?" লিউবোচ্‌কা জিজ্ঞেস করে।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিছু ভেবো না, ওটাও খুব ভাল, তুমি আমার কথা ঠিক ধরতে পারছ না।" আমি ওপরে নিজের ঘরে চলে গেলাম, সেণ্ট জেরোমকে বলে গেলাম পড়তে যাচ্ছি। আসলে কিন্তু "স্বীকৃতির" আর ঘণ্টা দেড়েক বাকী, এই সময়টা কাটাতে চাই সারাজীবনের কাজের আর কর্তব্যের একটা তালিকা তৈরি করে একখানা কাগজে স্পষ্ট করে লিখব আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, আর কি কি নীতি অনুসরণ করে জীবনটা কাটাব, একতিলও এধার-ওধার না করে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়মকানুন

এক টুকরো কাগজ নিয়ে প্রথমেই চেষ্টা করি সামনের বছরে কি কি আমার কাজ, কি কি কর্তব্য তার একটি তালিকা তৈরি করতে। এর জন্য কাগজটিতে লাইন কাটা দরকার—হাতের কাছে রুলার না পেয়ে ল্যাটিন অভিধানখানারই স্মরণ নিলাম। বইটার পাশ দিয়ে কলমটা এদিক থেকে ওদিকে টেনে নিয়ে বইটা সরিয়ে দেখি একটা লাইনের বদলে কাগজের ওপর কালির একটি ছোট-খাট পুকুর! তাছাড়া অভিধানখানা লম্বায় কাগজের চাইতে ছোট হওয়ায়, তার নরম কোণের পাশ দিয়ে লাইনটা গেছে বেঁকে। আরেকখানা কাগজ টেনে নিলাম; এবার অভিধানখানা সরিয়ে সরিয়ে যাহোক করে একটা লাইন তো কাটলাম। কর্তব্যগুলোর তিনটে ভাগ হল—আমার নিজের ওপর, প্রতিবেশীদের আর ভগবানের ওপর; প্রথমটি নিয়ে শুরু করতে দেখি তার সংখ্যা যেমনি অসংখ্য, তেমনি কত যে তার বিভাগ তার আর ইয়ত্তা নেই; অতএব প্রথমে লিখতে হল, "জীবনের নিয়মকানুন" আর তারই একটি তালিকা শুরু করলাম। তালিকাটি তৈরি করতে লাগল ছ তা কাগজ, তা দিয়ে একটি খাতা বাঁধলাম, মাথায় মস্ত মস্ত করে লিখলাম, "জীবনের নীতি।" কিন্তু লেখাগুলো এমনি আঁকাবাঁকা হিজিবিজি হল যে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম এগুলোকে আবার লিখে ফেলা উচিত কিনা। ছেঁড়াখোঁড়া এই তালিকা আর তার ওপর বেঢপ এই নাম—তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভীষণ চিন্তা করলাম। আচ্ছা, আমার অন্তরে যার রূপ এত সুন্দর, এত নির্মল কাগজে প্রকাশ করতে গিয়ে তা কেন এত কুৎসিত, বিশেষত মনে মনে যা ভাবি বাস্তবে তাকেই রূপ দিতে গেলে, তার সুর কেন এমনি করে কেটে যায়?

"পাদ্রী এসে গেছেন; দয়া করে নীচে নেমে এসে তার আদেশ শুনে যান।" নিকোলাই এসে জানান দিয়ে গেল।

খাতাখানা টেবিলে লুকিয়ে রাখলাম; আয়নার দিকে একবার তাকিয়ে

চুলগুলো উল্টে আঁচড়ে নিলাম, আমার ধারণা এতে আমাকে বেশ চিন্তাশীল দেখায়। তারপর নেমে গেলাম নীচে বসবার ঘরে—সেখানে একটা টেবিলের চারধার ঘেরাও করা হয়েছে, টেবিলের ওপর দেবমূর্তি আর জলন্ত মোমবাতি। বাবাও আমার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দরজা দিয়ে ঢুকলেন। পাদ্রী একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, মাথার চুল সব পাকা, কঠিন গম্ভীর মুখ—বাবাকে আশীর্বাদ জানালেন। বাবা তাঁর বেঁটে বেঁটে চওড়া শুকনো হাতে চুমু খেলেন, আমিও তাই করলাম।

"ওয়াল্ডেমারকে ডাক," বাবা বলেন "সে কোথায়? ওঃ হ্যাঁ, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিয়নে গেছে।"

"সে তো প্রিন্সের সঙ্গে ওপরে পড়াশুনা করছে।" বলে কাটেনকা লিউবোচ্‌কার দিকে তাকায়। লিউবোচ্‌কা কেন জানি না হঠাৎ আরক্তিম হয়ে ওঠে, যেন কোথায় ব্যথা লেগেছে, এমনি ভান করে মুখভঙ্গির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি ওর পেছনে পেছনে গেলাম। লিউবোচ্‌কা বসবার ঘরে গিয়ে থামল, কাগজের ওপর আরও যেন কি একটু লিখ্‌ল।

"কি ব্যাপার? নতুন কোন অন্যায় করলে নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না না সেরকমটা কিছু নয়", লিউবোচ্‌কা লাল হয়ে উঠে জবাব দেয়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা দ্‌মিত্রির গলা শুনতে পেলাম, ভলোদিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

"দুনিয়াটাই তোমাকে শুধু প্রলোভন দেখাচ্ছে না?" কাটেনকা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে লিউবোচ্‌কার উদ্দেশ্যে বলে।

আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, আমার বোনের কি হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কাটেনকা ওর পেছনে লাগছে আর ও এত বিব্রত হয়ে পড়েছে যে চোখে জল এসে গেছে; অস্বস্তি বাড়তে বাড়তে শেষে ও মহা চটে ওঠে, কাটেনকার ওপরেও, নিজের ওপরেও।

"যে কোন লোক খুব সহজেই বুঝতে পারে যে তুমি একজন "বিদেশী" (এই বিদেশী শব্দটার চাইতে বেশী অপমান কাটেনকার আর কিছুতে হতে পারে না, সেইজন্যেই লিউবোচ্‌কা এটা বলল) এরকম একটা পবিত্র কাজের আগে তুমি ইচ্ছে করে ঘাবড়ে দিচ্ছ আমাকে। তোমার এটা বোঝা উচিত যে সবতাতেই ঠাট্টা চলে না।"

"জান নিকোলেঙ্কা, ও কাগজটাতে কি লিখেছে?" ওই 'ঝিয়েলী' শব্দটায় আহত হয়ে কাটেনকা এবার ফাঁস করে দিতে চায়, "ও লিখেছে"—

"তোমার এত হিংসে, আশাই করতে পারিনি": আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে যেতে দ্রুত অস্পষ্ট গলায় বলে লিউবোচ্‌কা, "ও ইচ্ছে করে আমাকে অন্যায় করতে বাধ্য করছে, আর তা কিনা এই সময়ে। কিন্তু আমি তো কখনও তোমার মনের কথা নিয়ে, তোমার দুঃখকষ্ট নিয়ে তোমায় জ্বালাতন করি না, করি?"

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাপ স্বীকার

এই সমস্ত ঘটনায় চঞ্চল মন নিয়ে যখন বসবার ঘরে ফিরে এলাম, বাড়ির সবাই তখন সেখানে জড় হয়েছে, আর পাদ্রী উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন 'পাপ-স্বীকার' -এর আগে প্রার্থনা শুরু করতে। চারিদিকের স্তব্ধতার ভেতরে যখন পাদ্রীর কঠিন, ভাব-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে লাগল, বিশেষ করে যখন তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, "কোন লজ্জা করো না, কিছু লুকিয়ো না, তোমার সমস্ত পাপ স্বীকার করো, তাহলে ভগবানের কাছে তোমার আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটবে ; কিন্তু যদি কিছু লুকাও, তবে পাপ আরও বাড়বে।" আগের দিন সকালে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের কথা মনে করে যে ভক্তিমিশ্রিত উত্তেজনা বোধ করেছিলাম, সেই উত্তেজনার জোয়ার যেন আমার রক্তে ফিরে এল। এমন কি নিজের অবস্থাটাও উপলব্ধি করে আনন্দও পেলাম, এই অবস্থাটা ধরে রাখতে চেষ্টা করলাম মন থেকে আর সব চিন্তা দূরে সরিয়ে দিয়ে।

বাবাই প্রথমে গেলেন "স্বীকৃতি" দিতে। অনেকক্ষণ তিনি রইলেন দিদিমার ঘরে, আমরা ততক্ষণ সবাই বসবার ঘরে চুপচাপ বসে রইলাম কিংবা ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনা করতে লাগলাম এর পর আগে কে যাবে। অবশেষে দরজার ওপারে পাদ্রীর গলার স্বর শোনা গেল, প্রার্থনা করছেন, তারপর বাবার পায়ের শব্দ। কঁ্যাচ করে দরজায় শব্দ হল, বাবা বেরিয়ে এলেন, চিরদিনের অভ্যেস মতন একটা কাঁধ আরেকটা কাঁধের চেয়ে একটু উঁচু করে—বেরিয়ে এসে আমাদের কারোর দিকে তাকালেন না।

"তুমি এবার যেতে পার লিউবা, দেখো কিছু লুকিয়ো না কিন্তু। তুমি আমার সবচাইতে পাপী মেয়ে, জান তো?" বাবা খুশির স্বরে বললেন লিউবোচ্‌কার গালে একটা চিমটি কেটে।

লিউবোচ্‌কা পর্যায়ক্রমে একবার লাল আরেকবার ফ্যাকাশে হতে থাকে, সেই কাগজখানা একবার বার করে আবার তক্ষুনি লুকিয়ে ফেলল এ্যাপ্রনের

তলায়, দুই কাঁধের ভেতর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল যেন আকাশ থেকে আঘাত এসে পড়বে এক্ষুনি, তারপর দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল। বেশীক্ষণ থাকল না ও কিন্তু যখন বেরিয়ে এল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় ওর কাঁধদুটো কাঁপছে থিরথির করে।

সবশেষে, কাটেনকা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলে পর, আমার পালা এল। আধো-অন্ধকার ঘরটায় মনে একটা আতঙ্ক নিয়ে ঢুকলাম, মনে মনে আবার সেই আতঙ্কের ভাবটা যেন বাড়িয়ে দেবারই ইচ্ছে। পাদ্রী দাঁড়িয়ে আছেন পাঠমঞ্চের সামনে, ধীরে ধীরে মুখ ফেরালেন আমার দিকে।

মিনিট পাঁচেকের বেশী আমি দিদিমার ঘরে থাকিনি, কিন্তু যখন বেরিয়ে এলাম মনে আমার পরিপূর্ণ সুখ, তখনকার বিশ্বাস অনুযায়ী আমি তখন নির্মল, পবিত্র, আধ্যাত্মিক পরিবর্তনে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কিন্তু এই পরিবর্তনের পরেও আমায় ফিরতে হল সেই পুরনো পরিবেশেই, সেই ঘর, সেই আসবাব, আমার নিজের সেই পুরনো বিশ্রী চেহারা (আমার অন্তরের আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের চেহারাটাও যদি বদলে যেত)—এটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। তবুও রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত আমার এই হালকা খুশির ভাবটা বজায় থাকল।

তন্দ্রা এসে পড়েছে ; কল্পনায় মাথার ভেতর আনাগোনা করছে সেই সব ভয়ঙ্কর পাপ যার হাত থেকে মুক্তি পেলাম—হঠাৎ মনে ভেসে উঠল একটা ভয়ানক পাপের কথা, এটা তো আমি স্বীকার করিনি! পাপ স্বীকারের আগেকার সেই প্রার্থনা বাণী আমার মনের ভেতর উচ্চারিত হতে থাকল অনবরত। মনের শান্তি নিমেষে অন্তর্ধান করল, কানে কেবলি বাজতে লাগল, “যদি কিছুমাত্র পাপ লুকিয়ে রাখ, তবে আরও বেশি পাপের ভাগী হবে জেনো নিশ্চিত।” দেখতে পেলাম আমার মত মহাপাপীর উপযুক্ত শাস্তির সৃষ্টি পর্যন্ত হয়নি। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কতক্ষণ যে কাটালাম জানি না, প্রতিমুহূর্তে ভগবানের শাস্তির প্রতীক্ষা করলাম, এমন কি মনে হল যে কোন নিমেষে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে—এ চিন্তায় অবর্ণনীয় আতঙ্কে সারা শরীর কণ্টকিত হল। হঠাৎ আমার মনে হল, আছে, আছে, এরও উপায় আছে ; ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে পায়ে হেঁটে অথবা গাড়িতে ঐ পাদ্রীর আশ্রমে চলে যাব, দ্বিতীয়বার পাপ-স্বীকার করব—এই চিন্তাটাই ধীরে ধীরে আমার মনে শান্তি এনে দিল।

সপ্তম অধ্যায়

মঠ অভিমুখে

সে রাতে কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেল—পাছে দেরি হয়ে যায় সেই ভয়ে। ঠিক ছটায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। জানালাগুলোয় আলোর সামান্য একটু আভাসমাত্র। বিছানার পাশে কাপড়চোপড় আর জুতোগুলো স্তূপাকার হয়ে পড়েছিল—নিকোলাই সেগুলো সরিয়ে নেবার সময় পায়নি। আমি উঠে সেইগুলো পরে নিলাম, তারপর হাত মুখ না ধুয়ে বা প্রার্থনা না করে, জীবনে এই প্রথম একা একা এত ভোরে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

সামনের মস্ত সবুজ রঙের ছাদওয়ালা বাড়িটার পেছন থেকে সবেমাত্র ভোরের বিবর্ণ লালিমা ফুটছে। বসন্তের সকালের হাল্কা তুষার পায়ের নীচে মচ্‌মচ্‌ করছে, আমার মুখ আর হাত ভরিয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় এখনো একটাও গাড়ি চলতে শুরু করেনি—অবশ্য কারুর ওপরই আমি নির্ভর করিনি। কয়েকটা মালটানা গাড়ি অলস গতিতে চলেছে, কয়েকজন পাথরের কারিগর কথা বলতে বলতে চলে গেল। বেশ খানিকটা এগোতে তবে দেখা মিলল কিছু লোকজনের—কারু হাতে বাজারের টুক্‌রি, কারু হাতে বা জল আনবার পাত্র। রাস্তার মোড় ঘুরে একজন পাই-ফেরিওয়ালা এল, একটা রুটির দোকান খুলেছে, শেষে আরবাতস্ক গেটে এসে দেখা পেলাম একটা গাড়োয়ানের, পুরনো, ঝরঝরে তালিমারা নীল রঙের একটা ড্রস্‌কির মাথায় বসে ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বোধহয় ও আমাকে জানাল মঠে গিয়ে আবার ফিরে আসতে কুড়ি কোপেক লাগবে। কিন্তু কথাটা বলার পরেই ওর তন্দ্রা টুটে গেল। আমি যখন গাড়িতে চড়তে যাচ্ছি; ও হঠাৎ চন্‌মন্‌ করে উঠে ঘোড়াকে লম্বা চাবুক কষিয়ে প্রায় ছুটিয়ে দেয় আর কি! বিড়বিড় করে বলে, "ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে, আপনাকে নিতে পারব না, স্যর।"

বহুকষ্টে ওকে থামিয়ে রাজী করালাম চল্লিশ কোপেক কবুল করে। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে, আমার আপাদমস্তক বেশ সাবধানে দেখে নেয়, তারপর ডেকে

বলে, "ভেতরে উঠে বসুন, স্যর।" স্বীকার করছি, আমার মনে কেমন ভয় ঢুকল, ও যদি কোথাও একটা সরু গলির ভেতর গাড়ি ঢুকিয়ে আমার কাছ থেকে সবকিছু কেড়েকুড়ে নেয়। ওর ছেঁড়াখোঁড়া কোটের কলার আর কুঁজো পিঠের ওপর রেখাঙ্কিত গলাটা দেখতে দেখতে আমি গাড়ির বাঁকা দোলানো আসনে উঠে বসলাম, গাড়ি ঘড়ঘড় করে চলল ভজ্‌দভিজেস্কার পথে। গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ নজরে পড়ল কোচোয়ানের গায়ের কোটটা যে সব্‌জে কাপড়ে তৈরি, গাড়ির ভেতরেও সেই কাপড়েই আবরণ। এই ব্যাপারটাই কেন জানি না আমার মনকে শান্ত করে দিল, গলিতে ঢুকে জিনিসপত্র কেড়েকুড়ে নেবার ভয়টাও দূর হল।

সূর্য অনেক উঁচুতে উঠে গেছে; মঠে যখন পৌছলাম গীর্জার চূড়ার গম্বুজগুলো সোনালী আলোয় ঝকমক্ করছে। ছায়ায় ছায়ায় এখনো তুষারের কুচি জমে আছে, কিন্তু রাস্তার ওপর সেগুলো গলে স্রোত বইয়েছে, ঘোড়াটা সেই জলের ওপর দিয়ে ছপছপ্ করতে করতে এগোচ্ছে। মঠের সীমানায় ঢুকেই যাকে প্রথমেই সামনে পেলাম, তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গেলে পাদ্রীর দেখা পাব।

"ঐ যে ওঁর কুঠরি দেখা যাচ্ছে।" পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন সাধু থম্‌কে দাঁড়ালেন, ইশারা করে দেখালেন দূরে একটা ছোট বাড়ি, সামনে ছোট গাড়িবারান্দা।

"অনেক ধন্যবাদ," বিনয়ের সঙ্গে বললাম।

এরপর মাথায় চিন্তা এল ঐ যে পাদ্রীরা সব গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছেন, ওরা সব আমাকে দেখে না জানি কি ভাবছেন। আমি বড়ও নই, একেবারে ছেলেমানুষও নই, মুখ চোখ ধোয়া হয়নি, চুলে চিরুনি পড়েনি, পোশাক নোংরা, জুতোয় কালি পড়েনি, কাদা মাখা। সবাই যেন বেশ কটমট করে তাকাচ্ছে, অর্থাৎ বুঝে নিতে চায় আমি কোন স্তরের লোক। তবুও তরুণ পাদ্রীটির দেখানো পথ ধরেই আমি এগোলাম।

কুঠরির দিকে যেতে একটা সরু পথ পড়ে, তার ভেতর দেখা হল একজন বুড়োমানুষের সঙ্গে, পরনে কালো পোশাক, ঘন পাকা দাঁড়ি, জানতে চাইলেন আমি কি চাই।

এক মুহূর্তের জন্য মনে ইচ্ছে জাগল, "কিছু চাই না" বলে জবাব দিয়ে ছুটে চলে যাই গাড়িতে চড়ে একেবারে বাড়ি। কিন্তু বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে

যেন মনে অভয় পেলাম, ওঁর ভুরু দুটি কুঁচকে রয়েছে দেখেও! জানালাম, পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, নামটাও বললাম।

"এস আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দেব", উনি ফিরলেন আমার দিকে, মনে মনে বোধহয় হিসেব কষছেন, আমার আসবার কারণটা কি হতে পারে। "ফাদার প্রার্থনা মন্দিরে গেছেন, এক্ষুনি ফিরবেন।"

দরজা খুলে আমাকে নিয়ে এগোলেন, পর পর দুটো ঘর পার হয়ে গেলুম, পরিষ্কার লিনেন কাপড়ে মেঝে ঢাকা, তারপর ঢুকলুম সেই কুঠরিতে।

"দয়া করে একটু অপেক্ষা কর এখানে।" সহৃদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমাকে আশ্বস্ত করে উনি বেরিয়ে যান।

একেবারেই ছোট একফালি ঘর, কিন্তু চমৎকার পরিপাটি সাজানো। আসবাব বলতে ছোট একটি টেবিল, অয়েলক্লথে মোড়া, ডবল পাল্লা দেওয়া দুটো জানালার মাঝখানে পাতা, তার ওপরে বসান দুটো ফুলদানীতে জেরেনিয়াম ফুল, কয়েকটি মূর্তি, সামনে ঝুলছে একটি আলো, তাছাড়া একটি হাতলওয়ালা চেয়ার আর দুটি সাধারণ চেয়ার। কোণে দেওয়ালে ঝোলানো একটি ঘড়ি, কাচের ঢাকনাটায় রঙবেরঙের ফুল আঁকা, পার্টিশানের গায়ে পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে দুটো জোব্বা, এর পিছনে বোধহয় আছে শোবার বিছানা।

জানালার বাইরে সামান্য একটু দূরে সাদা একটা দেওয়াল। এদের মাঝে লিল্যাকের একটা বনাত। বাইরের জগতের ক্ষীণতম শব্দও এখানে এসে পৌঁছয় না, তাই নিঃশব্দতার পটভূমিতে ঘড়ির পেণ্ডুলামের নিয়মিত দোলানির শব্দটাকেও মনে হচ্ছে ভীষণ জোর। এই নির্জন কোণটিতে একা হতেই আমার মাথা থেকে আগের সব চিন্তা, সব স্মৃতি একেবারে ধুয়ে-মুছে গেল, যেন ওদের অস্তিত্বই ছিল না। কোন সময়,—মধুর একটা দিবাস্বপ্নের মোহে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। রংচটা জোব্বার ছেঁড়াখোঁড়া লাইনিং, কালো রঙের পুরনো হয়ে যাওয়া চামড়ায় বাঁধান বই আর তাতে পিতলের প্রচ্ছদপট বন্ধনী, গাছপালার ফিকে সবুজ রং, যত্নের সঙ্গে জল দেওয়া জমি: ধোয়া পাতা আর বিশেষ করে ঐ একঘেয়ে টিকটিক শব্দ—এরা সবাই মিলে আমার চোখের সামনে যেন নতুন একটা জীবনের পথ খুলে দিল, সে জীবন নির্জনতার, প্রার্থনার, সে জীবন শান্তি, স্থিরতা ও সুখের।

"মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে, বছরের পর বছর আমি বসে বসে ভাবি, উনি সবসময়ই একাকী, ধীর, স্থির, শান্ত ; সবসময়ই অনুভব করেন, ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করে তাঁর বিবেক নির্মল, প্রতিনিয়ত তাঁর প্রার্থনা ঈশ্বরের পায়ে পৌঁছে যাচ্ছে।" প্রায় আধঘণ্টা চেয়ারে নিশ্চুপ বসে থাকলাম। চারিদিকের নানা শব্দ আমার কানে কানে একযোগে কত কথা যে বলে যাচ্ছে, পাছে সে সুর কেটে যায়, তাই না নড়েচড়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেললাম! ঘড়ির পেণ্ডুলাম একই ছন্দে দোলে, ডানদিকে একটু জোরে শব্দ, বাঁদিকে একটু আস্তে।

অষ্টম অধ্যায়

দ্বিতীয় দফায় পাপ স্বীকার

পাদ্রীর পায়ের শব্দে আমার আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল।

"সুপ্রভাত," হাত চালিয়ে মাথায় পাকা চুলের রাশি গোছাতে গোছাতে তিনি বলেন, "তোমার জন্য কি করতে পারি ?"

আমি বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গে ওঁর ছোট্ট পীতাভ হাতে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ চাইলাম। এরপর যখন আমার আবেদন জানালাম, উনি মুখে তার কোনই জবাব দিলেন না, আস্তে আস্তে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্বীকৃতি শুনতে লাগলেন।

লজ্জাকে জয় করে যখন অন্তরেব সব কথা ব্যক্ত করলাম, আমার মাথায় হাত দুখানা রেখে গভীর সুরেলা গলায় তিনি বললেন, "খোকা, স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার ওপর ঝরে পড়ুক। চিরদিন তিনি তোমার হৃদয়ের বিশ্বাস, শান্তি এবং নম্রতা বজায় রাখুন। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক !"

আনন্দে আমার গলা বুঁজে এল! ওঁর জোব্বার নরম কাপড়ের ভাঁজে চুমু খেয়ে মুখ তুলে তাকালাম। পাদ্রীর মুখভাব শান্ত, সংযত।

বুঝতে পারলাম এই হৃদয়াবেগ আমার মনে একটা অপূর্ব আনন্দের লহর তুলেছে, পাছে এ ভাব মিলিয়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে পড়লাম, আশেপাশে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা সেই ঝরঝরে গাড়িটাতে গিয়ে চাপলাম। কিন্তু সেই গাড়ির অবিশ্রান্ত ঝাঁকুনি আর চোখের সামনে দিয়ে ছিটকে ছিটকে সরে যাওয়া হরেক রকমের জিনিস খুব তাড়াতাড়ি সে আনন্দের অনুভূতিটা নষ্ট করে দিল, ইতিমধ্যেই আমার চিন্তায় অন্য আলোড়ন জেগেছে, ভাবছি পাদ্রী বোধহয় এতক্ষণে ভাবছেন কি সুন্দর আত্মা, আমার মতন এমন চমৎকার একটি তরুণের সঙ্গে জীবনে তাঁর কখনো দেখা হয়নি, ভবিষ্যতে কখনো হবেও না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ; এই বিশ্বাস আমার মনে একটা আনন্দের হাওয়া বইয়ে দিল, ভীষণ ইচ্ছে হল কাউকে খুলে বলি মনের কথা।

উঃ, কি ভীষণ যে ইচ্ছে হচ্ছে কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ; কিন্তু কে-ই বা আছে। হাতের কাছে একমাত্র ঐ কোচোয়ান। অতএব ওর দিকেই ফিরি।

"আচ্ছা, আমি কি অনেকক্ষণ ভেতরে ছিলাম ?"

"না, বেশী নয়, কিন্তু ঘোড়ার দানাপানির সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমি রাতে গাড়ি চালাই, দেখতে পাচ্ছেন।" কোচোয়ান জবাব দেয়। সূর্য উঠেছে বলে ও একটু খুশী হয়ে উঠেছে।

"আমার কিন্তু মনে হল যেন মোটে মিনিটখানেক থেকেছি। জান, কেন আমি মঠে গিয়েছিলাম ?"

আমি আমার আসনটা বদলে কোচোয়ানের কাছাকাছি উঠে গিয়ে বসলাম।

"না, সে আমি কি করে জানব বলুন ? গাড়ি চালাই, যে যেখানে হুকুম করেন, পৌঁছে দিই এইমাত্র," কোচোয়ান জবাব দেয়।

"না, তবুও কি মনে হয় তোমার ?" জেরা করি।

"এই বোধহয় কেউ মারা গেছেন, তাই কবর দেবার জায়গা কিনতে গেছেন।"

"না বন্ধু, না। জান কেন গিয়েছিলাম ?"

"কি করে জানব বলুন ?" ও আবার বলে।

বুড়ো গাড়োয়ানের গলার স্বরটা এত কোমল যে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললাম ওকেই আমার কাহিনী খুলে বলব ; আমার নতুন উপলব্ধিটা পর্যন্ত।

"আমি তোমাকে বলব সব কথা যদি শুনতে চাও। দেখ—"

একে একে ওকে সব কথা খুলে বলি : আমার মনে সব নতুন নতুন ভাবোদয়ের কথা পর্যন্ত। মনে পড়লে আজও লজ্জায় লাল হয়ে উঠি।

"বেশ কথা, স্যর।" সব কথা শুনে গাড়োয়ান অবিশ্বাসের সুরে বলে। এরপর বুড়ো অনেকক্ষণ একদম চুপচাপ ; মাঝে মাঝে খালি এক একবার কোটের লেজটা ঠিক করে দিচ্ছে। আমি সবে ভাবতে শুরু করেছি বুড়োও নিশ্চয় ওই পাদ্রীর মতই ভাবছে যে এমন চমৎকার একটি ছেলে ত্রিভুবনে আর কোথাও নেই, এমনি সময় হঠাৎ ও আমার দিকে ফিরল।

"দেখুন কর্তা, ওটা আপনাদের ভদ্রলোকদেরই সাজে।"

"কি রকম ?" প্রশ্ন করি।

"এই, আপনারা ভদ্রলোকেরা যা করেন আর কি !"

"নাঃ, ও দেখছি আমাকে কিছু বুঝতে পারেনি।" আমি ভাবলাম, কিন্তু বাড়ি পৌঁছন পর্যন্ত আর একটিও কথা বললাম না।

মঠে থাকতে ভাব আর ভক্তির যে উচ্ছ্বাস জেগেছিল, সেটা অবশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না, তবুও একটা নতুন উপলব্ধির স্মৃতি মনের মধ্যে আনন্দের সুর হয়ে গুনগুন করে ফিরছিল সারাটা পথ ধরে, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে ঢুকতেই সেটা একেবারে হারিয়ে গেল। কুড়ি কোপেকের দুটো মুদ্রা এক্ষুনি আমার দরকার, কিন্তু আমার কাছে তো নেই। বাবুর্চি গ্যাভ্‌রিলোর কাছে আমি সবসময়ই ঋণী, সে তো আমাকে আর ধার দেবে না। আঙ্গিনা দিয়ে দুবার আমাকে ছুটোছুটি করতে দেখে কোচোয়ান বোধহয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে থাকবে, সে এইবার গুটিগুটি গাড়ি থেকে নেমে এসে বেশ চেঁচামেচি জুড়ে দিল ; গাড়ি চড়ে ভাড়া না দিয়ে পালিয়ে যায় এমনি সব জোচ্চোরদের সম্বন্ধে আমাকে লক্ষ্য করে বেশ দুচারটে বুলি ঝাড়তে লাগল।

বাড়িতে সবাই তখনো ঘুমে অচেতন, কাজেই চাকরবাকর ছাড়া এমন আর কেউ নেই যার কাছ থেকে এই চল্লিশ কোপেক ধার করতে পারি। শেষ পর্যন্ত ভ্যাসিলী, আমি বার বার কথা দেওয়াতে, যদিও (তার মুখ দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম) সে কথায় তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, কিন্তু তাহলেও আমাকে সে ভালবাসত তাই আর তাছাড়া আমি ওর মস্ত একটা কাজ করে দিয়েছিলাম সেই কথা স্মরণ করে শেষ পর্যন্ত, সেই আমার হয়ে গাড়োয়ানের ভাড়াটা মিটিয়ে দিল। সকলের সঙ্গে গীর্জায় যাব বলে পোশাক পরতে গিয়ে যখন দেখি আমার নতুন পোশাক তখনও আসেনি, তখন আমার ভীষণ রাগ হয়। অন্য একটা পোশাক পরে গীর্জার অনুষ্ঠানে গেলাম বটে কিন্তু মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে রইল, আগেকার সূক্ষ্ম আবেগগুলির প্রতি অবিশ্বাসে মনটা ভরে উঠল।

নবম অধ্যায়

পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়া

ঈস্টারের পরের শুক্রবারেই বাবা, আমার বোন, মিমি আর কাটেনকা গ্রামের বাড়িতে চলে গেল : দিদিমার অতবড় বাড়িতে রইলাম কেবল আমি, ভলোদিয়া আর সেণ্ট জেরোম। মনের যে উদ্বেল ভাব নিয়ে মঠে গিয়েছিলাম, সে ভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত : শুধু রেখে গেছে সে স্মৃতির মধুর ক্ষীণ একটু রেশ। স্বাধীন জীবনের নিত্য নতুন আবিষ্কারে সে রেশটুকুও লুপ্তপ্রায়।

"জীবনের নীতি" লেখা খাতাখানাও আর পাঁচটা বাজে খাতার তলায় সমাধিস্থ হয়েছে। যদিও জীবনটাকে নিয়মের ছক কাটা ঘরে ফেলে প্রতিটি পদে তা মেনে চলা, এই ধারণাটাই আমার খুব ভাল লাগত, এটা একই সঙ্গে খুবই সহজ আবার চমৎকার জমকালো একটি ব্যাপার, জীবনের প্রতিপদেই তা খাটাতে তবুও ইচ্ছুক ছিলাম, তবুও সেটা যে বর্তমান মুহূর্ত থেকেই শুরু করা দরকার, সাময়িক ভাবে তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম আর অনির্দিষ্ট কোন ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রেখেছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে খুবই আনন্দ দিত ; যে কোনসময় যে কোন একটা চিন্তা মনে জাগলেই তাকে আমার মন আপনা-আপনিই 'জীবনের নীতি'র যে কোন একটা জীবনের কোঠায় ফেলে দিত—আমার নিজের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি অথবা ভগবানের প্রতি কর্তব্যের যে কোন একটি ঘরে।

"এ চিন্তাটাকে তা হলে এই ঘরে ঢোকাই", নিজের মনেই ভাবি, "ভবিষ্যতে আরও যত কথা মনে হবে-এ সম্বন্ধে, সব যাবে এর সঙ্গে।" কত সময় নিজেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি, "আচ্ছা, আমার কোন ধারণাটা ঠিক,—যখন মানুষের বুদ্ধিকেই সর্বশক্তিমান বলে মনে করতাম সেটা, না বর্তমানে যে মানুষের বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা ও বিশেষত্বে আস্থা হারিয়েছি, এটা ?" কিন্তু এর কোন সঠিক জবাব নিজেকে দিতে পারিনি।

স্বাধীনতার স্বাদ আর প্রতিমুহূর্তে হঠাৎ কিছু একটা ঘটে যাবার আশা, সে

কথা আমি উল্লেখ করেছি, এই কটি চিন্তা প্রতিনিয়ত আমার মনে উত্তেজনার খোরাক জোগাত, তাই পরীক্ষার জন্য তৈরি হলাম খুবই খারাপভাবে। ধর, সকালবেলা তুমি পড়া তৈরি করতে বসেছ, মনে মনে জান খুব কষে পড়তে হবে: কেননা আসছে কালকেই একটা বিষয়ে পরীক্ষা, যার দুটো প্রশ্ন সম্বন্ধে তুমি একেবারেই কিচ্ছু জান না—কিন্তু হঠাৎ তোমাকে চমকে দিয়ে চমৎকার একটু সুবাস ভেসে এল জানালা পথে, তোমার মনেও কিসের একটা স্মৃতি যেন ফুটব ফুটব করছে! হাতদুটো তোমার আপনা আপনিই আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল, পাদুটোও যেন আপন গণ্ডিতেই পায়চারি শুরু করে দিল, মাথার একটা বল্টু যেন নড়াচড়া করে গোটা যন্ত্রটাকেই চালু করে দিল। তোমার মনটা হাল্কা খুশীতে ভরে গেল, রঙীন নানা কল্পনা এত দ্রুত তালে মনের পটে আনাগোনা করে যে তার ঔজ্জ্বল্যটুকুই কেবল তোমার মনের তরঙ্গে ছায়া ফেলে। এ ভাবে কেটে গেল এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা নিজের অজান্তেই। অথবা, তুমি পড়তে বসেছ, যথাসাধ্য চেষ্টা করছ মন বসাতে, হঠাৎ কানে এল বারান্দায় কোন মেয়ের পায়ের শব্দ, পোশাকের খস্‌খসানি। ব্যস্, তোমার মন থেকে আর সব মুছে গেল, কিছুতেই আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না, যদিও তোমার মন নিশ্চিতই জানে যে ও দিদিমার বুড়া ঝি গাশা ছাড়া আব কেউ হতে পারে না। তখন তোমার মন বলে, "বেশ ধরে নিলাম, না হয় ওটা গাশাই হল, কিন্তু 'সেই ব্যাপারটা' যদি এক্ষুনি শুরু হয়, তা হলে আমি ঠকে যাব তো?" তুমি তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেলে গিয়ে দেখলে গাশাই বটে, কিন্তু মাথাটাকে অনেকক্ষণ আর সংযত করতে পারলে না, কলটা যেন আবার কে টিপে দিয়েছে, চারিদিকে সব বিশৃঙ্খলা। কিংবা হয়তো তুমি একা একা সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরে বসে আছ, ঘরে একটা মাত্র মোমবাতি জ্বলছে। এক মিনিটের জন্য বই থেকে মুখ তুলেছ, হয়তো বাতিটা উস্‌কে দিতে কিংবা চেয়ারে একটু নড়েচড়ে আরাম করে বসতে—বাড়ির চারিদিকে অন্ধকার, দরজার কাছে, ঘরের কোণে কোণে, নিস্তব্ধতা ছেয়ে আছে সারা বাড়িতে। তুমি কি পারবে কান পেতে সে নিঃশব্দতার সুর না শুনে, কিংবা চোখ মেলে সে অন্ধকারের অতলে ডুবে না গিয়ে? অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ তুমি নিথর হয়ে বসে থাকবে, তারপর নিজের অজান্তেই পা পা করে নীচে নেমে গিয়ে খালি ঘরগুলোতে ঘুরে বেড়াবে। আমিও কতদিন এমনি অলক্ষ্যে বহুক্ষণ ধরে হলে বসে শুনেছি —গাশা মস্ত বড় ঘরটায় একটা মাত্র মোমবাতি জালিয়ে একা একা বসে

পিয়ানোতে একটা মাত্র আঙুল দিয়ে "নাইটিঙ্গেল" বাজাচ্ছে। চাঁদ যখন আলো ছড়ায়, আমি আর কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারি না, উঠে এসে বাগানের দিকের জানালার ওপর শুয়ে শুয়ে দেখি আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সাপিস্নিকোভদের বাড়ির ছাদ আর আমাদের গীর্জার উঁচু গম্বুজটা, আলোর ধারা বাগানের পথে পথে ঝোপঝাড়ের ছায়া। এতক্ষণ বসে বসে এ সব দেখলাম যে পরদিন সকালে বেলা দশটার আগে চোখই খুলতে পারলাম না।

কাজেই কেবল মাস্টারমশাইদের জন্যে, বিশেষ করে সেণ্ট জেরোম মাঝে মাঝেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার অহঙ্কারে ঘা দিয়ে ফেলতেন তাই, আর আমার বন্ধু নেখলুইদভ যার কাছে পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়ার বিশেষ মূল্য ছিল, ডিস্টিংশন পেয়ে তার চোখে ক্ষমতা জাহির করবার প্রবল ইচ্ছা ছিল তাই— নইলে সেবারের সেই বসন্ত আর আমার নতুন পাওয়া স্বাধীনতা আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিত, পরীক্ষায় আমি কিছুতেই পাশ করতে পারতাম না।

দশম অধ্যায়

ইতিহাস পরীক্ষা

সেণ্ট জেরোমের অভিভাবকত্বে ১৬ই এপ্রিল তারিখে আমি জীবনে এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত হলে ঢুকলাম। কায়দাদুরস্ত ফিটনে চেপে আমরা গেলাম। আমি সেই প্রথম একটা ড্রেসকোট পরেছি আর আমার গোটা পোশাকটাই এমন কি তলার জামা মায় মোজা-জোড়া পর্যন্ত আনকোরা নতুন আর দামী কাপড়ে তৈরি। বেয়ারা যখন আমার ওভারকোটটা খুলে নিচ্ছিল, তখন ঐ একদম ঝকঝকে পোশাকে আমার কেমন লজ্জাই হচ্ছিল; কিন্তু পরমুহূর্তেই হলের ভেতর পা দিয়ে চারিদিকে রঙের ছড়াছড়িতে ধাঁধা লেগে গেল। দেখলাম ঘরের মেঝেটা অবধি পালিশ করা চক্‌চকে, লোকজনে গিস্‌গিস্‌ করছে, শ'য়ে শ'য়ে তরুণ ছাত্র ঝক্‌মকে জিম্‌নাসিয়ামের পোশাকে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কয়েকজন নিতান্তই নির্বিকারভাবে আমার দিকে একটু তাকাল মাত্র, ঘরের সেই আরেক দিকে জাঁকালো চেহারার অধ্যাপকেরা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন ছাত্রদের জন্য পাতা বেঞ্চের ভেতরে ভেতরে, অথবা মস্ত মস্ত ইজিচেয়ারে বসে আছেন—নিজের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার আশঙ্কা আমার নিমেষে দূর হল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের ভাবেরও আমূল পরিবর্তন ঘটল—বাড়িতে থাকতে যে মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতে একটা আভিজাত্যের ছাপ পড়েছে, এখন সেই মুখেই দেখা গেল একটা ভীরু ভাব, এমনকি খানিকটা হতাশাও। মনেও অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল; বিশেষ রকম কুৎসিৎ ও নোংরা পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক, ঠিক একেবারে বৃদ্ধ না হলেও চুল প্রায় সবই পেকে উঠেছে, শেষের বেঞ্চিতে অন্য সকলের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে বসে আছেন, দেখে আমি মনে মনে খুবই খুশী হলাম। তখুনি গিয়ে তার পাশে বসে পড়লাম, তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম পরীক্ষার্থীদের আর তাদের হাবভাব। নানা চেহারা, নানা মুখ; কিন্তু আমার তখনকার হিসেবে তাদের তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম দলটায় পড়ছে আমার মত পরীক্ষার্থীরা যারা মাস্টারমশাই কিংবা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছে—এদের দলে দেখলাম আছে ইভিনদের সবচাইতে ছোট ভাই, সঙ্গে পরিচিত হের্ ক্রুস্ট আর ইলেন্‌কা গ্রাপ, বুড়ো বাপের সঙ্গে। এরা চুপচাপ শান্তভাবে বসে আছে, সঙ্গে আনা বই বা খাতার দিকে একটুও তাকাচ্ছে না, বরঞ্চ যেন একটু ভীরু-নয়নে তাকাচ্ছে অধ্যাপকদের দিকে আর পরীক্ষা নেবার টেবিলটার দিকে। দ্বিতীয় দল হচ্ছে তরুণদের, ঝক্‌ঝকে জিমনাসিয়াম পোশাক পরে, বেশীর ভাগেরই মুখে গোঁফের রেখা পড়েছে। এবং অনেকেই পরস্পরের পরিচিত, কথাবার্তা বলছে বেশ জোরে জোরে, অধ্যাপকদের নাম ধরে ধরে উল্লেখ করছে, ওরা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তৈরি করতে শুরু করেছে, বই খাতাপত্র টানাটানি করছে নিজেদের মধ্যে, ডেস্কের মাথায় চড়ে মাঝে মাঝেই প্যাটি, স্যাণ্ডউইচ এসব নিয়ে নিচ্ছে, আবার তখুনি তখুনিই ডেস্কের সামনে মাথা নীচু করে তা খেয়েও নিচ্ছে। শেষের দলটায় যারা আছেন, তাদের সংখ্যা অবশ্য খুব কম, তারা সবাই বৃদ্ধ না হলেও প্রৌঢ়, কয়েকজনের গায়ে ড্রেসকোট, বাকী সকলেই যেমন-তেমন—পোশাকের কোনরকম বাহার নেই কারও। তাদের সকলেরই মুখ গম্ভীর, মনমরাভাবে বসে আছেন একজায়গায়। আমার চাইতেও খারাপ পোশাক-পরা যাঁকে দেখে আমি মনে মনে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম, তিনি এই শেষের দলটিতে পড়েন। ডেস্কের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে, তার ওপর ঝুঁকে বসে এলোমেলো পাকা চুলের ভেতর হাত চালাতে চালাতে একখানা বই পড়ছিলেন, তাঁর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি এক নিমেষের জন্য আমার ওপর পড়ল, সে দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের কোনই ছাপ নেই, আর পরমুহূর্তেই মুখখানা কালো করে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, একটা কনুই আমার দিকে এমনিভাবে বাড়িয়ে দিলেন যেন আমি আর এগুতে না পারি। জিমনাসিযাম ছাত্ররা আবার খুবই পরিচিতের মত ব্যবহার করছে, আমার একটু ভয় করছিল তাদের দেখে। একজন আমার হাতে একখানা বই গুঁজে দিয়ে বলল, "ঐ যে, ওখানে ওকে দিয়ে দাও তো বইটা।" আরেকজন পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল, "ক্ষমা কর, ভাই।" তৃতীয় জন আবার ডেস্কের ওপরে চড়বার সময়ে আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠল, ঠিক যেন আমি একটা বেঞ্চি। বিরক্তিতে আমার মনটা একেবারে বিষিয়ে উঠল, এই জিমনাসিয়াম ছাত্রগুলোর চাইতে আমি নিজেকে বড় মনে করি—আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই করার কি অধিকার ওদের আছে? এর পর নাম ডাক শুরু

হল ; জিমনাসিয়াম ছাত্ররা বেশ সাহসের সঙ্গে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল, বেশীর ভাগই বেশ চটপট জবাব দিয়ে খুশী মনে ফিরে এল। আমাদের দলটা, মনে হল, তার চাইতে ভয়ে ভয়ে যাচ্ছে, পরীক্ষাও ওদের চেয়ে খারাপ দিচ্ছে। বুড়োদের দলে কয়েকজনের জবাব চমৎকার হল, আবার কয়েকজনের অবশ্য খুবই খারাপ হল। "সেমেনভ" বলে যখন ডাক পড়ল : আমার পাশে-বসা সেই ভদ্রলোক, যাঁর চুল সব পাকা আর চোখদুটি জলজলে, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে আমাকে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে, পা মাড়িয়ে দিয়ে হুড়োহুড়ি কোনরকমে গিয়ে দাঁড়ালেন একজন পরীক্ষকের টেবিলের সামনে। পরীক্ষকদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উনি চমৎকার জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। নিজের জায়গায় ফিরে এসে খাতাপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে উনি বেরিয়ে যান, কত নম্বর পেয়েছেন তা জানবার চেষ্টা মাত্র না করে। নাম-ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমি বারকয়েক চমকে চমকে কেঁপে উঠেছি, কিন্তু এখন পর্যন্তও আমার পালা আসেনি। যদিও কে আদ্যাক্ষরের কয়েকটি নামের ইতিমধ্যেই ডাক পড়েছে। হঠাৎ পরীক্ষকদের কোণ থেকে কে একজন হেঁকে উঠল, "ইকোনিন ও তেনিয়েভ।" আমার মাথার চুল থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা কাঁপুনি শিরশির করে নেমে গেল !

"কাকে ডাকা হচ্ছে ? বারতেনিয়েভ কি ?" আমার আশেপাশে সবাই গুজগুজ করতে থাকে।

"যাও, ইকোনিন, তোমাকে ডাকছে, কিন্তু কে এই বারতেনিয়েভ মরডেনিয়েভ কি যেন ?"—একটি লম্বা মতন, গোলাপী রঙের জিম্‌নাসিয়াম দলের ছেলে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে আমাকে ডেকে বলে।

"নিশ্চয়, তোমাকেই ডাকছে," সেণ্ট জেরোম বলেন।

"আমার নাম ইরতেনিয়েভ," গোলাপী রঙের জিম্‌নাসিয়াম ছেলেটিকে আমি বললাম, "ওঁরা কি ইরতেনিয়েভ বলে ডেকেছেন ?"

"হ্যা, হ্যা, কি মুস্কিল, যাচ্ছ না কেন ? হায় ভগবান, কি ফুলবাবু !" খুব জোরে জোরে না বললেও আমি বেঞ্চি থেকে উঠতে উঠতে কথাগুলো স্পষ্টই শুনতে পেলাম।

আমার ঠিক সামনে সামনে এগুচ্ছে ইকোনিন, বয়স বছর পঁচিশেক, আমার হিসেব মত বুড়োরা যে দলে, সেই দলে পড়ে। একটা আঁটসাঁট জলপাই রঙের কোট গায়ে, নীল সাটিনের রুমাল, তার ওপর ঝুলে পড়েছে লম্বা লম্বা পাতলা

চুল, চারদিকে গোল করে কাটা। যখন ডেস্কের সামনে বসেছিলাম তখনই ওর চেহারাটা আমার নজরে পড়েছিল। চেহারাটি বেশ ভাল কিন্তু কথা বলে বেশী। সবচাইতে আমার বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওর লালচে চুল—ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে, আর অনবরত ওয়েস্টকোটের বোতাম খুলে শার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুক চুলকোচ্ছে।

আমি আর ইকোনিন যে টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিনজন অধ্যাপক তার পাশে বসে আছেন। তিনজনের একজনও আমার নমস্কারের জবাব দিলেন না। কনিষ্ঠজন টিকিটগুলো ভাঁজছিলেন তাসের মত, দ্বিতীয় জনের কোটে একটা 'স্টার' তিনি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন জিম্‌নাসিয়াম দলের একজনের দিকে, সে ছোকরা হড়বড় করে "সার্লাহেন" সম্বন্ধে কি সব যেন বলে যাচ্ছিল, প্রতিটি কথার শেষে একবার করে "অবশেষে" যোগ দিচ্ছিল। তৃতীয়জন তিনি বৃদ্ধ, তিনি চশমার ভেতর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে টিকিটগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন! আমার মনে হল যেন ওঁর দৃষ্টিটা আমাকে আর ইকোনিনকে একসঙ্গে বিদ্ধ করছে, আমাদের দেখে যেন কোন কারণে উনি অপ্রসন্ন হয়েছেন (সম্ভবতঃ ইকোনিনের লালচে দাড়ি দেখে) কারণ দ্বিতীয়বারও তিনি ঐ একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু যেন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বুঝিয়ে দিলেন যে টিকিটগুলো আমরা চট্‌পট্‌ বেছে নিচ্ছি না কেন? আমি যেমন বিরক্ত তেমনি অপমানিত বোধ করলুম, কারণ প্রথমত ওঁরা কেউই আমাদের প্রতি নমস্কার জানাননি। দ্বিতীয়ত স্পষ্টতই ওঁরা আমাকেও ইকোনিনের দলের একজন পরীক্ষার্থী বলেই ধরে নিয়েছেন, আর ইকোনিনের লাল্‌চে দাড়ির জন্যে আমার প্রতিও ওঁদের একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছে। ভীরু ভাবটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আমি হাত বাড়িয়ে টিকিটটা তুলে নিয়ে জবাব দিতে তৈরি হলাম, কিন্তু তাকিয়ে দেখি অধ্যাপক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ইকোনিনের দিকে! নিজের টিকিটটা ভাল করে পড়ে দেখলাম জবাবটা আমার জানা, চুপচাপ আমার পালার প্রতীক্ষায় থেকে আশে পাশে কি ঘটছে, লক্ষ্য করতে লাগলাম। ইকোনিন কোন অসুবিধায় পড়েনি, বরঞ্চ তাকে একটু বেশী সাহসীই মনে হল, কারণ হাত বাড়িয়ে টিকিটটা নিতে সে টেবিলের একপাশে বেশ একটু ঝুঁকে পড়ল, মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিল, তারপর এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল টিকিটটা। সে সবে মুখ খুলতে যাচ্ছে এমনি সময় সেই 'স্টার' লাগান অধ্যাপক ভদ্রলোক এতক্ষণে জিম্‌নাসিয়াস্টকে বিদায় করে, ওর

দিকে তাকালেন। ইকোনিনের কি যেন একটা মনে পড়ে গেল, সে থমকে গেল। বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

"বল?" চশমাপরা ভদ্রলোক বললেন।

ইকোনিন আবার মুখ খুলল, কিন্তু চুপ করেই থাকল। "এস, এস। তুমি তো একা নও। প্রশ্নটার কি তুমি জবাব দিতে চাও না কি?" তরুণ অধ্যাপকটি বলে উঠলেন, কিন্তু ইকোনিন তার দিকে তাকিয়েও দেখল না। টিকিটটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চশমাপরা অধ্যাপক ওকে দেখলেন চশমার ভেতর দিয়ে, চশমার ওপর দিয়ে, তারপর চশমা খুলেও—কেননা উনি প্রচুর সময় পেলেন, ধীরেসুস্থে চশমাটি খুললেন, সাবধানে কাঁচদুটি মুছলেন, তারপর আবার তা চোখে পরলেন। ইকোনিন একটা কথাও বললে না। তারপর হঠাৎ ওর মুখ হাসিতে ছেয়ে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিয়ে সোজা টেবিলের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল, অধ্যাপকদের সকলের দিকে পর্যায়ক্রমে একবার করে তাকাল, তারপর আমার দিকে, একবার সকলের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে দিয়ে সোজা পেছন ফিরে নিজের বেঞ্চিতে চলে গেল। অধ্যাপকেরা মুখ চাওয়াচায়ি করলেন।

"হায় ভগবান!" তরুণ অধ্যাপকটি বললেন, "এ দেখছি নিজের টাকায় পড়াশুনা করতে চায়।"

আমি টেবিলের আরও একটু কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু অধ্যাপকেরা তখনও নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন, যেন আমার অস্তিত্বের কথা কেউ জানেনেই না। আমার তখন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওঁরা বলাবলি করছেন আমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারব কিনা আর পরীক্ষার ফল আমার ভাল হবে কিনা, কিন্তু নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্যে ওঁরা ভান করছেন—যেন আমাকে ওঁরা কেউ লক্ষ্যই করেননি, আমার সম্বন্ধে ওঁরা একেবারেই উদাসীন।

চশমাপরা ভদ্রলোক তাই যখন নির্বিকারভাবে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে বললেন আমি তখম সোজা ওঁর চোখের দিকে তাকালাম, ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন বলে ওর জন্যে আমিই লজ্জা বোধ করলাম—আর এই কারণেই প্রশ্নের জবাবটা শুরু করতে গিয়ে প্রথমটায় একটু দ্বিধা করলাম। কিন্তু পরে ক্রমে খুবই সহজ হয়ে গেল আর বিষয়টা ছিল রুশিয়ার ইতিহাস, ওটাতে আমার বেশ দখল আছে—তাই উপসংহার করলুম বেশ চমৎকার ভাবে; এতে নিজের ওপর বিশ্বাস এতই বেড়ে গেল যে আমি ইকোনিন নই, আর ইকোনিনের

সঙ্গে আমাকে এক পর্যায়ে ফেলা একান্তই অসম্ভব এই তথ্যটা আমার অধ্যাপকদের মাথায় ঢোকাতে আমি দ্বিতীয় একখানা টিকিট তুলতেও প্রস্তুত হলাম। কিন্তু অধ্যাপক মশাই মাথা নেড়ে বাধা দিলেন, বললেন, "থাক, ওতেই হবে।" তারপর খাতায় কি যেন সব লিখলেন। বেঞ্চিতে ফিরে আসতে আসতেই জিম্‌নাসিয়াস্টদের কাছে শুনলাম, আমি পুরো নম্বর পেয়েছি। ভগবানই জানেন সঙ্গে সঙ্গেই কোত্থেকে ওরা সব খবর পায়!

একাদশ অধ্যায়

অঙ্ক পরীক্ষা

এর পরের কদিন পরীক্ষায় আমার আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটল—গ্রাপ আর ইভিন ছাড়া। গ্রাপকে আমি পরিচয়ের যোগ্য বলেই মনে করি না, আর ইভিন কেন জানি না আমার সান্নিধ্য এড়িয়েই চলল। কয়েকজন আমাকে দেখলে বন্ধুর মতই সুপ্রভাত জানাত আর ইকোনিন তো আমাকে দেখলে খুবই খুশী হয়ে উঠত, এমনকি আমাকে চুপিচুপি ওর গোপন কথাও জানিয়েছে, যে ইতিহাসে নাকি ওকে আবার পরীক্ষা করা হবে—ঐ ইতিহাসের অধ্যাপকটি নাকি গতবারেও ওকে এমনি ঘাবড়ে দিয়েছিলেন, আর সেই থেকেই ওর ওপর তাঁর একটা বিদ্বেষ ভাব। সেমেনভ আমারই সঙ্গে একসঙ্গে গণিতবিভাগে ভর্তি হতে যাচ্ছে, ও ভয়ানক লাজুক, কারো সঙ্গেই কথাবার্তা বলে না, পরীক্ষার শেষদিনটি পর্যন্ত ঐ একই ভাবে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথার পাকাচুলে হাত চালাতে চালাতে কাটিয়ে দিল। তার পরীক্ষার ফল খুবই ভাল হল দ্বিতীয় স্থান। জিমনাসিয়াম দলের একটি ছেলে প্রথম হল। এই ছেলেটি লম্বা, রোগাটে ভীষণ ফ্যাকাসে, রং ময়লা, গলায় জড়ানো কালো রঙের একটা গলাবন্ধ, কপালটা ঘামাচিতে ভর্তি। হাতদুখানা রোগা লাল্‌চে, আঙুলগুলো মস্ত লম্বা লম্বা, নখগুলো কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করা, দেখলে মনে হয় আঙুলের মাথাগুলো বুঝি সুতো দিয়ে সেলাই করা। আমার কাছে এ সবই খুবই ভাল লাগল—ঠিক যেন জিম্‌নাসিয়ামে প্রথম হওয়া ছেলেরই উপযুক্ত। সে সকলের সঙ্গেই সমানভাবে কথা বলে, এমনকি আমিও ওর সঙ্গে পরিচয় করলাম। আমার মনে হল যেন অভিনবত্ব আছে ওর চেহারা কথাবার্তায়, ওর ঠোঁটদুটিতে ওর কাল চোখের তারায়—চুম্বকের মত যা সবাইকে আকর্ষণ করে।

অঙ্ক পরীক্ষার দিন, একটু তাড়াতাড়িই ডাক পড়ল আমার। বিষয়টা মোটামুটি ভালই জানি, কেবল বীজগণিতের দুটি প্রশ্ন, ওদুটি কি করে যেন মাস্টারমশাইদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম, তাই এ প্রশ্ন

ছুটি সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানি না। যতদূর মনে পড়ছে সে ছুটি ছিল 'থিওরি অব্ কম্বিনেশনস্' ও নিউটনের 'বিনমিয়েল থিয়োরেম।' পেছন দিকে নিজের ডেস্কে বসে এই ছুটো নিয়েই একটু নাড়াচাড়া করছিলুম, কিন্তু একে তো আমার গোলমালের ভেতর পড়াশুনা করার অভ্যেস নেই, তাতে আবার বুঝতে পারছি সময়ে কুলোবে না। তাই যা পড়ছি তাও ঠিক মাথায় ঢুকছে না।

"এই যে পেয়েছি। এদিকে নেখলুইদভ।" আমার পেছনে ভলোদিয়ার চেনা গলা শোনা গেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার ভাই আর দ্‌মিত্রি—কোটের বোতাম খোলা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বেঞ্চির গোলকধাঁধার ভিতর পথ করে করে এগিয়ে আসছে। এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হল না যে ওরা দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়টা ওদের ঠিক নিজেদের বাড়ির মতন। কেবলমাত্র ওই বোতাম খুলে রাখার ব্যাপারটাই আমরা যারা সবে ঢুকতে যাচ্ছি, আমাদের অবজ্ঞা করছে। আমাদের মনে ঈর্ষা ও সম্মান জাগাচ্ছে। চারিদিকে সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে যে দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছুটি ছাত্র আমার বিশেষ পরিচিত, আমার খুব গর্ব হল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম ওদের অভ্যর্থনা জানাতে।

ভলোদিয়া একটু মুরুব্বীয়ানা না দেখিয়ে পারল না; "আহা বেচারী, তোমার কি এখনও পরীক্ষা হয়নি?"

"না।"

"কি পড়ছিলে তুমি? তৈরি করে আসনি?

"হ্যাঁ, কিন্তু এই দুটো প্রশ্ন বুঝতে পারি না।"

"কোনটা? এইটে?" ভলোদিয়া নিউটনের বিনোমিয়েল থিয়োরেম ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে এমনি গোলমেলে ভাবে বলতে থাকে যে আমার চোখে ওর বিদ্যের সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাসের ছায়া ভেসে ওঠে। সেটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় ভলোদিয়া দ্‌মিত্রির দিকে ফিরে তাকায় কিন্তু ওর চোখেও সেই একই অবজ্ঞার আভাস দেখতে পেয়ে লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু তবুও থামে না, যাহোক কিছু বলতে থাকে যদিও তার একবর্ণও আমার মাথায় ঢোকে না।

"না, না ভলোদিয়া, থাম।" আমি একটু বুঝিয়ে দিই ওকে ভাল করে,

হয়তো সময় আছে এখনও।" দ্মিত্রি অধ্যাপকদের দিকে একবার তাকিয়ে আমার পাশে চুপ করে বসে পড়ে।

নেখলুইদভ যখন নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তখন ওর মন একটা চমৎকার শান্তি আর আনন্দের হাওয়ায় দোলে, এখন একচোখ তাকিয়েই বুঝতে পারলাম বন্ধু আমার বর্তমানে সেই মানসিক অবস্থাতে আছে। ঠিক এই অবস্থাতেই আমার সব চাইতে ভাল লাগে ওকে। দ্মিত্রি অঙ্ক খুব ভাল জানত, আর এত চমৎকার করে বুঝিয়ে দিল যে সেটা আমার আজও মনে আছে। ওর কথা শেষ হতে না হতেই সেণ্ট জেরোম ফিসফিস করে বললেন, "এই যে, নিকোলাস, এবার তুমি।" তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ইকোনিনের পিছু চললাম, আরেকটা প্রশ্ন আর দেখবার সুযোগ পেলাম না। টেবিলের পাশে গিয়ে, দাঁড়ালাম, দুজন অধ্যাপক বসে আছেন, আর জিম্‌নাসিয়াম দলের একটি ছেলে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ছেলেটি বেশ জোরে জোরে কি একটা ফর্মূলা আওড়াল, বোর্ডের ওপর খড়িটা ঠুকতে গিয়ে পট্ করে ভেঙ্গে ফেলল, তারপরেও আবার লিখে চলল, পরীক্ষক তখন বাধা দিলেন, বললেন, "হয়েছে, ব্যস্," আর আমাদের টিকিট তোলবার হুকুম দিলেন। নরম নরম টিকিটের স্তূপের ভিতর থেকে টিকিট তুলতে গিয়ে হাত কাঁপতে থাকে, যদি দেখি "থিওরি অব্ কম্বিনেশনস্" উঠেছে? ইকোনিন কিছুমাত্র না ভেবে-চিন্তে সবার ওপরের টিকিটটাই তুলে নিল, সেই আগের দিনের মতই সপ্রতিভ ভাবে, টেবিলের ওপর একপাশে ঝুঁকে পড়ে।

"ওঃ, সব সময়ই আমার সেই একই হতভাগা কপাল," দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে বিড়বিড় করে। নিজের হাতের দিকে তাকালাম।

সর্বনাশ! সেই থিওরি অব্ কম্বিনেশনস্!

"তুমি কি পেলে?" ইকোনিন জানতে চাইল। আমারটা দেখালাম।

"আমি বলি ওটা।" ও বলে।

"বদলে নেবে?"

"নাঃ, আজকে আমার কিছু হবে না, বুঝতে পারছি।" ফিস্‌ফিসানি শেষ হতে না হতেই অধ্যাপক আমাদের ডাক্‌লেন ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে।

"হায় হায়, সব গেল!" আমি ভাবলাম, কোথায় ভাবলাম বেশ ভালভাবে পরীক্ষায় পার হয়ে যাব, তার বদলে কিনা······ছিঃ, ছিঃ কি লজ্জা, এ আর কোনদিন মুছবে না। ইকোনিনের চাইতেও খারাপ ফল হবে। কিন্তু সেই

মুহূর্তেই কি আশ্চর্য, পরীক্ষকদের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে ইকোনিন করল কি, চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার হাতে ওর টিকিটটা গুঁজে দিয়ে, আমারটা ও নিজে টেনে নিল। হাতের টিকিটের দিকে তাকালাম, নিউটনের বিনোমিয়েল থিয়োরেম।

অধ্যাপকের বয়স বেশী নয়, মুখের ভাব কোমল, মমতাময় সুন্দর কপালের নীচের অংশটুকুই যেন মুখে মাধুর্য এনেছে।

"কি ব্যাপার? তোমরা টিকেট বদ্‌লাবদ্‌লি করছ?"

"না। ওরটা আমাকে একটু দেখতে দিয়েছিল, স্যর।" ইকোনিন বানিয়ে বলে দিল। সেদিনও এইটুকু কথাই ওর শেষ কথা। ঐ টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আরেক দিনের মতই আমার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় ও হাসল অধ্যাপকদের দিকে তাকিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি মারল যার মানে "মরুক গে!" (আমি পরে শুনেছিলাম ইকোনিন এই নিয়ে তিনবার পরীক্ষা দিল)।

এইমাত্র শিখে আসা প্রশ্নটার জবাব আমি খুব চমৎকারই দিলাম, পরীক্ষক বললেন যা দরকার তার চাইতেও নাকি ভাল বলেছি—নম্বরও পুরো পেলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

ল্যাটিন পরীক্ষা

ল্যাটিন পরীক্ষা পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই কাটল। এ পর্যন্ত গলাবন্ধ জড়ানো জিম্‌নাসিয়াম ছেলেটিই প্রথম হয়ে এসেছে, সেমেনভ দ্বিতীয়, আমি তৃতীয়।

গোড়া থেকেই দেখেছি সবাই আতঙ্কের সঙ্গে ল্যাটিন পরীক্ষার উল্লেখ করে, ল্যাটিনের অধ্যাপক নাকি একজন আস্ত শয়তান, ছাত্রদের ফেল করিয়ে দেওয়াতেই তাঁর যত আনন্দ—বিশেষত নিজের খরচে পড়ে তাদের, আর ল্যাটিন কিংবা গ্রীক ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথাই বলেন না। সেণ্ট জেরোম আমার ল্যাটিনের মাস্টার—উনি খুব উৎসাহ দিলেন, আমি নিজেও মনে মনে ভাবলুম সিসারো, হোরেস এসব থেকে যখন বিনা অভিধানে অনুবাদ করতে পারি, জুম্‌টও জানি বেশ ভাল—তখন অন্যদের চাইতে নিশ্চয় খারাপ তৈরি হয়নি। কিন্তু কাজের বেলায় কিন্তু ঘটল অন্য রকম। সারাটা সকাল ধরে বসে বসে কেবলি শুনলাম আমার পূর্ববর্তীদের ফেল করার কাহিনী ; একজন শূন্য পেয়েছে, আরেকজন নাকি এক, আরেকজন বকুনি খেয়েছে ভীষণ, প্রায় বারই করে দিয়েছিল তাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেমেনভ আর জিম্‌নাসিয়াম দলের সেই প্রথম মার্কা ছেলেটিই কেবলমাত্র যথারীতি স্বাভাবিক ভাবে পরীক্ষা দিয়ে এল, পুরো নম্বর পেয়ে। আমার মনটা আশঙ্কায় ছেয়ে গেল, একটু পরে ডাক পড়তে ইকোনিনের সঙ্গে গিয়ে ছোট টেবিলটির পাশে দাঁড়ালুম—সামনে বসে আছেন সেই মূর্তিমান বিভীষিকা। দেখতে বেঁটে, রোগাটে, পীতাভ রং, ভদ্রলোকের তেল কুচকুচে লম্বা লম্বা চুল, মুখখানা অতি গম্ভীর।

ইকোনিনকে সিসারোর বক্তৃতাবলীর একখণ্ড দিয়ে অনুবাদ করতে বললেন। দেখে খুবই অবাক হলাম, ইকোনিন বেশ পড়ে গেল খানিকটা এমনকি কয়েক লাইন অনুবাদও করল অধ্যাপকের সাহায্যে। কিন্তু এরপরে যখন "বাক্য বিন্যাসের" পালা এল, ইকোনিনেরও সেই আগেকার তূষ্ণীভাব ফিরে এল। এরকম একজন দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে করে

আমার মুখে একটু ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল। এক ফালি বিদ্রূপাত্মক চতুর হাসি নিয়ে আমি অবশ্য পরীক্ষককে খুশী করতেই চেয়েছিলাম—কিন্তু ফল হল উল্টো!

উনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে ভুল রুশ ভাষায় বললেন, "তুমি যখন হাসছ তখন নিশ্চয় বেশী জান। আচ্ছা দেখা যাবে। এখন এর জবাবটা দাও তো।"

পরে শুনেছিলাম ল্যাটিনের অধ্যাপকই বলতে গেলে ইকোনিনের অভিভাবক এমনকি ইকোনিন ওঁর বাড়িতেই থাকে। ইকোনিনকে করা প্রশ্নটার আমি ঝটপট জবাব দিয়ে দিলাম, কিন্তু ভদ্রলোক কেমন করে যেন গম্ভীর গম্ভীর ভাবে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"আচ্ছা বেশ ভাল। তোমার পালা আসবে, তখন দেখা যাবে, কতটা জান তুমি।" আমার দিকে না তাকিয়ে কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করেই উনি বললেন, তারপর ইকোনিনকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন ওর প্রশ্নটা সম্বন্ধে।

"তুমি এবার যেতে পার," তিনি বললেন, দেখলাম তিনি খাতায় ইকোনিনের পাশে চার নম্বর দিলেন। ভাবলাম কই ভদ্রলোক তো ততটা কঠোর নন। ইকোনিনের বিদায়ের পর ভদ্রলোক বই টিকিট সব গুছিয়েগাছিয়ে রাখলেন, নাক ঝাড়লেন তারপর চেয়ারটা সরিয়ে, তাতে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলেন, ঘরটার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, সবদিকেই তাকালেন কেবল আমার দিকে বাদে—হয়তো মোটে পাঁচ মিনিট, কিন্তু আমার মনে হল যেন কত যুগ! এতেও ছলনার শেষ হল না, এবারে তিনি একখানা বই খুলে পড়তে শুরু করলেন; যেন আমার কোনও অস্তিত্বই নেই। আমি এক পা এগিয়ে গিয়ে একটু কাশলাম।

"ওঃ, হ্যাঁ। তুমি আছ। আচ্ছা, কিছু অনুবাদ কর তো এ থেকে।" আমার হাতে একখানা বই দিলেন, . "না, ওখানা থাক্, এখানা নাও।" আরেকখানা বই তুলে নিলেন, এখানা হোরেস, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা পংক্তি বার করে দিলেন, আমার দেখে মনে হল সেটা বোধহয় কোনও মানুষেই অনুবাদ করতে পারে না।

"এটা আমি তৈরি করিনি।" আমি বললাম।

"ওঃ, তুমি যা শিখে এসেছ, সেটাই মুখস্থ বলতে চাও, কেমন? না, তা হবে না। এটা অনুবাদ কর।"

কোনোমতে মোটামুটি মানেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু ভদ্রলোক প্রতিবারই মাথা নেড়ে সংক্ষেপে বলতে লাগলেন, 'না'—সঙ্গে সঙ্গে একটা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস। তারপর একসময় ঝট্ করে বইটা বন্ধ করে দিলেন, এত তাড়াতাড়ি যে আঙুলটা ভেতরেই রয়ে গেল। রেগেমেগে সেটা টেনে বার করে আমাকে একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন দিলেন, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে কিরকম একটা বিদ্বেষ ভাব নিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন। আমি জবাবটা দিতে যাচ্ছিলুম ; কিন্তু ওঁর মুখের ভাবটা যেন গলা চেপে ধরল, মনে হল বোধহয় এর আগে যা বলেছি তা সবই ভুল।

"কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছুই হয়নি বুঝলে ?" একটু পরে হঠাৎ ভঙ্গিটা বদলে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাতের একটা আঙুলে ঢিলেভাবে পরানো সোনার আংটিটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলতে থাকেন, "শক্ত কোনও পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়ার রীতি এটা না, বুঝলে হে ? তোমার নজর হচ্ছে কেবল ঐ নীল রঙের কলার-দেওয়া ইউনিফর্মটার দিকে, সামান্য একটু ছিটেফোঁটা ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে নিজেকে ছাত্র বলে গর্ব করতে চাও, কেমন ? না মশাই, তা হবে না। ভিতটা বেশ শক্ত করে গড়তে হবে, বুঝলে ?" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ওঁর এই ভাঙা ভাঙা কথায় গোটা বক্তৃতাটার সময়ে আমি সোজা ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, আর উনি তাকিয়েছিলেন নীচে মেঝের দিকে। প্রথমটায় আমি তৃতীয় স্থান পাব না মনে হতেই মনটা মুচড়ে উঠল, তারপর আতঙ্ক জাগল যদি পরীক্ষায় একেবারে পাশই না করি, সবশেষে তার সঙ্গে যোগ হল অন্যায় ব্যবহারের জন্য একটা ক্ষোভ ; আহত অহঙ্কার আর অপমানের বেদনা। বিশেষ করে অধ্যাপক ভদ্রলোকের ওপর ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল সারা মন। উনি আমার দিকে তাকালেন ; আমার ঠোঁট দুটি কাঁপছে ; চোখ জলে ভরে এসেছে দেখে নিশ্চয়ই মনে করলেন এটা আমার নম্বর বাড়াবার আবেদন, তাই যেন করুণা করেই বল্লেন (তাও আবার আরেকজন অধ্যাপকের সামনে, যিনি এইমাত্র এসেছিলেন) :

"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। যদিও তুমি যোগ্য নও, তবুও ছেলেমানুষ, তাই পাশ নম্বর দিয়ে দেব। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে তোমার মাথায় গোবর পোরা থাকবে না।"

নতুন একজন অধ্যাপকের সামনে এই শেষোক্তিটাই আমাকে অপমানের

চূড়ান্ত করে ছাড়ল : মুহূর্তের জন্য চোখ ঝাপসা হয়ে এল, মনে হল যেন মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে ভদ্রলোক টেবিল নিয়ে বসে আছেন অনেক দূরে, মাথায় দপ্ দপ্ করতে লাগল একটিমাত্র চিন্তা, "যদি আমি—কি হয় যদি আমি······?" কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক্ তা করলাম না, বরঞ্চ যান্ত্রিকভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে দুজন অধ্যাপককেই বিশেষ নম্রভাবে নমস্কার জানিয়ে টেবিল ছেড়ে চলে এলাম, মুখে সামান্য একটু হাসি, বোধহয় ইকোনিনের মুখে যেমন দেখেছিলাম তেমনি।

সেদিনের অন্যায় ব্যবহারে এতই মর্মাহত হলাম যে নিজের ওপর আমার যদি কর্তৃত্ব থাকত, তাহলে এর পরে আর আমি পরীক্ষাই দিতাম না। আমার সব গর্ব নষ্ট হল (তৃতীয় স্থান তো আর পাব না), পরের পরীক্ষাগুলো কোনোমতে একটার পর একটা পার করে দিলাম, আমার তরফে বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা উত্তেজনা রইল না। সব মিলিয়ে আমার নম্বর চতুর্থ জনের চাইতে সামান্য কিছু বেশি ছিল ; কিন্তু আমার আর তাতে কিছুই যায়-আসে না। আমি মনস্থির করে ফেললাম, মনকেও বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিলাম প্রথম হওয়ার চেষ্টা করাটাই ভারী বিচ্ছিরি, ঠিক হচ্ছে বেশি ভালও হবে না, খুব খারাপও হবে না, এই মাঝামাঝি থাকবে, কি ধর এই ভলোদিয়ার মত। বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি এই নীতিই মেনে চলব ঠিক করলাম—এই বোধহয় প্রথম আমার বন্ধু দ্‌মিত্রির সঙ্গে মতের অমিল ঘটল।

আসলে যেটার কথা ভাবছিলাম সেটা হচ্ছে আমার ইউনিফর্ম, তিনকোণা টুপি, আমার নিজের দ্রস্‌কি, নিজের ঘর আর সবার ওপরে আমার স্বাধীনতা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আমি সাবালক

এই ধরনের চিন্তাগুলোরও নিজস্ব একটা মাধুর্য ছিল।

৮ই মে তারিখে ধর্মবিষয়ক শেষ পরীক্ষা দিয়ে আমি বাড়িতে ফিরে এসে দেখি রোসানভ দরজির বাড়ি থেকে একটি লোক এসে বসে আছে। একে আমি চিনি, আরেকদিন ওকে ডাকা হয়েছিল: আমার ইউনিফর্মটা ঠিক করতে দিয়েছিলাম আর তৈরি করতে দিয়েছিলাম একটা কালো চকচকে কোট, বুকখোলা। বুকের ভাঁজের জায়গাটা চক দিয়ে দাগ মেরে নিয়েছিল—আজ সে তৈরি পোশাক নিয়ে এসেছে: ঝকঝকে গিল্টি-করা বোতাম একটা কাগজে মুড়ে।

কোটটা পরলাম। আমার তো খুব পছন্দ; (অবশ্য সেণ্ট জেরোম বললেন, ওটা পেছনের দিকে একটু ঢিলে) সেটা পরে খুব খুশি মনে ভলোদিয়াকে খুঁজতে নীচে নেমে গেলাম; ভেতরের আনন্দটা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা হাসির আভা হয়ে মুখে-চোখে ছড়িয়ে পড়ছে। আশপাশ থেকে চাকরবাকরেরা স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছে বেশ বুঝতে পারছি: কিন্তু ভান করছি যেন কিছু নয়। হলের ভেতর বাবুর্চি গ্যাডরিলো এসে আমাকে ধরল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার জন্যে অভিনন্দন জানাল, তারপর বাবার আদেশমত চারখানা পঁচিশ রুবলের নোট হাতে দিয়ে জানাল আজ থেকে একটা ড্রসকি, বাদামী রঙের ঘোড়া "বিউটি" আর কোচোয়ান "কুজমা" কেবলমাত্র আমারই কাজে লাগবে। অপ্রত্যাশিত এই খবরে আমার মন আনন্দে নেচে উঠল, অনেক চেষ্টা করেও গ্যাডরিলোর কাছে আর উদাসীন ভাবটা বজায় রাখা গেল না—আনন্দে মেতে প্রথমে যে কথাটা মনে এল সেটাই বলে ফেললাম; বললাম, বিউটি চমৎকার দৌড়তে পারে। পাশের ছোট্ট ঘরটার আর বারান্দা যাবার দরজা ফাঁক করে বাকি সব মাথাগুলো উঁকিঝুঁকি মারছে দেখে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না—ঝক্‌ঝকে বোতাম-বসানো নতুন কোট পরে হলের ভেতর দিয়ে দৌড়

লাগালাম। ভলোদিয়ার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ডুবকভ আর নেখলুইদভের গলা শুনতে পেলাম ; আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে ; ওদের ইচ্ছে আজকের দিনটিতে উৎসব পালনের জন্য আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে ডিনার আর শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা করি। দ্মিত্রি বলল ওর যদিও শ্যাম্পেন-ট্যাম্পেন চলে না, তবুও আজকের দিন ও নিশ্চয় যাবে আমাদের সঙ্গে—আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার গোড়াপত্তন হবে আজ এই শ্যাম্পেনের মাধ্যমে। ডুবকভ সবাইকে বলল আমাকে নাকি দেখতে ঠিক কর্ণেলের মত লাগছে। ভলোদিয়া আমাকে কোনোরকম অভিনন্দন জানাল না, কেমন যেন নীরসভাবে কেবল বলল, 'আমরা তাহলে পরশুদিনই গ্রামে রওনা হতে পারি'। আমার মনে হল আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাতে ও খুশি হয়েছে বটে তবুও ওরই মত আমিও সাবালক হয়ে গেলাম, এ চিন্তাটাই যেন কোথায় ওকে বিঁধছে। সেণ্ট জেরোমও বাড়ি এসেছেন, গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে উনি সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন—আর কি ? তাঁর কাজ এবারে শেষ, ভালভাবে করেছেন কি করেননি তা জানেন না, শুধু জানেন তাঁর যথাসাধ্য তিনি করেছেন, আগামীকালই তিনি চলে যাবেন নতুন কাউণ্টের কাছে। আমাকে যে যাই বলছে, জবাবে শুধু আমার ঠোঁটে ভেসে উঠছে একটুকরো খুশি-খুশি একটু বোকা-বোকা ধরনের হাসি ; ইচ্ছে থাকলেও এ হাসি মুছতে পারছি না, আর দেখতে পাচ্ছি যারা আমার কাছে আসছে তাদের ঠোঁটে এ-হাসি সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব এতদিনে আমি সেণ্ট জেরোমের হাত থেকে মুক্তি পেলাম, আমার দখলে নিজস্ব একটা দ্রস্কি ; ছাত্রদের খাতায় আমার নাম, কোমরে ছোরা ঝোলান, প্রহরীরা হয়তো মাঝে-সাঝে সেলাম ঠুকবে। আমি সাবালক, আঃ কি আনন্দ !

ঠিক হল "ইয়ারে" পাঁচটার সময় সবাই ডিনার খাব। ভলোদিয়া ডুবকভের সঙ্গে কোথায় চলে গেল, দ্মিত্রিও তার নিজস্ব ধরনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, বলে গেল ডিনারের আগে কি-একটা বিশেষ দরকারী কাজ আছে—কাজেই আমার হাতে দুটি ঘণ্টা সময় ইচ্ছেমতন কাটাতে পারি। অনেকক্ষণ ধরে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালাম, প্রতিটি আয়নায় ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখলাম, কখনও কোটের ঝকঝকে বোতামগুলো সব লাগিয়ে, কখনও সবগুলো খুলে ফেলে আবার কখনো বা শুধু ওপরের বোতামটি আটকে—কি চমৎকার যে দেখতে লাগল নিজেকে ! ভেতরের আনন্দটা এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছে দেখে মনে মনে খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম ; কিন্তু তবুও পারলাম না, শেষপর্যন্ত গিয়ে হাজির হলাম

আস্তাবলে আমার দ্রস্‌কি, কুজমা আর বিউটিকে দেখতে ; আবার ফিরে গেলাম, এ-ঘরে সে-ঘরে পায়চারি করতে করতে আপন মনেই হেসে হেসে আয়নায় মুখ দেখি আর পকেটের টাকা গুনে গুনে সময় কাটাতে লাগলাম। কিন্তু এভাবে ঘণ্টা খানেক কাটতে না কাটতেই একঘেয়েমিতে বিরক্তি এল, মনে হল দূর ছাই, ধারে-কাছে কেউ একজনও নেই যে আমার এমন ঝকমকে পোশাকটা দেখে। এমনি চুপচাপ আর ভাল লাগছে না, কি করি, কি করি করে শেষপর্যন্ত দ্রস্‌কিটাই জুততে বললাম, ঠিক করলাম সবচাইতে ভাল হবে কুজনেস্তকি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করে আনা।

মনে পড়ল ভলোদিয়া যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকল সেদিন সে কিনেছিল ভিক্টর আদামের ঘোড়ার ছবি, কিছু তামাক, একটা পাইপ। অতএব আমার তো এগুলো কিনতেই হয় !

ঘোড়া ছুটল টগবগ করে কুজনেস্তির দিকে, পথের দুধারে সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সূর্যের ছটায় জলজ্বল করছে আমার ঝকঝকে বোতাম, ছোরা আর টুপিতে বসানো রিবন। দাতসিয়ারোর ছবির দোকানে এসে থামলাম। চারধার চেয়ে-দেখে ভেতরে ঢুকলাম। ভিক্টর আদামের ঘোড়ার ছবি কিনতে ইচ্ছে নেই—পাছে লোকে বলে ভলোদিয়াকে নকল করছি। আবার বেশি বাছাবাছি করতেও লজ্জা করল, দোকানদার বেচারীর কষ্ট হবে, তাই তাড়াতাড়িতে বেছে নিলাম জল রঙে-আঁকা জানালার কাছে-দাঁড়ানো একটি মেয়ের মাথা, এটার জন্য দিতে হল কুড়ি রুবল। কুড়ি রুবল খরচ করে ফেলার পরেও মনে কেমন একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে, এই সামান্য কটা টাকার জিনিস কিনে কিনা সুন্দর সাজগোজ-করা দুজন দোকানদারকে খাটালাম। আর তাছাড়া ওরা যেন কেমন উপেক্ষার দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমার আসল মূল্যটা ওদের বোঝাতে এবার আমি কাচের নীচে-বসানো ছোট্ট একটা রুপোর পেন্সিলদানীর দিকে নজর দিলাম ; আঠারো রুবল দাম শুনে ওটা বেঁধেছেদে দিতে বলে দাম চুকিয়ে দিলাম তারপর পাশের দোকানেই ভাল তামাক আর পাইপ পাওয়া যায় শুনে দোকানদার দুজনকে নমস্কার জানিয়ে বগলে ছবির প্যাকেটটি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। পাশের দোকানের সামনে আঁকা একটি নিগ্রো পাইপ টানছে—ওখানে ঢুকে কিনলাম সুলতান তামাক (অন্যদের মত দেখাদেখি জুকভ তামাক নয়), একটা টাকিশ পাইপ, দুটো চুবুক—একটা গোলাপ কাঠের, আরেকটা লিণ্ডেন কাঠের।

লাগালাম। ভলোদিয়ার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ডুবকভ আর নেখলুইদভের গলা শুনতে পেলাম ; আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে ; ও'দের ইচ্ছে আজকের দিনটিতে উৎসব পালনের জন্য আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে ডিনার আর শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা করি। দমিত্রি বলল ওর যদিও শ্যাম্পেন-ট্যাম্পেন চলে না, তবুও আজকের দিন ও নিশ্চয় যাবে আমাদের সঙ্গে—আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার গোড়াপত্তন হবে আজ এই শ্যাম্পেনের মাধ্যমে। ডুবকভ সবাইকে বলল আমাকে নাকি দেখতে ঠিক কর্ণেলের মত লাগছে। ভলোদিয়া আমাকে কোনোরকম অভিনন্দন জানাল না, কেমন যেন নীরসভাবে কেবল বলল, 'আমরা তাহলে পরশু-দিনই গ্রামে রওনা হতে পারি'। আমার মনে হল আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাতে ও খুশি হয়েছে বটে তবুও ওরই মত আমিও সাবালক হয়ে গেলাম, এ চিন্তাটাই যেন কোথায় ওকে বিঁধছে। সেণ্ট জেরোমও বাড়ি এসেছেন, গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে উনি সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন—আর কি? তাঁর কাজ এবারে শেষ, ভালভাবে করেছেন কি করেননি তা জানেন না, শুধু জানেন তাঁর যথাসাধ্য তিনি করেছেন, আগামীকালই তিনি চলে যাবেন নতুন কাউণ্টের কাছে। আমাকে যে যাই বলছে, জবাবে শুধু আমার ঠোঁটে ভেসে উঠছে একটুকরো খুশি-খুশি একটু বোকা-বোকা ধরনের হাসি ; ইচ্ছে থাকলেও এ হাসি মুছতে পারছি না, আর দেখতে পাচ্ছি যারা আমার কাছে আসছে তাদের ঠোঁটে এ-হাসি সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব এতদিনে আমি সেণ্ট জেরোমের হাত থেকে মুক্তি পেলাম, আমার দখলে নিজস্ব একটা ড্রস্‌কি ; ছাত্রদের খাতায় আমার নাম, কোমরে ছোরা ঝোলান, প্রহরীরা হয়তো মাঝে-সাঝে সেলাম ঠুক্‌বে। আমি সাবালক, আঃ কি আনন্দ!

ঠিক হল "ইয়ারে" পাঁচটার সময় সবাই ডিনার খাব। ভলোদিয়া ডুবকভের সঙ্গে কোথায় চলে গেল, দমিত্রিও তার নিজস্ব ধরনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, বলে গেল ডিনারের আগে কি-একটা বিশেষ দরকারী কাজ আছে—কাজেই আমার হাতে দুটি ঘণ্টা সময় ইচ্ছেমতন কাটাতে পারি। অনেকক্ষণ ধরে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালাম, প্রতিটি আয়নায় ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখলাম, কখনও কোটের ঝকঝকে বোতামগুলো সব লাগিয়ে, কখনও সবগুলো খুলে ফেলে আবার কখনো বা শুধু ওপরের বোতামটি আটকে—কি চমৎকার যে দেখতে লাগল নিজেকে! ভেতরের আনন্দটা এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছে দেখে মনে মনে খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম ; কিন্তু তবুও পারলাম না, শেষপর্যন্ত গিয়ে হাজির হলাম

আস্তাবলে আমার ড্রস্কি, কুজমা আর বিউটিকে দেখতে ; আবার ফিরে গেলাম, এ-ঘরে সে-ঘরে পায়চারি করতে করতে আপন মনেই হেসে হেসে আয়নায় মুখ দেখি আর পকেটের টাকা গুনে গুনে সময় কাটাতে লাগলাম। কিন্তু এভাবে ঘণ্টা খানেক কাটতে না কাটতেই একঘেয়েমিতে বিরক্তি এল, মনে হল দূর ছাই, ধারে-কাছে কেউ একজনও নেই যে আমার এমন ঝকমকে পোশাকটা দেখে। এমনি চুপচাপ আর ভাল লাগছে না, কি করি, কি করি করে শেষপর্যন্ত ড্রস্কিটাই জুততে বললাম, ঠিক করলাম সবচাইতে ভাল হবে কুজনেস্তকি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করে আনা।

মনে পড়ল ভলোদিয়া যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকল সেদিন সে কিনেছিল ভিক্টর আদামের ঘোড়ার ছবি, কিছু তামাক, একটা পাইপ। অতএব আমার তো এগুলো কিনতেই হয়!

ঘোড়া ছুটল টগবগ করে কুজনেস্তির দিকে, পথের দুধারে সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সূর্যের ছটায় জলজল করছে আমার ঝকঝকে বোতাম, ছোরা আর টুপিতে বসানো রিবন। দাতসিয়ারোর ছবির দোকানে এসে থামলাম। চারধার চেয়ে-দেখে ভেতরে ঢুকলাম। ভিক্টর আদামের ঘোড়ার ছবি কিনতে ইচ্ছে নেই—পাছে লোকে বলে ভলোদিয়াকে নকল করছি। আবার বেশি বাছাবাছি করতেও লজ্জা করল, দোকানদার বেচারীর কষ্ট হবে, তাই তাড়াতাড়িতে বেছে নিলাম জল রঙে-আঁকা জানালার কাছে-দাঁড়ানো একটি মেয়ের মাথা, এটার জন্য দিতে হল কুড়ি রুবল। কুড়ি রুবল খরচ করে ফেলার পরেও মনে কেমন একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে, এই সামান্য কটা টাকার জিনিস কিনে কিনা সুন্দর সাজগোজ-করা দুজন দোকানদারকে খাটালাম। আর তাছাড়া ওরা যেন কেমন উপেক্ষার দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমার আসল মূল্যটা ওদের বোঝাতে এবার আমি কাচের নীচে-বসানো ছোট্ট একটা রুপোর পেন্সিলদানীর দিকে নজর দিলাম ; আঠারো রুবল দাম শুনে ওটা বেঁধেছেদে দিতে বলে দাম চুকিয়ে দিলাম তারপর পাশের দোকানেই ভাল তামাক আর পাইপ পাওয়া যায় শুনে দোকানদার দুজনকে নমস্কার জানিয়ে বগলে ছবির প্যাকেটটি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। পাশের দোকানের সামনে আঁকা একটি নিগ্রো পাইপ টানছে—ওখানে ঢুকে কিনলাম সুলতান তামাক (অন্যদের মত দেখাদেখি জুকভ তামাক নয়), একটা টাকিশ পাইপ, দুটো চুবুক—একটা গোলাপ কাঠের, আরেকটা লিণ্ডেন কাঠের।

দোকান থেকে নেমে ড্রস্‌কির কাছে যেতে যেতে দেখি রাস্তার একপাশ দিয়ে সাধারণ পোশাকে সেমেনভ তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে কি—যেন ভাবতে ভাবতে মাথা নীচু করে। আমায় চিনতে পারল না দেখে বড় রাগ হল। ড্রস্‌কিতে চেপে জোরে হেঁকে বললাম, "এই চালাও", তারপর গিয়ে ধরলাম সেমেনভকে।

"কেমন আছ ?" ডেকে বলি।

"নমস্কার।" যেতে যেতেই ও জবাব দিল।

"ইউনিফর্ম পরনি কেন ?" আবার জিজ্ঞেস করি।

সেমেনভ থেমে গেল, ভুরু কুঁচকে সাদা সাদা দাঁতগুলো একটু বার করে তাকাল যেন সূর্যের দিকে। তাকাতে ওর চোখে লাগছে আসলে কিন্তু ও আমার ইউনিফর্ম আর ড্রস্‌কির প্রতি অবজ্ঞা জানাল, একটুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ও নিজের পথ ধরল।

কুজনেভ্‌স্কি বাজার থেকে রডারস্কাম্যাতে একটা খাবারের দোকানে ঢুকি ; যদিও ভাব দেখালাম যেন খবরের কাগজটার প্রতিই আমার আসল মনোযোগ, ওদিকে কাজের বেলায় কিন্তু একটার-পর-একটা কেক ধ্বংস করে যাচ্ছিলাম। কয়েকজন ভদ্রলোক খবরের কাগজের আড়াল থেকে খুব কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছেন দেখে আমার খুব লজ্জা করছিল, তবুও চট্‌পট একটা একটা করে আটটা কেক শেষ করলাম।

বাড়িতে ফিরে এসে যেন একটু বুকের ব্যথা বোধ করলাম কিন্তু তা উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কি কেনাকাটা করে এনেছে তাই দেখতে। ছবিটা দেখে এত বিচ্ছিরি লাগল যে ভলোদিয়ার মত বাঁধিয়ে ঘরে টাঙানো দূরে থাকুক পাছে কেউ দেখতে পায় সে ভয়ে একটা বাক্সে কাগজের ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখলাম। পেন্সিল-দানীটাও বিশেষ পছন্দ হল না। তবুও ওটা টেবিলের ওপর রেখে মনকে সান্ত্বনা দিলাম। আর যাই হোক জিনিসটা রুপোর, কাজেই দামী আর ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ দরকারী।

তামাক আর পাইপটা সম্বন্ধে অবশ্য ঠিক করলাম হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। চার আউন্সের একটা প্যাকেট খুলে সাবধানে টার্কিশ পাইপের মুখে লাল্‌চে হলুদ রঙের সুগুর কাটা সুলতান তামাক ভরে নিলাম, তার ওপরে এক টুকরো জলন্ত কাঠ কয়লা দিয়ে, আমার তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুলের মাঝখানে পাইপের গোড়াটা ধরে টানতে শুরু করলাম।

তামাকের গন্ধটা ভারী মিষ্টি, স্বাদ কটু, আর ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে এল।

তবুও অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে সহ্য করলাম, পাইপ টেনে টেনে ধোঁয়ার রিং বার করতে লাগলাম। হালকা নীলচে ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই হয়ে গেল, পাইপ থেকে খালি শব্দ বার হচ্ছে ভুর-র-র-র, ভু-র-র। আমার মুখে কেমন-একটা কটু স্বাদ, মাথাটা অল্প অল্প ঘুরছে। পাইপ হাতে কেমন দেখাচ্ছে দেখতে উঠে আয়নার কাছে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে অবাক হই আমার পা টলছে, ঘরটা যেন অল্প অল্প দুলছে, অনেক কষ্টে কোনোমতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখি মুখখানা কাগজের মতন সাদা। টলতে টলতে কোনোমতে এসে সোফায় এলিয়ে পড়লাম, ভয়ঙ্কর অসুস্থ আর দুর্বল বোধ হল, ভাবলাম তামাকটা মারাত্মক হয়েছে আমার পক্ষে, আমি বোধ হয় মরেই যাচ্ছি। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, কারুর সাহায্যের জন্য, ডাক্তার ডাকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

কিন্তু এই আতঙ্কটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, বেশ বুঝতে পারলাম গোলমালটা কোথায় হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ সোফায় শুয়ে থাকলাম, দুর্বল, মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা, চোখের পলক না ফেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, তামাকের প্যাকেটটার ওপরের ছবি আর ধূমপানের নানা সাজ-সরঞ্জামের দিকে, মেঝেতে ছড়ানো কেকের টুকরোগুলোর দিকে, আর বিষণ্ণ মনে ভাবছি, অন্যদের মতন যদি পাইপ টানতেই না পারলাম, তবে আর আমি সাবালক হলাম কি করে? বেশ বুঝতে পারছি অন্যদের মতন মাঝের আর তৃতীয় আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে পাইপ টানা, ধোঁয়াটা গিলে ফেলে আবার গোঁফের পাশ দিয়ে বার করে দেওয়া—এসব কসরত আমার জন্যে নয়।

দ্‌মিত্রি যখন পাঁচটার সময় আমাকে ডাকতে এল, এসে দেখল আমার এই অবস্থা। কিন্তু এক গ্লাস জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে ওর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

"তোমার আবার পাইপ টানবার শখ হল কেন?" আমার তামাক টানার নানা চিহ্ন লক্ষ্য করতে করতে দ্‌মিত্রি জিজ্ঞাসা করে, "একেবারে বাজে জিনিস। পয়সার শ্রাদ্ধ। আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে কখনও ধূমপান করব না। খুব হয়েছে, এখন ওঠ তো—তাড়াতাড়ি কর, ভুবকভকে তুলে নিতে হবে।"

চতুর্দশ অধ্যায়

ভলোদিয়া আর ডুবকভ কি করত

দ্‌মিত্রি ঘরে ঢুকতেই বুঝতে পারলাম ওর মেজাজটা বেজায় তিরিক্ষে—সেই চোখ পিটপিট করা আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে একদিকে মাথা ঝাঁকানো, অর্থাৎ নিজের ওপর রাগ হলে ওর যেরকম একটা গোঁয়ারগোবিন্দ ভাব হয়। এমনি মেজাজ দেখলে আমিও ভীষণ দমে যাই। সম্প্রতি আমি বন্ধুকে বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করতে আর তার চরিত্রের বিচার করতে শুরু করেছিলাম, অবশ্য তাতে আমাদের বন্ধুত্বে কোথাও ফাটল ধরেনি ; এখনও সেটা এতই গাঢ় যে যেদিক থেকেই দেখি না কেন দ্‌মিত্রির গুণই চোখে পড়ে। ওর ভেতর পাশাপাশি বাস করে স্পষ্ট দুটো লোক ; একজন চমৎকার বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, হাসিখুশি—একেই আমি ভীষণ ভালবাসি, সেও নিজের এই সব গুণ সম্বন্ধে সচেতন, মনের এই অবস্থায় যখন সে থাকে তার কথা, হাসি, প্রতিটি ভঙ্গিতেই সে ভাব ফুটে ফুটে বেরোয় ; দ্বিতীয় মানুষটিকে আমি সম্প্রতি চিনতে শুরু করেছি, তার বিশালতার কাছে মাথা নত করছি—সে হচ্ছে কঠিন, উদাসীন, নিজের এবং অপরের সম্বন্ধে কঠোর, গর্বিত, ধর্মান্ধ এবং নীতিবাগীশ। বর্তমান মুহূর্তে দ্‌মিত্রি সেই দ্বিতীয়জন।

আমাদের বন্ধুত্বের নিয়মানুযায়ী গোপনতা বলে কিছু নেই, তাই দ্রস্‌কিতে বসে খোলাখুলি ওকে বললাম আজ আমার জীবনের একটা বিশেষ আনন্দের দিন, স্মরণীয় দিন, আর আজকের দিনেই কিনা ওর মন এত অপ্রসন্ন, মুখ এত ভার।—এটা সত্যি ভারী দুঃখের কথা।

"নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে তোমার। আমাকে বলবে না কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

কেমন একটু ঘাবড়ে-যাওয়াভাবে দ্‌মিত্রি ঘাড়টা একদিকে হেলাল, গালটাও অল্প অল্প কাঁপছে, সে বলল, "নিকোলেঙ্কা, আমি যখন কথা দিয়েছি কিছু লুকোব না তোমার কাছে, তখন আমার কোনও গোপন কথা আছে বলে সন্দেহ করবার কারণ নেই। কিন্তু সব সময় কি মানুষের মনের অবস্থা একই রকম থাকতে পারে? যদি কিছু ঘটেই থাকে, তবে আমার নিজের কাছেও সেটা খুব স্পষ্ট নয়।"

"কি সুন্দর, অকপট মন, চমৎকার লোক সত্যি!" মনে মনে ভাবলাম, আর কিছু বললাম না।

এর পর ডুবকভের বাড়ি পর্যন্ত চুপচাপ গেলাম। ডুবকভের বাড়ি চমৎকার সাজানো, অন্ততঃ আমার তখন তাই মনে হয়েছিল। চারিদিকে গাল্‌চে, ছবি, সুন্দর সুন্দর রঙীন পর্দা, মানুষের প্রতিকৃতি আর আরাম-কেদারার ছড়াছড়ি। দেয়ালে ঝুলছে বন্দুক, পিস্তল, তামাকের থলি আর কয়েকটা জানোয়ারের মাথা কার্ডবোর্ডে বসানো। সম্প্রতি ভলোদিয়া তার পড়ার ঘর সাজাতে কাকে নকল করার চেষ্টা করছে—ডুবকভের এই পড়ার ঘরটা দেখে আজ তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। ভলোদিয়া আর ডুবকভ দুজনে বসে তাস খেলছে, দেখলাম। আর একজন অচেনা ভদ্রলোক (বিনীত ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় লোকটির নিশ্চয় বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই) টেবিলে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের খেলা লক্ষ্য করছেন। ডুবকভের গায়ে সিল্কের একটা ড্রেসিং-গাউন, পায়ে একজোড়া নরম চটি। ভলোদিয়া শার্ট গায়ে ওর উল্টো দিকে একটা কৌচে বসে। ভলোদিয়ার মুখখানা উত্তেজনায় লাল, খেলতে খেলতে মুখ তুলে নিমেষের জন্য একটিবার মাত্র তাকাল আমাদের দিকে, বোঝা গেল খেলায় মেতে আছে। আমাদের দেখে মুখখানা ওর আরও লাল হয়ে উঠল।

"এস, এবার তোমার পালা," ডুবকভকে ডেকে বলে। বুঝতে পারলাম তাস খেলা দেখে ফেলেছি বলে ভলোদিয়া চটেছে। তাই বলে ও তাতে কিছুমাত্র মুস্কিলে পড়েছে এমন কোনও ইঙ্গিত ওর হাব-ভাবে নেই, ওর দৃষ্টি যেন আমাকে ডেকে বলছে, "হ্যাঁ, আমি খেলছি তো হয়েছে কি? তুমি নেহাতই একটি নাবালক, তাই অবাক হচ্ছ। কিছু দোষ নেই এতে—বরঞ্চ আমাদের বয়সে এটা দরকারী।"

সেই মুহূর্তে আমি যেন এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

তাস ভাঁজা রেখে ডুবকভ আপাতত উঠে পড়ল, আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে দিল। পাইপ দিতে চাইলে আমরা অস্বীকার করলাম।

"এই যে আমাদের ডিপ্লোম্যাট এসেছে—আজকের দিনের নায়ক"—ডুবকভ বলে, "সত্যি বলছি, তোমাকে একেবারে হুবহু কর্নেলের মত দেখাচ্ছে।"

"হু-ম্", আমার মুখ দিয়ে অর্থহীন একটা আওয়াজ বেরোল বুঝতে পারলাম, নির্বোধ একটা তৃপ্তির হাসি আবার আমার মুখে ফুটব-ফুটব করছে।

ডুবকভ সম্বন্ধে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, আপ্লুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা ষোল

বছরের ছেলের পক্ষেই বোধহয় এভাবে মোহিত হওয়া সম্ভব একটি সাতাশ বছরের ছেলেকে নিয়ে—যে সেনাবাহিনীতে কাজ করেছে, গুরুজনদের মতে অতি চমৎকার ছেলে, নাচে ওস্তাদ, ফরাসীতে কথা বলে চমৎকার আর যদিও মনে মনে ছেলেমানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা করে তবুও বাইরে অন্ততঃ সে ভাবটা গোপন করেই রাখে।

কিন্তু এত সব সম্মান, শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ভগবানই জানেন, কি জানি কেন ওর সঙ্গে এতদিনের পরিচয়ের ভেতর কোনোদিনই ওর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি, কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হত।

এরপর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি তিন জাতীয় লোক আছে, যাদের চোখের দিকে আমি তাকাতে পারি না—যারা আমার চেয়ে ঢের নীচু স্তরের, যারা অনেকটা উঁচুতে আর যাদের সঙ্গে আমি মন খোলসা করে কথাবার্তা বলতে পারি না। ডুবকভ আমার চেয়ে ভাল কিংবা মন্দ তা জানি না কিন্তু এটা ঠিক যে ও অনেক সময়ই মিথ্যে কথা বলে, যদিও সেটা স্বীকার করে না ; ওর এই দুর্বলতা আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি, কিন্তু খোলাখুলি কোনোদিন বলতে পারিনি।

"এস, আর এক হাত খেলা যাক্", তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বাবার মতন কাঁধে একটা ঝাঁকুনি মেরে ভলোদিয়া বলে।

"আর ছাড়ান নেই দেখছি", ডুবকভ বলে, "পরে খেলা যাবে'খন। আচ্ছা, আচ্ছা, এস আরেকটিবার। তোমার দান।"

ওরা খেলতে লাগল, আমি বসে বসে ওদের হাত দুখানা লক্ষ্য করতে লাগলাম। ভলোদিয়ার হাত বেশ বড়, সুন্দর দেখতে। যখন তাস ধরে বুড়ো আঙুলটা একটু ফাঁক করে বাকি আঙুলগুলো নুইয়ে রাখে। ভঙ্গিটা একেবারে ঠিক বাবার মতন, মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল ভলোদিয়া বোধহয় ইচ্ছে করেই অমনি করছে বড়দের মতন দেখাবে বলে—কিন্তু পর মুহূর্তেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলাম, ওর মাথায় এখন আর খেলা ছাড়া অন্য কিছু নেই। ডুবকভের হাত ঠিক উল্টো, ছোট, ফোলা-ফোলা, একটু ভেতর দিকে হেলানো আর খুব সুন্দর নরম নরম কাব্যিক আঙুলগুলো—ঠিক যে ধরনের আঙুলে আংটি খুব সুন্দর মানায় আর যারা খুব সূক্ষ্মরুচির কারুকাজ করা জিনিস-পত্র পছন্দ করে তাদের মত।

ভলোদিয়া নিশ্চয় হেরেছে। কারণ যে ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে ওদের খেলা দেখছিলেন তিনি মন্তব্য করলেন, "এঃ, ভ্লাদিমির পেত্রোভিচের কপালটা

নেহাতই খারাপ দেখছি।" ডুবকভ পকেট থেকে নোট-বই বার করে কি যেন একটু লিখল, তারপর ভলোদিয়াকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক ?"

নোট-বইটার দিকে একচোখ তাকিয়ে অবজ্ঞার ভান করে ভলোদিয়া বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল এবার যাওয়া যাক।"

ভলোদিয়া ডুবকভকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে। দ্‌মিত্রি আমাকে তার ফিটনে তুলে নেয়।

"ওরা কি খেলছিল ?" দ্‌মিত্রিকে জিজ্ঞেস করলাম।

"পিকেট। যত সব বোকা-বোকা খেলা, আসলে জুয়া খেলাটাই বোকামি।"

"ওরা কি অনেক টাকার বাজী ধরে ?"

"না, তাহলেও এটা উচিত নয়।"

"তুমি খেল না ?"

"না। আমি কথা দিয়েছি খেলব না। ডুবকভ কাউকে পেলে না খেলে ছাড়ে না। ও সাধারণত জেতে।"

"সেটা ওর পক্ষে উচিত নয়।" আমি বললাম, "ভলোদিয়া হয়তো ওর মত ভাল খেলে না।"

"উচিত তো নয়ই। তবে কিনা বিশেষ কিছু একটা বদ্‌-মতলব নেই। ডুবকভ খেলতে ভালবাসে, খেলেও ভাল, তাহলেও লোক ও অতি চমৎকার।"

"ও, আমার কোনও ধারণা নেই অবশ্য।"

"ওর সম্বন্ধে কোনও খারাপ ধারণা করো না, আসলে লোক হিসেবে ও চমৎকার। আমি ওকে পছন্দ করি—আর এই দুর্বলতাটুকু সত্ত্বেও চিরদিন করবও।"

দ্‌মিত্রি এতখানি হৃদ্যতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ডুবকভকে সমর্থন করল বলেই বোধহয় আমার মনে হল আসলে দ্‌মিত্রির এখন আর ডুবকভের ওপর কোনও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নেই, কিন্তু জেদের বশে সেটা ও কিছুতেই স্বীকার করবে না, পাছে লোকে চঞ্চলমতি বলে। ও বোধ হয় সেই জাতের—যারা বন্ধুকে একবার ভালবাসলে সারা জীবনে আর তাকে ছাড়ে না, তার কারণ এই নয় যে সে বন্ধু সারা জীবনই তার প্রিয় থাকে। কিন্তু একবার কাউকে ভালবেসে, যদি ভুল করেও বাসে, তাহলেও পরে তাকে ভুলে যাওয়াটা অসম্মানজনক বলে মনে করে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উৎসব

"ইয়ারে" সকলের সঙ্গেই ডুবকভ আর ভলোদিয়ার চেনাজানা, বেয়ারা থেকে মালিক পর্যন্ত সবাই ওদের বিশেষ সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল। তক্ষুনি আমাদের একটি ঘরে বসতে দিয়ে চমৎকার ডিনার দেওয়া হল—ফরাসী খাবারের তালিকা থেকে ডুবকভ খাবার বেছে নিল। এক বোতল ঠাণ্ডা শ্যাম্পেন টেবিলের ওপর তৈরি—আমি অবশ্য নিতান্তই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকালাম। চমৎকার কাটল খাওয়ার সময়টা, খুব আনন্দে, ডুবকভ অবশ্য অভ্যেস মতন যত সব আজগুবি গল্প শুরু করে দিয়েছে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ওর দিদিমা কেমন করে তিনটে ডাকাতকে গুলি করেছিল একটা পুরনো ধরনের বন্দুক দিয়ে (শুনে লজ্জায় আমি চোখ নীচু করে মুখ ফিরিয়ে নিই)। আমি মুখ খুললেই ভলোদিয়া বেশ ভয় পেয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু ভয়ের কোনোই কারণ ছিল না, লজ্জা পাবার মত কোন কথাই আমি সেদিন বলিনি। গ্লাসে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালা হতে সবাই আমাকে অভিনন্দন জানায়, আমিও সকলের সঙ্গে হাত ঝাঁকাই, তারপর চুমু খাই, এরপর থেকে এদের 'তুমি' ডাকার অধিকার পেলাম। শ্যাম্পেনের বোতলটা ঠিক যে কার তা জানতাম না (পরে অবশ্য শুনেছিলাম ওটা তিনজনেরই)। আর এদিকে আমি নিজেব টাকায় বন্ধুদের খাওয়াব বলে পকেটে টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করছিলাম অনেকক্ষণ থেকে; এবার একটা দশ রুবলের নোট বার করে ওয়েটারকে ডেকে গোপনে অথচ ওরা স্পষ্ট শুনতে পায় এমনিভাবে বললাম দয়া করে আরও আধ বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে আসতে। ভলোদিয়া একদম লাল হয়ে গেল, চকিত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে আরেকবার বন্ধুদের দিকে ওকে তাকাতে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ভীষণ বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড করে ফেলেছি। যাই হোক, বোতলটাও এল, পরম সন্তোষের সঙ্গে সবাই মিলে সেটিকে শেষ করলাম। সময়টা বেশ মজাতেই কাটতে লাগল। ডুবকভ অবিচ্ছিন্ন মিথ্যে কথা বলে

চলল, ভলোদিয়াও মজার মজার সব গল্প বলল—ও যে এত মজা করে বলতে পারে, আমি ভাবতেই পারতাম না, সবাই মিলে প্রাণখুলে হাসলাম। ডুবকভ আর ভলোদিয়ার মজার ধরনটা হচ্ছে নিতান্ত পরিচিত গল্পকে খুব করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মজা করে বলা। "আচ্ছা, তুমি কি কখনও বিদেশে গিয়েছ?" একজন জিজ্ঞেস করে। "না, আমি কখনও যাইনি। কিন্তু আমার ভাই বেহালা বাজায়।" এরা আবার এ ধরনের ঠাট্টা-মস্করায় এত ওস্তাদ যে সেটাকেও বদলে বলে, "আমার ভাই আবার বেহালাও বাজায় না।" এইভাবেই ওরা একজন আরেকজনের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছে, কোনও সময় আবার প্রশ্ন না করেই দুজনে দুটো অদ্ভুত গল্পকে জুড়ে দিতে চেষ্টা করছে—আর এসব কথাবার্তাগুলো ওরা বলছে পরম গম্ভীর মুখে, ব্যাপারটা তাই আরও হাসির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমিও মজার কিছু বলতে চেষ্টা করলাম, ওরা তাতে সবাই আশঙ্কিত হয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। যতক্ষণ কথা বললাম কেউ আমার দিকে তাকাল না,—আমার গল্পটাও বিশেষ উতরাল না। ডুবকভ বলল, "তোমার গল্পটা একটু বোকা-বোকা, বুঝলে হে ডিপ্লোম্যাট?" শ্যাম্পেন আর এই বড়দের সঙ্গ পেয়ে আমি তখন এতই খোশমেজাজে যে এ রকম একটা কথাতেও আহত হলাম না। একমাত্র দ্‌মিত্রিই, যদিও আমাদের সঙ্গে সমান তালেই মদ খেয়েছে, তবুও বেশ শান্তশিষ্ট সভ্য-ভব্য ভাবেই আছে—ওর জন্যেই বাধ্য হয়ে আমাদের আর সকলের উচ্ছ্বাসকেও খানিকটা সংযত করে রাখতে হয়েছে।

"আচ্ছা, ভদ্রমহোদয়গণ, এবার শোন," ডুবকভ বলে, "ডিনারের পরে আমাদের ডিপ্লোম্যাটের একটা ব্যবস্থা করতে হয়। আমি বলি কি, মাসীমার কাছে গেলে কেমন হয়? দেখো কত তাড়াতাড়ি ও ওখানে মেতে যায়।"

"কি নেখলুইদভ যাবে না," ভলোদিয়া বলে।

"হ্যাঁ, ঐ আবার একটি সুপুত্তুর! সত্যি তুমি একেবারে অসহ্য!" ডুবকভ ওর দিকে ফিরে বলে, "চল, চল, আমাদের সঙ্গে চল, দেখবে কি চমৎকার মানুষ আমাদের মাসীমা।"

দ্‌মিত্রি একেবারে লাল হয়ে গেল, "আমি নিজে তো যাব না নিশ্চয়ই, তার চাইতেও বেশি হচ্ছে ওকেও যেতে দেব না।"

"কাকে? ডিপ্লোম্যাটকে? ডিপ্লোম্যাট তুমি যেতে চাও? দেখ, দেখ মাসীর নাম শুনেই ওর মুখচোখ একেবারে ঝকমক্ করছে।"

"ওকে যেতে দেব না, একথা বলিনি," দ্মিত্রি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে, আমার দিকে না তাকিয়ে, "কিন্তু আমি যেতে বলি না, চাইও না যে ও যায়। ও তো আর শিশু নয়, যেতে চায় তো নিজেই যেতে পারবে, তোমাদের বাদ দিয়েই। কিন্তু, ডুবকভ তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, নিজে অন্যায় করছ, আবার অন্যদেরও তা শেখাচ্ছ।"

"কিন্তু আমার মাসীমার বাড়িতে যদি এক কাপ চা খেতে তোমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে, তবে দোষ কি?" ডুবকভ জিজ্ঞেস করে, সঙ্গে সঙ্গে ভলোদিয়াকে একটু চোখ টিপে দেয়, "বেশ তো তোমার যদি আমাদের সঙ্গে আসতে ভাল না লাগে তো এসো না, আমি আর ভলোদিয়া যাব। কি ভলোদিয়া, তুমি আসছ তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়"। ভলোদিয়া বলে, "চল তারপর সেখান থেকে আমার ঘরে এসে পিকেট খেলব।"

"কিন্তু তুমি ওদের সঙ্গে যেতে চাও, না, চাও না?" দ্মিত্রি ঘুরতে ঘুরতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে।

"নাঃ", সোফার একধারে সরে গিয়ে ওকে বসতে জায়গা দিয়ে বলি, "কোথাও যেতে চাই না আমি। আর তুমি যদি না যেতে উপদেশ দাও তবে কিছুতেই কোথাও যাব না আমি।"

"না", একটু ভেবে শেষে আবার যোগ দিই, "এটা সত্যি নয় যে ওদের সঙ্গে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না, কিন্তু যাচ্ছি না যে তার জন্যে আমি খুশী।"

"সেটা খুব ভাল," দ্মিত্রি জবাব দেয়, "নিজে যা ভাল বুঝবে করো। পরের কথায় নাচা নয়; এটাই সবচাইতে ভাল পথ।"

এই ছোট্ট ঝগড়াটুকুতে আমাদের আনন্দে অবশ্য কোনও বাধা পড়ল না, বরং আনন্দ যেন আরও বেড়ে গেল। দ্মিত্রির মনটা আবার সেই কমনীয় ভাব ধারণ করল, তার মনের ঠিক যে ভাবটা আমি ভালবাসি। আমার যাওয়াটা ঠেকাতে পেরে ওর আনন্দের আর সীমা নেই; নিজের ওপরেই ও মহাখুশী। দ্মিত্রি খুশীর চোটে আর এক বোতল শ্যাম্পেনের হুকুম দিয়ে ফেলল (যা ওর নীতিবিরুদ্ধ)। অপরিচিত একজন ভদ্রলোককে আমাদের ঘরে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসে মদে প্রায় চুবিয়ে দেবার যোগাড় করল, নিজে গান ধরে আমাদের সবাইকে তাতে যোগ দিতে অনুরোধ জানাতে লাগল, শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব করল সবাই মিলে

গাড়ি চড়ে মকোলনিকিতে যাওয়া যাক,—ভুবকভ অবশ্য এতে বাধা দিল, বলল, দূর, সে ভারী ছেলেমানুষী হবে।

"এস, আজকে আমরা আনন্দে মাতি," স্মিতমুখে দ্‌মিত্রি বলে, "ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে আজকে আমি জীবনে প্রথম মাতাল হব। না হয়ে পারি না, কি বল?" ঠিক এমনি ধরনের অকৃত্রিম, সীমাহীন আনন্দ যেন কেবল দ্‌মিত্রিকেই সাজে! ও যেন একজন আনন্দিত পিতা বা শিক্ষক যিনি তাঁর সন্তান বা ছাত্রদের ওপর সন্তুষ্ট, এদের খুশী করতেও চান আবার এটাও বুঝিয়ে দিতে চান যে তিনি আনন্দ প্রকাশ করবার জন্যেও শোভনতা, শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। দ্‌মিত্রির হঠাৎ এই আনন্দ যেন আমাদেরও সংক্রামিত করে দিল, আরও বিশেষ করে আমরা প্রত্যেকেই আধ বোতল করে শ্যাম্পেন চালিয়েছিলাম, সেই কারণেও।

এই খুশী-খুশী ভাব নিয়েই আমি বসবার ঘরে পা দিলাম, ভুবকভ আমাকে যে সিগারেটটা দিয়েছিল সেটা টানতে।

যখন চেয়ার ছেড়ে উঠলাম, তখনি লক্ষ্য করলাম আমার মাথাটা অল্প অল্প টলছে, পুরো মনোযোগ দিলে তবেই হাত-পাগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকছে। একটু অন্যমনস্ক হতেই পাদুটো একদিকে চলে যাচ্ছে, হাতদুটোও আপনি-আপনি নানা ভঙ্গি করছে। মনটা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে নিবিষ্ট করলাম, হাতকে হুকুম করলাম উঠে কোটের বোতাম লাগিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিতে (চুল ঠিক করতে গিয়ে কনুইদুটো আবার স্বর্গে উঠে গেল), পা-কে হুকুম করলাম আমাকে দরজার কাছে নিয়ে যেতে—সে হুকুম তারা তামিল করল বটে, কিন্তু পাদুটো পড়তে লাগল হয় খুব ধুপধাপ করে নয়তো খু-উ-ব আস্তে ; বাঁ-পাটা আবার বিশেষ করে সবসময় গোড়ালির ওপরেই খাড়া হয়ে রইল।

"কোথায় যাচ্ছ?" কে যেন পেছন থেকে ডেকে বলল, "ওরা এক্ষুনি আলো নিয়ে আসছে।"

অনুমানে মনে হল গলাটা ভলোদিয়ার, ঠিকমত অনুমান করতে পেরেছি মনে করে খুব খুশী হলাম। জবাবে শুধু একটু হেসে আবার চলতে লাগলাম।

ষোড়শ অধ্যায়

ঝগড়া

বাইরের হলে ছোট একটা টেবিলের পাশে একজন বেঁটে, মোটা মতন ভদ্রলোক সাধারণ পোশাকে বসে খাচ্ছেন, তাঁর গোঁফ লালচে। পাশে বসে আছেন একজন লম্বা, রং ময়লা ভদ্রলোক, গোঁফ নেই। তাঁরা ফরাসীতে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। ওঁদের চাউনি দেখে একটু অস্বস্তি বোধ হল, তবুও ঠিক করলাম ওঁদের সামনে যে মোমবাতিটা জলছে, তাতেই সিগারেটটা ধরিয়ে নিই। ভদ্রলোকদের দৃষ্টি এড়াতে অন্যদিকে তাকিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বাতির শিখায় সিগারেটটা ধরলাম। সেটা প্রায় ধরে উঠেছে, তখন কেমন যেন অজান্তেই একবার যে ভদ্রলোক খাচ্ছিলেন, তার দিকে তাকিয়ে ফেললাম—দেখি তিনি ভ্রূকুটি করে বিরক্ত মুখে একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। আমি নিজের জায়গায় ফিরে আসতে যাব এমন সময় তাঁর লালচে গোঁফজোড়া নড়ে উঠল, ফরাসীতে বলে উঠলেন, "আমার খাবার সময়ে অন্য কেউ ধূমপান করে, তা আমি পছন্দ করি না, বুঝলে হে ছোকরা?"

আমি অস্পষ্ট জড়ানো গলায় কি যেন জবাব দিলাম।

"হ্যা, হ্যা, একেবারেই পছন্দ করি না।" গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক আর একবার কঠোরভাবে তিরস্কারের সুরে বললেন; চকিতে একবার অপর ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন যেন তাঁকে সমর্থন জানাতে আহ্বান করলেন, "আর তাছাড়া যারা নাকের ডগায় এসে ধোঁয়া ছাড়ার মত স্পর্ধা দেখায় তাদেরও পছন্দ করি না, বুঝলে?" এবার আমি বুঝলাম ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই আমাকে তিরস্কার করছেন, আর এই প্রথম আমার মনে হল সত্যি আমার তরফেই ভয়ানক অন্যায় হয়েছে।

"আপনার অসুবিধা হবে আমি বুঝতে পারিনি।" আমি বললাম।

"তুমি যে একেবারে অশিক্ষিত তা তুমি বুঝতে পারনি, না? কিন্তু আমি পেরেছিলাম, বুঝলে?" ভদ্রলোক অভদ্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন।

“আপনি আমাকে কথা শোনান কোন অধিকারে ?” ভদ্রলোক আমাকে অপমান করছেন বুঝতে পেরে আমারও রাগ ক্রমশ চড়তে থাকে।

“এই অধিকারে যে আমি কাউকে আমার সামনে বেআদবি করতে দিই না, আর তোমার মত ছোকরাদের সবসময়ই আদবকায়দা শিক্ষা দিই, বুঝলে ? তোমার নামটা জানতে পারি কি ? কোথায় থাক তুমি ?”

আমার রাগ আর বাধা মানছে না, ঠোঁট কাঁপছে, দমকে দমকে নিঃশ্বাস পড়ছে। তবুও ভেতরে ভেতরে আমার একটা অপরাধবোধ রয়েছে, বোধহয় এত বেশী শ্যাম্পেন টেনেছি বলে ; ভদ্রলোককে উল্টে অপমানজনক কোনও কথাই বলতে পারলাম না, বরঞ্চ আমার ঠোঁটদুটি নিতান্ত নিরীহভাবে যতদূর সম্ভব বিনয়ের সঙ্গে মিনমিন করে আমার নাম-ঠিকানা উচ্চারণ করল।

“আমার নাম কলপিকভ। আশা করি ভবিষ্যতে একটু কষ্ট করে তুমি ভদ্র ব্যবহার করবে, বুঝলে ? আমার কাছ থেকে চিঠি পাবে তুমি।” ভদ্রলোক এবার শেষ করলেন, সমস্ত কথা আমাদের ফরাসীতেই হল।

আমি শুধু বললাম “খুশী হব।” গলার স্বর অবিকৃত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তারপর পেছন ফিরে সোজা নিজেদের ঘবে চলে এলাম ; হাতে সিগারেটটা ধরা, সেটা ততক্ষণে নিভে গেছে।

ভেতরে গিয়ে ব্যাপারটাব কোনো উল্লেখ করলাম না, কারুর কাছেই না, বন্ধুও না, ভাইও না (বিশেষত ওরা দুজনেই তখন ভীষণ উত্তেজিতভাবে তর্কবিতর্ক করছে), নিজে একটা কোণে বসে আনমনে চুপচাপ ভাবতে থাকি। “অভদ্র” কথাটাই কেবল ঘুরেফিরে কানে বাজতে থাকে আর আমাব রাগও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এতক্ষণে আমার নেশা সম্পূর্ণ কেটে গেছে, সমস্ত ব্যাপারটা পূর্বাপর চিন্তা করতে গিয়ে মাথায় বিদ্যুতের মত একটা কথা ঘা মারল—আমি নিতান্তই ভীরুর মত ব্যবহার করেছি! আমাকে এভাবে আক্রমণ করার কি অধিকার ছিল ওঁর ? কেন শুধু খোলাখুলি বললেন না যে আমি ওঁকে বিরক্ত করছি ? অন্যায় তো ওঁর নিজেরই, তবে কেন আমাকে যখন “অশিক্ষিত” বললেন আমি তার জবাবে বললাম না, যিনি মুখ খারাপ করেন তিনি নিজেই অশিক্ষিত, বুঝলেন মশাই ? অথবা কেন শুধু চীৎকার করে উঠলাম না “মুখ সামলান” বলে ? ওঃ, কি চমৎকার হত তাহলে! কেন আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলাম না ? এসব কিছুই না করে নিতান্তই একটা কাপুরুষের মত কিনা সব অপমান হজম করলাম! “তুমি অশিক্ষিত”, “তুমি অশিক্ষিত” আমার কানে অনবরত

বাজতে থাকে। উঃ অসহ্য, অসহ্য! নাঃ, এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না, কিছুতেই না, শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে উঠে দাঁড়ালাম, এক্ষুনি ভদ্রলোকের কাছে ফিরে যাব, ভয়ঙ্কর কিছু একটা বলব, হয়তো সুবিধে বুঝলে মোমবাতিটা তুলেই মাথায় মেরে দেব। শেষের সম্ভাবনাটা মনে করেই মনটা খুশী হয়ে উঠল, তবুও বাইরের হলঘরটাতে যখন আবার ঢুকলাম, তখন বেশ ভয়-ভয় করছে। সৌভাগ্যক্রমে কলপিকভ তখন টেবিল ছেড়ে চলে গেছেন, একজন চাকর ঝাড়পোঁছ করছে। একবার মনে হল চাকরটাকেই সব কথা খুলে বলি, বুঝিয়ে দিই আমার কোনই দোষ নেই—আবার কি যেন কেন মত বদলে সোজা নিজেদের ঘরেই ফিরে আসি, ভীষণ রকম মন ভার করে।

"আরে, আমাদের ডিপ্লোম্যাটের হল কি?" ডুবকভ বলে, "ও বোধ হয়, ইওরোপের ভাগ্য নির্ণয়ে ব্যস্ত আছে।"

"আঃ, আমাকে একলা থাকতে দাও।" চটেমটে মুখ ঘুরিয়ে নিই। এরপর ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কেন জানি মনে হল, ডুবকভ লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। ওর সেই একঘেয়ে ঠাট্টা-মস্করা, "ডিপ্লোম্যাট" নাম দেওয়া—কোনটাই একটুও উপভোগ্য নয়। ওর কাজ হচ্ছে খালি ভলোদিয়ার কাছ থেকে টাকা জিতে নেওয়া, আর সেই "মাসী" না কে, তার কাছে যাওয়া। কিচ্ছু মজা নেই ওতে; ও যা যা বলে সব হয় মিথ্যে, নয়তো বিদ্রূপে ভরা, ওর হাসি সবসময়ই অন্যকে জ্বালিয়ে। আসলে ও যেমনি বোকা তেমনি পাজী। মিনিট পাঁচেক এমনি সব চিন্তা করে কাটালাম, যতই ভাবছি ডুবকভের ওপর বিদ্বেষ ততই বাড়ছে। ডুবকভ অবশ্য আমার দিকে কোনো নজরই দিচ্ছিল না, তাতে আমার রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছিল। দ্‌মিত্রি আর ভলোদিয়া যে ওর সঙ্গে কথা বলছে, তাতেও বিরক্তি ধরছিল।

"ওহে ভদ্রলোকেরা, কি করতে হবে জান? আমাদের ডিপ্লোম্যাটের মাথায় কিঞ্চিৎ জল ঢালতে হবে", ডুবকভ হঠাৎ বলে উঠল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে, আমার মনে হল সে হাসি বিদ্রূপে ভরা, "ও ভয়ঙ্কর তিরিক্ষে মেজাজে রয়েছে দেখছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখ, কি ভীষণ চটেছে!"

বিষের মত একটু হেসে আমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, "তুমি আর ডুবে ডুবে জল খেয়ো না। আসলে তোমার নিজেরই মেজাজ খারাপ।" ওকে যে "তুমি" বলে ফেললাম, রাগের চোটে তাও খেয়াল থাকল না।

আমার জবাবে ডুবকভ নিশ্চয় খুব অবাক হয়ে গেল, কিন্তু মুখে কোনো ভাব

প্রকাশ না করে নিশ্চিন্তভাবে আবার ভলোদিয়া আর দ্মিত্রির সঙ্গে কথাবার্তায় মেতে গেল।

একবার ভাবলাম ওদের আলোচনায় যোগ দিই, আবার ভাবলাম, না, নিজেকে গোপন করতে পারব না, কাজেই আমার সেই কোণটিতে ফিরে গিয়ে বিদায়ের সময় পর্যন্ত চুপচাপ কাটালাম।

ডিনারের বিল শোধ করে দিয়ে আমরা সবাই ওভারকোট পরছি, ডুবকভ দ্মিত্রিকে বলে, "তাহলে এবার অরেসেটস আর পিলেডস্, তোমাদের যাওয়া হচ্ছে কোথায়? বাড়িতে নিশ্চয়, "প্রেম" নিয়ে আলোচনা করতে, না? আমরা বাবা, আমাদের সেই "মাসীর" বাড়িতে যাই, তোমাদের ঐ পচা বন্ধুত্বের চাইতে সেটা অনেক বেশী মজার।"

"কোন সাহসে তুমি আমাদের নিয়ে হাসি তামাসা কর?" আমি একেবারে রাগে ফেটে পড়ে ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতমুখের নানা ভঙ্গী করে বলি, "যে হৃদয়বৃত্তির মর্ম তুমি বোঝ না, তাকে ঠাট্টা কর কি হিসেবে? এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। তুমি মুখ সামলে কথা বলবে।" আমি যথাসাধ্য চীৎকার করে কথাগুলো বলে চুপ করে গেলাম, আর কি বলব বুঝতে পারছি না, উত্তেজনার চোটে দমও ফুরিয়ে গেছে। ডুবকভ প্রথমটায় ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর হেসে কথাটা ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল, শেষটা আমি দেখে খুব বিস্মিত হলাম ও কেমন যেন ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

"আমি তোমাকে বা তোমার হৃদয়বৃত্তি নিয়ে মোটেই হাসিনি। ওটা আমার কথা বলবারই ধরণ।" ছাড়াছাড়া ভাবে ও দোষ কাটাবার চেষ্টা করে।

"কথা বলতে হবে না। থাম।" আমি আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠি। কিন্তু মনে মনে নিজের ব্যবহারে লজ্জা পাই, ডুবকভের জন্যও দুঃখ হয়—ওর সুন্দর মুখখানায় একটা আন্তরিক ক্ষোভের ছায়া।

"আবে, তোমার হয়েছে কি?" ভলোদিয়া আর দ্মিত্রি দুজনে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করে ওঠে, "কেউ তো তোমাকে অপমান করতে চায়নি।"

"নিশ্চয় চেয়েছে।"

"তোমার ভাই আবার এত ভয়ঙ্করভাবে ভদ্রলোক," ডুবকভ বেরিয়ে যেতে যেতে বলে যায় আমার জবাবটা আর শুনতে না হয়।

হয়তো আমি ওর পেছনে পছনে দৌড়ে গিয়ে আরও কিছু অভদ্র কথা বলে আসতাম, কিন্তু ঠিক তক্ষুনি সেই ওয়েটারটি যে আমার সঙ্গে কলপিকভের ব্যাপারটায় উপস্থিত ছিল সে আমাকে ওভারকোট পরাতে এল—ওকে দেখেই সাপের মাথায় ধুলো পড়ল। আমার রাগ একেবারে জল। হঠাৎ একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া দেখে পাছে দ্মিত্রির কোনো সন্দেহ হয়, তাই সামান্য রাগের ভানটুকু বজায় রাখলাম মাত্র।

পরের দিন যখন ভলোদিয়ার ঘরে আবার ডুবকভের সঙ্গে দেখা হল, আগের দিনের ঘটনার উল্লেখ করলাম না কেউই, কিন্তু দুজনে 'আপনি' করেই কথা বলতে লাগলাম। পরস্পরের দিকে চোখ তুলে তাকানো আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

কলপিকভের সঙ্গে ঝগড়ার ঘটনাটা—যার কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুত চিঠিখানা আর কোনদিনই আমার কাছে এসে পৌছয়নি—বহু বছর ধরে সে স্মৃতি আমার মনে জ্বলজ্বল করত আর মনে পড়লেই মনটা দমে যেত। পুরো পাঁচটা বছর পরেও সেই প্রতিশোধ না নেওয়া অপমানের কথা মনে করে মনে মনে ফুঁসেছি ; মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি, যাহোক, তারপরে ডুবকভের সঙ্গে ব্যাপারটায় তো বেশ পৌরুষের পরিচয় দিয়েছিলাম। বেশ অনেক দিন কেটে যাবার পর আমি গোটা ঘটনাটাকেই সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে পেরেছি। তখন কলপিকভের ব্যাপারটায় মনে মনে কৌতুক বোধ করেছি আর সেই বেচারী হাসিখুশী ভালমানুষ ডুবকভকে বিনাকারণে আঘাত দেওয়ার জন্য অনুতাপ করেছি।

সেইদিনই যখন দ্মিত্রির কাছে ঘটনাটা খুলে বললাম, ভদ্রলোকটির চেহারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে সে খুব অবাক হয়ে গেল, "আরে এ তো সেই লোকটাই মনে হচ্ছে। মজা দেখ! ঐ কলপিকভ একটা নাম-করা বদমায়েস জুয়াড়ী ; কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে, ও তো একটা মহাকাপুরুষ,—সৈন্যবাহিনীতে থাকতে কে একজন ওকে একটা চড় মেরেছিল, আর তার বদলে লড়াই করেনি এই অপরাধে সেখান থেকে ওকে তাড়িয়েই দিয়েছে। ও আবার এত সাহস পেল কোথা থেকে? আমার দিকে তাকিয়ে দ্মিত্রি একটু কোমল হাসল। "তা, তোমাকে ও 'অশিক্ষিত'র চাইতে আর বেশী কিছু বলেনি তো?"

"না", আমি লাল হয়ে গিয়ে জবাব দিই।

"ওটা অবশ্য খুবই খারাপ, তবে যাকগে, তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি," দ্মিত্রি আমাকে সান্ত্বনা দেয়।

আরও অনেক পরে যখন সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় জিনিসটা ভেবেছি তখন মনে হয়েছে, কলপিকভও হয়তো বহুদিন আগে সেনাবাহিনীতে একদিন গালে যে চড় খেয়েছিল, সেদিন ঐ পরিষ্কার কামানো ময়লা রং ভদ্রলোকের সামনে আমার ওপর তারই প্রতিশোধ নিয়েছিল—ঠিক যেমন আমি নির্দোষ ডুবকভকে হাতের কাছে পেয়ে 'অশিক্ষিত'র ঝালটা তারই ওপর ঝাড়লাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

দেখা-সাক্ষাৎ

পরের দিন ভোরে ঘুম ভেঙে প্রথমেই মনে পড়ল কলপিকভের অপমান। আবার মনে মনে জ্বলতে জ্বলতে মুখে বিড়বিড় করতে করতে ঘরময় দাপাদাপি করলাম, কিন্তু করবার তো কিছুই নেই। তাছাড়া ঐ দিনেই আমার শেষ মস্কোয় থাকা, বাবার হুকুম অনুযায়ী কালকেই আমাকে দেশের বাড়িতে যেতে হবে; আজকে ঘুরে ঘুরে দেখাসাক্ষাৎ সারার কথা, বাবা নিজেই একটা তালিকা বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জ্ঞান বা চরিত্র নিয়ে বাবার কোনো মাথাব্যথা নেই, তাঁর আসল দুশ্চিন্তা হচ্ছে সমাজের পাঁচজন নামী-লোকের সঙ্গে কি করে আমাদের আলাপ পরিচয় করানো যায় তাই নিয়ে। তালিকাটি বাবার হাতে তাড়াতাড়ি করে লেখা: (১) প্রিন্স ইভান ইভানিচের সঙ্গে, অতি অবশ্যই, (২) ইভিনদের সঙ্গে নিশ্চয়ই (৩) প্রিন্স মিখাইলো, আর (৪) সম্ভব হলে প্রিন্সেস নেখলুইদোভা ও ম্যাডাম ভালাখিনা, তাছাড়া, অবশ্য কিউরেটার, রেক্টর ও অধ্যাপকেরা।

শেষোক্ত জায়গাগুলোয় যেতে দ্মিত্রি আমাকে বাধা দিল, বলল ওগুলো শুধু যে অদরকারী তাই না—অনুচিতও বটে। বাকিগুলো অবশ্য সেইদিনই সারতে হবে—তার মধ্যে ওই প্রথম "অবশ্য" মার্কা দুটিই আমায় সবচাইতে ভয় ধরিয়ে দিল। প্রিন্স ইভান ইভানিচ্ একজন জেনারেল-ইন্-চীফ, বয়সে বৃদ্ধ, প্রচুর ধনী, থাকেন একাকী—আর আমি কিনা একটা ষোল বছরের ছাত্র, সোজাসুজি তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হবে, বেশ বুঝতেই পারছি আমার পক্ষে মোটেই মুখরোচক হবে না। ইভিনরাও খুব ধনী, ওদের বাবাও একজন নাম-করা বেসামরিক জেনারেল, মাত্র একদিন আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন সেই দিদিমার উৎসবের দিনে। দিদিমার মৃত্যুর পর থেকে লক্ষ্য করছি, ইভিনদের সবচেয়ে ছোট ভাই আমাদের কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে—তার বেশ যেন একটু চাল-মারা ভাব। বড় ভাই শুনেছি আইন পড়া শেষ

করে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চাকরিতে ঢুকেছে; মেজ (সার্জি) যাকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম, সেও নাকি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

যারা নিজেদের আমার চাইতে উঁচু স্তরের লোক বলে মনে করে, তাদের সঙ্গে মেলামেশাটা যৌবনে আমার ভীষণ অপছন্দ ছিল; এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সময় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি, এই বুঝি অপমান করে বসল। আর আমি যে স্বাধীন, ওদের কোনো পরোয়া করি না, সে প্রমাণ দিতে এত মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে।—তাই এ ধরনের লোকদের সাহচর্য আমাকে ভয়ঙ্কর পীড়া দিত। কিন্তু বাবার শেষের হুকুমটা যখন মানছি না, তখন প্রথম দিকের গুলো অন্তত মেনে বাবাকে ঠাণ্ডা করতে হবে তো! আমি ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলাম, চেয়ারের ওপর ছড়ান পোশাক; ছোরা আর টুপির দিকে তাকাতে তাকাতে—এমন সময় বুড়ো গ্রাপ এল ইলেন্‌কাকে নিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতে। গ্রাপ একজন জার্মান; রাশিয়ার নাগরিকত্ব নিয়েছে, অসম্ভব রকমের খোশামুদে আর মেনিমুখো। আর যদি পেটে কিছু পড়ে তো কথাই নেই। সে সাধারণত আমাদের কাছে আসে কিছু না-কিছু চাইতে। বাবা কোনো কোনো সময় পড়ার ঘরে বসে ওকে একটু চা-টা খাওয়াতেন কিন্তু ডিনারে কখনো ডাকতেন না। ওর বিনয় আর একটানা কাঙালপনার মধ্যে একটা বাহ্য ভালমানুষী ভাব আর আমাদের বাড়ির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে থাকত যে, আমাদের প্রতি এই আসক্তিকে সকলে ওর একটা গুণ বলেই ধরে নিত, কিন্তু কেন যেন আমি ওকে কোনদিনই পছন্দ করিনি। ওকে মুখ খুলতে দেখলেই আমার ভারি লজ্জা হত।

এই সময়ে এই অতিথিদের আগমনে আমি ভয়ানক অপ্রসন্ন হলাম, আর সেটা চাপা দেবারও বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলাম না। ইলেনকাকে অবজ্ঞা করতে এতই অভ্যস্ত ছিলাম আবার অবজ্ঞা করাটাকেও এতই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতাম যে ও এখন ছাত্র অর্থাৎ আমারই সমপর্যায়ের—কথাটা মনে করতেও আমার মাথা কাটা গেল। মনে হল, ও যেন সে কথাটা মনে করে আমার সামনে একটু বিব্রত। নিতান্ত উপেক্ষা ভরে ওদের অভ্যর্থনা করলাম বসতেও বললাম না, এমনকি লজ্জা পেলাম এই ভেবে যে ওরা হয়তো আমার অনুরোধের তোয়াক্কা না করেই বসে পড়তে পারে, এদিকে গাড়িও জুততে হুকুম দিলাম। ইলেনকা খুবই মরমী, বুদ্ধিমান ছেলে, প্রখর আত্মসম্মানজ্ঞান কিন্তু তাহলেও যাকে বলে একটু খামখেয়ালী ধরনের। সব সময় ওর মধ্যে একটা চূড়ান্তভাব—

কেন তা বোঝা যায় না। এই হয়তো কান্না-কান্না ভাব, তার পরেই হাসি পাবে আর তার পরেই হয়তো যে কোন তুচ্ছ কারণেই অভিমান। এখন আমার মনে হল ও ওই শেষোক্ত মেজাজে আছে। ইলেন্‌কা মুখে কিছু বলল না, শুধু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল একবার আমার দিকে আরেকবার ওর বাবার দিকে। যখন ডেকে কথা বলা হল, তখনই শুধু ও জোর করে ও বিনয়ের সঙ্গে একটু হাসি হাসল মুখের হাসি দিয়ে মনের ভাব ঢেকে রাখার ক্ষমতা এরই মধ্যে ও আয়ত্ত করে ফেলেছে—বিশেষ করে আমাদের কাছাকাছি এলে ওর নিজের বাবা সম্বন্ধে যে লজ্জা জাগে সেই ভাবটাকে।

"তাহলে, নিকোলাই পেত্রোভিচ", আমি চলে-ফিরে পোশাক পরছি আর বুড়ো গ্রাপ আমার দিদিমার দেওয়া নস্যির ডিবেটা মোটা মোটা আঙুলের ফাঁকে ধরে সাবধানে খুলতে খুলতে সমানে আমার পায়ে পায়ে ঘুরে বলছে, "আমি যখনই আমার ছেলের মুখে শুনলাম যে তুমি চমৎকার পাশ করেছ—অবশ্য তোমার বুদ্ধিমত্তার কথা সকলেরই জানা—তখুনি চলে এলাম, নিজে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে। ছেলেবেলায় কতদিন তোমাকে কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছি। আর সত্যি তোমাদের পরিবারকে আমি নিজের আত্মীয়ের মতই দেখি। আমার ইলেন্‌কাও বারবার তোমাকে দেখতে আসতে চাইছিল। তোমাদের ওপর ওরও এখন কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে।"

ইলেন্‌কা ততক্ষণ জানালার ধারে একলাটি চুপ করে বসে আছে; মনে হচ্ছে যেন আমার তিনকোণা টুপিটাই নিবিষ্টচিত্তে দেখছে আর চটেমটে নিজের মনেই কি যেন বিড়বিড় করছে।

"বুঝলে নিকোলাই পেত্রোভিচ্", বুড়ো বলে চলে, "তোমার কাছে জানতে এসেছিলুম আমার ইলেন্‌কা কি ভালভাবে পাশ করেছে? ও নাকি তোমার সঙ্গে একই ফ্যাকাল্টিতে পড়বে, তবে দয়া করে তুমি একটু ওর ওপর চোখ রেখো, দরকার পড়লে উপদেশ-টুপদেশ দিও।"

"কেন, ও তো পরীক্ষায় বেশ ভালই করেছে?" ইলেন্‌কার দিকে তাকিয়ে বললাম। ইলেন্‌কাও আমি তাকিয়েছি বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ঠোঁট নাড়া বন্ধ করল।

"আচ্ছা, আজকের দিনটা কি ও তোমার সঙ্গে কাটাতে পারে?" বুড়ো খুব ভয়ে ভয়ে ভীরু একটু হাসির সঙ্গে জিজ্ঞেস করে; আমাকে ওর খুব ভয় অথচ এমনি পায়ে পায়ে ঘুরছে যে একটি মুহূর্তের জন্যও মদ আর তামাক মেশান

ধোঁয়ার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি না। ওর ছেলেকে নিয়ে আমাকে এমনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে, তাছাড়া পোশাক পরাটা এখন আমার কাছে মহা জরুরী কাজ তা থেকে আমার মনোযোগটা খালি ছিনিয়ে নিচ্ছে, আর সবচাইতে বেশী হচ্ছে ওর মুখের বিশ্রী ব্র্যাণ্ডির গন্ধ—সব মিলে আমাকে এমনি বিষিয়ে দিল যে আমি নিরুত্তাপ ভাবে সোজাসুজি জানিয়ে দিলাম ইলেন্‌কার সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য আমার ঘটবে না, কারণ সেদিনটা আমি বাড়িতেই থাকব না।

"সেকি বাবা, তুমি তো তোমার বোনকে দেখতে যাচ্ছিলে, তাই না?" ইলেন্‌কা আমার দিকে না তাকিয়ে মৃদু হেসে ওর বাবাকে বলে, "আর তাছাড়া আমার তো কাজ আছে।"

আমি আরও বিব্রত বোধ করলাম; ভেতরে ভেতরে একটু বিবেকের খোঁচাও লাগল তাই তাড়াতাড়ি ওদের বোঝাতে লাগলাম যে সত্যি সত্যিই আমি বাড়ি থাকব না, আমাকে যেতে হবে প্রিন্স ইভান ইভানিচ্, প্রিন্সেস করনাকোভা আর ইভিনদের সঙ্গে দেখা করতে, খুব সম্ভব প্রিন্সেস নেখ্‌লুইদভার সঙ্গে ডিনার খেতে হবে। ভাবলাম, সমাজের এইসব গণ্যমান্য লোকদের বাড়িতে যাচ্ছি শুনলে নিশ্চয় ওরা আর আমার ওপর দাবি করতে পারবে না। ওরা যখন বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হল, তখন ইলেন্‌কাকে আবার আসতে আমন্ত্রণ জানালাম—জবাবে ইলেন্‌কা শুধু বিড়বিড় করে কি যেন একটু বলল, জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে। স্পষ্ট বোঝা গেল ও জীবনে আর কোনদিন আমার বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবে না।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে আমি দেখাসাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়লাম। একা যেতে লজ্জা-লজ্জা করবে বলে ভলোদিয়াকে আমার সঙ্গে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, কিন্তু ও অস্বীকার করল। বলল, এইটুকু একটা সুন্দর গাড়িতে চলেছে যেন রামলক্ষ্মণ দুভাই সেটা একটা বিশ্রী ভাবপ্রবণতার ব্যাপার হবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভালাখিন

অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়ি। আমার পথে প্রথমেই পড়বে সিভ্‌ট্‌সেভ ভ্রাঝেক ভালাখিনাদের বাড়ি। সোনেচ্‌কাকে দেখিনি তিন বছর হল, ওর সঙ্গে প্রেমটাও বহুদিন হল অতীতের ব্যাপার হয়ে গেছে তবুও শৈশবের সেই মধুময় প্রেমের ক্ষীণ একটু রেশ মধুর স্মৃতি হয়ে এখনও আমার বুকে জেগে আছে। এই তিন বছরের ভেতর হঠাৎ এক এক সময় ও এমনি স্পষ্ট, মনোহারিণী মূর্তিতে আমার মনে ফুটে উঠেছে যে আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেছে, নতুন করে আবার ওকে ভালবেসেছি। কিন্তু সে কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর একটানা অনেক দিন আবার ওকে ভুলে থেকেছি।

শুনেছি সোনেচ্‌কা মায়ের সঙ্গে বিদেশে গিয়েছিল, দুবছর ছিল, সেই সময় একটা দুর্ঘটনায় গাড়ির কাঁচে সোনেচ্‌কার মুখ বিশ্রী রকম ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়—তাতে যথেষ্ট সৌন্দর্যহানি ঘটেছে ওর সুশ্রী মুখখানার। গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে মনে ভেসে উঠল হুবহু সেই সেদিনের মিষ্টি সোনেচ্‌কা। ভাবলাম এবার গিয়ে না জানি কি দেখব! কল্পনায় দেখতে পেলাম দুবছর বিদেশে ঘুরে এসে সোনেচ্‌কা হয়েছে সুন্দরী তন্বী, দোহারা গড়ন, গম্ভীর অথচ কি চমৎকার, দেখামাত্রই আকৃষ্ট করে। ঐ সুন্দর মুখখানার ক্ষত-বিক্ষত চেহারা কিছুতেই কল্পনায় ফোটাতে পারলাম না; কিন্তু মনে পড়ল কোথায় যেন গল্প শুনেছিলাম একজন প্রেমিকের যে তার প্রেমের মর্যাদা রাখতে প্রেমিকার সুশ্রী মুখখানা বসন্তের দাগে বীভৎস হয়ে গেলেও তাকে পরিত্যাগ করেনি—অমনি কল্পনা করলাম যেন আমিও সোনেচ্‌কার প্রেমে পড়েছি আর সেই প্রেমিকের মতই মুখের কাটাদাগ সত্ত্বেও ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অতএব, ফল এই দাঁড়াল যে ভালাখিনাদের বাড়িতে যখন পৌছলাম, তখন আমি প্রেমে পড়িনি, কিন্তু পুরনো স্মৃতিকে মনে তোলাপাড়া করতে করতে মনটা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রেমে পড়তে—মনটা উন্মুখও হয়ে উঠেছে ঐ দিকে, কারণ, এতদিন বন্ধুবান্ধবদের

ভালবাসার কাহিনী শুনেছি আর মনে মনে খুবই লজ্জা পেয়েছি নিজে এত পিছিয়ে রয়েছি বলে।

ছবির মত সুন্দর সাজানো ছোট একটি কাঠের বাড়িতে ভালাখিনারা থাকেন—সামনে একটু খোলা জায়গা। ঘণ্টা টিপতেই ফিট্‌ফাট্‌ ছোট একটি ছেলে এসে দরজা খুলে দিল—মস্কোতে সে সময় এরকম ঘণ্টার ব্যবস্থা একান্তই বিরল। ছেলেটি হয় আমার কথা বুঝতে পারল না, নয়তো বাড়িতে সবাই আছেন কিনা সে কথা আমাকে জানাতে চাইল না, তাই আমাকে অন্ধকার ঘরটার ভেতর দাঁড় করিয়ে রেখে ও নিজে আরও বেশী অন্ধকার বারান্দার দিকে ছুটে চলে গেল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম সেই অন্ধকার ছোট ঘরটায়, বারান্দায় যাবার দরজাটা ছাড়া ঘরে আর একটা বন্ধ দরজা ; একবার মনে হল ইস্ 'বাড়িটা কি বিশ্রী বুকচাপা, আবার মনে হল কি জানি বিদেশ-ফেরতা লোকদের এই বোধ-হয় রীতি। মিনিট পাঁচেক পরে হলের দিককার দরজাটি ভিতর থেকে খুলে সেই ছেলেটি এসে ঢুকল, আমাকে নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকল—ঘরটি ছিম্‌ছাম সুন্দর সাজানো, কিন্তু দামী আসবাবপত্র নেই। সোনেচ্‌কাও এসে ঢুকল আমার পেছনে পেছনে।

ওর বয়স বছর সতের। দেখতে বেঁটে, রোগা ফিনফিনে মুখেচোখে হল্‌দেটে ফ্যাকাসে একটা অসুস্থতার ছাপ। মুখে কোনো কাঁটাছেঁড়ার দাগ চোখে পড়ছে না, তাছাড়া সুন্দর টলটলে উজ্জ্বল চোখ দুটি, আর আনন্দ উপচে-পড়া মিষ্টি হাসিটি ঠিক সেই তেমনিই আছে, সে হাসি আমার মনে দাগ কেটে বসে আছে, যাকে আমি এত ভালবেসেছি ছোটবেলায়। ঠিক এমনটি দেখব বলে যেন আশা করিনি তাই গাড়ি থেকে যে ভাব বয়ে এনেছিলাম, চট্‌ করে সেটা প্রকাশ করতে পারলাম না। ইংরেজী কায়দায় ও আমার হাতে হাত মিলাল, ঘণ্টার মত এটাও নতুন। তারপর আমার হাত ঝাঁকিয়ে সোফায় ওর পাশে বসতে অনুরোধ জানাল।

"ওঃ, নিকোলাস, কি খুশী যে হলাম তোমাকে দেখে," কথার সঙ্গে যেন সোনেচ্‌কার চোখেমুখেও অকৃত্রিম আনন্দ ফুটে উঠল। বিদেশ থেকে এসে ওর স্বভাব যেন আরও কোমল, আরও মিষ্টি আরও স্বাভাবিক হয়েছে ; কপাল আর নাকের কাছে এতক্ষণে ছোট ছোট দুটো কাটাদাগ চোখে পড়ল। কিন্তু ওর সুন্দর চোখদুটি আর হাসিটি আমার স্মৃতির সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে, ঠিক সেই আগের দিনেরই মতন ঝকঝকে।

"তুমি কি বদলে গেছ!" সে বলে, "ওঃ, তুমি এখন কত বড়। আর আমি— আচ্ছা আমার সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?"

"বাবাঃ, আমি তোমাকে চিনতেই পারছিলাম না।" মুখে বললাম—মনে মনে যদিও সেইমুহূর্তে ভাবছিলাম, যে কোনো সময়, যে কোনো পরিবেশই হোক না কেন, ওকে চিনতে কক্ষনো আমার ভুল হত না। পাঁচ বছর আগে যে আনন্দ নিয়ে একদিন ওর সঙ্গে "গ্র্যাণ্ডফাদার" নেচেছিলাম, সেই বেপরোয়া আনন্দঘন মুহূর্তটি যেন আবার আজ এইখানে আবার ফিরে এল।

"কেন, আমি কি খুব বিশ্রী হয়ে গিয়েছি?" সোনেচ্‌কা মাথা দুলিয়ে জিজ্ঞেস করে।

"না না, মোটেই না। সামান্য একটু বড় হয়েছ, বয়স বেড়েছে তো।" আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিই, "কিন্তু ঠিক উল্টো তুমি আবার এমন কি—"

"যাকগে যাকগে। তোমার মনে আছে আমাদের সেই নাচ, খেলা, সেণ্ট জেরোম, ম্যাডাম ডোরাটকে? (কোন ম্যাডাম ডোরাট—আমার মনে পড়ছে না—ও নিশ্চয় ছেলেবেলার সেই আনন্দ কল্পনা করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলছে) ওঃ, কি মজাই না করেছিলাম সে সময়।" ওর মুখের হাসিটি সেই আগের মতই রমণীয়, বোধহয় আমার স্মৃতির চাইতেও বেশী, সেই ঢলঢলে চোখদুটি জ্বলজ্বল করছে আমার চোখের সামনে। ও যতক্ষণ কথা বলছিল, আমি ততক্ষণ মনে মনে নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিচ্ছিলাম—শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম ঠিক এই মুহূর্তে আমি প্রেমেই পড়েছি। মনস্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বেপরোয়া হাসিখুশী ভাবটা মিলিয়ে গেল, তার বদলে চোখের সামনে কেমন একটা ছায়া-ছায়া কুয়াশা ভাব ফুটে উঠে সবকিছুকে অস্পষ্ট করে দিল, এমনকি ওর হাসিভরা চোখদুটিও—আমি কেন জানি লাজুক হয়ে উঠলাম, জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল, চোখমুখ লাল হয়ে উঠল।

"কিন্তু সময় বদলে গেছে," ভুরুদুটো সামান্য একটু তুলে সোনেচ্‌কা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে থাকে, "সব জিনিসই আরও মন্দ হয়ে গেছে, আমরাও, তাই না নিকোলাস?"

কোনো জবাব দিতে পারলাম না, ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি।

"সেই ইভিনরা, করনাকোভারা, তারা সব কোথায়? তোমার মনে পড়ে?" আমার রক্তিম, ভয়-পাওয়া মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ও বলতে থাকে, "আর, কি মজার সময় ছিল সেটা!"

তবুও আমার মুখে কথা সরল না।

ম্যাডাম ভালাখিনা ঘরে এসে ঢুকতে সাময়িকভাবে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে নত হয়ে নমস্কার জানালাম, এতক্ষণে মুখেও কথা ফুটল। কিন্তু কি আশ্চর্য, সোনেচ্‌কার আবার তেমনি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল! কোথায় গেল ওর সেই হাসি, আনন্দ আর বন্ধুত্ব, সব যেন একেবারে ভরে গেল, হাসিটা পর্যন্ত বদলে গেল। হঠাৎ যেন ও বিদেশ-ফেরতা একটি অচেনা তন্বীতে রূপান্তরিত হল, ওর লম্বা দোহারা গড়নটি ছাড়া বাকি আর ঠিক সে চেহারা কল্পনা করে আমি এর আগে আশঙ্কিত হয়েছিলাম। মনে হল ওর এ পরিবর্তনের কোনো হেতু নেই, কারণ ওর মা তো সেই আগেরই মতন মিষ্টি করে হাসছেন, হাবভাবও আগের মতই মধুর। ভালাখিনা নিজে একটা মস্ত ইজিচেয়ারে বসে, কাছাকাছি একটা আসনে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। মেয়েটি ইংরেজীতে কি যেন একটু বললেন, সোনেচ্‌কা তাড়াতাড়ি উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল, আমিও স্বস্তি বোধ করলাম। ভালাখিনা একে একে সকলের কথা জিজ্ঞেস করলেন, আত্মীয়স্বজন, আমার ভাই বাবা, তারপর ওঁর নিজের স্বামী হারানোর দুঃখের কাহিনী বললেন, এরপর যখন সব কথা বলা শেষ হয়ে গেল, কিছু আর বাকি থাকল না, তখন আর কি করবেন, নীরবে আমার দিকে চেয়ে বসে রইলেন, সে দৃষ্টি যেন আমাকে বলতে লাগল, 'তা বেশ হয়েছে কিন্তু এবার যদি তুমি উঠে পড়ে একটা নমস্কার ঠুকে রওনা হও, তাহলেই সবচাইতে ভাল হয়।' কিন্তু ইতিমধ্যে আমার তরফে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সোনেচ্‌কা ততক্ষণে তার হাতের কাজ নিয়ে ফিরে এসে একটা কোণে বসেছে, আমার দিকেই যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বলে মনে হল। ভালাখিনা যখন স্বামীকে হারানোর কাহিনী বলেছিলেন, আমি আরেকবার স্মরণ করলাম আমি ভালবেসেছি, ভাবলাম হয়তো মাও এটা ধরতে পেরেছেন,—ফলে হঠাৎ একটা লজ্জার ঝড় এসে আমাকে একেবারে আড়ষ্ট করে দিল, দেহের একটা অঙ্গও যেন আমি আর স্বাভাবিকভাবে নাড়তে পারছি না। উঠে দাঁড়িয়ে এখন বিদায় নিতে গেলে আমাকে ঠিক করতে হবে পা দুটো কোথায় ফেলব, মাথাটা নিয়ে, হাত দুটো নিয়েই বা কি করব। এক কথায় আগের দিন সন্ধ্যেয় আধ বোতল শ্যাম্পেন খেয়ে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এখন আবার হুবহু ঠিক সেই অবস্থা ফিরে এল। আশঙ্কা হল, এগুলোকে সব ঠিকমত চালনা করতে পারব

না, উঠে যেতেও পারব না, প্রকৃতপক্ষে ঘটলও তাই—আমি কিছুতেই উঠতে পারলাম না! আমার লালচে মুখ আর এই অনড় অবস্থা দেখে ভালাখিনা নিশ্চয় খুব অবাক হয়ে গেলেন; কিন্তু আমি ঠিক করলাম এই নড়বড়ে অবস্থায় উঠে বিদায় নেবার চেষ্টা করার চাইতে বরং এই নির্বোধ ভঙ্গীতে বসে থাকাও ভাল। অনেকক্ষণ সেই একইভাবে বসে থাকলাম, মনে মনে কামনা করতে থাকলাম, অভূতপূর্ব কোনো একটা ঘটনা যেন আমাকে সংকট থেকে ত্রাণ করে অবশেষে আমার উদ্ধারকর্তা হয়ে এল সাধারণ দর্শন একটি তরুণ;—হাবেভাবে মনে হল এ বাড়িতে সে বিশেষ পরিচিত, আমাকে নমস্কার জানালে। ভালাখিনা উঠে পড়লেন, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে একটু কথাবার্তার দরকার আছে জানিয়ে বিদায় দিলেন, যাবার সময় আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন, যেন বললেন, "তুমি যদি এভাবে বসে থাকতে চাও চিরজীবন ধরে থাক—আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না।" এই শেষবারের মত একটা আপ্রাণ চেষ্টা করে আমি এবার উঠে পড়লাম, মা ও মেয়ের করুণার দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করার মত অবস্থা মোটেই ছিল না; তাই সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম, যাবার পথে আচম্‌কা ধাক্কা খেলাম, একটা চেয়ারের সঙ্গে সেটা যদিও আমার যাতায়াতের পথ জোড়া করে ছিল না। ধাক্কা খেলাম তার কারণ আমার সমস্ত মনোযোগটাই ছিল যাতে পায়ের তলায় কার্পেটে পা জড়িয়ে হুড়মুড় করে না পড়ি সেই দিকে। কিন্তু খোলা বাতাসে এসে পড়ে, আর দু-চার বার জোরে জোরে বিড়বিড় করার পরে—এত জোরে করলাম যে কুজমা পর্যন্ত বার কয়েক জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ, কি বলছেন?"—আমার এই ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গেল। সোনেচ্‌কাকে আমার ভালবাসার কথা ধীরভাবে ভাবতে লাগলাম, আর ভাবলাম মায়ের সঙ্গে সোনেচ্‌কার অদ্ভুত ব্যবহার। ভীষণ আশ্চর্য ঠেকল আমার কাছে। এরপরে একদিন যখন কথায় কথায় বাবার কাছে সেদিনের সব কাহিনী খুলে বলে জানিয়েছিলাম ম্যাডাম ভালাখিনা আর তার মেয়ের মধ্যে সদ্ভাব নেই, তিনি তখন বলেছিলেন:

"হ্যাঁ, বেচারী মেয়েটা ভারী কষ্টে দিন কাটায় মায়ের বিশ্রীরকম কৃপণতার জন্যে।"

তারপর আবার আবেগের সঙ্গে বললেন, "সত্যি কি অদ্ভুত! ভদ্রমহিলা তো আগে ভারী চমৎকার মানুষ ছিলেন! আমি বুঝতেই পারি না কেন এ

পরিবর্তন? তুমি বোধ হয় সেখানে কোনো সেক্রেটারী দেখনি, না? একজন রুশ মহিলার সেক্রেটারী রাখাটা আবার কোন্ দেশী ফ্যাশান?" বাবা রাগ করে চলে গেলেন।

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি বটে একজন," আমি বললাম।

"ওঃ। তা অন্তত সে কি দেখতে বেশ সুশ্রী?

"না, মোটেই না।"

"বোঝা দুষ্কর! বাবা বিরক্তভাবে একবার কেশে কাঁধটা একটু ঝাঁকালেন।

সেদিন ভ্লুস্‌কিতে ফিরে আসতে আসতে ভাবলাম, "তাহলে, আমিও দেখছি প্রেমে পড়লাম!"

উনবিংশ অধ্যায়

করনাকোভা

দ্বিতীয় পালা করনাকোভাদের। আরবাতে একটা মস্ত বাড়ির দোতলায় থাকেন ওঁরা। সিঁড়িটা ঝকঝকে, তকতকে, সাজানো-গোছানো, তবে দামী জিনিসপত্র কিছু নেই। আগাগোড়া মোটা পশমী কাপড়ে মোড়া কিন্তু ফুলও নেই, আয়নাও নেই। হলঘরটার চক্‌চকে পালিশ করা মেজে মাড়িয়ে ড্রইংরুমে যেতে হল, এ ঘরটাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রুচির সঙ্গে সাজানো, উগ্রতা নেই কোথাও। প্রতিটি জিনিসই ঝক্‌ঝকে, দেখতেও বেশ পোক্ত, যদিও নতুন না কোনোটাই। কিন্তু ফুল বা পর্দা, ছবি বা অন্য কোনোরকমের মজা কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না। রাজকুমারীদের কয়েকজন ড্রইংরুমেই ছিল। সবাই চেহারায় একটা অলস ভাব ফুটিয়ে, নিখুঁতভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে বসে আছে। বেশ বোঝা গেল কোনো অতিথির আগমন প্রতীক্ষা না করলে নিশ্চয় ওরা এভাবে বসত না।

সবচেয়ে বড়জন উঠে এসে আমার কাছাকাছি বসতে বসতে বললে, "মা এক্ষুনি আসছেন।"

প্রায় মিনিট পনের সে আমার সঙ্গে কথাবার্তা চালাল, এমনি কায়দায় যে এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও ছেদ পড়ল না। তবুও···তবুও আমার মন ভরল না। এ যেন নিতান্তই অতিথির সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করা। নানা কথার ভেতর সে জানাল, তাদের ভাই স্তেপান, যাকে তারা ডাকে 'এতিয়েনে'-বলে, সে জাঙ্কারের স্কুলে পড়তে গিয়েছিল, সম্প্রতি অফিসার হয়েছে। ভাইয়ের কথা বলতে বলতে বিশেষ করে ও যে মায়ের অনিচ্ছে সত্ত্বেও অশ্বারোহী সৈন্যদের দলে ঢুকেছে সে কথা বলতে গিয়ে রাজকুমারীর মুখেচোখে একটা ভয়ের ভাব ফুটে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর আর সব বোনেদের, যারা চুপচাপ বসেছিল, তাদের মুখের ভাবও অবিকল তাই হল। আমার দিদিমার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে ওর মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল, অমনি অন্য বোনেদের মুখও ঠিক তাই। সেন্ট জেরোমকে আমি কেমন মেরেছিলাম আর উনি কি

করে টেনে হিঁচড়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বলতে বলতে রাজকুমারী তার বিশ্রী দাঁত বার করে হেসে ফেললে। অমনি বাকিদেরও সঙ্গে সঙ্গে হাসি আর সেই বিশ্রী দাঁত বার করা।

মা ঢুকলেন ; ঠিক সেই আগেরই মত শুকনো পাকানো ছোটখাট চেহারা, চঞ্চল দুটি চোখ আর সেই একজনের দিকে তাকিয়ে অন্যজনের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস! তিনি আমাকে এক হাতে ধরলেন ধরে আরেকটি হাত তুলে ধরলেন আমার ঠোঁটের কাছে। অর্থাৎ আমাকে চুমু খেতে হবে—আমি অবশ্য এমনি বেকায়দায় না পড়লে চুমু খেতাম না, ওটা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করিনি।

"আর, তোমাকে দেখে কি খুশী যে হলাম", সব মেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে উনি অভ্যেস মতন বকর-বকর করতে শুরু করলেন, "আর ঠিক একেবারে ওর মায়ের মত, তাই না লিসা ?"

লিসা মাথা নেড়ে সায় দিল ; যদিও আমি খুব ভাল করেই জানতাম মা-মণির সঙ্গে আমার চেহারার একটুও আদল নেই।

"ওঃ, কত বড় হয়ে গেছ তুমি! তুমি আর আমার এতিয়েনে—তোমাদের দিদিমারা ছিলেন একমায়ের পেটের বোন। মনে আছে তো? না না মাসতুতো বোনের ছেলে না তো, কী যেন, লিসা? আমার মা ছিলেন ভার-ভারা দমিত্রিয়েভ্না, দমিত্রি নিকোলায়েভিচের মেয়ে, আর তোমার দিদিমা ছিলেন নাতালা নিকোলায়েভ্না।"

"তাহলে, ওরা আর আমরা হলাম মাসতুতো বোনদের নাতি-নাতনী, না ?" বড়বোন জবাব দেয়।

"ওঃ হো, তুমি একদম সব গুলিয়ে ফেলছ মা," এবার চটেমটে চেঁচিয়ে ওঠেন, "মাসতুতো বোনদের নাতি-নাতনী হতে যাবে কেন? মাসতুতো বোনদের ছেলেমেয়ে। হ্যাঁ, সেই সম্পর্কই হচ্ছে তোমার আর আমার মানিক এতিয়েনের। ও এরমধ্যেই একজন অফিসার হয়ে গেছে, জান তো? কিন্তু একদিক থেকে সেটা ভাল না—বড্ড বেশী স্বাধীনতা পাচ্ছে। তোমাদের ছেলেছোকরাদের খানিকটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকা ভাল। হ্যাঁ, বাপু, সত্যি কথা বলছি বলে যেন বুড়ী মাসীর ওপর আবার রাগ করো না। এতিয়েনেকে আমি খুব শক্ত হাতে মানুষ করেছি—আমার ধারণা সেটাই উচিত।"

"হ্যাঁ আমাদের সম্পর্কটা হচ্ছে ওইরকম, যেরকম বললুম", উনি বলে চলেন,

"প্রিন্স ইভান ইভানিচ্ ছিলেন আমার আর তোমার মা দুজনেরই মামা। তাহলে আমি আর তোমার মা মাসতুতো বোন, মাসতুতো বোনের মেয়ে নয়। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আচ্ছা তুমি প্রিন্স ইভান ইভানিচের কাছে গিয়েছিলে তো?"

জানালাম তখনও গিয়ে উঠতে পারিনি তবে সেদিনই যাব।

"আঃ, সে কি? ওখানে তো তোমার সর্বপ্রথমেই যাওয়া উচিত ছিল। তুমি কি জান না, প্রিন্স ইভান ইভানিচ্ তোমার পিতৃতুল্য? ওঁর নিজের কোনো ছেলেপুলে নেই, কাজেই তোমরা আর আমার ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে ওঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। ওঁকে তোমাদের বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করা উচিত—বয়েসের জন্যে, সামাজিক পদমর্যাদার জন্যে, সব কিছুরই জন্যে। আমি জানি তোমরা আজকার ছেলেছোক্‌রারা আত্মীয়তা মানো না মোটেই, বুড়ো মানুষদেরও পছন্দ কর না একদম। কিন্তু তোমার এই বুড়ী মাসীর কথাটা একটিবার শোন, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার মাকেও ভালবাসতাম, দিদিমাকেও খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম। তুমি নিশ্চয়ই যাবে, কোনো কারণেই অন্যথা করবে না।"

আমি অতি অবশ্যই যাব বলে স্বীকার করলাম, তারপরে অনেকক্ষণ এসেছি মনে করে এবার উঠে পড়ে যাবার উদ্যোগ করি। কিন্তু ভদ্রমহিলা নিজেই আমাকে আটকালেন।

"না, এক মিনিট দাঁড়াও। তোমার বাবা কোথায় লিসা? এখানে ডাক তো। তোমাকে দেখে কত যে খুশী হবেন", আমার দিকে ফিরে বললেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সত্যি সত্যিই প্রিন্স মিখাইলো এসে ঘরে ঢুকলেন। বেঁটেখাটো, মোটাসোটা, পোশাক ভারী অগোছালো, দাড়ি কামাননি, মুখে-চোখে একটা নির্লিপ্ত ভাব, প্রায় বোকাটেগোছের বলা চলতে পারে। আমাকে দেখে তিনি মোটেই খুশী হলেন না, অন্তত মুখে একটি বারও বললেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী, যাঁকে তিনি খুব ভয় করেন বোঝা গেল; তিনি বললেন, "ওয়াল্ডেমার (আমার নামটা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়েছেন) একেবারে অবিকল ওর মায়েরই মত তাই না?" বলতে বলতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিনি চোখের ইশারা করলেন, স্বামী নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন কারণ তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক ও অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার কাছে এসে না-কামানো গালখানা পেতে দিলেন, আমি বাধ্য হয়েই তাতে চুমু খেলাম।

"তুমি এখনও তৈরি হওনি, আর তোমাকে কিনা এক্ষুনি বেরোতে হবে।"

ভদ্রমহিলা ধমকে উঠলেন সাধারণত যে স্বরে তিনি বাড়ির আর সবাইকে শাসন করেন, "বাইরের পাঁচজনের তোমার ওপর একটা খারাপ ধারণা করানোই তোমার মতলব, সকলেই তোমার ওপর রাগ করুক, তাই চাও, না ?"

"এই যে, এক মিনিট, এক মিনিট", বলতে বলতে প্রিন্স মিথাইলো প্রস্থান করলেন। আমিও নমস্কার করে বিদায় নিলাম।

এই প্রথম শুনলাম যে আমরা প্রিন্স ইভান ইভানিচের উত্তরাধিকারী— সংবাদটা শুনে একটু আশ্চর্য হলাম বটে কিন্তু একটুও প্রীতিকর ঠেকল না।

বিংশ অধ্যায়

ইভিনরা

এখন প্রিন্স ইভানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটাই সবচেয়ে বেশী অপ্রীতিকর বলে মনে হল। যাইহোক আমার পরিক্রমার পথে প্রথমে পড়ল ইভিনদের বাড়ি। ভারস্কয় বুল্‌ভারে চমৎকার একটি বাড়িতে ওঁরা থাকেন। দরজার কাছে দারোয়ান একটা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে—সে দিকে যেতে যেতে আমি যে একেবারেই ঘাবড়াইনি এমন কথা অবশ্য হলপ্ করে বলতে পারি না।

জিজ্ঞেস করলাম বাড়িতে সবাই আছেন কি না।

"খোঁজ করে দেখছি। কার নাম বলব ?" দারোয়ান ঘণ্টা টিপল।

সিঁড়িতে একজন ফুটম্যানের পা দেখা গেল। হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক এসে আমাকে গ্রাস করল, তাড়াতাড়ি ফুটম্যানকে বললাম জেনারেলকে খবর দেবার দরকার নেই, জেনারেলের ছেলের সঙ্গেই প্রথমে দেখা করব। মস্ত চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে নিজেকে ভীষণ ছোট্ট মনে হল (কথাটা আক্ষরিক ভাবে সত্যি) ড্রসকিতে চড়ে যখন সম্ভবত ফটকের ভেতর ঢুকছিলাম, তখনও ঠিক মনে এই ভাবটাই জেগেছিল—আমার ড্রসকি, ঘোড়া, কোচোয়ান সব যেন কেমন ছোট্ট হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি জেনারেলের ছেলে একখানা বই খুলে রেখে কৌচের ওপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ওর মাস্টার সেই হের ফ্রস্ট, যিনি এখনও ওদের বাড়িতেই আছেন ; লঘুপদক্ষেপে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গিয়ে ছাত্রকে জাগিয়ে তুললেন। ইভিন আমাকে দেখে বিশেষ কিছু খুশী হবার ভাব দেখাল না, লক্ষ্য করলাম আমার সঙ্গে যখন কথা বলছে তখনও তাকিয়ে রয়েছে আমার ভুরুজোড়ার দিকে। যদিও ওর ব্যবহার খুবই ভদ্র তবুও মনে হল যেন ঠিক সেই রাজকুমারীর মতন সামাজিকতা বজায় রাখছে মাত্র, আমার সম্বন্ধে ওর কোনই উৎসাহ নেই, হয়তো ওর নিজের বন্ধুবান্ধবের আলাদা গণ্ডী আছে তাই। এগুলো সবই হচ্ছে আমার নিজের কল্পনা আর তার ভিত্তি হচ্ছে ঐ আমার ভুরুর দিকে তাকিয়ে কথা বলা। এক কথায় বলা যায় ওর

ব্যবহার আমার কাছে যতই বিশ্রী লাগুক না কেন, সত্যি কথা স্বীকার করতে গেলে বলতে হয়, সে ব্যবহার ঠিক ইলেনকার ওপর আমার ব্যবহারেরই অনুরূপ। ভেতরে ভেতরে উষ্মা বোধ করলাম; ইভিনের প্রতিটি দৃষ্টিপাতেরই একটা করে মানে বার করতে লাগলাম, আর একবার যখন ইভিন আর হের ক্রুস্ট দুজনের দৃষ্টি মিলল অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার মানে করলাম। এই ছেলেটি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেন?

একটুক্ষণ কথা বলেই ইভিন জানাল ওর বাবা-মা বাড়িতেই আছেন, আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই কি না।

"আমি এখুনি পোশাক পরে নিচ্ছি"—বলে ও পাশের একটা ঘরে চলে গেল, যদিও ও বেশ ভাল পোশাকেই ছিল—নতুন একটা কোট আর সাদা একটা ওয়েস্ট কোট। কয়েক মিনিট পরেই ও ফিরে এল পুরো ইউনিফর্ম পরে, সবকটা বোতাম লাগানো; দুজনে মিলে নীচে গেলাম। অভ্যর্থনা-কক্ষগুলো পার হয়ে গেলাম। সেগুলো যেমনি উঁচু তেমনি দামী আসবাবে সাজান—মার্বেল, গিল্টিকরা, মসলিনে জড়ানো কি সব জিনিস আর আয়নার ছড়াছড়ি। আমরা ঢুকতে ঢুকতেই ওদিক থেকে আরেকটা দরজা দিয়ে ইভিনদের মা এসে ঢুকলেন। উনি খুবই হৃদ্যতার সঙ্গে আত্মীয়ের মতন আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, তারপর ওঁর পাশে একটা কৌচে বসিয়ে আমার পরিবারের সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে লাগলেন।

ম্যাডাম ইভিনকে এর আগে মাঝে মাঝে দু-এক ঝলক দেখেছি মাত্র, আজ ওঁকে খুব ভাল লাগল, তাই মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলাম। লম্বা রোগা চেহারা, ভীষণ ফর্সা, সাদাটে, মুখেচোখে সব সময়েই একটা ক্লান্ত, বিষাদের ভাব। হাসিটা বিষণ্ণ কিন্তু কোমল, চোখ দুটি বড় বড়, ম্লান একটু বাঁকা, তাতে তাঁর মুখে একটা বিষণ্ণ শ্রী ফুটেছে। একেবারে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেননি, কিন্তু সবসুদ্ধ শরীরের ভঙ্গীটাই একটু নুয়ে-পড়া, হাবভাব চলাফেরায় শ্লথভঙ্গী। কথা বলেন অবসন্নভাবে; আর ও এলের অস্পষ্ট জড়ানো উচ্চারণভঙ্গী শুনতে ভারী মজার। উনি আমাকে বাইরের অতিথি হিসেবে ধরেননি। আমার আত্মীয়স্বজনদের কথা শুনে ওঁরও অতীতের মধুর স্মৃতি মনে পড়াতে ভাল লাগল। ওঁর ছেলে কি দরকারে বেরিয়ে চলে যেতে উনি কয়েক মিনিট একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন। আমি সামনে চুপ করে বসে আছি মাথা চুলকাচ্ছি,

এ অবস্থায় কিই বা বলা যায়! উনি কেঁদেই চলেছেন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে। প্রথমে ওঁর জন্যে আমার কষ্ট হল, তারপর ভাবলাম, "ওঁকে আমার সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, কিন্তু কি বলেই বা দিই?" সব শেষে ভারী বিরক্তি ধরল আমাকে এমনিধারা অস্বস্তিতে ফেলেছেন বলে। ভাবলাম—"আমার চেহারাটাই কি এত করুণ না কি উনি এটা ইচ্ছে করেই করছেন? দেখছেন এ রকম অবস্থায় আমার কী ব্যবহার হয়?"

"এ অবস্থায় চলে যেতেও পারব না, নিশ্চয় ভাববেন কান্না দেখে পালিয়ে যাচ্ছি," বসে বসে ভাবতে লাগলাম। চেয়ারে একবার নড়েচড়ে বসি আমার উপস্থিতিটা মনে করিয়ে দিতে।

"উঃ, সত্যি কি বোকা আমি," আমার দিকে তাকিয়ে এবার উনি চোখের জলের ভেতর দিয়েই মৃদু একটু হাসতে চেষ্টা করেন, এমন দিনও আসে, মানুষ যখন বিনা কারণেই কাঁদে।

সোফার ওপর হাত বাড়িয়ে রুমাল খুঁজতে খুঁজতে ভদ্রমহিলা আরেকবার কেঁদে ওঠেন, এবার আরও জোরে।

"আঃ হা, কি বোকার মতই যে কাঁদছি! তোমার মাকে এত ভালবাসতাম, দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম—আর—আর···"

রুমালটা খুঁজে পেয়ে তাই দিয়ে মুখ ঢেকে উনি কেঁদে চললেন। কি অস্বস্তিতে যে পড়লাম, অনেকক্ষণ কাটল সেইভাবে। ভদ্রমহিলার ওপর ভীষণ আক্রোশ জন্মাল, কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখ হল আগের চাইতেও বেশী। এ অশ্রু সত্যিই অকৃত্রিম দুঃখের অশ্রু; আমি ভাবতে লাগলাম ভদ্রমহিলা কাঁদছেন আমার মা-মণির দুঃখে, আসলে উনি নিজে বর্তমানে অসুখী, কিন্তু অতীতে একদিন সুখের মুখ দেখেছিলেন। জানি না এ পর্ব কি করে শেষ হত যদি না হঠাৎ ছোট ইভিন এসে ঘরে ঢুকে জানাত—তার বাবা মাকে ডাকছেন। উনি উঠে ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করতেই ভদ্রলোক নিজেই এসে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক বেঁটেখাটো, গোলগাল, বেশ মোটা কালো একজোড়া ভুরু, চুলগুলো কিন্তু সব পাকা, গোল করে ছাঁটা, মুখের ভাব অতি কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালাম; কিন্তু বুড়ো ইভিন—তাঁর সবুজ কোটে তিনটে "তারকা"—তিনি আমাকে কোনোরকম প্রতিনমস্কার জানানো দূরে থাকুক, চোখ তুলেও একটিবার তাকিয়ে দেখলেন না। মনে হল যেন আমি মানুষই

নই, কোনরকম মনোযোগের অযোগ্য—নিতান্তই' একটা চেয়ার কিংবা জানালা, কিংবা যদি মানুষ হয়েও থাকি তো মূল্য ওগুলোর চাইতে বেশী নয়।

"কই, তুমি তো দেখছি কাউণ্টেসের কাছে এখনো চিঠি লেখনি," ভদ্রলোক বেশ কঠিন মুখ করে দৃঢ়তার সঙ্গে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ফরাসীতে।

"বিদায়, মঁসিয়ে ইরতেনিয়েভ", আচম্‌কা বলে উঠলেন ম্যাডাম ইভিনা আমার দিকে তাকিয়ে মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে এতক্ষণের বিষণ্ণতার বদলে তাঁর ভঙ্গিতে দর্পের ভাব ফুটে উঠল, ছেলের মতই উনিও আমার ভুরুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বললেন। আবার একবার আমি স্বামী-স্ত্রীকে নমস্কার জানালাম, স্বামীর ওপর অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া হল যেন একটা জানালা খোলা কিংবা বন্ধ করা হল। আমার সঙ্গে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকল যে ইভিন সে দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিল, কথায় কথায় জানাল ও বোধহয় শীঘ্রই পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবে, কেননা ওর বাবা নাকি সেখানে একটা চাকরি পেয়েছেন (মস্ত নাম করা একটা চাকরির উল্লেখ করল ইভিন)।

"থাকগে, বাবা পছন্দ করুন বা না করুন", ড্রস্‌কিতে বসতে বসতে নিজের মনেই বিড়বিড় করি, কিন্তু এ বাড়িতে আমি আর জীবনে কোনদিন পা দেব না। একজন তো আমাকে দেখে কেঁদেই ভাসিয়ে দিলেন যেন কি একটা মহা দুঃখের বস্তু আমি, আর ঐ হতচ্ছাড়া ইভিন তো নমস্কারটুকু পর্যন্ত করল না। আচ্ছা, আমিও দেখিয়ে দেব······", কি করে যে দেখাব, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা নেই, তবুও এই কথাটাই প্রথমে মনে এল।

এর পরে অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত বাবার উপদেশ বাণী শুনেছি ইভিনের মত নামী লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখা নাকি একেবারেই অপরিহার্য, আমার মত একটা বাচ্চার ওপর ইভিনের পর্যায়ের লোক কোনরকম মনোযোগ দেবেন, সে আশাও নাকি নিতান্তই বাতুলতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি—তবুও বহুদিন পর্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছিলাম।

একবিংশ অধ্যায়

প্রিন্স ইভান ইভানিচ্

"ব্যস্, এবারে একবার নিকিতস্কায়াতে, তাহলেই খতম।" কুজমাকে ডেকে বললাম। প্রিন্স ইভান ইভানিচের বাড়ির দিকে গাড়ি চলল।

কয়েকবার অভিজ্ঞতার ফলে এবারে আমার মনে একটু আত্মবিশ্বাস জেগেছে, কাজেই প্রিন্সের বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন আমি মোটামুটি স্বাভাবিক, সুস্থির; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রিন্সেস করনাকোভার কথা, আমরা নাকি প্রিন্সের উত্তরাধিকারী সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল ফটকের সামনে অপেক্ষা করছে আরও দুটি গাড়ি—ব্যস্, আর কথা নেই অমনি সেই পুরনো লজ্জা এসে আবার আমাকে চেপে ধরল।

বুড়ো দারোয়ান এসে দরজা খুলে দিল, ফুটম্যান আমার কোট খুলে নিল, ড্রইংরুমে বসে আছেন তিনজন ভদ্রমহিলা, দুজন ভদ্রলোক আর বিশেষ করে প্রিন্স নিজে—যিনি সাধারণ একটা কোট পরে কৌচের ওপর বসেছিলেন —আমার কল্পনায় মনে হল এঁরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন আর ভাবছেন এ একজন ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আর অমনি ওঁদের মনে একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠছে। প্রিন্সের ব্যবহার চমৎকার বন্ধুর মতন; আমাকে চুমু খেলেন অর্থাৎ এক মিনিটের জন্য ওঁর নরম শুক্নো ঠোঁট দুটি আমার গালে ছোঁয়ালেন, আপাতত কি করছি, ভবিষ্যতে কি করবার ইচ্ছে—সব জিজ্ঞেস করলেন, ঠাট্টা তামাসা করলেন, সেই যে দিদিমার উৎসবের দিনে কবিতা লিখেছিলাম, এখনও তেমনি লিখি কিনা তারপর নেমন্তন্ন করলেন সেদিন তার সঙ্গে ডিনার খেতে। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে যত বেশী মিষ্টি ব্যবহার করছেন ততই বেশী আমার মনে হচ্ছে, এ সবই ছলনা, আমার সম্বন্ধে ওঁর বিরূপ মনোভাবটা পাছে আমি ধরতে পারি, তাই সেটা চাপা দেবার চেষ্টা মাত্র। ওঁর একটা মুদ্রাদোষ আছে, মুখ-ভর্তি বাঁধানো দাঁত বলেই বোধ হয়— প্রত্যেক বার কথার শেষে ওপরের ঠোঁটটা একটু উঁচু করে তুলে ধরে নাক দিয়ে

একটা আওয়াজ বার করেন, যেন ঠোঁটটাকেই নাকের ভেতর টেনে নিচ্ছেন; আজকে যখন তিনি অমনি করছিলেন, আমার মনে হচ্ছিল যেন বলছেন, হ্যাঁ হে ছোক্‌রা, আমি জানি। তোমার আর বলে দেবার দরকার নেই, আমি নিজেই জানি যে তুমি আমার উত্তরাধিকারী, হ্যাঁ, উত্তরাধিকারী।

ছোট থাকতে আমরা সবাই প্রিন্সকে "দাদু" বলে ডেকেছি কিন্তু এখন আমি ওঁর উত্তরাধিকারী মনে হতে আর কিছুতেই ওই ডাকটা জিভে সরলো না, আবার অন্য অতিথিদের মতন "মহামান্য" বলে ডাকতেও কেমন যেন অপমান বোধ হচ্ছে—অগত্যা গোটা কথাবার্তাটা আমি বিনা সম্বোধনেই চালিয়ে দিলাম। সব চাইতে মুস্কিলে পড়লাম প্রিন্সের বৃদ্ধা বোনকে নিয়ে—উনিও একজন উত্তরাধিকারিণী, প্রিন্সের বাড়িতেই থাকেন। ডিনারের সময় আমার পাশেই রাজকুমারীর চেয়ার—আমার ধারণা হল তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন না, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমিও ওঁর সঙ্গে সমান তালে প্রিন্সের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাই আর প্রিন্স যে আমাদের দিকটায় মোটেই তাকাচ্ছেন না, তার কারণ হচ্ছে এদিকটায় আছি আমরা দুজন, দুজনেই ওঁর উত্তরাধিকারী অর্থাৎ দুজনেই সমান বিরক্তিভাজন, তাই।

"হ্যাঁ, সত্যি তুমি ভাবতেই পারবে না কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী লাগছিল আমার", সেদিনই সন্ধ্যে বেলায় দ্মিত্রির কাছে বলছিলাম নিজেকে কারও উত্তরাধিকারী বলে ভাবতে যে বিতৃষ্ণা জাগছিল সেটা ওকে বোঝাতে গিয়ে (মনের এই ভাবটা আমার পক্ষে খুবই সুরুচির পরিচায়ক বলে মনে হয়েছিল) "সত্যি আজ প্রিন্সের সঙ্গে দুটি ঘণ্টা কাটাতে আমার যে কি কষ্টই হয়েছে। মানুষ তিনি চমৎকার, কি সুন্দর ভদ্র ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে", ব্যাখ্যা করে বলি পাছে দ্মিত্রি মনে করে প্রিন্সের কাছে কোনো কারণে অপমানিত হয়েছি বলে এ সব কথা বলছি, "কিন্তু ঐ যে প্রিন্সেস যিনি ওঁর বাড়িতেই থাকেন, আর ওঁর সামনে সব সময় হাত কচলান, পাছে, সবাই আমাকেও সেই পর্যায়ে ফেলে সেই চিন্তাটাই আমাকে খালি কুরেকুরে খাচ্ছিল। মানুষ হিসেবে প্রিন্সের তুলনা নেই, যেমনি ভদ্র তেমনি রুচিবান্, সকলের সঙ্গে ব্যবহারেই, কিন্তু দেখলে সত্যি দুঃখ হয় প্রিন্সেসের সঙ্গে উনি কি জঘন্য ব্যবহার করেন। অর্থ জিনিসটা সত্যিই অনর্থের মুল, সব সম্বন্ধই নষ্ট করে দেয়।

"দেখ, আমি ভাবছি কি জান, প্রিন্সের কাছে আমার সব কথা খুলে বলাটাই বোধ হয় ভাল হবে। বলব, মানুষ হিসেবে ওঁকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি, কিন্তু

তাঁর সম্পত্তি চাই না ; অনুরোধ করব উনি যেন দয়া করে আমাকে কিছু না দিয়ে যান, একমাত্র তাহলেই আমি ওঁর বাড়িতে আবার যেতে পারি।

দ্মিত্রি আমার কথা শুনে একটুও হাসল না, বরঞ্চ কয়েক মিনিট গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করল, তারপর আমাকে বলল :

"আসল কথা কি জান ? তুমি ভুল করছ। হয় তুমি এ কথা ভাববে না যে আর সবাই তোমাকে ঐ প্রিন্সেসের সঙ্গে একচোখে দেখছে, অথবা যদি নিতান্ত ভাবও তাহলে তোমাকে তোমার অনুমানের ভিত্তিতে আরও একটু এগোতে হবে ; অর্থাৎ কিনা তুমি মনে করতে অন্যেরা তোমার সম্বন্ধে কি ভাবছে তা তুমি জান কিন্তু যেহেতু সেগুলো তোমার আসল উদ্দেশ্যের চাইতে অনেক, অনেক দূরে, অতএব তাকে তুমি ঘৃণা কর আর তাই এই ভুল ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এমন কোনো কিছুই তুমি ধর্তব্যের মধ্যে আন না। এখন, ধর, তুমি যে অন্যদের ধরতে পেরেছ, এটা যদি আর সবাই ধরতে পারে," দ্মিত্রি বুঝতে পারে ওর কল্পনায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে ; একটু থেমে আবার তাই তাড়াতাড়ি বলে, "তা যাক্‌গে, একেবারে কিছুই ধরতে না পারার চাইতে সেটা ভাল।"

আমার বন্ধু ঠিকই বলেছিল। এব পরে অনেক অনেক দিন কেটে গেছে, বহুদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে শিখেছি, যে কথা একান্তই নিজের মনের গোপনে থাকা উচিত, তা সে যত মহৎই হোক না কেন, তা নিয়ে চিন্তা করা নিতান্তই দোষের, প্রকাশ করায় তো ক্ষতির সীমা নেই। আরও জেনেছি মহৎ চিন্তা আর মহৎ কাজে কত দুস্তর ব্যবধান। আমার বিশ্বাস যে কোনো একটা মঙ্গল চিন্তাকে আগে থেকে ঘোষণা করে দিলে তাকে কাজে পরিণত করতে কত বাধা আসে, বেশীর ভাগ সময় শেষ পর্যন্ত অসম্ভবই হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অন্তরের সুচিন্তা প্রকাশে যে আত্মতৃপ্তি, যৌবনে কি কেউ তা দমন করতে পারে ? তারপর বহুদিন গত হলে তবেই কেবল মানুষ এ সম্বন্ধে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারে, তখন কেবল হা-হুতাশ করা—ঐ সুন্দর চিন্তাটি যেন একটি পুষ্পকোরক, ফুটবার আগেই তাকে বৃন্তচ্যুত করা হয়েছে এখন তা মাটিতে লুটাচ্ছে দলিত মথিত হয়ে।

সেদিন ছবি আর তামাকের পেছনে টাকা খরচ করে আমার পকেট শূন্য, অতএব আমি—যে আমি একটু আগেই দ্মিত্রিকে বলছিলাম যে টাকাই একমাত্র মানুষের আত্মীয়তা নষ্ট করে—সেই আমাকেই গ্রামে যাবার জন্যে বিদায়ের আগে বন্ধুর কাছ থেকে পঁচিশ রুবল ধার করতে হল, আর সে ধার শোধ দিতে পারিনি তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আমার বন্ধুর গোপন কথা

"কুন্তসেভো" যেতে যেতে ফিটনে বসে আমাদের কথাবার্তা চলছিল। দ্‌মিত্রি সকালবেলা তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে আমায় বাধা দিয়েছিল, কিন্তু দুপুরে লাঞ্চের পরে নিজে এসে আমায় নিয়ে চলেছে ওদের গ্রামের বাড়িতে সারা দুপুরটা এমনকি সম্ভব হলে রাতটাও কাটাতে। গাড়ি চলতে শুরু করল; ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শহরের নোংরা সরু রাস্তা আর গাড়ি-ঘোড়ার কানে তালা-লাগান শব্দ, আমার আশেপাশে ফুটে উঠল দিগন্তবিসারী মাঠের শ্যামলিমা, কানে আসতে লাগল ধূলিভরা পথে আমাদের গাড়ির চাকার মৃদু ঘর্ঘর আওয়াজ—সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন এতক্ষণে গত দিনের নতুন পাওয়া স্বাধীনতা আর হরেক রকম অভিজ্ঞতার আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। দ্‌মিত্রিও বেশ শান্ত ও সহৃদয়, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গলার রুমাল ঠিক করছে না, কিংবা অভ্যাস মত চোখ পিটপিট বা বাঁকা করেও তাকাচ্ছে না। আমার উচ্চস্তরের হৃদয়বৃত্তির কথা ওকে জানিয়ে আমি পরম পরিতৃপ্ত, ভাবছি এর পরে নিশ্চয় কলপিকভের সঙ্গে আমার কাপুরুষের মত ব্যবহারের কথা ও ভুলে যাবে, এর জন্যে আমাকে আর ঘৃণা করবে না। বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে নানা গোপন কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে লাগলাম—এমন সব গোপন কথা যা নিতান্ত প্রাণের বন্ধুরাও অনেক সময়ে ভাঙে না।

দ্‌মিত্রি তার পরিবারের সবাইকার গল্প করল, যাঁদের সঙ্গে আমার এখনও আলাপ পরিচয় ঘটেনি—মায়ের কথা বলল, বোন মাসী সকলের কথা, আর বলল সেই ভদ্রমহিলার কথা যার সম্বন্ধে ভলোদিয়া আর ডুবকভ ইঙ্গিতে বলে, "সেই ছোট লাল মাথাটি" এঁর সম্বন্ধে দ্‌মিত্রি নাকি বিশেষ অনুরাগী। মায়ের সম্বন্ধে ও বলল নিরুত্তাপ অথচ বেশ গর্বিত প্রশংসার ভঙ্গীতে যেন এ সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদেরই অবকাশ রইল না। মাসীর সঙ্গে কথা বলল বেশ উৎসাহের সঙ্গে তবে একটু যেন তাচ্ছিল্যের ভাব মিশিয়ে, বোনের কথা বিশেষ কিছুই বলল না,

যেন আমার কাছে ওর কথা বলতে লজ্জা করছে ; কিন্তু সেই লাল্‌চে চুল ভদ্রমহিলা……তার কথা বলতে গিয়ে দ্‌মিত্রি যেন একেবারে উৎসাহে, জলজল করে উঠল—ভদ্রমহিলার আসল নাম লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌না, কি একটা আত্মীয়তা সূত্রে ওদের বাড়িতেই থাকেন ; বয়স্কা, অবিবাহিতা।

"হ্যাঁ, সে চমৎকার মেয়ে, লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলেও দ্‌মিত্রি সাহসের সঙ্গে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তরুণী নয়, বয়স বেশ বেশীই হয়েছে বলা চলে, দেখতেও কিছু সুরূপা নয়, কিন্তু কেবল রূপকে ভালবাসা অর্থহীন মূর্খামি মাত্র। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কেন যে মানুষ রূপ নিয়ে মজে, ওটা তো নিছক বোকামি (দ্‌মিত্রি এমনভাবে বলল যেন সম্প্রতি একটা নতুন বিশেষ শক্তিশালী সত্য আবিষ্কার করেছে)। কিন্তু ওর আত্মা পবিত্র, মনটি কি নিখুঁত, কি চমৎকার ন্যায় নীতিটাকে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি এমন আর একটি দ্বিতীয় মেয়ে, তুমি খুঁজে পাবে না আজকালকার দিনে। বর্তমান যুগে নাকি কিছুই পাওয়া যায় না—কেন জানি না দ্‌মিত্রির আজকাল সবসময় এইটি বলা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে ; কথাটা ওকে বেশ মানায়ও।

কেবল আমার ভয়, রূপের পূজারীদের যথেষ্ট ছি ছি করার পরে এবারেও শান্তভাবে বলতে থাকে, তোমার দিক থেকে ওকে ঠিকমত বুঝতে বা জানতে বেশ কিছুটা সময় নেবে। ও বিনয়ী একটু বরং গম্ভীর ; নিজের সুন্দর গুণগুলোকে বাইরে জাহির করতে পছন্দ করে না। যেমন ধর না কেন, আমার মা, এমন চমৎকার বুদ্ধিমতী মহিলা লিউবভ্‌ সার্জিয়েভনাকে জানেন ও বহু বছর ধরে—কিন্তু হলে ,কি হবে ওঁকে ঠিকমত বুঝতে পারেন না। এমন কি কাল রাতেও—তোমাকে বলছি কাল রাতে কেন আমি অতটা মনমরা হয়েছিলাম। গত পরশুদিন লিউবভ্‌ সার্জিয়েভনা আমাকে বলেছিল ওর সঙ্গে ইভান ইয়াকোভ লেভিনের কাছে যেতে—ইভান ইয়াকোভ্‌লেভিনের নাম শুনেছ নিশ্চয়, লোকে বলে পাগল, কিন্তু আসলে একজন মস্ত গুণী লোক। লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌না খুব ধর্মপ্রাণা তাই তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে। ও মাঝে মাঝেই তার কাছে যায় কথাবার্তা বলে, গরীব লোকদের দান করবার জন্যে কিছু টাকা-পয়সা দেয়, ওর নিজস্ব রোজগার থেকে। সার্জিয়েভ্‌না সত্যি অতি চমৎকার, তুমি নিজেই দেখতে পাবে। কাজেই ওর সঙ্গে আমি গেলাম আর ইভান ইয়াকোভ্‌লেভিনের মত গুণী ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু মা এসব বুঝতে পারেন না—খালি ভাবেন যত সব

কুসংস্কার। কাল রাতেই জীবনে প্রথম আমি এই নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, দ্‌মিত্রি কথা শেষ করে গলায় একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করল, কালকের রাতের স্মৃতিটা মনে করে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

"যাক্‌গে কিন্তু তুমি কি ভাবছ? তার মানে শেষ পর্যন্ত কিরকমটা দাঁড়াবে? অথবা তুমি কি কখনও ওর সঙ্গে কথা বলেছ এ নিয়ে? আলোচনা করেছ তোমার বন্ধুত্ব আর ভালবাসার কোথায় শেষ হবে?" ওর মনটাকে ঝগড়ার অপ্রিয় স্মৃতি থেকে সরিয়ে আনতে আমি অন্য প্রসঙ্গ টানি।

"অর্থাৎ তুমি জিজ্ঞেস করছ, আমি বিয়ের কথা কিছু ভাবছি কিনা?" দ্‌মিত্রি আবার রাঙ্গা হয়ে উঠলেও আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে খোলাখুলিই জিজ্ঞেস করে।

"বেশ তো", আমি নিজেকে বোঝাই এতে আপত্তি কি? "আমরা এখন সাবালক তাই ফিটনে বসে দুটি বন্ধু ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে আলোচনা করছি। আড়াল থেকে লুকিয়ে কেউ এখন আমাদের দুজনকে দেখলে আমাদের কথা শুনলে খুব মজা পাবে।"

"কেন নয়?" আমায় ঘাড় নাড়তে দেখে দ্‌মিত্রি আবার শুরু করে, "সেটা আমার লক্ষ্য, ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো একজন লোকেরই মত আমারও ইচ্ছে যতটা সম্ভব সুখী হওয়া, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই জীবনটা ভালভাবে কাটাব ওর সঙ্গে। কেবলমাত্র ও নিজে যদি ইচ্ছুক হয় তবে শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীর চাইতেও ওকে নিয়েই আমি বেশী সুখী হব।"

এমনি সব কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে থাকায় আমাদের নজরে পড়ল ফিটন কুন্তসেভো পৌঁছে গেছে, এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টির আর বেশী দেরি নেই। সূর্য আমাদের ডানদিকে কুন্তসেভো বাগানের পুরনো ঝাঁকড়া গাছগুলোর মাথার সামান্য ওপরে, রক্তবর্ণ গোল থালাটার অর্ধেকটাই ধূসর রঙের স্বল্পালোকিত মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। বাকি আধখানা থেকে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ আলোর ঝলক ছুটে এসে বাগানের গাছগুলোকে রাঙিয়ে দিচ্ছে, পাঁশুটে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় ঘন সবুজ পাতা ভরা ঝাঁকড়া মাথাগুলো রক্তবর্ণ দীপ্তি ছড়াচ্ছে। আর এর ঠিক উল্টো, আমাদের সামনের দিকে দূর-দিগন্তে শিশু বার্চগাছের মাথায় মাথায় লাল্‌চে মেঘের সমারোহ।

ডানদিকে সামান্য একটু দূরে ছোট ছোট গাছ, ঝোপগোছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে গ্রীষ্মাবাসের কুটিরগুলোয় নানা রঙে রঙ করা ছাদ—কতকগুলো

রক্তবর্ণ রশ্মির প্রভায় ঝলমলে, বাকিগুলো পাঁশুটে মেঘের আলো গায়ে মেখে বিবর্ণ। নীচে বাঁদিকে নিথর পুকুর, টলটলে নীল জল, উঁচু পাড় ঘিরে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ সবুজ উইলো গাছ, চারিদিকে ছায়া মেলে ; পুকুর ছাড়িয়ে পথে ধোঁয়া ধোঁয়া কালো জমি মাঝখান দিয়ে সবুজ একটি রেখা মাঠকে দুভাগে ভাগ করে সোজা গিয়ে মিশেছে, দূরে দিগন্তে যেখানটা সীসের মত কালো ভয়ঙ্কর। ফিটন একই গতিতে চলেছে মসৃন রাস্তা ধরে। দুপাশে রাই গাছের সবুজ বন্যা মাঝে মাঝে এখানে সেখানে শীষ ধরছে। বাতাস নিথর পরিষ্কার ; চারিদিকের গাছপালা, পাতা, শস্যভরা মাঠ সব নিষ্কম্প, সতেজ, পরিচ্ছন্ন। মনে হয় যেন প্রতিটি গাছের পাতা প্রতিটি ঘাসের শীষ, যে যার নিজের নিজের খুশীমতন স্বাধীন জীবন যাপন করছে। রাস্তার পাশে চোখে পড়ল কালচে সরু একটা পায়ে চলা পথ, ছোট ছোট ঘন সবুজ সরষে গাছের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে ; এই পথটি কেন জানি স্পষ্টভাবে আমার নিজের গ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দিল গ্রামের কথা মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন মনে পড়ল সোনেচ্‌কা—মানুষের চিন্তাগুলো কি করে যে এমনি মিলেমিশে জট পাকিয়ে যায় জানি না—আর আর মনে পড়ল ওকে আমি ভালবেসেছি !

দ্‌মিত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যতই গভীর হোক আর ওর খোলামেলা স্বভাব আমার যতই ভাল লাগুক—লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌না সম্বন্ধে ওর মনের কথা, মনের ইচ্ছে আর বেশী জানতে চাইলাম না ; কিন্তু ভাবলাম সোনেচ্‌কার সঙ্গে আমার প্রেমের কথা ওর জানা উচিত—সে প্রেম অবশ্য এর চেয়ে উঁচু স্তরের বলেই আমার ধারণা। তবুও জানি কেন শেষ পর্যন্ত মন খুলে ওকে সবকথা বলতে পারলাম না, কিছুতেই বলতে পারলাম না কি চমৎকার হবে যখন সোনেচ্‌কাকে বিয়ে করে আমি গ্রামের বাড়িতে থাকব, খুদে খুদে বাচ্চারা মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে, আধো-আধো স্বরে আমায় 'বাবা' বলে ডাকবে আর দ্‌মিত্রি যখন তার স্ত্রী লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌নাকে নিয়ে ভ্রমণের পোশাক পরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, কি খুশীই যে হব আমরা ! কিন্তু এ সব কিছুই না বলে অস্তমিত সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, "দেখ, দেখ, দ্‌মিত্রি কি সুন্দর।"

দ্‌মিত্রি কোনো কথা বলল না ; মনে হল ও চটেছে—বিশেষ চেষ্টা করে ও আমার কাছে মনের গোপন রন্ধ্র খুলল আর আমি কিনা তার জবাব

দিলাম প্রকৃতির দিকে ইশারা করে—সে প্রকৃতি সম্বন্ধে এমনিতেই ও চিরদিন উদাসীন নির্বিকার। প্রকৃতি আমার মনকে যেমনি দোলা দেয়, ওকে দেয় সম্পূর্ণ অন্যভাবে। তার রূপ ওকে মুগ্ধ করে না, তার মূল্যবোধে ও আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতিকে ও ভালবাসে মন দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে নয়।

"আমার আজ কি আনন্দ," এরপরে আমি বলি দ্মিত্রি যে নিজের ভাবেই বিভোর সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই, "আমার বিশ্বাস একটা তরুণীর কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম ছোটবেলায় একবার যার প্রেমে পড়েছিলাম—আজ আবার তার সঙ্গে দেখা হল।" পরম উৎসাহভরে শেষটুকু যোগ দিই, "এবার সত্যি সত্যিই ওর প্রেমে পড়েছি, তাতে কোনো ভুল নেই।"

দ্মিত্রির মুখেচোখে একটা নিরাসক্ত ভাব লক্ষ্য করা সত্ত্বেও আমি একে একে আমার প্রেম, ভবিষ্যতের বিবাহিত জীবনের আমার সব স্বপ্নের কথা তাকে খুলে বললাম। কিন্তু কি আশ্চর্য আমার অন্তর সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার আবেগের জোর কমে যেতে থাকে।

বার্চে ঘেরা যে চওড়া পথটি বাড়ি পর্যন্ত গেছে সেই পথটিতে ঢুকতে ঢুকতেই বৃষ্টি এসে গেল ; মস্ত কয়েকটা ফোঁটা টপটপ করে আমার হাতে আর নাকে এসে পড়ল। বার্চের কচি পাতায় পট্‌পট করে কি যেন এসে পড়ছে, গাছগুলো সব ডালপালা নুইয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে সে নির্মল ধারাকে গ্রহণ করছে—আনন্দিত মনে গাছপালারা স্নান করছে, গোটা পথটা সুবাসে ভরে গেছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড় লাগালাম তাড়াতাড়ি হবে বলে। বাড়িতে ঢোকার মুখেই দেখা হল চারজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে, দুজনের হাতে কিছু কাজ, আরেকজনের হাতে বই আর চতুর্থ জন দ্রুতগতিতে আসছেন উল্টো দিক থেকে সঙ্গে একটা ছোট্ট কুকুর। দ্মিত্রি তক্ষুনি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল তার মা, বোন, মাসী আর লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌নার। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্য থামলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিটাও জোরে চেপে এল।

"চল, বারান্দায়ই যাওয়া যাক, ওখানে আরেকবার পরিচয় করিয়ে দিও তোমার বন্ধুর সঙ্গে।" বোধ হয় দ্মিত্রির মা বললেন। ভদ্রমহিলাদের নিয়ে আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নেখলুইদভ পরিবার

এই দলটির মধ্যে যিনি সবচাইতে বেশী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি হচ্ছেন লিউবভ্ সাজিয়েভ্না, পুরুষতন বোনা জুতো পায়ে, কোলে একটা আদুরে ছোট্ট কুকুর—তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন সকলের পরে আর উঠতে উঠতে দুবার থেমে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন তারপর চুমু খেলেন কোলের কুকুরটাকে। কোনমতেই সুশ্রী বলা চলে না, চুল লালচে, শরীরটা রোগা-রোগা, মাথায় ছোট আর একপেশে: বিশেষ করে ঐ একপাশে চুল আঁচড়াবার অদ্ভুত কায়দাতেই যেন ওঁর সাধারণ মুখখানা আরও সাদা-মাঠা দেখাচ্ছে। বন্ধুকে খুশী করবার ইচ্ছেয় শত চেষ্টা করেও কিন্তু আমি ওঁর মুখখানায় কোনো শ্রী খুঁজে পেলাম না। বাদামী চোখ দুটির ভাব যদিও সরল তবুও এত কুতকুতে আর বোকা-বোকা যে তাকেও সুন্দর কিছুতেই বলা চলে না। এমন কি হাত দুটি, যা হচ্ছে মানুষের চরিত্রের নিদর্শন, সে দুটি যদিও বিশ্রী বড় বা আকারে খারাপ নয় তবুও লাল-লাল, কর্কশ।

বারান্দায় পৌঁছে ভদ্রমহিলারা সবাই আমার সঙ্গে দুচারটে কথা বলেই আবার যে যার কাজে মন দিলেন দ্মিত্রির বোন ভেরেনকা বাদে—সে তার ঘন বাদামী রঙের বড় বড় চোখ মেলে গভীর ভাবে আমাকে লক্ষ্য করছিল। এবার আঙুল ঢুকিয়ে পাতা ঠিক্ করা কোলের ওপর-রাখা বইখানা তুলে নিয়ে জোরে পড়তে শুরু করে।

প্রিন্সেস্ মারিয়া আইভানোভনার বয়স বছর চল্লিশ, লম্বা, সুবাস চেহারা। টুপির তলা থেকে কিছু পাকা চুল বেরিয়ে রয়েছে, তাই দেখে মনে হয় বয়স হয়তো আরও একটু বেশী হতেও পারে। কিন্তু মুখের ডৌলটি ভারী কমনীয়, বিশেষ করে টানাটানা চোখদুটিতে চিক্‌চিক্ করছে খুশীর একটা আভা—এতে যেন তার বয়েসটা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। চোখদুটি বাদামী, সম্পূর্ণ খোলা, ঠোঁটদুটি ভারী পাতলা—ভঙ্গিটা যেন একটু কঠিন; নাকটা মোটামুটি

সাধারণ বাঁদিকে সামান্য একটু হেলান ; হাত বেশ বড় বড় পুরুষালী, কিন্তু আঙুলগুলো সরু সরু, তাতে আংটি নেই। ঘন নীল রঙের একটি আঁটসাঁট পোশাক পরেছেন, তাতে দেহের সৌষ্ঠব যেন ফুটে বেরুচ্ছে, আর তাতে তিনি বেশ গর্বিত। ভদ্রমহিলা সোজা টানটান হয়ে বসে কি যেন একটা সেলাই করছেন। আমি বারান্দায় ঢুকতে তিনি আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন যেন সামনাসামনি নিরীক্ষণ করতে চান, ছেলের মতই মাও সেই একই কঠিন, আবেগহীন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বলতে থাকেন আমাকে তিনি অনেকদিন আগে থেকেই চেনেন, দ্মিত্রির কাছে কত কথা শুনেছেন আমার, আরও ভাল করে আলাপ পরিচয় করতেই তিনি আমাকে গোটা দিনটা এখানে কাটাতে নেমন্তন্ন করছেন—"এখানে তোমার যা মন চায় কর। আমরা কে কী মনে করব এসব একদম ভেব না। তুমি থাকায় আমাদের কোনই কাজের ব্যাঘাত হবে না। তোমার ইচ্ছে হলে বেড়াও, ইচ্ছে হলে পড়াশুনা কর, ইচ্ছে হলে ঘুমোও—যখন যেটা ভাল লাগে কর।"

সোফিয়া আইভানোভ্না বয়স্কা, অবিবাহিতা, প্রিন্সেসের সব চাইতে ছোট বোন, কিন্তু দেখলে মনে হয় বড় মোটাসোটা, বেঁটেখাটো কর্সেটের বাঁধনে ফেটে পড়া একজাতীয়া অবিবাহিতা মহিলা দেখা যায়, তিনি সেই ধরনের। মনে হয় শরীরের সব স্বাস্থ্যটুকু যেন ঠেলে উর্ধ্বমুখী হয়েছে যে কোনও মুহূর্তে ওঁকে দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে পারে। বডিসের সূঁচালো অগ্রভাগ পার হয়ে ছোট ছোট বেঁটে বেঁটে হাতদুটি একজায়গায় মেলে না। দুইবোনের চেহারায় ভারী মিল—যদিও মারিয়া আইভানোভ্নার চুল ও চোখ কালো আর সোফিয়া আইভানোভ্না গৌরাঙ্গী, নীলনয়না, চোখদুটি বড় বড়, তাতে খুশীর ভাব, অথচ শান্ত। তাঁদের মুখের ভাব এক—নাকটি, ঠোঁট দুটিতে পর্যন্ত মিল, কেবল তফাৎ সোফিয়ার নাক আর ঠোঁট সামান্য একটু পুরু, হাসলে ওঁর ঠোঁট একটু ডানদিকে বাঁকে, প্রিন্সেসের আবার ডানদিকে। সোফিয়া আইভানোভ্না বয়সটাকে ধরে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন—পোশাক আর প্রসাধন থেকে এটা স্পষ্ট ধরা পড়ে, ওঁর মাথায় চুল পেকে থাকলেও নিশ্চয় ধরতে দেবেন না। আমার সঙ্গে ব্যবহারে প্রথমটায় ওকে ভয়ানক উদ্ধত মনে হচ্ছিল, আমিও তাই বিশেষ অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম, এদিকে প্রিন্সেসের ঘরোয়া মিষ্টি ব্যবহারে আমার খুবই ভাল লাগছিল। বোধহয় প্রথম দর্শনেই সোফিয়া অইভানোভ্নার চেহারায়

সঙ্গে ক্যাথারিন দি গ্রেটের ছবির খানিকটা মিল ঠেকায় আমার অবচেতন মনে ওঁকে অতটা উদ্ধত মনে হয়েছিল ; কিন্তু তিনি যখন আমার দিকে এক মুহূর্ত গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমাদের বন্ধুদের বন্ধুরা আমাদেরও বন্ধু"—তখন আমি বিশেষ লজ্জা পেলাম। তিনি এই কথা কটা বলে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হাঁ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—এতেই যেন আমি সম্পূর্ণ ধাতস্থ হলাম, ওঁর সম্বন্ধে মতামতটাও পাল্টে ফেললাম। খুব মোটা হওয়ার দরুনই বোধহয় প্রতিটি কথার শেষে ওঁর একবার করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার অভ্যেস, মুখটা একটু হাঁ করে, নীল চোখ দুটি গোলাকৃতি করে। কি জানি কেন এই নিঃশ্বাস ফেলার ভঙ্গীটুকুতেই বিশেষ একটা ভালমানুষের ছাপ ফুটে উঠল, তা দেখে আমারও সব ভয় কেটে গেল, খুব ভাল লেগে গেল ওঁকে। চোখদুটি সুন্দর, গলার স্বর মিষ্টি, সুরেলা ; এমনকি ওঁর মোটা দেহের গোল রেখাটি পর্যন্ত সেই বয়সে আমার কাছে শুধুই কুশ্রী ঠেকল না।

আমার বন্ধুর বান্ধবী লিউবভ্ সাজিয়েভ্না (আমার মনে হল) বোধহয় বিশেষ বন্ধুত্বসূচক গোপন কোনো কথা আমাকে বলতে উদ্যত হয়েছিলেন কিন্তু একটু দ্বিধা করে অনেকক্ষণ চুপ করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, হয়তো সন্দেহ হল কথাটা আমার পক্ষে খুব প্রীতিকর হবে কিনা—শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙতে শুধু প্রশ্ন করলেন, আমি কোন ফ্যাকালটিতে ভর্তি হয়েছি। তারপরে আবার সেই গভীর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, যেন আবার ভাবছেন সেই গোপন কথাটা আমার কাছে ভাঙবেন কিনা ; এটা লক্ষ্য করে আমিও চোখের ইঙ্গিতে নীরবে জানতে চাইলাম, "বলুন, বলুন, আমায় সব কথা খুলে বলুন"। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত খালি বললেন, "লোকে বলে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাকি বিজ্ঞানের ওপর খুবই কম নজর দেওয়া হয়", এই বলে তার আদরের কুকুর সুজেৎকে ডেকে নিলেন।

লিউবভ্ সাজিয়েভ্না সারাটা সন্ধ্যে এমনি নানা টুকরো টুকরো অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে কাটালেন ; কিন্তু দ্মিত্রির ওপর আমার অখণ্ড বিশ্বাস আর তাছাড়া গোটা সন্ধ্যেটা সে এমনি ব্যাকুলভাবে একবার আমার দিকে আরেকবার লিউবভ্ সাজিয়েভ্নার দিকে তাকাচ্ছে যেন ওর দৃষ্টিটা খানিক প্রশ্ন করছে, "কিহে, কেমন বুঝছ? তাই আজিও ভেতরে ভেতরে ঠিকই বুঝছিলাম যে সাজিয়েভ্নার ভেতর বিশেষত্ব কিছুই নেই তবুও সেকথা এমনকি নিজের মনের কাছেও কিছুতেই স্বীকার করতে পারছিলাম না।

এবার বাকি রইল শুধু ভারেনকা, দ্‌মিত্রির বোন, গোলগাল, ষোল বছরের একটি মেয়ে।

ওর মুখে সবচাইতে সুন্দর হল টানাটানা ঘন পিঙ্গল চোখদুটি—তাতে মেশানো খুশীর আমেজ আর একটা শান্ত মনোযোগের ভাব অনেকটা ঠিক ওর মাসীর মতন। আর আছে সোনালী চুলের মস্ত লম্বা বিনুনী, সুন্দর, নরম হাত।

"তোমার বোধহয় একঘেয়ে লাগছে মঁসিয়ে নিকোলাস, তুমি তো প্রথম দিকটা শোননি।" সোফিয়া ইভানোভ্‌না হাতের সেলাইটা উল্টো করে ধরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেন। দ্‌মিত্রি একটু কোথায় যেন গেছে তাই পড়াটা একটুক্ষণের জন্য থেমেছে।

"নাকি তুমি আগেই "রব্ রয়" পড়েছ ?

ছাত্রের ইউনিফর্ম পরেছি, অতএব আমাব ধারণা একমাত্র সেই কারণেই যে কোনো প্রশ্নেরই খুব বুদ্ধি খাটিয়ে মৌলিক জবাব দেওয়া চাই-ই চাই। প্রশ্নটা যত সাধারণই হোক না কেন, অপবিচিত বা স্বল্পপরিচিত কোনো লোকের কাছ থেকে এলে তার জবাবে শুধুমাত্র "হাঁ" কি "না" কিংবা "কি ভীষণ বিশ্রী", "বাঃ, কি চমৎকার"—এ ধরনেব কথা বলতে আমার ভীষণ আপত্তি। তাই এখন এই প্রশ্নে চেকনাই প্যাণ্ট আব ঝকঝকে বোতামের দিকে একনজর তাকিয়ে জবাব দিলাম আমি "রব রয" পড়িনি কিন্তু শুনতে খুব ভাল লাগছে কারণ আমি গোড়া থেকে শুরু না কবে মাঝখান থেকে পড়তেই ভালবাসি।

"তাতে দুগুণ মজা আমাকে কল্পনা করতে হয এর আগে কি হয়ে গেছে, আবার এর পরে কি হবে।" বলে বেশ একটা আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলাম।

প্রিন্সেস হাসতে শুরু করলেন, কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক হাসি (পরে অবশ্য লক্ষ্য করেছি তিনি অন্য কোনোভাবে হাসতেই পারেন না।

"বেশ, বেশ, বোধহয় তাই সত্যি", উনি বললেন, "তুমি কি এখানে অনেকদিন থাকবে, নিকোলাস ? মঁসিযোটা বাদ দিচ্ছি বলে কিছু মনে করছ না ? তা, তুমি কবে যাচ্ছ ?"

"ঠিক জানি না ; বোধহয় কাল, কি জানি কিছুদিন থেকেও যেতে পারি হয়তো", বললাম, মনে মনে কিন্তু জানি কালকে নিশ্চয রওনা হব।

"আরও একটু বেশী থাকতে পারলে খুশী হতাম, নিজেদের জন্যেও, দ্‌মিত্রির জন্যেও" প্রিন্সেস আনমনে দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমাদের বয়সে বন্ধুত্বের মতন জিনিস আর নেই।

বেশ বুঝতে পারলাম সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে অপেক্ষা করছে কি জবাব দিই, কেবল ভারেনকা ভান করছে যেন মাসীর হাতের কাজটা দেখছে। মনে হল যেন ওরা সবাই আমাকে পরীক্ষা করছে, কাজেই আমারও মুখরক্ষা করতে হবে।

"হ্যাঁ নিশ্চয়, আমার কাছেও", জবাব দিই, "দ্‌মিত্রির বন্ধুত্ব বিশেষ দামী; কিন্তু আমি ওর কোনো কাজে আসব না, ও আমার চাইতে হাজারগুণে ভাল। (দ্‌মিত্রি আমার কথা শুনছে না তাই রক্ষে নইলে আমার ফাঁকা বুলি ও নির্ঘাত ধরে ফেলত) প্রিন্সেস আবার সেই অস্বাভাবিক হাসি হাসলেন—ওঁর পাশে ওটাই স্বাভাবিক।

প্রিন্সেস খুশী হয়ে ফরাসীতে দ্‌মিত্রির প্রশংসা করলেন, বললেন, কথা বলার আর্টটা ও চমৎকার জানে।

"যাকগে, তোমার কথা বাদ দিলেও ওর একটা ক্ষমতা অদ্ভুত", প্রিন্সেস গলার স্বর নামিয়ে (শুনতে আমার খুব মিষ্টি লাগল) লিউবভ সাজিয়েভ্‌নার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "এই ধর, আমাদের বেচারা মাসী লিউবভ্‌ সাজিয়েভ্‌না, ওই আদুরে কুকুর স্যুজেৎ-সহ ওকে আমি চিনি প্রায় কুড়ি বছর হল, কিন্তু আমাদের দ্‌মিত্রি ওর ভেতর এমন সব গুণ আবিষ্কার করেছে, যা আমি কল্পনাও করতে পারি না। ভারিয়া, আমাকে এক গ্লাস জল দিতে বল তো", প্রিন্সেস আবার কথা থামিয়ে ফেলে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, বোধহয় হঠাৎ মনে পড়ল তাড়াতাড়ি নিজের ঘরোয়া ব্যাপারে আমাকে জানানো উচিত নয়। "অথবা তার চাইতেও ভাল হয়, নিকোলাস যাক্। ওর তো করার কিছু নেই, তুমি বরঞ্চ পড়। বুঝলে নিকোলাস, তুমি সোজা দরজার ভেতর দিয়ে একটুখানি এগিয়ে বেশ জোর গলায় হেঁকে বল 'পিয়ত্র, মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে বরফ দিয়ে এক গ্লাস জল দিয়ে এস'!". আমাকে এই কথা বলে উনি আবার হাল্কা গলায় হেসে উঠলেন—সেই অদ্ভুত হাসি!

"উনি নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে আলোচনা করতে চান", ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবি, "বোধহয় বলতে চান আমি একটি ভয়ানক বুদ্ধিমান ছেলে।" কিন্তু পনের পা যেতে না যেতেই মোটা সোফিয়া আইভানোভ্‌না হাঁফাতে হাঁফাতে এসে আমাকে ধরেন। "ধন্যবাদ", উনি বলেন, "আমি নিজে ওখানে যাচ্ছি। আমিই বলব'খন।"

চতুর্বিংশ অধ্যায়

প্রেম

এক জাতীয়া স্ত্রীলোক আছেন, যাঁরা বিবাহিতা পারিবারিক জীবনযাপনের পক্ষে একান্ত উপযুক্ত হলেও যে কোনো কারণেই হোক সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা, ফলে হঠাৎ তাঁরা একদিন এ বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেন এবং তাঁদের এতদিনকার সঞ্চিত প্রেম দু-চার জন প্রিয়পাত্রের ওপর বর্ষণ করে তৃপ্তি পান ; কিন্তু এদের ভালবাসা এত অফুরান যে বিশেষ প্রিয়পাত্রদের ছাড়িয়ে সে ধারা অবশেষে আশে-পাশের ভাল-মন্দ-নির্বিশেষে সবাইকে সিঞ্চিত করে। সোফিয়া আইভানোভ্না ছিলেন সেই জাতীয়া, পরে জেনেছিলাম।

প্রেম তিনরকম :

(১) সুন্দর প্রেম, (২) যে প্রেম মানুষকে ত্যাগস্বীকার করায়, আর (৩) সক্রিয় প্রেম।

তরুণ-তরুণীর অনুরাগের কথা বলছি না ; এ প্রেমকে আমি ভয় করি আর আমারও এমনি দুর্ভাগ্য যে এ ধরনের ভালবাসায় সত্যের ফুল্‌কি একটাও চোখে পড়েনি, খালি দেখেছি একটা মিথ্যের জাল, তার পেছনে কাজ করছে কোনসময় কামনা, কোনসময় অর্থের লোভ, কোনসময় বা কাউকে বাঁধা বা ছাড়ার মতলব। এ প্রেমের ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। আমি বলছি, সাধারণভাবে মানুষের ভালবাসার কথা, যা তার অন্তরের ঐশ্বর্যের পরিমাপ অনুযায়ী একজন বা একাধিক-জনের ওপর কোনো-এক বিশেষ পথে কিংবা হয়তো বহুপথকে আশ্রয় করে অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়।—তা হচ্ছে মা-বাপ, ভাই-বোনের ভালবাসা, বন্ধুপ্রীতি, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা, মানবজাতির ওপর ভালবাসা।

সুন্দর প্রেম তাদের যারা এই বিশেষ অনুভূতির সৌন্দর্য ও তার প্রকাশকে ভালবাসে। এই ধরনের লোকদের কাছে তাদের প্রেমের বস্তুর মূল্য ঠিক ততখানি, যতখানি তারা তাদের প্রেমিকের এই প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করতে পারে। প্রেমের আনন্দকে হৃদয়ে সদাই জালিয়ে রাখতে এরা ঘন ঘন প্রেমের পাত্র বদলায়। প্রতিটি মুহূর্তে এই আনন্দানুভূতিকে মনে মনে চাখবার উদ্দেশ্যে এরা

অনবরত কাব্যিক ভাষায় প্রিয়পাত্র ও বাইরের লোক সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে বেড়ায়—এমনকি যাদের তার এই প্রেমের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সংস্রব নেই তাদের কাছেও। আমাদের দেশে যারা এই ধরনের প্রেমের পূজারী তারা শুধু যে সকলের সঙ্গেই এ নিয়ে আলোচনা করেন তাই নয়, আলোচনাটা আবার অনিবার্যভাবে করবেন ফরাসী ভাষায়। কথাটা শুনতে খুবই অদ্ভুত কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমাজের উঁচুস্তরের লোকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন বিশেষত মহিলা, যাঁদের ভালবাসার—তা সে ভালবাসা স্বামীপুত্র কিংবা বন্ধুবান্ধব যার ওপরেই হোক না কেন—সে ভালবাসার জৌলুসই কমে যায়, যদি কোনো কারণে তাঁরা ফরাসী ভাষায় সে প্রেমের গল্প করতে বাধা পান।

দ্বিতীয় দলে পড়েন তাঁরা যাঁরা প্রেমাস্পদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন, পাত্রের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার না করেই। "দুনিয়ার কাছে ওর প্রতি আমার প্রেমের গভীরতার পরিচয় দিতে এমন কিছুই নেই, যা আমি করতে পারি না", এই হল এ জাতীয় লোকদের জীবনাদর্শ। এরা প্রেমে প্রতিদান চায় না (বিনা প্রতিদানে নিজেকে উৎসর্গ করাই বেশী মহত্ত্বের পরিচায়ক) আর বেশীর ভাগ সময়েই রুগ্ন, যার ফলে এদের স্বার্থত্যাগ লোককে আরও বেশী মোহিত করে। এরা সাধারণত একনিষ্ঠ, কারণ পাত্রপরিবর্তনে পূর্ববর্তীর জন্য কৃত ত্যাগের মূল্য নষ্ট হয়; প্রেমাস্পদের কাছে নিজের একনিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য তারা যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত কিন্তু প্রাতিদিনের ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপারে নিজের প্রেম প্রকাশ করতে তারা কুণ্ঠিত—এতে বিশেষ কোনো স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হয় না তাই। তুমি পেট ভরে খেলে কিনা, প্রয়োজনমত ঘুমোলে কিনা, তোমার মনে আনন্দ আছে কি নেই কিংবা তোমার স্বাস্থ্য ভাল কি মন্দ, এ সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁদের মন নেই, তোমার দৈনন্দিন কোনো প্রয়োজন মেটাতেই তারা বিন্দুমাত্র চেষ্টা করবে না, তাদের ক্ষমতার ভেতরে হলেও—কিন্তু গুলির সামনে বুক পাতবার, জলে কিংবা আগুনে ঝাঁপ দেবার কিংবা প্রেমের আগুনে গুম্‌রে গুম্‌রে মরবার সুযোগ পেলে তারা ছাড়বে না। এ ধরনের লোক যারা প্রেমের জন্য নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত তারা সবসময়ই গর্বিত, ঈর্ষান্বিত, অবিশ্বাসী। সবচাইতে আশ্চর্য যে তারা প্রেমের পাত্রের বিপদ কামনা করে যাতে সে বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে, দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে, এমনকি চায় তার প্রিয়পাত্র পাপে লিপ্ত হোক—তবে তো সে তাকে প্রেমের জোরে সুপথে ফিরিয়ে আনার সুযোগ পাবে!

ধর, তুমি গ্রামে বাস করছ, সঙ্গে স্ত্রী—তিনি আবার মজেছেন এই স্বার্থত্যাগী প্রেমের মোহে। তুমি শান্ত, ভদ্র, মনের মতন কাজকর্ম করে দিন কাটাও, তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী ভগ্নস্বাস্থ্য, ঘরের কাজকর্ম তিনি দেখতে পারেন না—তার ভার চাকরবাকরদের ওপর, ছেলেমেয়েদের ভার নার্সের ওপর; তোমার স্ত্রী ভালবাসেন এমন কোনই কাজ নেই কারণ তিনি তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভালবাসেন না। তিনি স্পষ্টতই অসুস্থ, কিন্তু কষ্ট দেবার ভয়ে তোমার কাছে কখনো তা বলবেন না; একঘেয়েমিতে তিনি ক্লান্ত, কিন্তু তোমার জন্য তিনি সারাজীবন ধরে সে ক্লান্তি বহন করতে প্রস্তুত। তুমি যে তোমার নিজের কাজে দিনরাত রয়েছ (কাজটা যাই হোক না কেন—শিকার, বই পড়া, চাষবাস, কিংবা চাকরি) এটাই তাঁর মৃত্যুকে আরও এগিয়ে আনছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই সব কাজগুলোই নিশ্চিত তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তবুও তিনি তোমার শান্তি নষ্ট করেন না, নিজের মনেই তুষানলে জ্বলেন। তারপর হয়তো তুমি সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়লে—এবার তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী নিজের অসুখের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন, তোমার অজস্র অনুরোধ না মেনে রোগশয্যার পাশে একবার বসে থাকলেন, সারারাত তোমার বিছানা ছেড়ে একটি বারও নড়লেন না; প্রতি মুহূর্তে তুমি অনুভব করলে সমবেদনায় করুণ দুটি চোখ তোমার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে, সে দৃষ্টি যেন খালি তোমাকে বলছে, "দেখলে তো! আমি বলেছিলাম! তবে যাইহোক, আমি তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করব না।" সকালবেলা একটু ভাল বোধ করে উঠে তুমি অন্য ঘরে গেলে, দেখলে সে ঘরে আগুন জ্বলেনি, ঘর গোছান হয়নি, একমাত্র সুপই তোমার পথ্য, অথচ বাবুর্চিকে সুপ আনতে বলা হয়নি, ওষুধ আনতে লোক যায়নি: বেচারা রুগ্ন স্ত্রী তোমার সারারাতের অনিদ্রায় একেবারে ভেঙে পড়েছে, সেইরকম করুণ দৃষ্টি মেলে এখনও তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, পা টিপে টিপে চলছে, নীচু গলায় অনভ্যস্তভাবে চাকরবাকরদের এলোপাথাড়ি হুকুম দিচ্ছে। তুমি একটু পড়তে চাও—কিন্তু তোমার স্ত্রী ছলছল চোখে এসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলবে সে জানে তুমি তার কথা শুনবে না, তার ওপর রাগ করবে তাতে সে অভ্যস্ত তবুও তার একান্ত অনুরোধ তুমি পড়ো না, পড়লে শরীর খারাপ হবে। তুমি একটু হাঁটা-চলা করতে চাইছ, কিন্তু না করলেই ভাল হয়। একজন বন্ধু এসেছে, তার সঙ্গে একটু গল্প করছ—বেশী কথা বলা ভাল নয়। রাতে আবার একটু জ্বর এল তোমার, একলা থাকতে চাইছ; কিন্তু উপায় কি, তোমার স্ত্রী শ্রান্তক্লান্ত,

উস্কোখুস্কো চুলে অবসন্ন দেহে তোমার ঠিক সামনে একটা ইজিচেয়ারে আধো অন্ধকারে বসে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে—বিরক্তিতে তোমার মন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, সামান্যতম শব্দ বা নড়াচড়ায় স্ত্রীর ওপর অধৈর্য হয়ে উঠছ। তোমার হয়তো কুড়ি বছরের পুরনো চাকর আছে, কাজেকর্মে সেবায় চমৎকার, কারণ দিনের বেলায় সে যথেষ্ট ঘুমিয়েছে, আর তার কাজের সেবার জন্য সে মূল্য পায়, তুমিও তার সেবায় খুবই অভ্যস্ত : কিন্তু হলে হবে কি—তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী তাকে কোনো কাজই করতে দেবে না। অপটু, দুর্বল হাতে নিজেই সে সব কিছু করবে। তিক্তবিরক্ত হয়ে তুমি দেখছ ফর্সা ফর্সা আঙুলগুলো বৃথা চেষ্টা করছে বোতলের ছিপি খুলতে, মোমবাতি নেভাতে কিংবা তোমার ওষুধ ঢেলে দিতে অথবা আলতো হাতে তোমাকে স্পর্শ করতে। তুমি যদি অধৈর্য রগচটা মানুষ হও, ওকে সেখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ কর, তবে তোমার অসুস্থ কানে অনবরত এসে পৌঁছবে দরজার বাইরে থেকে মৃদু একটু ফোঁপানি আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ, তোমার লোকটার কাছে ফিসফিস করে হয়তো অর্থহীন কি যেন বলছে। শেষ পর্যন্ত তুমি যদি না মর, তবে তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী যিনি তোমার অসুস্থতার কুড়িটা দিন ঘুমোননি (সবসময় তোমাকে বলেন সে কথা)—তিনি এবার বিছানায় পড়েন, কষ্ট পান, ভোগেন শেষ পর্যন্ত আরও অকেজো হয়ে পড়েন। যতদিনে তুমি তোমার সাধারণ স্বাস্থ্য ফিরে পেলে, ততদিনে তোমার স্বার্থত্যাগী স্ত্রী তোমার চারিদিকে বেশ চমৎকার একটি রুগ্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে।

যারা তৃতীয় দলের, অর্থাৎ সক্রিয় প্রেমিকরা আবার তাদের প্রেমপাত্রের সব প্রয়োজন, ইচ্ছে, খেয়াল এমনকি বদখেয়াল পর্যন্ত মেটায়। এরা যেন জীবন দিয়ে ভালবাসে ; যতই ভালবাসে তখন বেশী করে জানে প্রেমাস্পদকে,—ভালবাসা তাদের পক্ষে ততই সহজ হয় অর্থাৎ ভালবাসার পাত্র অথবা পাত্রীকে খুশী করার পথ সরল হয়। এদের ভালবাসা কখনো ভাষায় প্রকাশ পায় না, যদিও বা কচিৎ কখনো প্রকাশিত হয়, তা আত্মতৃপ্তির সঙ্গে, জোরালো ভাষায় নয়—বরঞ্চ হয় অপ্রস্তুত মুখে লজ্জাকাতর ভঙ্গীতে। এদের সবসময়েই ভয়—বুঝি এদের ভালবাসা যথেষ্ট নয়। এরা প্রেমের পাত্রের দোষত্রুটিগুলি পর্যন্ত পছন্দ করে, কারণ সেগুলোকে চরিতার্থ করেও ওদের নিজেদেরই তৃপ্তি। এরা প্রতিদান চায়, তাতে বিশ্বাস করে, পেলে আনন্দিত হয় ; ঠিক এর উল্টো দিক থেকেও ওরা ভালবাসে, নিজেকে বাদ দিয়ে কেবল প্রিয়পাত্রেরই সুখশান্তি

কামনা করে, শত চেষ্টা করে যেভাবেই পারুক সে বস্তুকে প্রেমিক বা প্রেমিকার হাতের মুঠোয় তুলে দেয়।

এই সক্রিয় প্রেমের আলোই আমি জ্বলতে দেখেছিলাম সোফিয়া আইভানোভ্‌নার চোখে—সে প্রেম তার বোনপোর ওপর, বোনের ওপর, লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌না, এমনকি আমার ওপরেও, কারণ আমি দ্‌মিত্রির বন্ধু, সে আমাকে ভালবাসে।

সোফিয়া আইভানোভ্‌নার সম্পূর্ণ মূল্য বুঝতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছিল, কিন্তু সেই সময়েও একটা প্রশ্ন মনে জেগেছিল: দ্‌মিত্রি যখন প্রেমের সাধারণ পথ ছেড়ে নতুন পথে তাকে বুঝতে চেষ্টা করছে, তখন চোখের সামনে এই সুন্দর আদর্শ সোফিয়া আইভানোভ্‌না থাকতে ওই দুর্বোধ্য লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌নার দিকে ঝুঁকল কেন?

মাসীমার ভেতরেও অনেক গুণ আছে—সোফিয়া সম্বন্ধে দ্‌মিত্রি শুধু এইটুকুই স্বীকার করে। সত্যি, "গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না" কথাটায় একটুও ভুল নেই। হয়, মানুষের ভেতর গুণের চাইতে দোষের ভাগই বেশী, নয়তো মানুষ দোষের দিকেই আকৃষ্ট হয় গুণের চাইতেও বেশী। লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌নার সঙ্গে দ্‌মিত্রির পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়, কিন্তু সোফিয়া আইভানোভ্‌নার ভালবাসার স্বাদ সে পাচ্ছে সেই জন্মের শুরু থেকে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সকলের সঙ্গে পরিচয়

যখন বারান্দায় ফিরলাম, দেখলাম, আমার সম্বন্ধে কেউই আলোচনা করছে না; তবে ভারেনকা বইও পড়ছে না, বইটা পাশে রেখে দিয়ে ভীষণ উত্তেজিত ভাবে দ্‌মিত্রির সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছে—আর দ্‌মিত্রি ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, গলার রুমালটা বারবার ঠিক করছে আর চোখের সেই অদ্ভুত ভঙ্গী করছে। বিষয়বস্তুটা মনে হল কে একজন ইভান ইয়াকোভলেভিন্ আর কুসংস্কার। প্রিন্সেস আর লিউবভ্ সার্জিয়েভ্‌না চুপ করে বসে শুনছেন, মাঝে মাঝে ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি তর্কে নেমে পড়লেন কিন্তু আবার নিজেদের সংবরণ করছেন, ভারেনকা আর দ্‌মিত্রিকেই দুপক্ষ থেকে ওদের দুজনের প্রতিনিধিত্ব করতে দিচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকতে ভারেনকা আনমনে একবার তাকাল আমার দিকে, চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ও তর্কে একেবারে মজে আছে, আমি ওর কথা শুনলাম কি শুনলাম না তাতে ওর কিছু আসে যায় না। প্রিন্সেস ভারেনকার মুখেচোখেও সেই একই ভাব। কিন্তু দ্‌মিত্রি যেন আমার উপস্থিতিতে আশ্বস্ত হয়ে তর্কের জোর আরও বাড়িয়ে দিল, আর লিউবভ্ সার্জিয়েভ্‌না যেন আমাকে দেখে একটু ভয় পেলেন তাড়াতাড়ি কাউকে লক্ষ্য না করেই বলে উঠলেন বুড়ো লোকেরা ঠিকই বলে, 'যৌবনের যদি জ্ঞান থাকত, আব বৃদ্ধের যদি শক্তি থাকত।'

এই কথাতে তর্কের ইতি হল না বরঞ্চ আমার মনে হল আমার বন্ধু আর লিউবভ্ সার্জিয়েভ্‌না এরা দুজনেই বোধহয় ভুল করছে। প্রথমটায় একটু অস্বস্তি বোধ করলাম এঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত ঝগড়ার সাক্ষী হয়ে থাকছি বলে; তারপর আবার বেশ মজাও পেলাম কারণ দেখলাম এই ছোট ঘটনাটুকুর মাধ্যমে কিভাবে বাড়ির লোকদের আসল সম্বন্ধটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে, আর তাছাড়া আমার উপস্থিতিতে ওদের কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না।

অনেক সময় এমনি ঘটে, একটা গোটা পরিবারকে তুমি দেখে আসছ

বছরের পর বছর একই রকম ভদ্রতার মুখোশ পরে তাঁদের ভেতরের আসল সম্বন্ধটা তোমার কাছে রহস্যই থেকে গেল (আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, এই পর্দাটা ভেদ করা যত বেশী শক্ত, পরে ধরা পড়ে তাদের সম্বন্ধটাও তত বেশী বিষাক্ত)। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল তুচ্ছ কোনো একটা প্রশ্ন উঠল পরিবারের সামনে, নিতান্তই সামান্য একটা প্রশ্ন : হয়তো কোনো একজন সুন্দরী তরুণী সম্বন্ধে কিছু, নয়তো স্বামীর ঘোড়াগুলো দেখতে যাওয়া কিংবা হয়তো সম্পূর্ণ অকারণেই ঝগড়াটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভদ্রতার ওড়নাটা বজায় রেখে সেটা মিটমাট করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ে ; শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আতঙ্কের সঙ্গে আর উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য হয়ে দেখে যে এদের আসল সম্বন্ধটা অনাবৃত হয়ে পড়েছে, পর্দাটা আর আবরণের কাজ করতে না পেরে নিরর্থক বাতাসে লটপট করছে, যুধ্যমান দুইপক্ষের মধ্যে আর তোমাকে কেবলি মনে করিয়ে দিচ্ছে কতদিন ধরেই না তুমি প্রতারিত হয়েছ এই সুদৃশ্য পর্দাটা দেখে। এ অবস্থায় হৃদয়ের বিশেষ কোনো এটি স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম তন্তুতে আঘাত করার চাইতে দেয়ালে মাথা ঠুকে মরাও বোধহয় সহজ। প্রতি পরিবারেই এরকম একটি বিশেষ কোমল স্থান থাকে—এই নেখলুইদভ পরিবারে সেটি হচ্ছে লিউবভ্ সার্জিয়েভ্নার প্রতি দ্‌মিত্রির অদ্ভুত আকর্ষণ। ওর মা আর বোন এই ব্যাপারে ঠিক ঈর্ষান্বিত না হলেও অন্তুতপক্ষে এতে ওদের পরিবারের আভিজাত্য নষ্ট হয়েছে বলে মনে করেন। এই কারণেই ইভান ইয়াকোভলেভিচ আর কুসংস্কার নিয়ে আলোচনাটা এদের পক্ষে এত জরুরী।

"তুমি সব সময়ই দেখতে চেষ্টা কর যেগুলোকে অন্যেরা ঠাট্টা করে, ঘৃণা করে", ভারেনকা মিষ্টি সুরেলা গলায় প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে করে দ্‌মিত্রিকে বলছে, "আর তাতে বিশেষ ভাল কিছু-একটা আবিষ্কার করবেই করবে।"

"প্রথমত, কেবলমাত্র বিশেষ রকম লঘুচিত্ত লোকই ইভান ইয়াকোভলেভিচের মত একজন অসামান্য ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে পারে", দ্‌মিত্রি উত্তেজিতভাবে বোনের দিক থেকে মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা ছুঁড়ে মারে, "আর তাছাড়া আসলে তুমি নিজেই ইচ্ছে করে চোখ মেলে গুণটা দেখতে চাইছ না, সেটা তোমার নাকের ডগাতেই রয়েছে।"

সোফিয়া আইভানোভনা ফিরে এসে ভীতচকিতভাবে একবার বোনপোর

দিকে, আরেকবার বোনঝি, তারপর আমার দিকে কয়েকবার তাকালেন। দু-একবার মুখও খুললেন যেন কিছু বলবেন, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন গভীরভাবে।

"এবার ভারিয়া, লক্ষীটি, আবার পড়া শুরু করে দাও", ওর হাতে বইটা তুলে দিয়ে হাতের ওপর সস্নেহে একটা চাপড় মেরে সোফিয়া বলেন, "আমি একেবারে দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি, ছেলেটি আবার মেয়েটিকে খুঁজে পায় কিনা (আসলে বইটাতে কিন্তু এরকম কোনো ঘটনাই নেই)। আর তুমি মিতিয়া, তুমি বাপু গলাটা ভাল করে ঢাক; হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা, তোমার আবার দাঁত ব্যথা হবে," বোনপোর দিকে তাকিয়ে বললেন, বোনপোটি যে তর্কের সূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কটমট করে তাকালেন, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই। পড়া আবার শুরু হল।

এই ছোট্ট ঝগড়াটুকুতে ওদের পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হল না, বিশেষত মেয়েদের যে একটা আলাদা কেন্দ্র ছিল তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

এই কেন্দ্রের মধ্যমণি প্রিন্সেস মারিয়া ইভানোভনা, তিনিই এর পরিচালিকা—এর সুর আমার কাছে মনে হল অনবদ্য, সহজ অথচ সুললিত, নতুনত্বে মন আকর্ষণ করে। এই সুন্দর সুর আমার কাছে ধরা পড়ে ছোট ছোট জিনিসের সৌন্দর্যনির্মল স্বাভাবিক বিশেষত্বে—ঘণ্টা, বইয়ের ওপরের বাঁধাই আরাম-কেদারা, টেবিল, আঁটসাঁট কর্সেটে বাঁধা প্রিন্সেসের সোজা হয়ে বসার সুঠাম ভঙ্গিটি, ধরা-পড়ে-যাওয়া দুটো চারটে পাকা চুল, প্রথম থেকেই আমাকে শুধু নিকোলাই আর তুমি বলে ডাকা, জোরে জোরে পড়া, সেলাই করা, ওঁদের সবাইকার হাতের শুভ্রতা (ওদের সকলেরই হাতের একটা বিশেষত্ব ছিল, হাতের নরম জায়গাটা গোলাপী রং আর ওপরের দিকটা আবার তেমনি সাদা ধবধবে)। কিন্তু এদের বিশেষত্বটা আমার কাছে সব চাইতে বেশী ধরা পড়ছিল যখন ওঁরা তিনজনে ফরাসী কিংবা রুশ ভাষায় কথা বলছিলেন—প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ, প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের শেষে অলঙ্কার ব্যবহার। বিশেষ করে আমার সঙ্গে ওঁদের ব্যবহার নিতান্তই সহজ, স্বাভাবিক, আমাকে ওঁদের মতই একজন বলে মনে করে, নিজেদের সব ভাবনাচিন্তা আমাকে বলছেন, আমার মতামতও শুনছেন ঠিক বড়দের মতন (এই ব্যাপারটাতেই আমি এত অনভ্যস্ত যে আমার ঝকঝকে বোতাম আর নীল রঙের কলার সত্ত্বেও

মনে মনে ভয় হঠাৎ যদি কেউ বলে বসে, এই যে তুমি কি ভাবছ বড়দের সঙ্গে সমান তালে গল্প করবে? যাও, পড়াশুনো কর গিয়ে!)—তাই আমিও ওদের মাঝখানে বিন্দুমাত্রও অস্বস্তি বোধ করলাম না আসন বদলে বদলে সকলের সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে লাগলাম, কেবল ভারেনকা বাদে, কেন জানি ওর সঙ্গে প্রথমে কথা বলাটা অনুচিত বলে মনে হল।

পড়া চলেছে, ওর মিষ্টি গলার স্বর শুনতে শুনতে একবার ওর দিকে তাকাই, আবার দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিই বাইরে ফুলবাগানের বালুময় পথটায় যেখানে বৃষ্টির জল ছোট ছোট কালো কালো চক্র গড়েছে অথবা লেবু গাছে যার পাতায় পাতায় এখনও ছড়িয়ে-পড়া নীলচে হালকা ঝড়ো মেঘের কোল থেকে মাঝে মাঝে টুপটাপ করে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি ঝরছে, আবার ওর দিকে ফিরে দেখলাম, আবার তাকালাম অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মির দিকে যার লাল আভায় আলোকিত হয়ে উঠছে চারিপাশের বাচ্চা গাছগুলোর জলে-ভেজা পাতা, তারপর আবার ফিরে দেখি পাঠরতা ভারেনকার মুখের দিকে। এবারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম প্রথমে যতটা ঠেকেছিল, ভারেনকার মুখ ঠিক ততখানি সাদামাঠা নয়।

"আমার দুর্ভাগ্য যে এর আগেই আমার প্রেমট্রেম করা সারা," মনে মনে ভাবলাম, "আর সোনেচ্‌কা ভারেনকা না। কি মজাই না হত যদি হঠাৎ এ পরিবারের একজন হয়ে যেতাম! একই সঙ্গে তবে তিনজনকে পেতাম—স্ত্রী, মা, মাসী। ভাবতে ভাবতে ভারেনকার দিকে তাকালাম, সে তখনও পড়ছে দেখে হঠাৎ মনে হল আমি ওকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করব, ও তাকাবে আমার দিকে—ঠিক সেই মুহূর্তেই ভারেনকা বই থেকে মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে, আমার চোখে চোখ পড়াতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

"এখনও বৃষ্টি ধরেনি দেখছি", ভারেনকা বলে।

হঠাৎ আমার শরীরে অদ্ভুত একটা শিহরণ বয়ে গেল। বিদ্যুতের মত মনে ঝলসে উঠল একটা কথা, এই মুহূর্তে যা ঘটছে আমার জীবনে আরেকবারও ঘটেছে, ঠিক এই একই ঘটনা, আজকে ওটা তারই পুনরাবৃত্তি। সেদিনও এমনি ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছিল, সূর্য অস্ত যাচ্ছিল বার্চগাছের আড়ালে আড়ালে, সে বই পড়ছিল, আমার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মুখ তুলে তাকাল, এমন কি তখন আমার এ কথাটা পর্যন্ত মনে হয়েছিল যে এটা যেন এর আগেও কবে ঘটেছিল।

"এ কি তবে সে ? সে ?" আমি ভাবলাম, "এটা কি তবে শুরু ?" কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি স্থির করলাম না, এ সে নয়, এটা শুরুও নয়। প্রথমত এ সুন্দরী নয়, এ সাধারণ একটি তরুণী, সাধারণ পরিবেশে এর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে আর আমার সে হবে অসামান্যা, তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটবে অসাধারণ অপরিচিত কোনো পরিবেশে ; তাছাড়া এ পরিবারকে আমার ভাল লেগেছে এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না বলে। আমি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌছই, "এর মত আরও আনেক আছে, জীবনে এ-রকম আরও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে।"

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

বড়াই করা

চায়ের সময় পড়া থামল ; মহিলারা নিজেদের মধ্যে নানা লোকজন আর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন সেগুলো আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এর ফলে ওদের শত হৃদ্যতা সত্ত্বেও আমার মনে হল যেন খোঁচা দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছেন ওঁদের সঙ্গে আমার তফাত কতখানি—কি বয়সে, কি প্রতিষ্ঠায়। সাধারণ আলোচনায় অবশ্য আমি আগেকার তুষ্ণীভাবের শোধ দিয়ে দিচ্ছিলাম, কথায়-বার্তায় আমার চমৎকার বুদ্ধির দীপ্তি আর অভিনবত্ব দেখিয়ে,—যাইহোক আমার ইউনিফর্মটার মান রাখতে হবে তো! যখন গ্রামের বাড়ির কথা উঠল হঠাৎ আমি বলতে শুরু করলাম মস্কোর কাছাকাছি প্রিন্স ইভান ইভানিচের এমনি চমৎকার একটা ভিলা আছে যে লণ্ডন আর প্যারিস থেকে লোকেরা বেড়াতে আসে সেটা দেখতে, রেলিং-ঘেরা একটা জায়গা আছে সেটার দাম তিনশ আশি হাজার রুবল; উনি আমার নিকট-আত্মীয়, সেদিনই ওঁর সঙ্গে ডিনার খেয়েছি, ঐ ভিলাতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে গোটা গ্রীষ্মকালটা কাটাতে বারবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিন্তু আমি নিজেই অস্বীকার করেছি কেননা, কতবারই তো গেলাম ওখানে, তাছাড়া ওসব ঘেরা জায়গা, সেতু-টেতু দেখতে আমার মজা লাগে না, আমি বিলাসিতা মোটেই পছন্দ করি না, গ্রামের বাড়িতে সব জিনিস গ্রাম্য দেখতেই আমার ভাল লাগে। অমনিতর একটা মিথ্যের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করে আমি মহা গোলমালে পড়ে আরক্তিম হয়ে উঠলাম, সবাই নিশ্চয় সেটা লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছে, আমি ডাহা মিথ্যে বলে চলেছি। ভারেনকা আমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিচ্ছিল আর সোফিয়া আইভানোভ্না একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, ওরা দুজনেই আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য কথার আলোচনা তুললেন ওদের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠল সে দৃষ্টি আমি পরে ভবিষ্যতে অনেকের চোখে দেখেছি যখন কেউ তাদের কাছে অকারণে কতগুলো মিথ্যের জাল বুনে যায়, যার মানে হল, অবশ্য আমরা ঠিকই জানি যে ও মিথ্যে কথা বলছে, কিন্তু বেচারা কেন যে বলছে।

প্রিন্স ইভান ইভানিচের ভিলার গল্পটা বললাম, বোধহয় আর কোনো পথ খুঁজে পেলাম না ওদের জানাতে যে প্রিন্স ইভানিচ্ আমার নিকট-আত্মীয় আর আজই আমি ডিনার খেয়েছি তার সঙ্গে। কিন্তু তিনশ আশি হাজার রুবলের রেলিংয়ের গল্প করলাম কেন আর কেনই বা বললাম অনেকবার গিয়েছি সেখানে —একবারও না গিয়ে, আসলে যেতেই পারি না' কারণ প্রিন্স ইভানিচ্ থাকেন কেবল মস্কো কিংবা নেপল্‌স-এ, নেখলুইদভরা সে কথা খুব ভাল করেই জানেন! আমি আজ নিজের কাছে এর কোনো জবাব খুঁজে পাই না। শৈশবে, কৈশোরে কিংবা পরে পরিণত বয়সেও কোনদিন আমি নিজের মধ্যে মিথ্যে বলার প্রবৃত্তি খুঁজে পাইনি। বরঞ্চ সবসময়ই আমি সোজাসুজি খোলামেলা কথাবার্তা বলতেই পছন্দ করেছি। কিন্তু সেই বয়ঃসন্ধির প্রথম দিকটায় অদ্ভুতভাবে অকারণে কেবল মিথ্যের জাল বোনার একটা প্রবল ইচ্ছে দেখা দিয়েছিল। অদ্ভুত বলছি এই কারণে যে খুব সহজেই সে মিথ্যে কথাগুলো লোকের কাছে ধরা পড়ে যেত। আসলে আমি যা তার চাইতে সম্পূর্ণ অন্য লোক বলে নিজেকে দেখাবার জন্য আর মিথ্যে বলেও ধরা পড়ব না এই অসার দম্ভই বোধ হয় এই অদ্ভুত প্রবৃত্তির মূলে ছিল।

চায়ের পরে বৃষ্টিটাও ধরে গেল, আকাশটাও পরিষ্কার শান্ত, প্রিন্সেস প্রস্তাব করলেন বাগানের পেছন দিকে বেড়াতে যাওয়া যাক আর সেখানে ওঁর একটা বিশেষ পছন্দ-করা জায়গা আছে সেটা দেখা যাক। আমার তখনকার ধারণা অনুযায়ী কথাবার্তা হবে সবসময়ই অভিনব ধরনের, আর আমার ও প্রিন্সেসের মতন উজ্জ্বল রত্নদের কাছে মিথ্যে একটা সামাজিক ভদ্রতার কোনো স্থান নেই। অতএব আমি চট্ করে জবাব দিয়ে বসলাম, লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে আমি মোটেই ভালবাসি না আর যদিও বা কখনও বেড়াই তা একা একা। জবাবটা যে কতদূর অভদ্র হল তা বোঝবার ক্ষমতা ছিল না কিন্তু জানি আমার জবাব অসাধারণ হওয়া চাই, একঘেয়ে প্রশংসার মত বিশ্রী জিনিস আর নেই, একটু রূঢ় সত্য বলাই হচ্ছে একমাত্র বিশেষত্বের লক্ষণ। যাইহোক, নিজের জবাবে বেশ তৃপ্তি বোধ করে সকলের সঙ্গে বেড়াতে চললাম।

বাগানের মাঝখানে একটুকরো জলা জমির ওপরে ছোট্ট একটি সাঁকো— প্রিন্সেসের বিশেষ পছন্দ-করা জায়গা সেটা। দৃশ্যটা চমৎকার, কিন্তু একটু বিষণ্ণতা ছড়ানো চারিদিকে। জীবনে আমরা আঁকা ছবি আর প্রকৃতিকে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেছি যে ছবিতে অদেখা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলে ঠিক

সেটাকে সত্যি বলে মনে হয় না আবার ছবিতে ঘন ঘন দেখা যায় এমন জিনিস দেখলে মন ভরে না, একঘেয়ে লাগে। দৃশ্যটা এই রকম : ছোট একটি পুকুর, বড় বড় ঘাসে তার পাড় ছাওয়া, ঠিক পেছনে একটা খাড়া পাহাড় তাতে ছড়িয়ে আছে নানাবর্ণের গাছ, ঝোপঝাড়, পাহাড়ের ঠিক পায়ের নীচে পুকুরের ওপর এসে নুয়ে পড়েছে একটা বুড়ো বটগাছ, পাড়ের স্যাঁতসেঁতে জমিতে শিকড় মেলে দাঁড়িয়ে আছে, ডালপালা-ছাওয়া মস্ত একটা অ্যাশ্ গাছের মাথার ওপর জেগে রয়েছে তার মাথা আর শান্ত নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে ছায়া ফেলে দুলছে তার আঁকাবাঁকা পাতাভরা ডাল।

"আঃ কি চমৎকার!" আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে প্রিন্সেস বলেন বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না করে।

"হ্যাঁ, এটা খুবই সুন্দর, কিন্তু তবুও কেমন যেন মনে হচ্ছে থিয়েটারের একটা দৃশ্য।" প্রতিটি জিনিসেই আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে, সেটা জাহির করবার চেষ্টা করি।

প্রিন্সেস উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকলেন যেন আমার মন্তব্য কানেই যায়নি, ওর বোন আর লিউবভ সাজিয়েভ্‌নার দিকে ফিরে ছোটখাট সুদৃশ্যের দিকে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন—ঐ যে বাঁকা হয়ে নুয়ে পড়েছে ঐ ডালটি, আর জলের ওপর দুলছে ছায়া যেটি বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে প্রিন্সেসকে। সোফিয়া আইভানোভনা বললেন জায়গাটি ভারী চমৎকার! ওঁর দিদির নাকি দিনের বেশ কয়েকটি ঘণ্টা এখানে কাটানো অভ্যেস,—কিন্তু বেশ বোঝা গেল প্রিন্সেসকে খুশী করতেই কথাটা বলা। আমি দেখেছি যাদের হৃদয়ে সক্রিয় প্রেমের ঐশ্বর্য আছে তারা সাধারণত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয় না। লিউবভ্ সাজিযেভ্‌নারও দেখলাম একেবারে তদ্গত ভাব, নানা প্রশ্নের ভেতর এমন প্রশ্নও করছেন, "ওই কাটা গাছটা কিসের আশ্রয়ে আছে? ওকি বেশীদিন ওভাবে থাকতে পারবে?" তিনি অনবরত তাকাচ্ছেন ওর সুজেতের দিকে— বাচ্চা কুকুরটা ছোট্ট ছোট্ট বাঁকা বাঁকা পা ফেলে লেজ নাড়তে নাড়তে সেতুটার ওপর কেবল দৌড়ে যাচ্ছে আর থামছে, মনে হয় যেন জীবনে ও প্রথম ঘরের বাইরে ছাড়া পেয়েছে। দ্মিত্রি তর্কশাস্ত্রের ধোঁয়া সৃষ্টি করে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে আকাশ যেখানে সীমাবদ্ধ, প্রাকৃতিক দৃশ্য সেখানে সম্পূর্ণ খোলে না। ভারেনকা কিছুই বলছে না। ওর দিকে তাকালাম, দেখি রেলিংয়ে ভর দিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমার দিক থেকে একপাশটা

নজরে আসছে। কোনো একটা বিশেষ জিনিসে ওর মন মেতেছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে ও দিবাস্বপ্নের ঘোরে আছে, নিজের সম্বন্ধেও খেয়াল নেই, আর যে কেউ তাকিয়ে আছে ওর দিকে তাও জানে না। বড় বড় ঢলঢলে চোখদুটি যেন একমনে কি দেখছে, প্রশান্ত একটা চিন্তার ছায়া তাতে, দাঁড়াবার ভঙ্গীটা মনোরম —সবসুদ্ধ মিলিয়ে দেখতে এত চমৎকার যে আমার মনে সেই পুরনো স্মৃতি আবার ভেসে উঠল, নিজেকে আবার প্রশ্ন করলাম, "এটা শুরু নয় তো ?" নিজেই আবার জবাব দিলাম, "আমি সোনেচ্‌কার প্রেমে পড়েছি আর ভারেনকা সাধারণ একটি তরুণী আমার বন্ধুর বোন।" কিন্তু সেই মুহূর্তে ওকে আমার খুব ভাল লাগল আর কেন জানি না সেই সঙ্গে মনে একটা অস্পষ্ট ইচ্ছে জাগল ওর অপছন্দ কিছু-একটা করে তন্ময়তা ভেঙে দিতে।

"জান, দ্‌মিত্রি," আমি বন্ধুর কাছে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, যাতে ভারেনকা স্পষ্ট শুনতে পায়, "এ জায়গাটায় যদি মশা নাও থাকত, তবুও সৌন্দর্য বিশেষ কিছু আছে বলতে পারতাম না।" বলতে বলতে সত্যি সত্যি কপালে চাপড় মেরে একটা মশাও মারলাম, "ওঃ কি বিশ্রী"।

"আপনি তাহলে প্রকৃতিকে ভালবাসেন না ?" ভারেনকা আমার দিকে মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করে।

"প্রকৃতি নিয়ে মেতে থাকাটা নিতান্তই একটা অলস খেয়াল মাত্র," কথাটা বলে বেজায় খুশী হয়ে গেলাম, যাহোক ওকে চটাবার মত কিছু-একটা বলতে পেরেছি! ভারেনকা দেখা যায় কি না-যায় এমনিভাবে ভুরুকে সামান্য একটু তুলে আমার দিকে একপলক তাকাল, দৃষ্টিটা করুণার ; তারপর আবার আগের মতই শান্তভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভারী বিরক্তি লাগল ; তবুও জায়গায় জায়গায় রং-চটে-যাওয়া সবুজ রং লাগানো রেলিংয়ের ওপর ওর ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে-থাকা শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে ভেঙে-পড়া বার্চ গাছের গুঁড়ির হেলানো ছায়া যেন বাঁকা হয়ে নুয়ে-পড়া ডালপালার সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, জলাজমির গন্ধ কপালের ওপর মরা মশাটা আর ওব সেই একভাবে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে-থাকা সুন্দর ভঙ্গীটি—বহুদিন পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমার মানস চক্ষে ভেসে উঠত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দ্‌মিত্রি

সেদিন যখন সবাই ফিরে এলাম, ভারেনকা রোজ সন্ধ্যের মত গান করতে রাজী হল না। মনে মনে ভারী আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম, ভাবলাম আমিই এর মূলে, সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে ওকে যা বলেছি সেটাই কারণ। নেখলুইদভরা সাপার খায় না, রাতে তাড়াতাড়ি শুতে যায়। সেদিন আবার সোফিয়া ইভানোভ্‌নার ভবিষ্যৎবাণী সফল করে দ্‌মিত্রির দাঁতব্যথা হওয়ায় আমরা দুজনে আরও তাড়াতাড়ি ওর ঘরে চলে গেলাম। নীল কলার আর বোতামের মান রাখতে পেরেছি, তাই খুশীতে আমার মনটা গুনগুন করছে। দ্‌মিত্রির আবার ওদিকে ঠিক উল্টো ব্যাপার, বেজায় গম্ভীর আর মনভার—খানিকটা সেই ঝগড়ার ফলে আর খানিকটা দাঁত ব্যথায়। ও খাতাপত্র খুলে বসল, ডায়েরী আর যে খাতাখানাতে রোজ সন্ধ্যেয় ও অতীত আর ভবিষ্যত কর্তব্যের হিসেব লেখে, সেইটে—তারপর বহুক্ষণ বসে বসে তাতে কি যেন সব লেখে, মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি করে, কখনো গালে হাত দিয়ে ভাবে।

"আঃ বিরক্ত করো না যাও", সোফিয়া ইভানোভ্‌নার ঝি এসে দাঁতের ব্যথা কেমন জিজ্ঞেস করাতে দ্‌মিত্রি চটে ওঠে। এরপর শীগগির ওরা বিছানা তৈরি করে দেবে—দিলেই তাড়াতাড়ি ও শুয়ে পড়বে, আমাকে এই কথা বলে ও লিউবভ্‌ স্যাজিয়েভ্‌নার কাছে গেল।

"কি দুঃখ যে ভারেনকা সুন্দরীও নয়, সোনেচ্‌কাও নয়", আমি একা ঘরে বসে বসে ভাবি, নইলে কি মজাই হত, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর সোজা এসে একদিন ওর কাছে হাজির হতাম। বলতাম, প্রিন্সেস, আমি আর এখন তরুণ নেই, তাই আমার ভালবাসায় এখন আর যৌবনের দাহ নেই, তবুও তোমাকে আমি চিরদিন প্রিয় বোনের মত মনে রাখব। "আর আপনাকে আমি সত্যি শ্রদ্ধা করি", ওর মাকে বলব। "আপনি সোফিয়া ইভানোভ্‌না, দয়া করে বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি খুবই সমীহ করি।" তারপর সোজাসুজি

স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করব, "তুমি কি আমার স্ত্রী হবে?" হ্যাঁ বলে ও হাত বাড়িয়ে দিলে আমি সে হাতখানা ধরে একটু চাপ দিয়ে বলব, "আমার প্রেমের পরিচয় কথায় নয় কাজে।" কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হল, আচ্ছা, দ্‌মিত্রি যদি লিউবোচ্‌কার প্রেমে পড়ে যায়, লিউবা তো ওকে ভালবাসেই, আর ওকে বিয়ে করতে চায়, তবে? তাহলে আমাদের মধ্যে একজন বিয়ে করতে পারবে না। ওঃ চমৎকার! আমি তাহলে চারিদিকে লক্ষ্য রাখব কি ঘটছে না-ঘটছে, কিন্তু মুখে কিছু বলব না; তারপর একদিন দ্‌মিত্রিকে গিয়ে বলব, ওহে বন্ধু, বৃথাই আমরা দুজনে মনের কথা গোপন রাখতে চেষ্টা করছি। তোমার বোনের প্রতি আমার যে প্রেম তা নষ্ট হতে পারে কেবল আমার মৃত্যুতে। আমি সব জানি, তুমি আমার সারাজীবনের সব সুখ হরণ করেছ কিন্তু নিকোলাই এরতেনিয়েভ এর প্রতিশোধ নেবে কি করে জান? "এই যে আমার বোন, নাও, একে নাও," বলে লিউবোচ্‌কার হাতখানা ওর হাতে তুলে দেব। ও বলবে: না, কখনো না। আমি তার জবাবে বলব, "প্রিন্স নেখলুইদভ বৃথা চেষ্টা করো না। নিকোলাই এরতেনিয়েভের চাইতে বেশী পরোপকারী লোক এ দুনিয়ায় নেই।" এবার নমস্কার জানিয়ে আমি চলে যাব। দ্‌মিত্রি আর লিউবোচ্‌কা চোখে জল নিয়ে আমার পেছনে ছুটোছুটি করবে।

ওরা নিজেরা ত্যাগ করতে চাইবে। সেটা স্বীকার করে নিতে পারি যদি কেবল ভারেনকাকে ভালবাসি। কল্পনাটা এত চমৎকার লাগল যে ভারী ইচ্ছে করল দ্‌মিত্রিকে জানাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো কিছুই গোপন না করার প্রতিজ্ঞা থাকলেও কেবলই মনে হতে লাগল এ কথাটা ওকে বলা কোনমতেই সম্ভব নয়।

দ্‌মিত্রি লিউবভ্‌ সাজিয়েভ্‌নার কাছ থেকে ফিরে এল দাঁতে কয়েক ফোঁটা ওষুধ লাগিয়ে। দাঁতে খুব ব্যথা, তাই মুখটিও অমাবস্যার আকাশ। আমার বিছানা তখনও তৈরি হয়নি। দ্‌মিত্রির একটি ছোকরা চাকর জিজ্ঞেস করতে এল আমার বিছানা কোথায় হবে।

"আঃ, জাহান্নামে যাও।" মাটিতে পা ঠুকে দ্‌মিত্রি চেঁচিয়ে ওঠে। ছেলেটা বেরিয়ে যেতে না যেতেই আবার চেঁচাতে শুরু করে. "ভাস্‌কা, ভাস্‌কা, ভাস্‌কা।" প্রতিবার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে গলার জোরও বাড়তে থাকে, "ভাস্‌কা, মেঝেতে আমার একটা বিছানা পেতে দাও।"

"না, মেঝেতে আমি শোব," আমি বলি।

"তাতে কিছু আসে যায় না, কর একটা যেখানে হোক" দ্‌মিত্রি একইভাবে চটেমটে বলতে থাকে, "আরে, করছ না কেন ?"

কিন্তু ভাস্‌কা আসলে বুঝেই উঠতে পারছে না ওকে কি করতে বলা হচ্ছে, তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

"কি, হয়েছে কি তোমার ? কথা শুনতে পাচ্ছ ? যা বলছি তা কর শীগগির ?" দ্‌মিত্রি রেগে একেবারে আগুন হয়ে ওঠে।

কিন্তু ভাসকা তবুও কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

"ও, তুমি ঠিক করেছ আমার সব নষ্ট—আমাকে পাগল করবে বলে ঠিক করেছ ?" দ্‌মিত্রি এবার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে ভাস্‌কাকে ধরে মাথায় গোটাকতক ঘুসি মেরে বসলো, বেচারী ভাস্‌কা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দ্‌মিত্রি দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আমার দিকে ফিরে তাকাল, এক মুহূর্তে আগেকার রাগ আর নিষ্ঠুরতা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে এমন সুন্দর একটা লজ্জা, অনুতাপ মেশানো ছেলেমানুষী কোমলতার ভাব ফুটে উঠেছে। সে দেখে ওর জন্যে ভারী দুঃখ হল, মুখ ফিরিয়ে নেব ভাবলেও কিছুতেই প্রাণ ধরে তা পারলাম না। ও কোনো কথা বলল না, অনেকক্ষণ ধরে খালি ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকায় মিনতির দৃষ্টিতে : একটু পরে নোটবই বার করে কি যেন লিখে, কোটটা খুলে সাবধানে ভাঁজ করে, তার পরে ঘরের কোণে বেদীর কাছে গিয়ে মস্ত মস্ত ফর্সা হাত দুখানা বুকের ওপর ভাঁজ করে প্রার্থনা শুরু করে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করে দ্‌মিত্রি—আর সেই ফাঁকে ভাস্‌কাকে ডেকে আমি ফিস্‌ফিস করে হুকুম করলে সে একখানা মাদুর এনে মেঝেতে বিছিয়ে দেয়। আমি কাপড়-জামা ছেড়ে মাটিতে তৈরি বিছানায় শুয়ে পড়লাম—ও তখনও প্রার্থনা করছে। যখন মাটিতে নত হয়ে প্রণাম করছিল তখন ওর বাঁকা পিঠ আর পায়ের গোড়ালির নম্র ভাব দেখে আমার বুক ভরে উঠল, আগের চাইতেও ওকে অনেক বেশী ভালবাসলাম, মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমাদের বোনেদের নিয়ে যা ভাবছিলাম জানাব কিনা। প্রার্থনা শেষ করে দ্‌মিত্রি এসে আমার পাশে শুয়ে পড়ল। হাতের কনুইতে ভর দিয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল অপলকে, স্নেহভরা দৃষ্টিতে। এটা ওর পক্ষে খুবই কষ্টকর মনে হচ্ছিল কিন্তু ও যেন নিজেকে শাস্তি দিচ্ছিল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ও-ও হাসল।

"কেন তুমি বলছ না যে আমার ব্যবহারটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে," ও বলে, "তখনি এটাই তো তোমার মনে হয়েছিল।"

"হ্যাঁ," আমি বলি, যদিও এতক্ষণ আমি অন্য কথা ভাবছিলাম কিন্তু এখন মনে হল ঠিক আমিও এই কথাই ভেবেছিলাম। তাই বললাম, "হ্যাঁ, তোমার ব্যবহারটা খুব শোভন হয়নি। তোমার কাছ থেকে আমি এটা আশা করিনি। থাকগে, তোমার দাঁতের কি খবর?"

"অনেকটা ভাল। ওঃ নেকোলেঙ্কা, বন্ধু আমার", আবেগে দ্মিত্রির গলা বুজে আসে, চোখে জল চিকচিক করে, "আমি জানি, আমি বুঝতে পারছি যে আমি খুব খারাপ। একমাত্র ভগবানই সাক্ষী আমি কত আপ্রাণ চেষ্টা করছি নিজেকে শোধরাতে, তাঁর পায়ে মিনতি জানাচ্ছি আমাকে ভাল করে দিতে। কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর বিশ্রী একটা মেজাজ নিয়ে আমি কি যে করি! আমি কি করব? নিজেকে সংযত করতে, সংশোধন করতে চেষ্টা করি—কিন্তু হঠাৎ সেটা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, অন্তত আমার একার পক্ষে। লিউবভ সার্জিয়েভ্না আমাকে বুঝতে পারে, অনেকটা সাহায্যও করেছে এ ব্যাপারে। ডায়েরী থেকে দেখতে পাচ্ছি, গত এক বছরে অনেকটা উন্নতি করেছি আমি। আর নেকোলেঙ্কা, প্রিয় বন্ধু!" দ্মিত্রির গলার স্বরে স্নেহ উপচে পড়ছে কিন্তু এই স্বীকৃতির পরে তার মনের ভাব অনেকটা শান্ত। "জীবনে ওর মত একটি নারীর প্রভাব কত দামী! হে প্রভু! ভাব, আমি যখন নিজের পায়ে দাঁড়াব, তখন ওর মতন একটি বন্ধুর প্রতি মুহূর্তের সাহচর্য কত ভাল হবে আমার পক্ষে। ওর সঙ্গে যখন থাকি, তখন আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ!"

এরপর দ্মিত্রি আমাকে ওর জীবনের পরিকল্পনা খুলে বলে, ওর বিয়ে, গ্রামে বসবাস আর নিয়ত আত্মোন্নতি করার চেষ্টার পরিকল্পনা।

"আমি গ্রামে বাস করব। তুমি বোধহয় আসবে আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে, তোমার বিয়ে হবে সোনেচ্‌কার সঙ্গে। আমাদের বাচ্চারা একসঙ্গে খেলা করবে। অবশ্য কথাগুলো নিতান্তই হাস্যকর মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যিও তো হতে পারে!"

"নিশ্চয়, কেন না?" একটু হেসে আমি বললাম, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, তার চাইতেও ভাল হয় যদি আমি ওর বোনকে বিয়ে করি।

"একটা কথা জান," দ্মিত্রি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "তুমি কল্পনা করছ যে সোনেচ্‌কার প্রেমে পড়েছ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা

এখনও ততো গভীর নয়; প্রেমের সত্যিকারের অনুভূতি এখনও তোমার জীবনে আসেনি।"

কোনও জবাব দিতে পারলাম না, কারণ আমিও ওর সঙ্গে প্রায় একমত। একটুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকি।

"তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, আজকে আবার আমার মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল। ভারিয়ার সঙ্গে বিশ্রী একটা ঝগড়া হল। পরে আমার ভীষণ খারাপ লেগেছে বিশেষ করে তুমি সেখানে ছিলে তাই। যদিও অনেক জিনিসই ও এমনিভাবে চিন্তা করে যেটা ওর পক্ষে অনুচিত তবুও চমৎকার মেয়ে ভারিয়া, ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটলে বুঝতে পারবে ও কত ভাল।"

ওকে এভাবে প্রসঙ্গ পাল্টাতে দেখে অর্থাৎ একটু আগে সত্যি সত্যি আমি সোনেচ্‌কার প্রেমে পড়িনি বলে বুঝিয়ে এখন আবার ওর বোনের প্রশংসা করা —আমি এতে আনন্দে আরক্তিম হয়ে উঠলাম। তাহলেও আমি ওর বোন সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না, দুজনে অন্য আর পাঁচ কথা নিয়ে আলোচনা চালালাম।

গল্প করতে করতে দ্বিতীয়বার মুরগী ডেকে উঠল, জানালা দিয়ে ম্লান একটু প্রভাতী আলো ঘরে এসে লুটিয়ে পড়ল—দ্‌মিত্রি তখন নিজের বিছানায় উঠে গিয়ে আলো নিবিয়ে দিল।

"এবার ঘুমনো যাক", ও বলে।

"হ্যাঁ," আমি বলি, "কিন্তু আর একটা কথা মাত্র।"

"কি ?"

"জীবনটা ভারী চমৎকার, তাই না ?"

"হ্যাঁ, সত্যি তাই।" ওর গলার স্বরে মনে হল যেন এই অন্ধকারেও আমি স্পষ্ট ওর স্নেহভরা চোখদুটিতে একটা খুশীর ঝিলিক আর ঠোঁটে ছেলেমানুষী সরল মিষ্টি একটুকরো হাসি দেখতে পেলাম।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

গ্রামে

পরের দিন আমি আর ভলোদিয়া গ্রামে রওনা হলাম। পথে যেতে যেতে মস্কো প্রবাসের নানা স্মৃতি মনে ভেসে বেড়ায়, কিন্তু সোনেচ্কা ভালাখিনার কথা মনে পড়ে সারা দিন পরে সেই সন্ধ্যেবেলায়। "কি আশ্চর্য," মনে মনে ভাবি, আমি ভালবেসেছি অথচ তার কথা প্রায় ভুলেই গেছি। নাঃ, ওর কথা আমাকে বেশি করে ভাবতে হবে। ওর কথা ভাবতে শুরু করলাম—ভ্রমণপথে মানুষ যেমন ভাবে, টুকরো টুকরো অসংলগ্ন কিন্তু স্পষ্ট। ভাবতে ভাবতে মনটা এমনি অবস্থায় এসে ঠেকল যে মনে হল এমনি একটা বিষণ্ণ ভাব দেখান আমার নিতান্তই কর্তব্য, ফলে বাড়িতে পৌঁছবার দুদিন পর পর্যন্তও মুখে একটা করুণ বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে বাড়ির লোকজন—বিশেষ করে কাটেনকার কাছে ঘুরে বেড়ালাম—কাটেনকাই একমাত্র এ-সব ব্যাপারে মন খোলবার পথে উপযুক্ত, তাই সুযোগ পেতেই ওকে আমার হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের একটু ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলাম। কিন্তু যতই কেননা বিষাদ-বিষাদ ভাব দেখাই এর আগে প্রেমে পড়া লোকদের যা যা করতে দেখেছি তা সব হুবহু নকল করতে চেষ্টা করি—এই পুরো দুটো দিন আমি কিছুতেই সবসময় সোনেচ্কার কথা মনে রাখতে পারি না, মনে পড়ে কেবল বেলাশেষে সেই গোধূলিতে। তারপর ধীরে ধীরে গ্রামের জীবনের নতুনত্বে মেতে গেলাম, সোনেচ্কার সঙ্গে প্রেমও মুছে গেল মন থেকে।

পেত্রোভ্স্কয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন বেশ রাত। আমি তো গভীর ঘুমে অচেতন, না দেখলাম বাড়িটা, না দেখলাম বার্চে-ঘেরা প্রিয় সেই পথটা বা বাড়ির কোনো লোকজন—তারা অনেক আগেই সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ো ফোকা নুয়ে পড়েছে, খালি পা, গায়ে মেয়েদের মতন একটা নরম, রঙীন ড্রেসিং গাউন, মোমবাতি হাতে করে এসে আমাদের দরজা খুলে দিল। আমাদের দেখে বুড়ো আনন্দে কেঁপে ওঠে, কাঁধের ওপর চুমু খেয়ে তাড়াতাড়ি কম্বলটা গুছিয়ে নিয়ে

নিজের চারিদিকে জড়াতে থাকে। আমি বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম ঘুম ঘুম ভাবে। কিন্তু শোবার ঘরের পাশের ছোট ঘরটায় ঢুকতে চট্‌কা ভেঙে গেল। সে ঘরের সব জিনিস—দরজার তালাটা, খিল, ইস্ত্রি, সেই পুরনো দিনের মত বাতিদান, তাতে চর্বির ছিটে, নতুন যে চর্বির বাতিটা জ্বালান হয়েছে তার বাঁকা ছায়া, ডবল পাল্লার ধুলোভরা বড় জানালাটা যেটা কোনোদিন খোলা হত না, মনে পড়ল ওর পেছনে একটা গাছ গজিয়েছিল—এইসব চিরপরিচিত, অতীতের স্মৃতিভরা জিনিস, সমস্ত কিছুর আড়ালে যেন একটা সুর কথা কয়ে উঠল, হঠাৎ মনে হল যেন গোটা বাড়িটা আমার দেহে প্রিয় পরশ বুলিয়ে দিল। "এই বাড়ি আর আমি, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে এতকাল ছিলাম কি করে?" মনে মনে অবাক হয়ে ভাবি। তাড়াতাড়ি দৌড়লাম দেখতে ঘরগুলো সেই আগের মতই আছে কিনা। সব ঠিক সেই আগেরই মতন, কেবল ছোট, নীচু,—আর এদিকে আমি হয়েছি তেমনি লম্বা, ভারী আর আনাড়ি। কিন্তু আমি যাই হই না কেন, বাড়িটা যেন দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে আমায় কাছে টেনে নিল। প্রতিটি ঘর, দরজা, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ অতি ক্ষীণ একটু শব্দের রেশও আমার মনে গভীর আলোড়ন তোলে। মনের সূক্ষ্ম তন্তুতে বেজে ওঠে শব্দের সেই হারানো একটা সুর, কত শত স্মৃতি সেই আনন্দভরা অতীতের—যে অতীত আর কোনো দিন ফিরবে না। ছোটবেলাকার সেই শোবার ঘরে গেলাম—শিশুমনের আতঙ্কবিজড়িত সেই সব অন্ধকার কোণগুলো। গেলাম ড্রইংরুমে—মা-মণির স্নেহের পরশ জড়িয়ে আছে প্রতিটি জিনিসে। তারপরে ঢুকলাম হলের ভেতর—একদিন কত ছেলেমানুষী হাস্যমুখর আনন্দের জায়গা ছিল সেটা, আবার সেই আনন্দ জাগিয়ে তোলার অপেক্ষায় নিশ্চুপে পড়ে আছে। বসবার ঘরে ফোকা আমাদের জন্য বিছানা পেতেছে, ওর সে ঘরের প্রতিটি জিনিস, আয়নাটা, পর্দা, পুরনো দিনের কাঠের বেদী সাদা কাগজে ঢাকা ঘরের প্রতিটি খাঁজে যেন লেখা মৃত্যু আর মৃত্যুর যন্ত্রণা। এর-ও পুনরাবৃত্তি ঘটবে না কখনো।

আমরা শুয়ে পড়লাম, ফোকা শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

"এই ঘরেই মা-মণি মারা গিয়েছিলেন, তাই না?" ভলোদিয়া জিজ্ঞেস করে।

আমি কোনো জবাব দিলাম না, ঘুমোবার ভান করে পড়ে থাকলাম। একটা কথাও বলতে চেষ্টা করলে, কান্না আর চাপতে পারব না। পরদিন

সকালে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, বাবা সেই আগের দিনের মত ড্রেসিং গাউন আর বাহারে চটি পায়ে দিয়ে ভলোদিয়ার মাথার কাছে বসে ওর সঙ্গে হাসি গল্পে মেতে উঠেছেন। আমাকে জাগতে দেখে খুশী হয়ে লাফিয়ে উঠে এলেন, মস্ত হাতখানা দিয়ে আমার পিঠে চাপড় মারলেন, গালখানা এগিয়ে এনে আমার ঠোঁটের সঙ্গে চেপে ধরলেন। "খুব ভাল করেছ ডিপ্লোম্যাট, খুব খুশী হয়েছি," বাবা তাঁর ছোট ছোট চোখদুটিতে খুশীর ঝিলিক হেনে নিজস্ব আদরের সুরে বলতে থাকেন, "ভলোদিয়া আমাকে বলেছে তুমি নাকি খুব ভাল পাশ করেছ। বাঃ, চমৎকার! বোকামি করবে না বলে ঠিক করলেই তুমি আমার একটি চমৎকার ছেলে। ধন্যবাদ, খোকন আমার, ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবারে দেখ, এখানেও আমরা কি মজাতে কাটাচ্ছি। শীতকালে বোধহয় সবাই সেণ্টপিটার্স-বার্গে যাব। খালি দুঃখের কথা শিকার শেষ হয়ে গেছে, নইলে ভেবেছিলাম শিকারে নিয়ে গিয়ে খুব আমোদ দেব তোমাদের। ওয়াল্ডেমার, তুমি ভাল বন্দুক চালাতে শিখেছ তো? এখানে অজস্র শিকার, আমি নিজে একদিন যাব তোমার সঙ্গে। তাহলে প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, শীতকালে আমরা সবাই মিলে সেণ্টপিটার্সবার্গে যাব, সেখানে পাঁচজন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। ওয়াল্ডেমার, এবাব তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছ, আমারও কর্তব্য শেষ হল। এখন তুমি নিজেই হাঁটতে পারবে। কিন্তু যদি কখনও উপদেশ চাও, এসো, কেমন?—আমি আর এখন তোমার বাবা নই, এখন আমি তোমার বন্ধু, তোমার পরামর্শদাতা, যা হলে তোমার কাজে লাগতে পারি, তাই—অন্য কিছু নয়। তোমার দার্শনিক হিসেবে এটা কিরকম, কোকো? ভাল না মন্দ?"

আমি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলাম এটা ঠিক একেবারে আমার হিসেবে মিলে যাচ্ছে, আমার মনের কথাও আসলে তাই। বাবার সেদিনকার হাসি-খুশীতে জলজলে মুখখানা আমার ভারী ভাল লাগল, আমার মনটাকে খালি টানতে লাগল, বিশেষ করে ওই ভাব যে উনি আমার সমান, আমার বন্ধু, আমার সঙ্গী—এই জন্যে ওঁর প্রতি আমার ভালবাসা বেড়ে গেল হাজারোগুণে।

কতক্ষণ যে বসে বসে আমরা গল্প করলাম, তার আর ঠিক নেই, সূর্য এদিকে বসবার ঘরের জানালায় ছায়া ফেলে সরে গেছে—ইয়াকভ, সেই আগেরই মত বুড়ো আর সেই চিরদিনের অভ্যেস মত পেছন দিকে হাত নিয়ে আঙুলগুলোকে অনবরত মোচড়াচ্ছে, সে এবার ঘরে ঢুকে বাবাকে জানায় গাড়ি তৈরি।

"কোথায় যাচ্ছ, বাবা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ওঃ হ্যাঁ, আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম," অভ্যেসমত কাঁধে একটা ঝাঁকুনি মেরে অপ্রস্তুতভাবে একটু কেশে বাবা বলেন, "এপিফানোভ্‌দের বাড়ি যাব বলে কথা দিয়েছিলুম। এপিফানোভাকে মনে পড়ে তো তোমার? সেই-যে যাকে বলতুম, ক্লেমাদের সুন্দরী মেয়েটি? তোমার মা-মণিকে সব সময় দেখতে আসত। ভারী ভাল লোক ওরা।" একটু যেন সচকিতভাবে (আমার তাই মনে হল) বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আমাদের কথাবার্তার ভেতর লিউবোচ্‌কা বারকয়েক দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, "ভিতরে আসতে পারি?" আর বাবা প্রত্যেকবারেই দরজার ভেতর দিয়ে কথা ছুঁড়ে মেরেছেন, "না, কখনো না, কারণ আমরা তখনো পোশাক পরিনি।"

"তাতে ক্ষতি কি? আমি তো কতদিন তোমাকে ড্রেসিং-গাউন পরা দেখেছি।"

"তাই বলে ভাইদের নিশ্চয় দেখতে পার না।" বাবা চেঁচিয়ে বলেন, "ওরা যদি এ অবস্থায় গিয়ে তোমার ঘরের দরজায় ধাক্কা মারে তবে কেমন হয়, শুনি? এভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলা পর্যন্তও অভদ্রতা, তা জান?"

"আর তুমি সত্যি একেবারে অসহ্য! যাইহোক, দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করে ড্রইংরুমে এসো, মিমি মরে যাচ্ছে ওদের সঙ্গে দেখা করতে।" লিউবোচ্‌কা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলে।

বাবা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমি চট করে ইউনিফর্মের কোটটা গায়ে ঢুকিয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেলাম।

ভলোদিয়ার ব্যাপার আবার ঠিক উল্টো, কিছু তাড়াহুড়ো নেই—ওপরেই কাটাল অনেকক্ষণ ইয়াকভের সঙ্গে গবেষণা করে কোথায় পাওয়া যাবে তিতির, কাদাখোঁচা ইত্যাদি। আমি আগেই বলেছি ও যেটাকে জীবনে সব চাইতে বেশি ভয় করে সেটা হচ্ছে আবেগ, তা বাবা, মা, ভাই, বোন যার সম্বন্ধেই হোক না কেন, তাই সেটাকে এড়াতে গিয়ে ও একেবারে বিপরীত ধর্মকে আশ্রয় করে অর্থাৎ সব ব্যাপারে একটা নির্বিকার উদাসীন ভাব দেখায়—যারা এর কারণ জানে না, তারা এতে আহত হয়। পাশের ছোট ঘরটায় বাবাকে ধরলাম, উনি তখন দ্রুতগতিতে গাড়ির দিকে চলেছেন। গায়ে মস্কো থেকে আনা নতুন সৌখীন কোট আর সুগন্ধি। আমার সঙ্গে দেখা হতে আনন্দের

সঙ্গে মাথা নাড়লেন, মনে হল যেন বললেন, "কেমন, বেশ সুন্দর তাই না?" আবার বাবার চোখে সেই সকালবেলাকার মত খুশীর ঝিলিক দেখলাম।

ড্রইং-রুমটা সেই আগেরই মত উজ্জ্বল খুব উঁচু, হলদেটে মস্ত বড় বিলিতি পিয়ানো, সেই বড় বড় জানালা যার ভেতর দিয়ে খুশীভরা মুখে উঁকি মারছে, সবুজ গাছপালা আর হলুদ-রাঙা বাগানের পথটা। মিমি আর লিউবোচ্‌কাকে চুমু খেয়ে আমি কাটেনকার দিকে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হল তাইতো, ওকে চুমু খাওয়াটা তো শোভন হবে না; মাঝপথেই থেমে পড়ে রাঙা হয়ে উঠলাম। কাটেনকা নিজে একটুও অপ্রস্তুত হয়নি, স্বাভাবিকভাবেই ওর ফর্সা হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে আমাকে অভিনন্দন জানায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার জন্যে। ভলোদিয়া ঘরে ঢুকতেও আবার আরেকবার এরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। কাটেনকার সঙ্গে একসঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি, প্রতিদিনে আমাদের দেখাশোনা হত প্রতিটি কাজে ছিল আমাদের সাহচর্য—এ অবস্থায় বড় হয়ে প্রথম বিচ্ছেদের পর ঠিক যে কিভাবে আমাদের গ্রহণ করা উচিত পরস্পরকে, সেটা ঠিক করা সত্যই ভারী মুস্কিল। কাটেনকাই আমাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি রাঙা হয়েছে। ভলোদিয়া একটুও ঘাবড়ায় নি, ওর দিকে সামান্য একটু মাথা হেলিয়ে লিউবোচ্‌কার কাছে গিয়ে দু-চার মিনিট কথা বলল হালকাভাবে; তারপর বেরিয়ে কোথায় বেড়াতে চলে গেল।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব

মেয়েদের সম্বন্ধে ভলোদিয়ার যত সব অদ্ভুত ধারণা; ও বড়জোর তাদের সম্বন্ধে ভাবতে পারে, "ওদের কি খিদে পেয়েছে? ভাল ঘুমিয়েছে তো? ঠিক মত পোশাক পরা হয়েছে কিনা অথবা ফরাসী বলতে ভুল করে কি না—যা নিয়ে অপরিচিত লোকের কাছে ওর লজ্জা পেতে হবে? কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করে না যে মেয়েরাও মানুষের মত কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে পারে, আর এ কথা তো ভাবতেই পারে না যে কোনো ছেলে আবার মেয়েদের সঙ্গে গুরুতর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। দৈবাৎ যদি কখনো মেয়েরা গম্ভীর কোনো প্রশ্ন নিয়ে ওর কাছে আসত, (এ রকম ব্যাপার অবশ্য ওরা সাধারণত এড়িয়েই চলে) কোনো উপন্যাস সম্বন্ধে মতামত জানতে চাইত কিংবা ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করত, জবাবে ও খালি একটা মুখভঙ্গী করে নিঃশব্দে চলে যেত, নয়তো ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে 'কি সুন্দর' বা ঐ জাতীয় কিছু একটা বলত, আর নয়তো মুখে একটা বোকাটে ভাব ফুটিয়ে তুলে গম্ভীরভাবে গোটাকতক সম্পূর্ণ অসংলগ্ন কথা বলে চোখের দৃষ্টিটা ঘোলাটে করে তুলত। কি পাগলামি! লিউবোচ্‌কা কাটেনকার কাছে শুনে ঐ অর্থহীন কথাগুলি ওর কাছে পুনরাবৃত্তি করে দেখেছি, ও সব সময় বলে, "হুঁ, তুমি দেখছি এখনও ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাও। তুমি একটা আস্ত গর্দভ!"

এই কথাকটিতে ও যে কি ঘৃণা ছড়িয়ে দিত, তা যদি একবার শুনতে! ভলোদিয়া সাবালক হয়েছে আজ প্রায় দুবছর হল; এর মধ্যে কোনো সুন্দরী তরুণীর সংস্পর্শে এলেই তার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে; কিন্তু কাটেনকার সঙ্গে যদিও ওর এখন রোজ দেখা হচ্ছে (প্রায় দুবছর হল কাটেনকাও পোশাকের ঝুল বাড়িয়েছে আর দিনকে দিন বেশি সুন্দর হয়ে উঠছে)—তবুও কি জানি কেন, ওর সঙ্গে প্রেমে পড়ার কথা ভলোদিয়ার মাথায়

ঢোকেনি। এর কারণ শৈশবের স্মৃতি—সেই ক্লার, ছোট্ট কাটেনকার সেই ফ্রক আর খেয়ালখুশী এগুলো এখনো ভলোদিয়ার মনে জলজল করছে। তাই, কিংবা তরুণদের সাধারণত বাড়ির যে-কোনো জিনিসের ওপরই বিতৃষ্ণা থাকে সেজন্যে নাকি মানুষের সাধারণ দুর্বলতা যা জীবনের প্রথমে একটি ভাল জিনিস দেখলে আশা করে এর চাইতেও ভাল জিনিস বোধহয় পরে পাবে, সেই কারণে ; তা কারণটা যাই হোক না কেন, ভলোদিয়া এ পর্যন্ত কাটেনকার দিকে পুরুষের চোখে চেয়ে দেখেনি।

সেবার গ্রীষ্মকালটা ভলোদিয়ার ভারী একঘেয়ে কাটল। একঘেয়েমির আসল কারণ অবশ্য আমাদের সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব—সেটা সে গোপন করতেও চেষ্টা করেনি। ওর মুখখানায় যেন সব সময় লেখা থাকত, "উঃ কি বিরক্তিকর! কথা বলবার পর্যন্ত একটা লোক নেই।" সকালে হয় শিকারে বেরোত নয়তো একখানা বই নিয়ে কাটাত ডিনারের সময় পর্যন্ত সেই রাতের পোশাকেই। বাবা বাড়িতে না থাকলে ও খাবার টেবিলে পর্যন্ত বইখানা নিয়ে বসে, কারও সঙ্গে একটিও কথা না বলে খেতে খেতে বই পড়ে যায়—এতে আমাদের মনে একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে, মনে হয় বোধহয় কোনো কারণে ওর ওপর কখনো অন্যায় করেছি। সন্ধ্যেবেলায়ও ড্রইংরুমে কৌচে বসে হাতের কনুইয়ে মাথা রেখে হয় ঘুমায় নয়তো উদ্ভট, মজাদার সব গল্প জুড়ে দেয়, সেগুলো আবার সব সময় শালীনতার সীমা মানে না—মিমি চটে আগুন হয়, আর আমরা হেসে সারা হই। কিন্তু একমাত্র বাবা ছাড়া আর কারও সঙ্গেই ও কখনো দরকারী কোনো কথাবার্তা বলে না, ক্বচিৎ কদাচিৎ হয়তো বলে আমার সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে আমিও নিজের অজান্তে আমার ভাইকে নকল করতে চেষ্টা করতাম, যদিও হৃদয়াবেগ সম্বন্ধে আমার ওর মত আতঙ্কও ছিল না—মেয়েদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের ভাবটাও ততটা শক্ত ভিঁত গাড়েনি। সেই গ্রীষ্মকালটা আমি এমন কি কয়েকবার কাটেনকা, লিউবোচ্‌কার সঙ্গে ভাব জমাতেও চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ওরা না পারে ন্যায়শাস্ত্রের পথ ধরে চিন্তা করতে, না আছে ওদের কোনো সাধারণ জ্ঞান যেমন, এই টাকা কি অথবা যুদ্ধ কাকে বলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি পড়ায় ইত্যাদি—দেখে দেখে ক্রমেই হতাশ হলাম আর তাতে ওদের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাবটা আরও একটু বেশি দৃঢ় হল মাত্র।

মনে পড়ছে একদিন সন্ধ্যেবেলা লিউবোচ্‌কা পিয়ানোতে বসে বসে বিশ্রী

একঘেয়ে একটা সুর সমানে বাজিয়ে যাচ্ছিল। ভলোদিয়া ড্রইংরুমে একটা কৌচে বসে ঝিমুচ্ছিল আর মাঝে মাঝে বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না করে নিজের মনেই বিদ্রূপ করছিল, "হা ভগবান! উঃ ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, কি বাজিয়ে— বি-টো-ফে-ন (নামটা বিশেষ ব্যঙ্গভরে উচ্চারণ করে)। বেশ, বেশ, অনেকবার। বাঃ এই তো," ইত্যাদি ইত্যাদি। কাটেনকা আর আমি তখনও চায়ের টেবিলে —এখন আর মনে পড়ছে না, কাটেনকা কি করে যেন আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে তার সেই প্রিয় বিষয় "প্রেম"-এ গিয়ে ঠেকেছে। আমার মনে একটা দার্শনিক ঘোর, বেশ উঁচু একটা ভাব থেকে প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি, প্রেম হচ্ছে একজন মানুষের যে জিনিসটি নেই তাকে অধিকার করার ইচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাটেনকা এদিকে জোর গলায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে, যে মেয়ে অর্থের জন্য কোনো পুরুষের গলায় মালা দেয় তার প্রেম প্রেমই নয়, ওর মতে অর্থ ই নাকি সব চাইতে অর্থহীন জিনিস আর আসল প্রেম হচ্ছে তা যা বিচ্ছেদ সইতে পারে (বুঝতে পারলাম ডুবকভের ওপর ওর প্রেমের ইঙ্গিত করছে)। ভলোদিয়া নিশ্চয় আমাদের আলোচনা শুনতে পেয়েছিল, কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে বসে প্রশ্ন করে, "কাটেনকা, রাশিয়ান নয়?"

"আঃ, আবার তোমার সেই পাগলামী!" কাটেনকা বলে।

সমাজের কোনো কোনো স্তরে বিশেষত কোনো কোনো পরিবারে সাধারণভাবে বিদ্যাবুদ্ধি, সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি ইত্যাদি ছাড়া অপর আর একটি গুণেরও অনুশীলন করা হয়, আমি তার নাম দিয়েছি "বোধশক্তি"। দুটি লোকের মধ্যে এই গুণটি বর্তমান থাকলে তারা পরস্পরের কথার অর্থ ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তারা জানে কোথায় গিয়ে কথা থামাতে হবে। একই ধরনের বোধ-শক্তিওয়ালা লোকেরা যে কোনও ব্যাপারকেই ঠিক একই দৃষ্টিতে দেখে। এর ফলে এই সব পরিবারে চলতি নিজস্ব একটা ভাষার সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে বিশেষ অর্থে চলতি কথাগুলোর মানে অন্যদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের মধ্যে এই ধরনের মিলটা ছিল সব চাইতে বেশি বাবা আর আমাদের দুভাইয়ের মধ্যে। ডুবকভও বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দ্মিত্রি যদিও ওর চাইতে অনেক বেশী চালাক তবুও এ ব্যাপারে ভীষণ বোকা। আমাদের মধ্যে আবার আমি আর ভলোদিয়া চূড়ান্ত করে ছাড়তাম, বাবা অনেকটা পিছিয়ে থাকতেন। আমরা দুজনে—ঈশ্বরই জানেন কেন, কতগুলো কথার নতুন মানে সৃষ্টি করেছিলাম: যেমন "কিস্‌মিস্‌" মানে হচ্ছে কারুর টাকাপয়সা

আছে সেটা জাহির করার ইচ্ছে ; "ধাক্কা" মানে হচ্ছে সুন্দর, তাজা কোনো জিনিস কিন্তু জাঁকালো নয় (শব্দটা উচ্চারণ করতে হাতের আঙুলগুলো মিলে যাবে আর ব্যঞ্জনবর্ণের ওপর খুব জোর পড়বে) কোন নামকে বহুবচন করে বললে তার ওপর একটা অহেতুক পক্ষপাতিত্ব বোঝাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া কথাটার মানে বোঝাবে মুখের ভাবে আর গোটা আলোচনাটার ধারায়—যাতে হঠাৎ নতুন কোনো একটা শব্দ আবিষ্কার করলে অপরজন সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক তার রংটা ধরতে পারে। মেয়েরা এ সবের ধার ধারত না, সেটাও একটা মস্ত কারণ ছিল আমাদের একাকীত্বের আর ওদের ওপর একটা বিতৃষ্ণার ভাবের।

হয়তো ওদেরও একটা নিজস্ব হিসেব ছিল ; কিন্তু সেটা এতই ভিন্ন যে আমরা যেখানে দেখতাম কেবলমাত্র কথার খেলা, ওরা সেখানে দেখত সত্যিকারের হৃদয়াবেগ। আমাদের কাছে ব্যঙ্গ, ওদের কাছে পরম সত্য। তখন বুঝতে পারতাম না, এতে ওদের কোনো দোষ নেই, আর এ বিদ্যেটা-বাদ দিয়েও ওদের ভাল ও বুদ্ধিমতী মেয়ে হতে কোনো বাধা নেই। ওদের ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝতাম না, ফলে ওদের ঘৃণা করতাম। যেমন রোজ রাতে শোবার সময় লিউবোচ্‌কা বাবার ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকত, আমার মনে হত কুসংস্কার। কেন যে ওরা গীর্জায় গিয়ে মা-মণির স্মরণ-অনুষ্ঠানে দুজনে মিলে কাঁদে, কেন যে কাটেনকা পিয়ানো বাজাতে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর চোখ দুটোকে গোল করে ঘোরায়, কিছুই বুঝি না। নিজেকে প্রশ্ন করি, "ওরা এরকম বড়দের নকল করে ঢং করতে শিখল কবে থেকে ? আর এ জন্যে ওরা লজ্জাই বা পায় না কেন ?"

ত্রিংশ অধ্যায়

আমার কাজ

যাইহোক, সেবার গ্রীষ্মে, অন্যবারের তুলনায়, মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর হল, আমার গান নিয়ে মেতে ওঠাটাই অবশ্য তার কারণ। সেবার বসন্তে আমাদের প্রতিবেশী একটি তরুণ একদিন দেখা করতে এল আমাদের সঙ্গে; ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকাতেই ওর নজরে পড়ল পিয়ানোটা, আর তারপর থেকে মিমি আর কাটেনকার সঙ্গে মাঝে মাঝে দুচারটা কথা বলতে বলতে ও সকলের অলক্ষ্যে চেয়ারটা একটু একটু করে পিয়ানোর কাছে এগিয়ে নিতে থাকে। এরপর কথায় কথায় কৌশলে আলোচনাটা ঘুরিয়ে নিয়ে যায় —যারা পিয়ানো সারায় তাদের দিকে; সবশেষে জানায় ও নিজেই একজন বাজিয়ে। সত্যি, ও বাজাল তিনটে ওলাট্‌জ্‌—মিমি, কাটেনকা, লিউবোচ্‌কা পিয়ানো ঘিরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকে। ছেলেটি আর কোনদিন ফিরে আসেনি কিন্তু ওর বাজনা ভারী ভাল লেগেছিল আমার, পিয়ানোতে বসার ওর ভাবভঙ্গীও। কেমন সুন্দর, মাঝে মাঝে চুলে দোলা দিচ্ছিল, সবচাইতে ভাল লাগছিল যখন আটটা সুরের তরঙ্গ তুলছিল—বাঁ হাতে চট্‌ করে বুড়ো আর কড়ে আঙুল ছড়িয়ে শেষ রীড দুটো চেপে ধরে আস্তে আস্তে আঙুল দুটো কাছে গুটিয়ে আনা আবার ছড়িয়ে মেলে দেওয়া। কেমন সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ও পিয়ানোতে বসল, মাঝে মাঝে চুলে দোলা দিতে দিতে সুন্দর ভঙ্গীতে বাজাতে লাগল আর সকলের ওপরে, মেয়েরা কি ভয়ঙ্কর যে মনোযোগ দিল ওর দিকে—সব মিলিয়ে আমার মনে আগুন জ্বলে উঠল : পিয়ানোটা বাজাতে শিখতে হবেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক করে ফেললাম যে গানবাজনায় আমার ঝোঁকও আছে, ক্ষমতাও আছে, ব্যস্‌, শিখতে লেগে গেলাম। এ ব্যাপারে আমার অবস্থাও হল ঠিক সেইসব হাজার হাজার ছেলে—বিশেষ করে মেয়েদের মতন যারা আর কিছু করার নেই বলে গান-বাজনার দিকে ঝোঁকে অথচ শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই এই কলার আসল মাধুর্যের কোনই স্বাদ পায় না,

কি করে এই বিদ্যেকে আয়ত্ত করা যায় তারও কোনো পথ খুঁজে পায় না। সঙ্গীত—বিশেষ করে পিয়ানো বাজনা আমার পক্ষে হল মেয়েদের হৃদয়ে ঘা দেবার উপায় বিশেষ। কাটেনকা আমাকে স্বর শেখাল, মোটা মোটা আঙুলগুলো ক্রমে একটু বাগেও এল—এই ঝোঁকে মাস দুয়েক অতি উৎসাহে দিনরাত বাজনা চালালাম, অবাধ্য চতুর্থ আঙুলটাকে ডিনারের সময় হাঁটুর ওপর আর রাতে শোবার সময় বালিশের ওপর কায়দা করতে চেষ্টা করতাম। ছোট ছোট গৎ বাজাতে শিখলাম, ভালই বাজাতাম—এমনকি কাটেনকাও তা স্বীকার করত, তবে কিনা বিনা তালে।

ছোট গৎগুলো খুবই পরিচিত—ওলাট্জ্, গ্যালপ, লাভ-সং ইত্যাদি। এরকম গতের রাশীকৃত বই আছে, যে কোনো দোকান থেকেই একগাদা বেছে নিয়ে সবাই তোমাকে বলবে, এগুলো বাজিয়ো না খবরদার : এগুলোর না আছে স্বর, না আছে মানে, এরকম বাজে জিনিস আর কখনো গানের বইয়ে ছাপা হয় নি। আর সেইজন্যেই বোধহয় যে কোনো আধুনিক রুশ তরুণীর পিয়ানোয় এ বইগুলো দেখতে পাওয়া যাবেই যাবে। অবশ্য আমাদের "সোনাটা প্যাথেটিক"-ও ছিল আর ছিল বিটোফেনের "সি মাইনর সোনাটা", যেগুলোকে আধুনিক তরুণীরা সবসময়েই বাজনার নামে হত্যা করে ; মা-মণিকে স্মরণ করে লিউবোচ্‌কা এ সব বাজাত, আরও সুন্দর সব বাজনাও ছিল—ওর মস্কোর শিক্ষকের কাছে শেখা—তাছাড়াও আরও কতকগুলো ছিল এই শিক্ষকের নিজের লেখা, অদ্ভুত কতগুলো মার্চ আর গ্যালপের স্বর, লিউবোচ্‌কা এগুলোও বাজাত। আমি আর কাটেনকা হাল্কা স্বর পছন্দ করতাম, আমাদের প্রিয় গৎ ছিল, "লে ফাউ", "নাইটিঙ্গেল"—কাটেনকা নাইটিঙ্গেল বাজাত ঝড়ের গতিতে, আঙুল দেখা যেত না, আমিও ক্রমে বেশ জোরে, ছন্দ রেখে বাজাতে শিখলাম। সেই ছেলেটির ভাবভঙ্গীগুলো আমিও ধার করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আশেপাশে অপরিচিত কেউ নেই যে আমাকে বাজাতে দেখে। কিন্তু শিগ্‌গিরই বুঝলাম লিসত আর কাল্‌কব্রেনা আমার ক্ষমতার বাইরে, এতে কাটেনকাকে কিছুতেই হারাতে পারব না। অতএব, এবার আমার মাথায় ঢুকল উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-কলাই অপেক্ষাকৃত সহজ ; খানিকটা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আর খানিকটা নতুনত্বের মোহেও বটে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলাম যে আমি শক্ত জার্মান সঙ্গীতকলারই পক্ষপাতী আর সেই কারণেই লিউবোচ্‌কা "সোনাটা প্যাথেটিক" বাজাতে বললে আমি একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম, যদিও আসলে এই

সুরটা শুনলে আমার চিরদিনই বিষম বিরক্তি লাগে। আমি নিজে বিটোফেন বাজাতে শুরু করলাম, নামটা জার্মান ভঙ্গীতে উচ্চারণ করা অভ্যেস করলাম। কিন্তু এই সব গোলমাল আর ছলনার ভেতরেও আজ আমার মনে হয়, সঙ্গীত-কলার প্রতি আমার সত্যিকারের একটু প্রীতি ছিল কারণ, গান-বাজনা কত সময় আমার চোখে জল এনে দিত, আর যে সুরটা ভাল লাগত সেটা আমি স্বরগ্রাম ছাড়াই পিয়ানোতে তুলে ফেলতে পারতাম। আজ তাই মনে হয়, সেদিন যদি পিয়ানো বাজনাটাকে কেবলমাত্র চমক লাগিয়ে মেয়েদের মন ভোলাবার অস্ত্র হিসাবে না নিতাম, কেউ যদি সেদিন সঙ্গীত-কলালক্ষ্মীর হৃদয়ে পৌঁছবার রুদ্ধদ্বার সামান্য একটু খুলে দিতেন, তবে বোধহয় সত্যি সত্যিই আমি একজন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠতে পারতাম।

ভলোদিয়া সঙ্গে করে একগাদা ফরাসী নভেল এনেছিল, সেগুলোকে নাড়াচাড়া করাও আমার সেবারকার গ্রীষ্মের আর একটা কাজ ছিল। সে সময় সবে মণ্টেক্রিস্টো আর নানা রহস্য-রোমাঞ্চ বই বাজারে বেরুতে শুরু করেছে। আমি স্যু, ডুমা, আর পল ডি-ককের উপন্যাসে ডুব দিলাম। যত সব অস্বাভাবিক মানুষ আর ঘটনা আমার কাছে মনে হত জীবন্ত, সত্য। লেখককে সন্দেহ করতে সাহসই হত না, এমনকি লেখকের অস্তিত্বই থাকত না মনে ; বইয়ের পাতা থেকে রক্তমাংসে গড়া মানুষেরা বেরিয়ে এসে আমার সামনে লোমহর্ষক সব কাজ করত, আমি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। এ রকম কোনো লোক বাস্তব জীবনে আমি দেখিনি বটে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করিনি যে কোনো না কোনো দিন সত্যিসত্যিই এদের অস্তিত্ব থাকবে।

পড়তে পড়তে আবিষ্কার করতাম ; বইয়ে যত চরিত্র আছে, সকলের সঙ্গেই আমার সাদৃশ্য, যত বিভিন্ন প্রবৃত্তির খেলা চলছে সেখানে ; সমস্ত কিছুর অঙ্কুর আমার ভেতর—ঠিক যেমন দুর্বল প্রকৃতির কোনো লোক একখানা ডাক্তারী বই খুলে বসলে, নিজের হাজারটা রোগের লক্ষণ খুঁজে পায়। সবচাইতে ভাল লাগত চরিত্রগুলোর অস্বাভাবিক সব মনোবৃত্তি, জলন্ত হৃদয়াবেগ—চরিত্রগুলো যে যার নিজের মতন পরিপূর্ণ। যে ভাল সে একেবারে মাটির মানুষ, যে মন্দ সে একেবারে চূড়ান্ত বদমাস—ঠিক যেমনটি বাস্তবে আমি নিজে দেখেছি ছোটবেলায়। খুব, খুব খুশী হতাম যে বইগুলো সব ফরাসী ভাষায়, নায়ক ভয়ানক ভয়ামক বীরত্বের কাজ করতে গিয়ে যা যা বলছে, সেগুলো সব মনে করে রাখতে পারব আর পরে যখন বড় হয়ে নিজে কোনো বীরত্বের কাজ করব, তখন

সেগুলো বেশ যুৎসইমতন ব্যবহার করব। কত সুন্দর সুন্দর কথা যে আমি এই সব বইয়ের সাহায্যে মনে মনে টুকে নিলাম,—যদি কখনো কলপিকভের দেখা পাই তবে তাকে ঘায়েল করতে আর "ওর" কাছে প্রেম নিবেদন করতে—দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে যখন আমাদের মিলন ঘটবে। দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন কথা উচ্চারণ করব, যা শুনে তক্ষুনি ওরা মরবে। আমি আমার জীবনের ন্যায়নীতির নতুন আদর্শ সৃষ্টি করে ফেললাম। সবচেয়ে বেশী আমি হব মহানুভব ; হব আবেগশীল আর হব ঠিক হিসেবমতন। এমনকি বইয়ের নায়কদের মধ্যে যাদের এই সব গুণ আছে তাদের বাইরের চেহারার সঙ্গেও নিজের মিল ঘটাতে চেষ্টা করি। মনে পড়ে সেবারের শ'য়ে শ'য়ে বইয়ের ভেতর আমার প্রিয় একজন অতি উৎসাহী নায়ক ছিল যার ভুরু দুটি ছিল খুব চওড়া, ঘন লোমে ভরা। আমার প্রবল ইচ্ছে হল বাইরে ওর মত হতে (অন্তরে আমি হুবহু ওরই মত) তাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করি ভুরু জোড়াকে। দেখতে দেখতে মনে হয় যদি একটু ছেঁটে দিই, তাহলে আরও ঘন হয়ে বাড়বে নিশ্চয় : যাঁহা ভাবা, তাঁহা কাজ, কাঁচি চালালাম। ব্যস্, চালাতে চালাতে একজায়গায় দেখি বেশী ছোট হয়ে গেছে, অতএব বাকীগুলোকেও তার সমান করতে হল। এবারে গিয়ে আবার আয়নার সামনে দাঁড়ালাম—হা ঈশ্বর ! আমার একেবারে কান্না এসে গেল। ভুরুজোড়া নেইই একদম, কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী যে লাগছে ! যাহোক, কি আর করি, নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে এরপরে ভুরু যখন আবার গজাবে, দেখব, ইয়া চওড়া আর ঘন জঙ্গলের মত ঠিক যেন আমার সেই নায়ক। কিন্তু মুস্কিল হল, বাড়ির সবাই এখন বিনা-ভুরুতে আমায় দেখলে বলবে কি ? ভলোদিয়ার পাউডারের কৌটোটা খুলে একটু পাউডার নিয়ে ভুরুর ওপর ঘসে দিয়ে, তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। বুদ্ধিটা ঠিক খাটল পাউডার জ্বলে উঠল না বটে কিন্তু দেখতে ও জায়গাটা পোড়া পোড়া হয়ে গেল। আমার কায়দা কেউ ধরতে পারল না, ভুরুজোড়াও এরপরে সত্যি সত্যিই ঘন পুরু হয়ে গজাল, খালি দুঃখের কথা, আমার সেই ভয়ঙ্কর বীর নায়কের কথা ততদিনে একদম ভুলে মেরে দিয়েছি।

একত্রিংশ অধ্যায়

হিসেবমতন

ইতিমধ্যে কয়েকবার আমি মানুষের স্তরবিভাগে "হিসেবমতন" কথাটা ব্যবহার করেছি। *এটির* একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন কারণ আমার সমাজ ও শিক্ষা যতগুলো ভুল ও মিথ্যে ধারণা আমার মাথায় ঢুকিয়েছিল *এটিই* তার মধ্যে প্রধানতম।

মানবগোষ্ঠীকে কতভাগে ভাগ করা চলে—ধনী, দরিদ্র; ভাল, মন্দ; সামরিক ও বেসামরিক; চালাক এবং বোকা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষেরই এই বিভাগের নিজস্ব একটা রীতি আছে, নব-পরিচিত প্রত্যেককেই সে তৎক্ষণাৎ এদের কোনো না কোনো একটা কোঠায় ফেলে দেয়। আমার প্রিয় রীতি ছিল মানুষকে এ ভাবে ভাগ করা: একদল "হিসেবমতন," অপরদল "হিসেবমতন নয়"। এই দ্বিতীয় দলটার আবার দুটো ভাগ, যারা কেবল হিসেবমতন নয় আর যারা নিতান্তই সাধারণ। যারা হিসেবমতন, তারা আমার সমান পর্যায়ের; যারা দ্বিতীয় দলে পড়ে, তাদের আমি অবজ্ঞা করার ভান করি আসলে কিন্তু ওদের সম্বন্ধে মনে মনে আমার একটা আহত অভিমানের ভাব আর তৃতীয় দলটার কোনো অস্তিত্বই নেই আমার কাছে, ওরা একেবারেই ঘৃণার পাত্র। হিসেবমতন বলতে আমি বুঝি, ফরাসী কথা ভালভাবে জানা—বিশেষ করে উচ্চারণ নিখুঁত হওয়া চাই। যে-লোক সুন্দর উচ্চারণ করে না আর ফরাসী বলতে পারে না তার সম্বন্ধে তখুনি আমার একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব হয়। বিদ্রূপ করে নিজের মনেই তাকে জিজ্ঞেস করি, "যখন জান না তখন আমাদের মত কথা বলবার চেষ্টা কর কেন?" এই "হিসেবমতনদের" দ্বিতীয় চিহ্ন হল, লম্বা লম্বা পরিষ্কার পালিশ করা নখ; তৃতীয়ত, ঠিক মত জানা কি করে নমস্কার করতে হয়, নাচতে হয়, আলাপ-পরিচয় করতে হয়। এছাড়া আরও কতকগুলো চিহ্ন ছিল সেগুলো দিয়েও আমি মানুষের স্তর নির্দেশ করতাম। ঘর গোছানো, হাতের লেখা, গাড়ি এবং ঘোড়া—এসব ছাড়াও ঐ

চিহ্নগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল তার পা। বুটের সঙ্গে তার প্যান্ট কতটা খাপ খেল দেখে ঠিক বলে দিতাম ভদ্রলোক কোন স্তরের। বুটের গোড়ালি না থাকা, সামনের দিকটা সূঁচালো, প্যান্টের ওপর দিকটা সরু—এগুলো হচ্ছে সাধারণ লোকের চিহ্ন।

এটা খুবই আশ্চর্য যে আমি নিজে এই সব কে হিসেবমতন, আর কে নয় তাই নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাতাম অথচ এই সব চিহ্ন দিয়ে বিচার করলে আমি নিজেই এই হিসেবমতনদের পর্যায়ে কিছুতেই পড়ি না! কিন্তু এই বিশেষত্বগুলোকে কামনা করতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হত বলেই বোধহয় এগুলো এত অমূল্য ছিল আমার কাছে। ভাবতেও দুঃখ হয় আমার জীবনের সবচাইতে ভাল সময়, ষোল বছর বয়সের যৌবনের সেই অমূল্য দিনগুলোর কতটাই আমি বৃথা নষ্ট করেছি শুধুমাত্র এই গুণগুলো আয়ত্ত করতে গিয়ে। যাদের আমি নকল করতাম, তাদের কাছে কিন্তু এগুলো যেন সহজাত—সেই ভলোদিয়া, ডুবকভ আর আমার পরিচিত আরও অনেকের কাছে। ওদের দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাতাম আর নিজে নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করে ফরাসী শিখতাম, অভ্যেস করতাম কি করে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাতে হয়, যাকে জানাচ্ছি তার দিকে না তাকিয়েই, কথাবার্তায় সব সময়ই একটা নির্বিকার ঔদাসীন্যের ভাব বজায় রাখতে, আঙুলের নখগুলো পালিশ করতে। তাও সবসময়েই মনে হত আরও যেন কি বাকি রইল, আমার লক্ষ্যে পৌছতে এখনও ঢের দেরি আছে। আমার ঘর, লেখবার টেবিল, আমার গাড়ি—এগুলো যে ঠিক কি ভাবে সাজালেগুছালে "হিসেবমতন"দের পর্যায়ে পড়বে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই, এসব বাজে কাজ ভালও লাগে না—তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করি এগুলো ঠিক করে রাখতে। কিন্তু মনে হত অন্যদের কাছে যেন এগুলো একেবারে জলভাত, এরকম ছাড়া অন্য রকমটি যেন হতেই পারত না। মনে পড়ে একবার নখ নিয়ে প্রচুর ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও বাগে আনতে না পেরে ডুবকভের সুন্দর ঝকঝকে নখ দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম কতদিন ধরে এগুলো ঠিক এমনটি হয়েছে আর কি করেই বা ও' করল। ডুবকভ তার জবাবে বলল, "এগুলো নিয়ে কোনদিন আমাকে কিছু করতে হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। কোন ভদ্রলোকের নখ এ ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবতেই পারি না।" জবাবটা যেন আমাকে হুল ফুটিয়ে দিল। এই স্তরের লোকদের একটা বিশেষত্বই হচ্ছে এই গুণগুলো আয়ত্ত করতে কতটা পরিশ্রম করতে

হয়েছে, তা গোপন করে রাখা—এ কথাটা তখনও আমি জানতাম না। হিসেবমতন সে আর সকলের (উর্ধ্বে) ; অন্যের ভেতর কোন গুণ দেখলে সে প্রশংসা করতে পারে বটে, কিন্তু তবুও সে তাদের সমপর্যায়ের নয়। আমি বলতে পারি আমার বাপ-মা-ভাই-বোনদের ভেতরেও কেউ যদি আমার চেয়ে নীচু স্তরের লোক হয় তবে সেটা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই, তবুও বলতে বাধ্য হব যে তার সঙ্গে আমার মিল কিছুমাত্র নেই। এর ফলে কত যে অমূল্য সময় নষ্ট হল। ঐ বিশেষ শক্ত গুণগুলো আয়ত্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টায়, আর সব কাজ দূরে পড়ে থাকল, সমাজের শতকরা নব্বুইজন লোকের ওপরে ঘৃণা জন্মাল, এই স্তরের বাইরেকার যে কোনো গুণ চমৎকারই হোক না কেন, তাকে অস্বীকার করতে শিখলাম। সবচাইতে বেশী ক্ষতি হল আমার মাথায় এই ধারণা ঢুকল যে সমাজের এই বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে, সে সমাজের মাথায় উঠে গেল, এর জন্যে তার নিজের দিক থেকে আর কোনরকম প্রচেষ্টারই কিছুমাত্র দরকার নেই।

"বেশীর ভাগ লোকই যৌবনের কোনো না কোনো সময়ে নানা ভুলভ্রান্তি করে, বিপথে চলে, তারপর একসময় সামাজিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতে ইচ্ছুক হয়ে কোনো একটি কাজ বেছে নিয়ে তাতে লেগে পড়ে। কিন্তু যারা হিসেবমতন, তারা এসবের ধার ধারে না। এই স্তরের বহু বৃদ্ধলোককে আমি জানি, নাস্তিক, আত্মবিশ্বাসী পরের কাজের তিক্ত সমালোচনা করতে ওস্তাদ, এঁরা পরপারে গেলে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কে ? নীচের জগতে কি করেছ ?—তবে তাঁদের একমাত্র জবাব হচ্ছে, "আমি একজন পুরোপুরি ভদ্রলোক ছিলাম।"

আমার ভাগ্যেও তাই অপেক্ষা করছিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

যৌবন

সেবার গ্রীষ্মকালটায় যদিও আমার মাথার মধ্যে দিবারাত্রি ছিল এমনি সব চিন্তা তবুও আমি নিষ্পাপ, স্বাধীন তাই মনেপ্রাণে সুখী। অনেক সময়, বেশ ঘনঘনই বলা চলে, আমি ঘুম ভেঙে উঠতাম সেই পাখি-ডাকা ভোরে (বারান্দায় খোলা বাতাসে শুতাম, প্রভাত সূর্যের প্রথম উজ্জ্বল তির্যক রেখাটি এসে আমার চোখে লেগে ঘুম ভাঙিয়ে দিত)। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে হাতে একটি তোয়ালে আর বগলে একখানা ফরাসী উপন্যাস চেপে ধরে বার্চকুঞ্জের ছায়ায় ছোট একটি নদীতে স্নান করতে যাই। গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়ি—মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি নদীর দিকে, গাছের ছায়ার নীচে নীল তার জল ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় ধীরে ধীরে বুদ্বুদ কাটছে ; ওপারে হাল্‌কা সোনালী সরষের ক্ষেত, বার্চের সারি একটার পর একটার পেছনে লুকিয়ে পিছু হঠতে হঠতে ঐ দূর দিগন্তে গহন বনের অতলে মিলিয়ে গেছে, প্রভাত সূর্যের আলো তার অজস্র ডালপালাকে রাঙিয়ে তুলেছে। আমার চারিদিকে প্রকৃতিতে জীবন আর যৌবনের জোয়ার—আমার অন্তরেও যেন সেই একই প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসের আবেশ। ভোরের পিঙ্গল মেঘে আকাশ ছেয়ে যায় আমি তখন স্নান সেরে উঠে শীতে হিহি করে কাঁপি, তারপর মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই বনের ভিতর, মাঠ ভেঙে ভেঙে, সবুজ নরম ঘাসের শিশিরে জুতোজোড়া সম্পূর্ণ ভিজিয়ে। আনমনে ঘুরে বেড়াই আর মনে মনে রঙীন কল্পনার জাল বুনি,—শেষপড়া উপন্যাসের চরিত্রগুলো সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে, ওদের অনুসরণ করে নিজেকে কখনও কল্পনা করি একজন মস্ত সৈন্য, কখনও মন্ত্রী, তারপরেই একজন বিরাট শক্তিশালী লোক, ঠিক তারপরেই একজন পরম অনুরাগী পুরুষ হিসেবে। অনবরত এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি,—হঠাৎ যদি "সে" দেখা দেয়, কোনো প্রান্তরে, কোনো গাছের আড়াল থেকে! চলতে চলতে যদি কখনও মাঠে কাজ করা কোনো চাষীর কাছাকাছি এসে পড়ি, তবে

যদিও আমি সাধারণ লোকেদের দিকে বড় একটা চোখ তুলে তাকাই না, তবুও একটা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যাই, ওর চোখ এড়িয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করি। বেলা বেশ বেড়ে যেতেও যদি দেখি মেয়েরা তখনও তৈরি হয়ে চায়ের জন্য এসে পৌঁছায়নি, আমি তবে ফুল কিংবা ফলের বাগানে নেমে যাই ফল, ফলমূল পাকা যা পাই, তাই তুলে তুলে খাই। কি যে আনন্দ পেতাম আপেলের বাগানে গিয়ে, মস্ত লম্বা, চারিদিকে ডালপালা ছড়ান রাস্পবেরীর ঘন-ঝোপের ভেতর ঢুকে বসে পড়তে! মাথার ওপরে নির্মেঘ আকাশ, চারিদিকে গলে-গলে-পড়া উজ্জ্বল সোনালী আলো, আর আশেপাশে ফিকে সবুজ রঙের কাঁটাওয়ালা ডালপালা, মাঝে মাঝে আগাছা।

ঘন সবুজ বিছুটি গাছ, ছোট হালকা ফুলের স্তবক মাথায় নিয়ে আকাশের দিকে ডালপালা মেলে ধরেছে; ছোট ছোট গোলাপী রঙের কাঁটাওয়ালা ফুল-সহ ভাঁটুই গাছ রাস্পরেবী ঝোঁপের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, এখানে-সেখানে হয়তো বিছুটি গাছের সঙ্গে জড়িয়ে বুড়ো আপেলের নুয়ে-পড়া ফিকে সবুজ ডালগুলো পর্যন্ত ধরেছে; ওপরের ডালে থোকা থোকা ঝুলছে আপেল, সুন্দর গোল, হাতির দাঁতের মত রং, কিন্তু পাকেনি, সূর্যের আলো তার গায়ে ঠিক্‌রে পিছলে পিছলে পড়ছে; নীচে একটা চারা রাস্পবেরীর ঝোপ, পাতাবিহীন, প্রায় শুকনো বাঁকা হয়ে উঠেছে, সূর্যের দিকে সবুজ ঘাসের শীষ বর্শার মত ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠেছে গতবছরের মরা পাতার ফাঁকে ফাঁকে—ভোরের শিশিরে সিক্ত হয়ে সবুজ, সতেজ শ্যামলতা গায়ে মেখে ছায়ার নীচে পড়ে আছে, যেন ওপরে ডালে আপেলের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য লুকোচুরি খেলছে তা ওদের অজানা।

ঝোপের ভেতর একটা ভিজে-ভিজে ভাব। ঘন পুরু ছায়া, মাকড়সার জাল, মাটিতে কালো-হয়ে-পড়ে-থাকা দুটো-একটা আপেল। আরও একটু এগোলে তুমি ভয় পাইয়ে দেবে একঝাঁক খুদে খুদে চড়াই পাখিকে, এই ঝোপঝাড়ে যাদের বাস, শুনতে পাবে ওদের ভীত স্বরে কিচিমিচি আর গাছের ডালে ডালে ছোট ছোট নরম ডানার ঝাপটানি। কোনো জায়গায় শোনা যাচ্ছে বোলতার গুনগুনানি, বাইরে রাস্তায় কোথাও হয়তো মালীর পায়ের শব্দ, সেই বোকাটে মতন আকিম, নিজের মনে বিড়বিড় করছে। তুমি নিজের মনেই বললে, "নাঃ, যেই হোক, এখানে আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। ডাইনে, বাঁয়ে দুহাতে সমানতালে রসালো বেরী ছিঁড়ে ছিঁড়ে মনের খুশীতে টপাটপ একটার পর একটা মুখে পুরে দিচ্ছ। পা-দুটো হাঁটু পর্যন্ত ভিজে, মাথার ভেতর অকারণ

কোনো একটা খেয়াল গুনগুন করে বেড়াচ্ছে (হাজার বার মনে গুনছ, "আ-র কু-ড়ি, আ-র সা-ত")। বিছুটি হাতে ফুটে যাচ্ছে—এমনকি পায়েও ভিজে প্যান্টের ভেতর দিয়ে, সূর্যের খাড়া রশ্মি ঝোপঝাড় ভেদ করে এসে তোমার মাথা পুড়িয়ে দিচ্ছে ; খাবার ইচ্ছে অনেকক্ষণ হল অপসৃত হয়েছে। ঝোপ-জঙ্গলে ছড়িয়ে বসে তুমি আনমনে তাকাও আর শোন আর অন্যমনস্কভাবে যন্ত্রের মত একটার পর একটা বেরী তুলে তুলে মুখে পোর।

এগারটার কাছাকাছি মেয়েরা যখন চা-পর্ব সমাধা করে যে যার কাজ নিয়ে বসেছে, আমি তখন ড্রইংরুমে ঢুকি। ঢুকতেই প্রথম জানালাটায় লিনেনের পর্দা ঢাকা, তারই ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো ঘরে ঢুকে জায়গায় জায়গায় উজ্জ্বল চক্রের সৃষ্টি করেছে, সেই গণ্ডীটুকুর মধ্যে যে কোনো জিনিস পড়ছে তাই চকমক করছে। তাকালে চোখ ঝলসে যায়—তার কাছেই দাঁড় করান এমব্রয়ডারী ফ্রেম, তাতে লাগান সাদা কাপড়ে অসংখ্য মাছি বসে আছে নিশ্চিন্তভাবে। সামনে বসে মিমি, রাগতভাবে খালি মাথাটা নাড়ে এদিক-সেদিক, আর জায়গা বদল করে রোদের হাত থেকে বাঁচতে—সূর্যটাও যেন ততই নাছোড়বান্দা হয়ে খালি ঢুকে পড়ছে এদিক-ওদিক থেকে ফুটো দিয়ে, একটুকরো তীব্র আলো এসে পড়ছে কখনো ওর হাতে, কখনো মুখে। বাকি তিনটে জানালা দিয়ে কড়া রোদ এসে ঢুকছে সোজাসুজি চৌকো হয়ে। এরই একটা চৌকোর ভেতর শুয়ে আছে মিল্‌কা, অভ্যেসমত কান চুলকাচ্ছে আর আলোর গণ্ডীতে ঘুরে বেড়ান মাছিগুলোকে একদৃষ্টে দেখছে। কাটেনকা সাধারণত কৌচে বসে থাকে—হয় বোনে, নয়তো বই পড়ে ; ফর্সা টুকটুকে হাত দুখানা, সূর্যের আলোয় দেখায় প্রায় স্বচ্ছ, অধীর হয়ে সে হাত দুখানা নাড়ে এদিক-সেদিক মাছি তাড়াতে—ওরা তখন ঝাঁক বেঁধে সোনালী চুলে বসে গুনগুন করছে। লিউবোচ্‌কা হয় হাত দুখানা পেছনে রেখে ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায়—কখন বাগানে খেলতে যাবে সেই অপেক্ষায়, নয়তো বহুচেনা পুরনো একটা সুর বাজায়। আমি কোথাও বসে বসে সুযোগের অপেক্ষা করি কখন পিয়ানোতে গিয়ে বসব। ডিনারের পর সাধারণত আমি রাজী হই মেয়েদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বার হতে (আমার বয়স এবং মর্যাদা অনুযায়ী হেঁটে বেড়ানটা আমার পক্ষে অনুপযুক্ত বলে মনে করি) ; আমাদের বেড়ানটা খুব মজার হয়, যতসব নতুন নতুন পথে ওদের নিয়ে যাই। কোনসময় আমরা এ্যাড্‌ভেঞ্চার করি, আমি তাতে অসমসাহসের পরিচয় দিই, মেয়েরা আমার ঘোড়ায় চড়ার, আমার বীরত্বের

ভূয়সী প্রশংসা করে, আমাকে ওদের রক্ষাকর্তা বলে মেনে নেয়। সন্ধ্যেবেলা আমরা ছায়াঘেরা বারান্দায় বসে চা খাই, তারপর কোনো অতিথি না থাকলে বাবার সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত কাজে একটু ঘুরে এসে বারান্দায় আমার সেই পুরনো জায়গায় শুয়ে শুয়ে আগের দিনের মতই বই পড়ি আর স্বপ্ন দেখি —লিউবোচ্‌কা আর কাটেনকার গান শুনতে শুনতে। একদিন ড্রইংরুমে একটা কৌচে হেলান দিয়ে একা একা বসে বই পড়ছি, লিউবোচ্‌কা গান করছে, বহু পুরনো একটা সুর, বই পড়তে পড়তে আনমনে একবার মুখ তুলে বাইরে বারান্দার দিকে তাকাই, সামনের গাছ থেকে কচি কচি ডাল বাঁকা হয়ে এসে ঝুঁকে পড়েছে, সাঁঝের আবছা আলো গাছের ওপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, আবার তাকাই নির্মেঘ আকাশে, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ একটা ধোঁয়াটে হলুদ ফুলকি ফুটে উঠে আবার নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যায়, কানে আসছে হল থেকে বাজনার সুর, ফটকের ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ আওয়াজ, গ্রামের পথে গৃহপালিত পশু নিয়ে ফিরে আসছে মেয়ের দল—হঠাৎ আমার মনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল একে একে নাতালিয়া সাভিশ্‌না, মা-মণি, কার্ল ইভানিচ্‌, মুহূর্তের জন্য মনটা ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু জীবন তখন আশা আর আলোয় ভরা বেদনার স্মৃতিগুলো তাই মুহূর্তের জন্য আমাকে ধাক্কা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

রাতের খাওয়া সেরে সাধারণত আমি কাউকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে একটু বেড়াই—অন্ধকার পথে একা বেড়াতে ভয় হয়—তারপর বারান্দায় সেই জায়গাটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ি। জায়গাটা আমার ভারি প্রিয়, যদিও আমাকে লাখো লাখো মশা ছিঁড়ে খায়। আমি কত যে পূর্ণিমার রাত কাটিয়ে দিয়েছি বারান্দায় গাল্‌চের ওপর বসে বসে আলো আর ছায়ার লুকোচুরি দেখে, কান খাড়া করে শুনেছি রাতের শব্দ আর নিথরতা, স্বপ্ন দেখেছি কত কাব্যের আর 'অপার্থিব শান্তির'—জীবনে এগুলোয়ই মহত্তম সুখ কিন্তু মনে মনে দুঃখ পেয়েছি এই ভেবে যে আমার জীবনে কেবল কল্পনাই সার হল। অনেক সময় যেই দেখতাম সবাই যে যার ঘরে চলে গেল ড্রইংরুমের আলোগুলো নীচে থেকে ওপরের ঘরগুলোতে উঠে গেল, ওখান থেকে এক্ষুনি শোনা যাবে মেয়েদের গলার স্বর, জানালা খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ—আমি অমনি বারান্দায় চলে গিয়ে পায়চারি করে বেড়াই, দেখি কেমন আস্তে আস্তে সমস্ত বাড়িটা নিঃঝুম হয়ে ঘুমে ডুবে যায়!

খালি পায়ের সামান্য একটু শব্দ, একটু খুক খুক করা কাশি বা দীর্ঘনিঃশ্বাস,

টুক করে জানালার একটু শব্দ কিংবা পোশাকের সামান্য একটু খসখসানি—যে কোনো সামান্য একটু শব্দ কানে আসতে না আসতেই আমি তড়াক্ করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে তাকাই আর কান পেতে শুনি, দৃশ্যতঃ কোনো কারণ না থাকলেও মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠি। কিন্তু ওপরতলার আলোগুলোর একে একে নিভতে দেরি হয় না, পায়ের শব্দ আর কথাবার্তার জায়গা নেয় নাকের ডাক, রাতের পাহারাদার খট্‌খট্ আওয়াজ শুরু করে, জানালায় আলোর রেখা অদৃশ্য হওয়ায় বাগানটা আরও বেশি অন্ধকার কিন্তু তবুও উজ্জ্বল ; ভাঁড়ার ঘরের শেষ মোমবাতিটা আস্তে আস্তে পাশের ছোট ঘরটায় গিয়ে ঢুকল, শিশির-ভেজা বাগানে সরু একটা আলোর রেখা এসে পড়ল, দেখতে পেলাম বুড়ো ফোকার নুয়ে-পড়া দেহ, গায়ে একটা আলোয়ান হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে শুতে চলেছে। কি উত্তেজনা আর উৎসাহ! নিয়েই না আমি কত সময় ভিজে ঘাসের ওপর গুঁড়ি মেরে মেরে ওদের ঘরের জানালায় কান পেতে দাঁড়াই, নিঃশ্বাস রোধ করে শুনি বাচ্চা চাকরটার নাক-ডাকা, ফোকার গোঙানি, ও ভাবছে এখানে এসে কেউ শুনতে পাচ্ছে না, আর শুনি বহুক্ষণ, বহুক্ষণ ধরে ওর কাঁপা কাঁপা স্বরের প্রার্থনা। অবশেষে সেই শেষ মোমবাতিটাও নিভে যায়, দড়াম্ করে জানালাটা বন্ধ হয়ে যায়, আমি একেবারে একা পড়ে যাই ; এবারে কোথাও কোনো সাদা নারীমূর্তি দেখা যায় কিনা, কোনো ঝোপঝাড়ের আড়ালে কিংবা আমার বিছানার পাশে—চারিদিকে তাই লক্ষ্য করতে করতে লাফিয়ে লাফিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠি। তারপর বাগানের দিকে মুখ করে শুয়ে শরীরটাকে যতদূর সম্ভব ঢাকা দিয়ে আর চামচিকের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বাগানের দিকে চেয়ে থাকি, রাতের শব্দ শুনি কান ভরে আর হৃদয় ভরে কল্পনা করি ভালবাসা আর সুখের।

এবার সমস্ত পরিবেশটাই নতুন অর্থে ধরা দেয় আমার কাছে ; ঐ যে কতকালের বার্চগাছ—একদিকের ডালপালাগুলো চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত অন্য দিকের গুলো ছায়া মেলেছে ছোট ছোট ঝোপ আর পথের ওপর, নিস্তরঙ্গ, শান্ত পুকুর চিক্‌চিক্ করছে রুপোলী আলোয়, বারান্দার সামনে ফুলের ওপর শিশিরবিন্দু যেন টলটলে এক ঝলক জ্যোৎস্না ধূসর রঙের কেয়ারীর ওপর, ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সে ফুলের গাছ, পুকুরের অপর তীরে স্নাইপের ডাক, রাস্তায় একটা মানুষের গলা, দুটো বুড়ো বার্চগাছের গা ঘষাঘষির ক্ষীণ অস্পষ্ট একটু আভাস, আমার কানের কাছে কম্বলের তলায় একটা মশার গুনগুনানি, টুপ করে

শুকনো ডাল থেকে খসে পড়ল একটা আপেল, থপ থপ করে লাফিয়ে বারান্দার কিনারা পর্যন্ত উঠে আসছে ব্যাংগুলো, সবুজ পিঠগুলো আবছা আলোয় রহস্যময় ঠেকছে—এ সবই যেন বিশেষ অর্থপূর্ণ, এরা যেন সবাই অসীম একটা সৌন্দর্য, কল্পনাতীত একটা সুখের বার্তা বয়ে আনছে। তারপর দেখলাম তাকে, সে এল—লম্বা কালো চুলের বিনুনি, উঁচু বুক, সদা বিষণ্ণ কিন্তু ভারী সুন্দর মুখ নিয়ে আর আলিঙ্গনোন্মুখ দুটি শুভ্র বাহু বাড়িয়ে। ও আমাকে ভালবাসে, ওর একটি মুহূর্তের ভালবাসার জন্যে সারাটা জীবন আমি বিলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আকাশে চাঁদ ক্রমশই ওপরে উঠতে থাকে, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর জ্যোৎস্নার প্লাবনে চারিদিকে ভাসিয়ে দেয়, পুকুরের চিকচিকে জল আরও স্পষ্ট দেখা যায়, ছায়া আরও গভীর, আলো আরও স্বচ্ছ—এ-সবের দিকে তাকিয়ে বুক, কান ভরে এঁদের বারতা শুনি, কে যেন আমার ভেতর গুনগুন করে বলে ওঠে ঐ যে আমার প্রিয়া, ওর ব্যগ্রব্যাকুল বাহু আর তপ্ত আলিঙ্গন ও আমার চরম ও পরম সুখ থেকে অনেক, অনেক দূরে। ওর প্রতি প্রেমও যেন আমার সব চাওয়া আর পাওয়ার শেষ কথা নয় ; যতই আমি মুগ্ধ নেত্রে তাকাই আকাশে চাঁদের দিকে, অন্তর আমার শুদ্ধ, নির্মল হয়ে ততই ভগবানের কাছাকাছি পৌছয়, সব সৌন্দর্য সব সুখের যিনি আকর—প্রকৃত সৌন্দর্য আর সুখের অনুভূতিতে হৃদয় আমার ভরে ওঠে, অতৃপ্ত আনন্দ আর উত্তেজনার অশ্রুতে চোখ ভেসে যায়।

. তবুও আমি একা, একেবারে একা ; হালকা নীলচে আকাশের গায়ে চাঁদটা যেন আটকে আছে—উজ্জ্বল একখানা থালার মত, উঁচুতে কত উঁচুতে, চারিদিকের প্রকৃতি কি অপূর্ব—আর আমি কত ছোট, কত তুচ্ছ একটা পৃথিবীর অসার বাসনা কামনায় মত্ত একটা কীট মাত্র ; কিন্তু তবুও সীমাহীন আমার কল্পনা আর প্রেমের ক্ষমতা, সেই জোরেই এই মুহূর্তে মনে হল, ঐ যে প্রকৃতি, ঐ যে আকাশ আর চাঁদ আর আমি—সবাই আমরা এক।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

প্রতিবেশী

গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে প্রথম দিনই আমি খুব অবাক হলাম বাবা এপিফানোভ্‌দের "চমৎকার লোক" বলে উল্লেখ করছেন শুনে—তার চাইতেও বেশী আশ্চর্য হলাম দেখে বাবা ওদের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন! এপিফানোভ্‌দের সঙ্গে আমাদের বহুদিন ধরে মামলা চলছে ; ছোটবেলায় দেখেছি বাবা এই মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে গজরাচ্ছেন, এপিফানোভ্‌দের যথেচ্ছ গালাগালি করছেন, বিস্তর লোকজন যোগাড় করছেন আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে। ইয়াকভ ওদের বলত আমাদের শত্রু "শয়তান লোক" আর মনে পড়ে মা-মণি বলে দিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে কিংবা তাঁর সামনে যেন কখনও ওদের কোনরকম উল্লেখ না করা হয়।

এসব ব্যাপারের ওপর ভিত্তি করে ছোটবেলায় আমার মনে স্পষ্ট ছাপ পড়েছিল যে এপিফানোভ্‌রা আমাদের ভীষণ শত্রু, ওরা যে কোনও সময় বাবার গলা কাটতে প্রস্তুত, আর শুধু বাবাই নয় আমরাও রেহাই পাব না বাবার ছেলে বলে যদি একবার কোনমতে ধরতে পারে কাউকে—অর্থাৎ কি না ওরা যে শয়তান সে কথাটা একেবারে আক্ষরিকভাবে সত্যি। তাই সে বছর মা-মণির মৃত্যুর সময়ে এসে যখন দেখি আভ্‌দোতিয়া এপিফানোভা তাঁর সেবা-পরিচর্যা করছে, আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, ইনি আমাদের সেই শত্রু পরিবারেরই একজন আর ওদের সম্বন্ধে সেই হীন ধারণা এখনও মনে মনে পোষণ করি। সেবার গ্রীষ্মকালে যদিও মাঝে মাঝেই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছে, তবুও ওদের পরিবারটা সম্বন্ধেই আমার বিতৃষ্ণা কাটেনি। এপিফানোভ্‌দের পরিবারটা হচ্ছে এইরকম : মা বিধবা, বছর পঞ্চাশেক বয়েস কিন্তু বেশ হাসিখুশী আমুদে ভদ্রমহিলা, সুন্দরী মেয়ে আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না, ছেলে একটু তোতলা পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌, ভদ্রলোক একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট —অবিবাহিত, হাবভাবে খুব গম্ভীর।

আনা দ্মিত্রিয়েভনা এপিফানোভা স্বামীর মৃত্যুর আগে প্রায় বছর কুড়ি

স্বামীর কাছ থেকে দূরে থেকেছেন—কখনও সেণ্টপিটার্সবুর্গে যেখানে ওঁর আত্মীয়স্বজনেরা আছেন, বেশির ভাগই ওর গ্রাম 'মিতিশ্চি'তে, আমাদের বাড়ি থেকে তিন ভার্স্ট দূরে। চারিদিকে ওঁর সম্বন্ধে এত বিশ্রী-বিশ্রী গুজব রটানো ছিল যে মেসালিনা তার তুলনায় নেহাতই নিষ্পাপ ছিল। এই সব কারণে মা-মণির অনুরোধ ছিল এপিফানোভ্‌দের নামও যেন তাঁর সামনে উল্লেখ না করা হয়, কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করে সত্যিসত্যিই বলতে গেলে বলতে হয় যে গ্রামদেশে যেসব গুজব রটে তার দশ ভাগের এক ভাগও বিশ্বাস করা চলে না। আমি যখন আনা দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নাকে জানতাম, তখন যদিও তাঁর বাড়িতে চাষবাস তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কর্মচারী থাকত, তার নাম মিতুশা, খুব প্রসাধন করে চুল কোঁকড়া করে সেজেগুজে থাকত সার্কাসের লোকদের মত কোট গায়ে দিয়ে, ডিনারের সময় সে কর্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকত আর কর্ত্রী তার সাক্ষাতেই অতিথিদের ফরাসী ভাষায় আমন্ত্রণ জানাতেন, ঐ লোকটির সুন্দর চোখমুখের প্রশংসা করতে করতে—তবুও তখন পর্যন্তও গুজব রটাবার মত কিছু ছিল না। আসলে গত দশ বছরে অর্থাৎ আনা দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না যখন থেকে তার কর্তব্যপরায়ণ ছেলে পেত্রুসাকে সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, তখন থেকেই তার জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বদল ঘটেছে।

আনা দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার জমিদারী ছোট, সবসুদ্ধ একশজন প্রজার বেশি হবে না, কিন্তু ওঁর স্ফূর্তির খরচ এত বেশী যে দশ বছর আগে সেই সময়েই জমিদারীর বন্ধকের সময় পার হয়ে তা নীলামে ওঠার যোগাড়। তখন তিনি ছেলেকে জানান মাকে রক্ষা করার জন্য কাজে অবসর নিয়ে চলে আসতে।

পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ কাজে বেশ নাম করছিলেন কিন্তু মায়ের ডাক শুনে মাতৃভক্ত পুত্রের মত স্থির করলেন শেষ বয়সে মায়ের কাজে লাগাটাই একমাত্র কর্তব্য, অতএব অবসরপ্রাপ্তদের তালিকায় নাম উঠিয়ে তিনি গ্রামে ফিরে এলেন।

পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচের চেহারা যদিও সাদামাঠা, কথাবার্তা তোতলা, একটু বোকা-বোকা গোছের, তাহলেও ভদ্রলোক অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার লোক আর বাস্তব-বুদ্ধিটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নানা কলাকৌশলের সাহায্যে, ধারকর্জ, প্রার্থনা, শোধ দেবার প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি নানা উপায়ে শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পত্তিটা রক্ষে করেন। এরপর জমিদারীর রাশ পিয়ত্র নিজের হাতে নিলেন, গাড়ি, ঘোড়া সব বিক্রী করে দিলেন, মিতিশ্চিতে অতিথি আসা বন্ধ করলেন, খালনালা কাটালেন, বেশি জমিতে ফসল ফলালেন, চাষীদের প্রাপ্য কমিয়ে

দিলেন, গাছ কেটে বেশ ব্যবসায়ী বুদ্ধি খাটিয়ে বিক্রি করলেন—মোটামুটি সমস্ত ব্যাপারটাকেই কায়দা করলেন। পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ প্রতিজ্ঞা করলেন যতদিন না সব ঋণ শোধ হবে, ততদিন তিনি পরবেন কেবল ওঁর বাপের একটি পুরনো পোশাক, আর নিজে বানিয়েছিলেন একটি ক্যানভাসের কোট, সেটি আর চাষীদের ব্যবহৃত, সাধারণ ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর কোনো গাড়ি চড়বেন না—উনি নিজে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। বাড়ির ব্যাপারও শক্ত হাতে চালাতেন, কেবল মায়ের সম্মানটুকু বজায় রেখে। ড্রইংরুমে নিতান্ত অনুগত-ভাবে মায়ের সব ইচ্ছা পূরণ করতেন, তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে সবাইকে বকাঝকা করতেন কেউ যদি মায়ের কোনো হুকুম না মানত কিন্তু নিজের পড়ার ঘরে বা অফিসে বসলে সবাইকে কঠোর শাসন করতেন, টেবিলে যদি কোনদিন একটা হাঁস পড়ত তাঁর বিনাহুকুমে কিংবা আনা দমিত্রিয়েভ্‌না কোনো চাষীকে পাঠাতেন কোনো প্রতিবেশীর খবরাখবর করতে কিংবা কোনো চাষী-মেয়েকে বনে পাঠাতেন রাস্পবেরী তুলতে বাগান নিড়োবার বদলে।

বছর তিনেকের ভেতর ঋণ শোধ হয়ে গেল। পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ মস্কো থেকে ফিরে এলেন নতুন পোশাক পরে চার চাকার নৌকোর মত দেখতে এক গাড়িতে চেপে। কিন্তু তারপরেও কাজকর্ম বেশ ভাল চলা সত্ত্বেও ভদ্রলোক নিজের হাবভাব সেই আগের মতনই কঠিন করে রাখতেন আর তাতে নিজের পরিবার বা অপরিচিতদের সামনে বিশেষ গর্ববোধ করতেন। অনেক সময় তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বলেন, "আমাকে যে সত্যিসত্যিই দেখতে চায় সে আমাকে ভেড়ার চামড়ার কোট পরা দেখেই খুশি হবে, আর আমার সঙ্গে খুশী হয়েই সে বাঁধাকপির সুপ আর ঝোল খাবে, আমি নিজে যা খাই।" উনি যে ওর মায়ের জন্য স্বার্থত্যাগ করেছেন, সম্পত্তি বাঁচিয়েছেন তার জন্যে গর্ব আর অন্যেরা যে সে রকম কিছু করেনি তার জন্যে তাদের প্রতি ঘৃণা—এ দুটোই ওঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গিতে ফুটে বেরোয়।

মা আর মেয়ের চরিত্র এ থেকে একদম আলাদা, ওদের দুজনের মধ্যে আবার বিস্তর প্রভেদ। মা হচ্ছেন হাসিখুশী, সামাজিক, মধুর স্বভাবের মহিলা, মনটাও ভাল। ভাল কোনো জিনিস দেখলে প্রকৃতই তিনি খুশী হন। ছোটদের আনন্দ করতে দেখলে তিনি আনন্দ পেতেন—বিশেষ রকম সহৃদয় বুড়োবুড়ীদেরই এই গুণটি থাকে। কিন্তু ওঁর মেয়ে আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না সে আবার এর ঠিক উল্টো, ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির অথবা বরঞ্চ বলা চলে

স্বভাবত উদাসীন, কল্পনাপ্রবণ, খানিকটা উদ্ধত কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও —সাধারণত অবিবাহিতা সুন্দরী তরুণীদের ভেতরে যে গুণগুলো বিশেষভাবে প্রকট থাকে। তাই ভদ্রমহিলা যদি কখনো আনন্দিত হতে চেষ্টা করেন, তবে একটা ভারী অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, মনে হয় যেন নিজেকে অথবা যাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন তাদের ব্যঙ্গ করে হাসছেন,—আসলে ভদ্রমহিলার নিশ্চয় সেরকম কোনো মতলব নেই। আনা দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না খুব কর্মপটু—ঘরের কাজ, বাগান করা, ফুলের যত্ন, পাখি পোষা সবেতেই ওঁর সমান উৎসাহ। ওঁর ঘরগুলো কিংবা বাগান কোনটাই আকারে বেশি বড় নয় বা বিলাসিতার উপকরণে ভরা নেই কিন্তু প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার ঝকঝকে ছিমছাম, সাজানো-গোছানো, চমৎকার রুচির পরিচয় দেয়, সবেতেই যেন একটা হালকা খুশির আলো ছড়িয়ে থাকে—অতিথিরা সব সময় খুশি হয়ে আনা দ্‌মিত্রিয়েভ্‌নার ঘরবাড়ি আর ছোট বাগানটির প্রশংসা করে বলেন, "খেলার পুতুল।" কিন্তু আনা দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না নিজেই একটি ছোট্ট পুতুল—ছোটখাট রোগা ফর্সা টুকটুকে মানুষটি, ছোট্ট ছোট্ট নরম তুলতুলে হাত, সব সময় হাসিখুশী আর সুন্দর সাজগোজ করা। কেবলমাত্র হাতের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠা লালচে শিরাগুলোই যা একটু সৌন্দর্যের হানি ঘটায়।

আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না আবার এর ঠিক উল্টো, কখনও কাজই করেন না। ফুল বা অন্য কোনো শখ নিয়ে মাততে উনি ভালবাসেন না, এমনকি নিজের চেহারারও কোনো যত্ন করেন না। বাড়িতে অতিথি এলে ওঁকে সব সময় দৌড়তে হয় পোশাক পরতে। কিন্তু সেজেগুজে ফিরে এলে দেখায় ভারী চমৎকার, কেবল হাসি আর চোখের নিষ্প্রাণ ভঙ্গীটি বাদে। ওর সুন্দর মুখ আর লম্বা জাঁকালো দেহটি যেন সব সময় বলে, "যদি ইচ্ছে হয় তো আমার দিকে তাকাতে পার।

কিন্তু মায়ের এই হাসিখুশী হালকা ভাব আর মেয়ের গম্ভীর নিরাসক্ত মূর্তি আমাদের যেন বলে দিত—কী বর্তমান, কী অতীতে মেয়ের মা নিছক সৌন্দর্য আর হাসি-আহ্লাদ নিয়েই ভুলে থেকেছেন আর মেয়ের প্রকৃতি হল তাদের মত—যারা একবার কাউকে ভালবাসলে গোটা জীবনটাই তার হাতে সঁপে দেয়।

চত্বারিংশ অধ্যায়

বাবার বিয়ে

বাবার বয়েস তখন আটচল্লিশ বছর—আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলেন।

একজন জুয়াড়ী মোটা টাকা জেতার পর খেলা বন্ধ করে দিলে যেমন উত্তেজিত, অথচ আমোদ-আহ্লাদে উৎসুক, পাঁচজনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে উন্মুখ হয়ে থাকে—আমার ধারণা সেবার বসন্তে বাবা যখন মেয়েদের নিয়ে গ্রামে এলেন, তখন তাঁর ঠিক সেই মানসিক অবস্থা। তিনি জানেন ওঁর আয়ত্তে এখনও এত প্রচুর অর্থ যে জুয়া খেলে নষ্ট না করলে, তা দিয়ে জীবনের সাফল্য আনা খুবই সহজ। তাছাড়া, সময়টা বসন্ত, দৈবাৎ হাতে এসে গেছে প্রচুর টাকা, জীবনটাও একঘেয়ে লাগছে। ইয়াকভের সঙ্গে নানা আলোচনা করতে করতে বাবার মনে পড়ে যায় এপিফানোভ্‌দের সঙ্গে বহুকালের মামলা আর আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার মিষ্টি মুখখানা, যাকে তিনি বহুকাল দেখেননি—আমি যেন কল্পনানেত্রে দেখতে পাই বাবা বলছেন ইয়াকভ্‌কে, বুঝলে ইয়াকভ্‌ খারলামিচ্‌ আমি ভাবছিলাম কি জান, ওই অভিশপ্ত জায়গাটুকু ছেড়ে দেওয়াই ভাল, কি বল ?

আমি কল্পনা করতে পারি এর জবাবে ইয়াকভের আঙুলগুলো পিঠের দিকে 'না'-এর ভঙ্গীতে আকুলিবিকুলি করছে, তারপর মৌখিক প্রতিবাদ জানাচ্ছে, "কিন্তু আমাদের দাবিই তো ন্যায্য, পিয়ত্র আলেকজান্দ্রোভিচ্‌।"

কিন্তু বাবা গাড়ি বার করতে হুকুম দিলেন, তারপর বাহারে জলপাই রঙের কোটটি গায়ে চড়িয়ে, বাকি চুল কগাছার ওপর ব্রাস চালিয়ে রুমালে সুগন্ধি ঢেলে খুব খুশী মনে—খুশী হবার কারণ হচ্ছে ওঁর ধারণা যে উনি অভিজাতদের উপযুক্ত কাজই করতে যাচ্ছেন, আর বিশেষ করে একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে সেই আনন্দে, গাড়ি চড়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে চলে গেলেন।

আমি কেবল এইটুকু জানি সেদিন বাবা পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচের দেখা

পাননি, তিনি মাঠে ছিলেন, কাজেই দু-এক ঘণ্টা মেয়েদের সঙ্গে কাটিয়ে আসেন। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি বাবা সে সাক্ষাতে কেমন অমায়িকতার বন্যায় মেয়েদের একেবারে ভাসিয়ে দেন, মুগ্ধ করে দেন, মেঝেতে নরম বুটের টোকা মেরে কত গল্প করেন, ফিসফিস করে কত কথা বলেন, কতরকমে চোখ নাচান। আরও কল্পনা করতে পারি, ছোট, হাসিখুশী বৃদ্ধা মহিলাটির মনে বাবার প্রতি কেমন স্নেহের ভাব জাগে, আর সুন্দরী উদাসীন মেয়েটির মনেই বা কেমন উৎসাহের সঞ্চার হয়।

চাকর যখন হাঁফাতে হাঁফাতে মাঠে গিয়ে পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌কে সংবাদ দেয় যে বুড়ো এরতেনিয়েভ নিজে এসেছেন আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই পিয়ত্র চটেমটে জবাব দেন, "এসেছে তো এসেছে তাতে হয়েছে কি ? এসেছেই বা কেন ?" তারপর একমাত্র এই কারণেই যতটা সম্ভব দেরি করে ধীরে-সুস্থে তিনি বাড়ির পথ ধরেন, এমনকি বোধহয় একবার পথে পড়ার ঘরে গিয়েও ঢোকেন আর ইচ্ছে করেই নোংরা কোটটা গায়ে চড়ান তারপর বাবুর্চিকে খবর পাঠান, খবর্দার যেন ডিনারে একটি পদও না বাড়ে এমনকি যদি মেয়েরা হুকুম দেয় তাহলেও না।

এরপরে এপিফানোভ্‌দের সাহচর্যে বাবাকে এতবার দেখেছি যে প্রথম দিনের সাক্ষাতের ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। কল্পনা করতে পারি সেদিন বাবা যদিও মামলাটা আপসে মিটিয়ে দিতে চান পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌ তবুও গম্ভীর মনমরা হয়ে থাকেন কারণ এরজন্যে তিনি মায়ের কাজে স্বার্থত্যাগ করেছেন আর বাবাকে সেরকম কিছুই করতে হয়নি, কিন্তু বাবা ওর মুখভার না দেখার ভান করে নিজে হৈ-চৈ স্ফূর্তি করতে লাগলেন, বরঞ্চ এমন ভাব দেখালেন যেন পিয়ত্র নিজে খুব কৌতুকপ্রিয়, এতে অবশ্য মাঝে মাঝে পিয়ত্র খুবই চটে যাচ্ছিলেন, তবে মাঝে মাঝে আবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবার ইচ্ছার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। যে কোনো কারণেই হোক, বাবা সব ব্যাপারটাকেই ঠাট্টা তামাসা বলে চালাতে চান তাই বোধহয় পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌কে কর্নেল বলে ডাকছিলেন; পিয়ত্র তাতে রেগে লাল হয়ে আরও বেশী তোতলাতে তোতলাতে বলছিলেন, "আমি ক-ক-কর্নেল নই, আমি লে-লে-লেফ্‌-টেন্যাণ্ট"—কিন্তু বাবা ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই আবার সেই 'কর্নেল' বলে ডেকে ফেলছিলেন।

লিউবোচ্‌কার কাছে শুনেছিলাম আমাদের গিয়ে পৌঁছবার আগে

এপিফানোভ্‌দের সঙ্গে রোজই দেখাসাক্ষাৎ হত—বেশ মজাতেই দিন কাটছিল। বাবার সব কাজেই বেশ রুচির পরিচয় আবার বেশ নতুনত্বের ছোঁয়াচ, সেই ভাবেই বাবা শীকার, মাছধরা এসবের ব্যবস্থা করলেন, একবার বাজী পোড়ানোর উৎসবও হল—এপিফানোভ্‌রা তাতে উপস্থিত থাকলেন। লিউবোচ্‌কার কাছে শুনেছি আরও বেশী মজা হত কিন্তু ঐ অসহ্য পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌ খালি ভুরু কুঁচকে থাকে আর তোতলাতে তোতলাতে কি যে সব বলে—সব মজাটাই মাটি হয়ে যায়।

আমরা যাওয়ার পরে এপিফানোভ্‌রা কেবল একবার এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, আমরাও সৌজন্যের খাতিরে একবার গিয়েছিলাম। বাবার নামকরণের স্মৃতি উৎসবের দিনে আরও অনেক অতিথির সঙ্গে এপিফানোভ্‌রাও এসেছিলেন, তারপর থেকেই ওঁদের সঙ্গে আমাদের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল, তখন থেকে বাবা নিজে একাই যেতেন দেখাসাক্ষাৎ করতে।

বাবা আর দুনেচ্‌কা—ওটা ওঁর মায়ের দেওয়া নাম—ওঁদের দুজনকে যখনি আমি একসঙ্গে দেখেছি, তখন যা আমার নজরে পড়েছে, তা হচ্ছে এই : বাবা সবসময়ই হাসিখুশী, আনন্দে উজ্জ্বল সেই প্রথম দিনে যেমনটি দেখেছিলাম। নতুন করে ফিরে-পাওয়া যৌবন আর জীবনের আনন্দে ভরপুর। সে আনন্দের ছটা যেন ওঁর মুখেচোখে ফুটে বেরোয়, আর আশেপাশে যারা থাকে অজান্তে তাদের ভেতরেও সে আনন্দ সঞ্চারিত হয়ে যায়। আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না ঘরে থাকতে বাবা কখনও তাকে ছেড়ে এক পা-ও যান না আর উঠতে বসতে এত মিষ্টি-মিষ্টি প্রশংসা করেন সমানে যে আমার ভীষণ লজ্জা হয় বাবার জন্যে। অথবা বাবা বসে বসে দুইচোখে অনুরাগ ভরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবেন ওর দিকে, মাঝে মাঝে বেশ পরিতৃপ্তভাবে ঘাড় নাড়বেন কিংবা কাশবেন, কোনো সময় ফিসফিস করে ওর কানে কানে কিছু বলবেন হাসিমুখে। কিন্তু বাবার মুখে সবসময়েই লেগে থাকে একটা ঠাট্টা-তামাসার হাসি—বাবার একটা বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে পরম গম্ভীর ব্যাপারেও এই হাসি-ঠাট্টার ভাবটা বজায় রাখা।

গম্ভীর আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার মনটাতেও যেন মনে হত বাবার হাসি আর আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে। নীল চোখ দুটিতে সে খুশীর আলো যেন সবসময় উপচে পড়ত, কেবল মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা লজ্জার ঝড় এসে তাঁকে আড়ষ্ট করে দিত—মনের এই বিশেষ ভাবটির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তাই

তখন ওঁর দিকে তাকাতে আমি কষ্ট পেতাম। এমনি মুহূর্তে ভদ্রমহিলা ভীষণ ভয় পেতেন, ভাবতেন, সবাই বুঝি একদৃষ্টে ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছে আর ওঁর প্রতিটি কাজে সবাই অসন্তুষ্ট হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে সকলের দিকে তাকাতেন; মুখচোখের রং ঘন ঘন বদলাত তারপর কথা বলতে শুরু করতেন সাহসের সঙ্গে আর খুব জোরে জোরে, বেশীর ভাগই একেবারেই অর্থহীন; এ সম্বন্ধে উনি সম্পূর্ণ সচেতন তাই যখন বুঝতেন উপস্থিত সবাই এমনকি বাবা পর্যন্ত তার কথা মন দিয়ে শুনছেন, তখন লজ্জায় আরও রাঙা হয়ে উঠতেন। বাবা কিন্তু ওঁর কথায় কিছুমাত্র বোকামি খুঁজে পেতেন না; আগের মতই সানুরাগে কাশতেন আর নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতেন মোহগ্রস্তের মত। আভ্‌দোতিয়ার ওপর লজ্জার আক্রমণ ঘটত সাধারণত বিনা কারণেই, তবে অনেক সময় দেখেছি সেটা হত বাবার সামনে সুন্দরী কোনো তরুণীর নামোল্লেখ করলে; তৎক্ষণাৎ ভদ্রমহিলার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটত, গম্ভীর ভাব থেকে হঠাৎ হাসিখুশী হয়ে উঠতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু সে ভাবটা খুব সহজ, স্বাভাবিক হত না, কেমন বাধ বাধ ঠেকত—এ কথা আমি আগেই বলেছি। তাছাড়া বাবার প্রিয় কথাগুলোর বার বার উল্লেখ করা, সেই ঢঙে কথা বলা, বাবার সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল, অন্য আর পাঁচজনের সঙ্গে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা চালান—এ সব জিনিসগুলোই নিঃসন্দেহে আমার কাছে ধরিয়ে দিত বাবা আর আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার সত্যিকারের সম্পর্কটা—যদি আমার বয়েসটা আর একটু বেশি হত অথবা সংশ্লিষ্ট লোকটি যদি আমার বাবা না হয়ে অন্য কেউ হতেন। কিন্তু আমি কিছুই সন্দেহ করলাম না, এমনকি একদিন যখন বাবা আমার সামনেই পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচের একখানা চিঠি পড়ে খুবই মুষড়ে পড়লেন আর সেই থেকে আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত এপিফানোভ্‌দের কাছে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন তখন পর্যন্তও না।

আগস্ট মাসের শেষে বাবা আবার আমাদের প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে দেখা শুরু করলেন আর আমার আর ভলোদিয়ার মস্কো যাবার আগের দিন প্রকাশ করলেন যে তিনি আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নাকে বিয়ে করবেন বলে স্থির করেছেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

খবর শুনে

খবরটা প্রকাশিত হবার ঠিক আগের দিন সবাই সেটা জেনেছে, তা নিয়ে আলোচনা করছে। মিমি সারাটা দিন ঘর ছেড়ে বেরোয়নি, কেবল কেঁদেছে। কাটেনকা মায়ের কাছে বসে থাকল, কেবল খাবারের সময় বেরিয়ে এল, মুখে-চোখে একটা ভীষণ আহত অপমানের ছাপ ফুটিয়ে, সেটাও মায়ের কাছ থেকে ধার করা। লিউবোচ্‌কার আবার দেখি ঠিক উল্টো, মহা স্ফূর্তি, ডিনারে বসে আমাদের বলল ভীষণ একটা মজার খবর আছে ওর ঝুলিতে, কিন্তু আমাদের কা-উ-কে বলবে না, কখনো না। "তোমার গোপন খবরটাতে মজা কিচ্ছু নেই," ভলোদিয়া বলে, ওকে দেখলাম একটুও খুশী নয়। "বরঞ্চ তোমার যদি কোনো জিনিস তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা থাকত, তবে দেখতে ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যের।" লিউবোচ্‌কা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।

ডিনারের শেষে ভলোদিয়া আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু লোকে কি ভাববে বলে বোধহয় শেষ পর্যন্ত শুধু আমার কনুইতে সামান্য একটু ছুঁয়ে ইশারা করে হলের দিকে দেখিয়ে দিল।

"লিউবোচ্‌কার গোপন খবরটা কি জান?" আশেপাশে আর কেউ আছে কিনা ভাল করে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভলোদিয়া বলে।

আমি আর ভলোদিয়া দুজনে কখনো এভাবে মুখোমুখি কোনো দরকারী কথা নিয়ে আলোচনা করিনি, তাই এখন দুজনেরই খুব অপ্রস্তুত লাগল; তবুও আমার চোখে ভয়ের ছায়া দেখে ভলোদিয়া যতদূর সম্ভব গম্ভীরভাবে সোজাসুজি স্পষ্ট চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল যেন বলছে, "ঠিক আছে, ভয় পাবার কিচ্ছু নেই; যাইহোক আমরা দুজনে ভাই, পারিবারিক গুরুতর কোনো ব্যাপার ঘটলে, আমাদের আলোচনা করতেই হবে।

"বাবা এপিফানোভাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, জান?"

আমি মাথা নাড়লাম, খবরটা আগেই শুনেছি।

"ভারি বিশ্রী ব্যাপার", ভলোদিয়া বলে চলে।

"কেন ?"

"কেন ?" ভলোদিয়া ঝাঁকিয়ে ওঠে, "ওই রকম একটা তোতলা মামা আর ঐ সব আত্মীয়স্বজনকে পেলে খুব মজা হবে, না ? আর হ্যাঁ, ওঁকে এখন মোটামুটি ভালই মনে হচ্ছে, খুব খারাপ নয়, কিন্তু কে বলতে পারে পরে গিয়ে কিরকমটা দাঁড়াবে ? ধরেই নিলাম না হয় আমাদের কোনো ক্ষতি হল না, কিন্তু শীগগিরই লিউবোচ্‌কা সমাজে বেরোবে। এরকম একটি মামা থাকা খুব সম্মানের নয়, বুঝলে ? ভদ্রমহিলা তো ফরাসী ভাষাটা ভাল করে জানেন না, কি আদবকায়দা আর তিনি লিউবোচ্‌কাকে শেখাতে পারবেন ? উনি কেবল একটি স্ত্রীলোক মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। এমনিতে যদি ভালও হন, তবুও তিনি তাই।" ভলোদিয়া তার কথা শেষ করে, বেশ বোঝা গেল ব্যঙ্গ করে স্ত্রীলোক কথাটা বার বার ব্যবহার করে সে বেশ খুশী।

বাবার কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভলোদিয়াকে এরকম ঠাণ্ডা মাথায় মতামত দিতে দেখে আমি যতই অবাক হই না কেন, কথাটা কিন্তু আমার কাছে সত্যি বলেই ঠেকল।

"বাবা বিয়ে করছেন কেন ?" আমি প্রশ্ন করি।

"কে জানে, সে নাকি এক অদ্ভুত গল্প। আমি কেবল এইটুকু জানি, পিয়ত্র ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌ই নাকি এই বিয়েটা দাবি করেছেন, তাই নিয়ে জেদাজেদি করেছেন। বাবার এটা ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটায় মজা পেলেন, এক ধরনের শিভ্যাল্‌রি আর কি। অদ্ভুত গল্প একটা। আমি বাবাকে সবে বুঝতে শুরু করেছি—উনি খুবই চমৎকার, ভাল, বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু ভীষণ হাল্‌কা প্রকৃতির, চঞ্চলমতি। সত্যি আশ্চর্য! কোনো মেয়ের দিকে উনি কখনো ঠাণ্ডা মাথায় তাকাতে পারেন না। কেন, তুমি নিশ্চয় জান এ পর্যন্ত উনি কোনো মেয়ের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় করতে পারেননি তার প্রেমে না পড়ে। এমন কি মিমি পর্যন্ত, জান না ?"

"তার মানে ?"

"শোন বলছি, আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যৌবনে বাবা মিমিরও প্রেমে পড়েছিলেন। ওর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখতেন; ওদের দুজনের মধ্যে কিছু একটা ছিল। মিমি আজ পর্যন্ত তাই নিয়ে কষ্ট পায়।" ভলোদিয়া হেসে ফেলে।

"যাঃ, তা কখনো হতে পারে না।" ভীষণ অবাক হয়ে বলি।

"কিন্তু কথাটা হচ্ছে," ভলোদিয়া আবার খুব গম্ভীর হয়ে পড়ে; আর হঠাৎ ফরাসী ভাষায় বলতে শুরু করে, "আমাদের সব আত্মীয়স্বজনের কাছেই বা এই বিয়েটা কেমন ঠেকবে? আর ওঁর নিশ্চয় ছেলেমেয়ে হবে!"

ঠিক সেই মুহূর্তেই লিউবোচ্‌কা আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। "তাহলে তোমরা জান?" উৎসাহে জলজ্বলে মুখ নিয়ে ও জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ," ভলোদিয়া বলে, "কিন্তু দেখে আমি খুবই অবাক হচ্ছি লিউবোচ্‌কা, তুমি তো আর কচি খুকিটি নও, তুমি কি করে এতে খুশী হও যে বাবা একটা বাজে মেয়েলোককে বিয়ে করছেন?"

লিউবোচ্‌কা হঠাৎ খুব গম্ভীর, আর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল।

"আঃ, ভলোদিয়া! বাজে মেয়েছেলে! কি করে তুমি সাহস করলে আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার সম্বন্ধে এমন কথা বলতে? বাবা যখন ওঁকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তখন কখনো উনি বাজে হতে পারেন না।"

"নাঃ, মানে—এই, ওটা আমার বলবার ধরণ, কিন্তু তবুও……"

"এতে আর 'তবুও' কিছু নেই," লিউবোচ্‌কা জ্বলে ওঠে।

"তুমি যে মেয়েকে ভালবাস, তাকে বাজে মেয়েছেলে বলতে আমাকে কখনো শোননি, শুনেছ? আর তুমি কিনা…বাবা আর চমৎকার একজন ভদ্রমহিলার নামে তুমি ও কথাটা বললে কি করে? তুমি আমার সবচাইতে বড় ভাই হলেও অমন কথা আর কখনো আমার কাছে উচ্চারণ করো না। করা তোমার উচিত নয়।"

"আমি কি কারুর সম্বন্ধে আমার একটা মতামতও প্রকাশ করতে পারি না?"

"না! আমাদের বাবার মত বাবার সম্বন্ধে না!" লিউবোচ্‌কা আবার বাধা দেয়, "মিমি পারে কিন্তু তুমি আমাদের বড় ভাই, তুমি পার না।"

"কিন্তু তুমি এখনও কিছু বোঝ না", ভলোদিয়া ঘৃণার সঙ্গে বলে, "শোন। এটা কি ভাল, কে-একজন এপিফানোভা ইনেচ্‌কা এসে তোমার মা-মণির জায়গা দখল করবে?"

লিউবোচ্‌কা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, তারপরেই ওর চোখ দুটিতে জল টলটল করে ওঠে।

"আমি জানতাম তুমি অহঙ্কারী, উদ্ধত কিন্তু জানতাম না তুমি এতবড় শয়তান," বলে লিউবোচ্‌কা ঘর ছেড়ে চলে যায়।

"যাও, যাও," ভলোদিয়া গম্ভীর মুখে একটা বোকাটে ভাব ফুটিয়ে মুখখানাকে মজার করে তোলে, "ওদের একবার বোঝাবার চেষ্টা কর!" ভলোদিয়া আপন মনেই বলে—যেন লিউবোচ্‌কার মত একটা মেয়ের সঙ্গে আবার এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে গেছে বলে নিজেকে ধমকাচ্ছে।

পরের দিন আবহাওয়াটা ভারী বিশ্রী, আমি যখন ড্রইংরুমে ঢুকলাম, তখন আর কেউ নীচে চা খেতে নামেনি—বাবাও না, মেয়েরাও নয়। রাতে বৃষ্টি হয়ে কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে, এখনও ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ আকাশে এখানে-সেখানে ভাসছে, তার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের ঝাপসা আলো দেখা যাচ্ছে। বাইরে বাতাস, শীত আর স্যাঁতসেঁতে। বাগানে যাবার দরজাটা খোলা। গাড়িবারান্দায় জমা বৃষ্টির জলের পুকুর ধীরে ধীরে শুকোচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় খোলা দরজার পাল্লা একবার খুলছে আরেকবার বন্ধ হচ্ছে; রাস্তাঘাট স্যাঁতসেঁতে, কাদা-প্যাচপেচে; বুড়ো বার্চগাছগুলো পত্রবিহীন সাদা ডালপালা-সহ, ঝোপঝাড়, ঘাস, কাঁটাগাছগুলো, এল্ডার তার পাতার বিবর্ণ দিকগুলো উল্টে ধরে যে যার নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে বাতাসের সঙ্গে লড়াই করছে, মনে হচ্ছে যেন শিকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়তে চায়; চারিদিকে গোল হলদেটে শুকনো পাতার রাশি ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে—বাতাসের ঘূর্ণিতে পড়ে গোল হয়ে হয়ে ঘুরছে একটা যেন আরেকটাকে ধাওয়া করছে, লিচুগাছে-ঘেরা পথটা বেয়ে উড়তে উড়তে নিজেরা ভিজে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ভিজে রাস্তা, আর স্যাঁতসেঁতে ঘন সবুজ ভিজে মাঠে। আমার মনের আনাচেকানাচে ঘুরছে খালি বাবার বিয়ের কথা, ভলোদিয়া যে-দিক থেকে দেখছে, সে-দিক থেকে। আমার বোনের ভবিষ্যৎ, আমাদের ভবিষ্যৎ, এমন কি আমার বাবারও—কোনদিকেই আলোর রেখা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার বুকটা ভার—একজন অপরিচিত বাইরের লোক, বিশেষ করে একটি সুন্দরী তরুণী সে কিনা এসে জায়গা দখল করবে, কার? আমার মা-মণির? মনটা একদম দমে গেল, বাবাকে আরও বেশী অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। এমন সময় বাবার গলা কানে এল, বাবুর্চিখানার ভাঁড়ার ঘরে ভলোদিয়ার সঙ্গে কথা বলছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে বাবার সঙ্গে দেখা করতে মন চাইল না, তাই দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু লিউবোচ্‌কা এসে জানাল বাবা নাকি আমাকে খুঁজছেন।

ড্রইংরুমে পিয়ানোর ওপর একটা হাতের ভর দিয়ে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, আমার আসার পথের দিকে তাকিয়ে, অধীর দৃষ্টিতে কিন্তু বিজয়ীর ভঙ্গিতে।

এতদিন ধরে যে আনন্দ আর যৌবনের আভা জলজল করতে দেখেছি তার চিহ্নমাত্রও নেই। খুব চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হল। ভলোদিয়া ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, হাতে একটা পাইপ। আমি বাবার কাছে গিয়ে সুপ্রভাত জানালাম।

"দেখ", বাবা মাথা একটু তুলে স্থির সঙ্কল্পের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা বলতে শুরু করেন, যেমন করে মানুষ অপ্রিয় অথচ অনিবার্য কোনো ঘটনাকে প্রকাশ করে, "তোমরা বোধহয় জান আমি শীগগিরই আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নাকে বিয়ে করছি। (এবার বাবা একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন) তোমাদের মা-মণি মারা যাবার পর আমি আর বিয়ে করতে চাইনি—কিন্তু—(এক মুহূর্ত থামলেন) —কিন্তু এটা বোধহয় ভাগ্যের লেখা। ইনেচ্‌কা ভারী ভাল, কোমল মন—বয়েসও খুব কম নয়। আশা করি, তোমরা ওকে ভালবাসতে পারবে, ও তো তোমাদের খুবই ভালবাসে।" এবার ভলোদিয়া আর আমার দিকে ফিরে আমাদের প্রতিবাদ জানাবার কোনো সুযোগ না দিয়েই বাবা আবার বলেন, "তোমাদের চলে যাবার সময় হয়েছে। কিন্তু আমি নতুন বছর পর্যন্ত থাকব (একটু দ্বিধা করে) তারপর আমার স্ত্রী আর লিউবোচ্‌কাকে নিয়ে যাব," বাবার এরকম ভীত আর অপরাধী ভাব দেখে আমার বুকে একটা কাঁটা খচ্‌ করে বিঁধল, একটু এগিয়ে গেলাম বাবার দিকে; কিন্তু ভলোদিয়া সেই একইভাবে মাথা নীচু করে সিগারেট টানতে টানতে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে।

"তাহলে বন্ধুরা, তোমাদের বুড়ো বাবা এই ঠিক করেছে," বলে বাবা কথা শেষ করেন, লাল হয়ে উঠে অপ্রস্তুতভাবে একটু কাশেন আর আমার ও ভলোদিয়ার হাত দুখানা ধরে তাতে চাপ দেন। বাবার চোখে জলের আভাস লক্ষ্য করলাম ভলোদিয়ার দিকে যে হাতটা বাড়িয়ে ধরেছেন—ভলোদিয়া তখন ঘরের আর এক কোণে—সে হাতটি অল্প অল্প কাঁপছে থির থির করে। এই হাতের কাঁপন চোখে পড়তেই আমার ভীষণ দুঃখ হল, সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কথা মনে হল, ১৮৪২ সালে বাবা ছিলেন সৈন্যবাহিনীতে একজন সাহসী অফিসার, সকলেই ওঁর নাম জানত। আমি বাবার মস্ত বড় পেশীবহুল হাতখানা ধরে চুমু খেলাম। বাবা আমার হাতখানা খুব জোরে চেপে ধরলেন তারপর চোখের জলটা কোনমতে চেপে লিউবোচ্‌কার মাথাটি দুহাতে তুলে ধরে ওর চোখে চুমু খেতে লাগলেন। ভলোদিয়া হাত থেকে পাইপটা মাটিতে ফেলে দিল, নীচু হয়ে কুড়োবার ছলে হাতের মুঠো দিয়ে চোখটা মুছে সকলের অলক্ষ্যে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়

বিয়ে হবে দুসপ্তাহ বাদে ; কিন্তু আমাদের ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে, তাই সেপ্টেম্বরের প্রথমেই আমি আর ভলোদিয়া মস্কো ফিরে গেলাম। নেখ্‌লুইদভ্‌রাও গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। দ্‌মিত্রি (আমরা দুজনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চিঠি লিখব বলে কিন্তু কেউ একটাও লিখিনি) শহরে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, ঠিক হয়েছে পরের দিন ও সঙ্গে করে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশে নিয়ে যাবে।

পরিষ্কার, ঝকঝকে রোদ-ওঠা দিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটায় ঢুকতেই আমার সব সাহস ভরে গেল—চারিদিকে আলোয় আলো ঘর, বারান্দা, মাঠে গিজগিজ করছে সুবেশ ছাত্রের দল, চারিদিকে হল্লা, হৈ-চৈ। আমিও ওদেরই দলের একজন, ভাবতেও ভারী ভাল লাগল। কিন্তু মুখচেনা মাত্র সামান্য কয়েকজনের সঙ্গে, তাদের সঙ্গেও আলাপ হল শুধু একটু মাথা নাড়ায়, কেমন আছ ইরতেনিয়েভ? কিন্তু আমার আশেপাশে যেন ঝড় বয়ে চলেছে, হাত ঝাঁকাঝাঁকি, গল্পগুজব, শুভেচ্ছা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদির আর শেষ নেই। এদের সকলেরই ভেতর যেন একটা অদৃশ্য বাঁধন কিন্তু আমার মনে ভারী কষ্ট হল আমি যেন ঠিক এদের সঙ্গে মিলতে পারছি না। অবশ্য সেটা কেবল এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই বিরক্তি ধরল, আর সেই বিরক্তি থেকেই চট্‌ করে সিদ্ধান্ত করে ফেললাম ভালই হয়েছে—যে আমি এদের দলে মিশে যাইনি, আমার নিজস্বও একটা বন্ধুর দল থাকবে—চমৎকার সব ছেলে তারা। আমি তৃতীয় বেঞ্চে গিয়ে বসলাম, সেখানে বসেছে কাউণ্ট বি, ব্যারন জেড্‌, প্রিন্স আর, ইভিন, ওদের সমাজের আরও অনেকে—আমি কেবল চিনি ইভিন আর কাউণ্টকে। এদের চাউনি দেখে বুঝলাম আমি ওদের দলেও পড়ি না। চারপাশে কি ঘটছে বসে বসে তাই দেখতে থাকি। সেমেনভ, তার মাথা, উস্কোখুস্কো চুল আর সাদা দাঁত নিয়ে

একটু দূরেই বসেছে, হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে একটা কলম কামড়াচ্ছে। জিম্‌নাসিয়াস্ট দলের ছেলেটি সেই পরীক্ষায় যে প্রথম হয়েছিল, সে প্রথম বেঞ্চিতে বসেছে, তার গলায় এখনও কালো রঙের রুমাল জড়ানো, সাটিনের ভেস্টের ওপর ঝোলানো একটা ঘড়ি নিয়ে খেলা করছে। ইকোনিনও শেষ পর্যন্ত কি করে যেন এখানে ঢুকতে পেরেছে, সে বসেছে সবচাইতে উঁচু বেঞ্চিটায়। ওর নীল প্যাণ্টের তলায় জুতো একদম ঢাকা পড়েছে—ও হাসছে আর চেঁচিয়ে সবাইকে ডেকে বলছে ও পারনামাসে* উঠে বসে আছে। ইলিনকা—দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম, আমাকে নমস্কার করল নিতান্তই নির্বিকারভাবে এমনকি বেশ খানিকটা অবজ্ঞার সঙ্গে, যেন আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে যে এখানে সবাই সমান—ও ঠিক আমার সামনে গিয়ে বসে বেশ সহজ ভঙ্গিতে কায়দা করে বেঞ্চির ওপর রোগা পা দুটো তুলে দিয়ে আর একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। মাঝে মাঝে এক-আধবার আমার দিকে তাকায় মাত্র।

আমার পাশে-বসা ইভিনের দল ফরাসীতে কথা বলছে। এদের আমার ভীষণ বোকা লাগল। দু-একটা কথা যা আমার কানে এল তা শুধু অর্থহীন নয়, ভুলও বটে, আদৌ ফরাসীই নয়। আর এদিকে সেমেনভ, ইলেনকা আর বাকিদের ব্যবহার আবার অভদ্র মনে হল ঠিক "হিসেব মতন" নয়।

আমি এদের কোনো দলেই পড়ি না ; দলছাড়া হয়ে পড়ে আর বন্ধুবান্ধব জোটাতে না পেরে মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। একজন ছাত্র নখ কামড়াচ্ছে আমার সামনের বেঞ্চিতে বসে—এত বিশ্রী লাগল যে ওর কাছ থেকে অনেকটাই সরে গেলাম। মনে পড়ে, সেই প্রথম দিনটায় আমার অবস্থা অতি করুণ হয়েছিল।

অধ্যাপক এসে ঢুকতে সবাই একবার উঠে দাঁড়াল, তারপর একেবারে চুপচাপ—এবাবে আমি ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে অধ্যাপকের দিকে নজর দিলাম। শুরুতেই যে বক্তৃতাটা দিলেন, সেটা শুনে আমি খুবই অবাক হলাম আমার মতে সেটা সম্পূর্ণ অবান্তর। আমি চেয়েছিলাম বক্তৃতাটা শুরু থেকে শেষ অবধি আগাগোড়াই এমনি মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল হবে যে তা থেকে একটা লাইনও বাদ দেওয়া বা যোগ দেওয়া যাবে না। অতএব আমি

* পারনামাসে—গ্রীসের একটি পবিত্র পাহাড়—অনুবাদিকা

এবার মোটা বাঁধান খাতাটিতে 'প্রথম বক্তৃতা' নামের নীচে বেশ করে আঠারটি নানাভঙ্গীর মুখ আঁকলাম মালার মত গোল করে—মাঝে মাঝে কেবল হাতটা এক-আধবার কাগজের ওপর এধার থেকে ওধার নেবার ভান করছিলুম, যাতে অধ্যাপক (আমার বিশ্বাস, তিনি আমার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছিলেন) মনে করেন আমি লিখছি। সেই বক্তৃতাতে বসে বসেই ঠিক করে ফেললাম অধ্যাপকেরা যে যা বলেন তার সবকিছু টুকে নেওয়ার কোনো দরকার নেই, এমনকি লিখে নেওয়াই বোকামী—এর পর থেকে আগাগোড়া সেই নিয়মটাই বজায় রেখেছিলাম।

এর পরের বক্তৃতাগুলোয় আর ততটা একা লাগল না ; অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালাম, গল্পগুজব করতাম, হাতে হাত দিতাম ; তবুও কি জানি কেন কারও সঙ্গেই আমার ঠিক মনের মিতালী হল না, অনেক সময়ই মন ভার করে একা একা বসে থাকতাম, খুশী হবার ভান করতাম। ইভিন আর তার অভিজাত দলে মিশতে পারতাম না, কেননা, এখন মনে পড়ে ওদের সঙ্গে আমার ব্যবহারটা মোটেই নম্র মধুর ছিল না, ওরা আগে নমস্কার করলে তবেই আমি একটা প্রতিনমস্কার ঠুকতাম আর আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের ওদের দিক থেকে কোনোই প্রয়োজন ছিল না। অন্যদের ব্যাপারে অবশ্য কারণটা ছিল একটু আলাদা। যেই দেখতাম আমার দিকে কেউ একটু ঝুঁকেছে অমনি তাকে কথায় কথায় জানাতাম আমি প্রিন্স ইভান ইভানিচের সঙ্গে মাঝে মাঝে ডিনার খাই আর আমার নিজস্ব একটা দ্রুসকি আছে, আমি অবশ্য কথাগুলো বলি নিজের কদর বাড়াতে, যাতে বন্ধুটি আমাকে আরও বেশী ভালবাসে, কিন্তু তার ফল হয় উল্টো, বন্ধুটির আমার অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে, প্রিন্স ইভানের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা শুনেই আর তারপর থেকেই দেখি তার ব্যবহার একদম পালটে গেছে, কিরকম যেন নির্বিকার উদ্ধত।

আমাদের মধ্যে একটি ছাত্র ছিল, সরকারী খরচে পড়ত—নাম ওপেরভ, খুব পরিশ্রমী আর সব কাজে পটু ছেলেটি—ও সকলের সঙ্গে হাত মেলাত হাতটাকে শক্ত কাঠের মত করে রেখে আঙুলগুলো একটুও না নুইয়ে হাতখানা সামান্যমাত্রও না নাড়িয়ে। ছেলেরাও ঠাট্টা করে ওর সঙ্গে ওমনিভাবেই হাত ঝাঁকাত। আমি প্রায় সব সময়েই ওর পাশে বসতাম, কথাবার্তা বলতাম। বেশী ভাল লাগত ওকে অধ্যাপকদের সম্বন্ধে খোলাখুলি মতামত দিতে বলে। প্রতিটি অধ্যাপকের পড়ানোর দোষগুণের সোজাসুজি নিখুঁত ব্যাখ্যা করত

ওপেরভ। কোনো সময় হয়তো ঠাট্টা করে অবিকল নকল করত—ওর ছোট্ট মুখখানায় শান্ত গলার স্বরে ওই নকল করার ভঙ্গী আমার ওপর অদ্ভুত একটা প্রভাব বিস্তার করত। কিন্তু তাহলেও ছোট ছোট হাতে ও ক্লাসে বসে নোট টুকত। প্রতিটি অধ্যাপকের প্রতিটি কথা ও লিখে নিত, একটি শব্দও বাদ না দিয়ে। আমাদের দুজনে খুব ভাব হয়েছে, ঠিক করেছি একসঙ্গে পড়াশুনা করব। যথারীতি ক্লাসে গিয়ে ওর পাশে বসলেই দেখতাম ও ছোট ছোট কটা চোখ দুটি হাসিতে ভরে আমার দিকে তাকাত। কিন্তু হঠাৎ আমার কি খেয়াল হল ওর কাছে বসে গল্প করলাম, আমার মা মরবার সময়ে বাবাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যেন আমাদের পড়ান না হয়, কারণ, স্টেট-স্কলাররা······অবশ্য তাঁরা খুবই বিদ্বান, তবুও ঠিক যেন আমাদের হিসেবমতন নয়—থেমে থেমে কথাটা বললাম, কি জানি কেন মুখচোখ লাল হয়ে উঠল তাও বেশ বুঝতে পারছিলাম। ওপেরভ জবাবে কিছু বলল না, কিন্তু ওর পরের বক্তৃতাগুলোতে আমাকে প্রথমে নমস্কার করল না, ওর সেই শক্ত কাঠের মত হাতখানা আমার হাতে মেলাল না, সে আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলল না। যখন বেঞ্চিতে ওর পাশে বসলাম তখনও বইয়ের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে থাকল, নামতে নামতে মাথাটা প্রায় বইয়ে ঠেকল। ওপেরভের ব্যবহারে আমি ভীষণ অবাক! আমার মনে খুবই লাগল তবুও সরকারী সাহায্যে-পড়া ছাত্র ওপেরভকে কিছু বলতে আমার অহঙ্কারে আটকাল। একদিন আমি আগেই পৌঁছেছি, সেদিন একজন জনপ্রিয় অধ্যাপকের বক্তৃতা, সাধারণত অনুপস্থিত ছাত্রেরাও সব এসে ভীড় করেছে, তাই আসন সব বেদখল দেখে আমি ওপেরভের জায়গায় বসে ডেস্কের ওপরে খাতাখানা খুলে রেখে একটু বেরিয়ে যাই। ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখি আমার খাতাখানা পেছনের বেঞ্চিতে সরিয়ে রেখে ওপেরভ তার জায়গায় বসে আছে। আমি তখন ওকে বললাম যে আমার বই-খাতাপত্র এখানে রেখেছিলাম।

"আমি সেসব কিছু জানি না," হঠাৎ চটেমটে ও চেঁচিয়ে ওঠে, আমার দিকে একটিবার তাকায় না পর্যন্ত।

"আমি বলছি তোমাকে, বইগুলো আমি এখানে রেখেছিলাম", আমিও সমান তালে চেঁচাই। "সবাই দেখেছে আমাকে এখানে রাখতে," চারিদিকে ছাত্রদের দিকে তাকাতে তাকাতে আবার বলি। ওরা যদিও অনেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে, কিন্তু কেউ কিছু বলছে না।

"জায়গা এখানে কারও কেনা নয়। যে আগে আসবে সেই বসবে," ওপেরভ নড়েচড়ে ভাল করে বসে আমার দিকে তাকিয়ে দুচোখে অগ্নিবর্ষণ করে।

"তার মানে হচ্ছে তুমি অতি বাজে ঘরের ছেলে," আমি বলি। ওপেরভ বিড়বিড় করে কি যেন বলে, একবার মনে হয় যেন বলল, "তুমি একটি বোকার ডিম," অবশ্য আমি ঠিকমত শুনিনি। আর শুনলেই বা কি করতাম? আমরা কি একজোড়া জলজন্তুর মত লড়াই করতাম? হয়তো আমি আরও কিছু বলতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজায় শব্দ হল, অধ্যাপক নীল রঙের ফ্রককোট গায়ে দিয়ে এসে ঘরে ঢুকে ওঁর ডেস্কের কাছে গেলেন।

কিন্তু সে যাইহোক, পরীক্ষায় আগে যখন আমার নোট-খাতার দরকার পড়ল, তখন ওপেরভ আগেকার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে নিজের খাতা আমাকে দিতে চাইল আর একসঙ্গে পড়াশুনা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার

সে শীতটা আমি হৃদয়ের ব্যাপার নিয়ে মেতে থাকলাম। প্রেমে পড়লাম পরপর তিনবার। প্রথমবারে ভীষণভাবে প্রেমে পড়লাম একজন মস্ত লম্বা-চওড়া ভদ্রমহিলার সঙ্গে যিনি ফ্রেতাগ ঘোড়ায় চড়ার স্কুলে ঘোড়ায় চড়তেন ; ফলে আমি প্রতি মঙ্গল, শুক্রবার—যে দুটো দিনে উনি ঘোড়ায় চড়তেন, সেই দুদিনেই ক্লাবে গিয়ে হাঁ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু সকল-সময়ই একটা ভীষণ আতঙ্কে থাকতাম পাছে উনি আমাকে দেখতে পান, তাই সবসময়ই ওর কাছ থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়াই আর আমার দিকে কাছাকাছি ওঁর আসবার কোনো সম্ভাবনা দেখলেই সেখান থেকে দৌড় লাগাই ; কখনও আমার দিকে তাকালে চট্ করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাই—এর ফলে তাঁর মুখখানাই আমি কখনো ভাল করে দেখিনি, আজও জানি না তিনি কি ছিলেন, সুন্দরী না কুৎসিত !

ডুবকভের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল , একদিন ক্লাবে ফারক্লোক-বয়ে-আনা ফুটম্যানের পেছনে লুকিয়ে থেকে ডুবকভ্ আমাকে ভীষণ চমকে দিল, দ্মিত্রির কাছে আমার অনুরাগের কাহিনী শুনে ও আমাকে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাইল , ভয়ে ছুট লাগালাম, এমনকি পাছে ডুবকভ তাঁকে আমার কথা বলে দিয়ে থাকে, সেই ভয়ে ক্লাবে আর জীবনে পা দিলাম না।

আমি যখন ভদ্রমহিলাদের প্রেমে পড়তাম বিশেষ করে কোনো বিবাহিতার, তখন লজ্জার ঝড় এসে আমাকে আড়ষ্ট করে দিত, সেই সোনেচ্‌কার প্রেমে পড়বার সময় যা হয়েছিল তার চাইতেও হাজারোগুণে বেশী। সব চাইতে বেশী ভয়, এই বুঝি প্রিয়ারা আমার প্রেমের কথা জানতে পেরে যায়, অন্তত পক্ষে বা আমার অস্তিত্ব ! আমার ধারণা ছিল যদি কেউ জানতে পারে তবে সে এতই অপমানিত বোধ করবে যে জীবনে কোনোদিন ক্ষমা করবে না আমাকে। ঘোড়ায়-চড়া সেই রণরঙ্গিনী মূর্তিটি যদি সত্যিসত্যি খুঁটিনাটি সব জানতেন,

আমি কিরকম সতৃষ্ণ নয়নে দূর থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কল্পনা করতাম তাকে ধরে নিয়ে গ্রামে পালিয়ে যাব, কি মজায় তার সঙ্গে দিন কাটাব—তাহলে অবশ্য তাঁর অপমানিত হবার যথেষ্ট কারণই ঘটত। এটা আমার মাথায় ঢোকেনি যে আমাকে চিনলেও আমার মনের সব কথা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই শুধুমাত্র মুখের আলাপ করাতে কোনোই দোষ ছিল না।

সোনেচ্‌কার সঙ্গে আমি আবার প্রেমে পড়লাম, আমার বোনের সঙ্গে ওকে একদিন দেখে। ওর সঙ্গে দ্বিতীয়বারের প্রেম তখন আমার মন থেকে মুছে গেছে। একদিন লিউবোচ্‌কা আমাকে সোনেচ্‌কার একখানা কবিতার খাতা এনে দিল তাতে লেরমেনটভের অনেকগুলো করুণাত্মক প্রেমের কবিতা টুকে নীচে লাল কালিতে দাগ দিয়ে রাখা, আর পাতাগুলোয় ফুলের পাপড়ি গোঁজা। ভলোদিয়া বছর খানেক আগে একদিন ওর প্রিয়ার টাকার থলিতে চুমু খেয়েছিল, সে কথা মনে করে আমিও সেরকম করতে চেষ্টা করলাম। সে দিন সন্ধ্যায় ও-ঘরে যখন আমি একা, তখন নানা কথা ভাবতে ভাবতে আবেশে মুগ্ধ হয়ে ফুলের পাপড়িগুলোর ওপর আমার ঠোঁট চেপে ধরি, মনটা কি এক ভাবে সিক্ত হয়ে ওঠে, আবার আমি প্রেমে পড়ি, অন্ততপক্ষে এর পরে কয়েকটা দিন তাই মনে করেছিলাম।

শেষপর্যন্ত ভলোদিয়া যে মেয়েটিকে ভালবেসেছিল, আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে সে আসত—আমি তার প্রেমে পড়লাম। এখন যতদূর মনে পড়ে, মেয়েটি কিছুমাত্র সুন্দরী ছিল না, বিশেষ করে যে-ধরনের রূপ আমি ভালবাসি, তার বিন্দুমাত্রও ছিল না। মস্কোর একজন বিখ্যাত বিদুষী ভদ্রমহিলার মেয়ে সে ; দেখতে ছোটখাট, রোগা বিলিতি মেয়েদের ধরনে লম্বা সোনালী চুল। সবাই বলত এই তরুণীটি নাকি মায়ের চাইতেও বেশী চালাক, বেশী বিদুষী ; আমি অবশ্য এ বিষয়ে নিজের কোনো মতামত গড়তে পারিনি কারণ ওর ভীষণ বিদ্যেবুদ্ধির খবরে লজ্জিত হয়ে আমি মোটে একটিবার ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তাও আবার বিশেষ সঙ্কুচিতভাবে। কিন্তু ভলোদিয়ার উচ্ছ্বাসের সীমা নেই, বাইরের লোকের সামনেও ওর প্রবল অনুরাগ প্রকাশে বাধা পায় না—তার ছোঁয়াচ লেগে আমিও একেবারে ভীষণভাবে তরুণীটিকে ভালবেসে ফেললাম। "দুটি ভাইয়ের একজনের প্রেমে পড়া"র খবরটায় ভলোদিয়া হয়তো খুশী হবে না ভেবে আমার প্রেমের কথা চেপে গেলাম। বরঞ্চ এই কথা মনে

করে আমার প্রাণে আনন্দের হিল্লোল বইল যে আমারা দুটি ভাই, আমাদের প্রেম এত পবিত্র, মন এত নির্মল যে দুজনের একই প্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই, দরকার পড়লে একজন আরেকজনের জন্য নিজেকে বলি পর্যন্ত দিতে পারি। আমার এই আত্মত্যাগের ব্যাপারটায় অবশ্য ভলোদিয়ার মোটেই সায় থাকতে পারে না, কেননা ও মেয়েটির প্রেমে এতই মজে গেছে যে একজন ভদ্রলোক, একজন সত্যিকারের ডিপ্লোম্যাট, তিনি নাকি শীগগিরই ওকে বিয়ে করবেন বলে শোনা যাচ্ছে,—তাঁর সম্বন্ধে ভলোদিয়ার মনোভাব হচ্ছে হাতের কাছে পেলেই একটি চড় কষিয়ে দিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা। আমি তাই আনন্দের সঙ্গে আমার মনের গোপন অনুরাগকেই বলি দিয়ে দিলাম, বোধহয় তাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হল না তাই। অন্তরে অন্তরে এই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও পরের সপ্তাহেই আমার প্রেমের মৃত্যু ঘটল।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

উঁচু সমাজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আমার বড় ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হৈ-হল্লা মজা করে দিন কাটাব ভেবেছিলাম কিন্তু সেবার শীতে আমাকে ভয়ানক হতাশ হতে হল। ভলোদিয়া খুব নাচত; বাবাও তাঁর তরুণী স্ত্রী নিয়ে বলনাচে যেতেন—কিন্তু আমাকে বোধহয় ওঁরা নেহাতই ছেলেমানুষ কিংবা এ ধরনের আমোদ-আহ্লাদের নিতান্তই অনুপযুক্ত বলে মনে করতেন, তাই আমাকে কেউই বলনাচের বাড়িগুলোতে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন না। দ্‌মিত্রির কাছেও মন খোলসা করে বলতে পারলাম না যে আমি বলনাচে যেতে চাই, ভীষণ বিরক্তি বোধ করলাম যে আমাকে সবাই ভুলেই গেছে, আমাকে সবাই এ সব আমোদ-আহ্লাদের উর্ধ্বে দার্শনিক বলে ঠাউরে নিয়েছে—অগত্যা আমিও সেই দার্শনিক হবারই ভান করি।

সেবার শীতেই একবার প্রিন্সেস করনাকোভা সান্ধ্য-উৎসবের আয়োজন করলেন। উনি নিজে এসে সবাইকে নেমন্তন্ন করলেন, আমাকেও। জীবনে প্রথম আমি সেদিন বলনাচে যাব। রওনা হবার আগে ভলোদিয়া আমার ঘরে এল দেখতে কেমন সাজগোজ করলাম। এতে আমি যেমনি অবাক তেমনি অপ্রস্তুত। ভাবলাম বোধহয় ভাল সাজপোশাক করার ইচ্ছেটা লজ্জাজনক, তা গোপন করাই উচিত। আবার ও ভাবছে এ ইচ্ছেটা নিতান্তই স্বাভাবিক আর এতই দরকারী যে ওর ভয় আমি হয়তো ঠিকমত সাজগোজ না করেই সেখানে গিয়ে লজ্জার কারণ ঘটাব। বারবার করে বলে দিল আমি যেন নিশ্চয়ই পেটেণ্ট লেদারের জুতো পরি, আমাকে শ্যামল চামড়ার দস্তানা পরতে দেখে ভলোদিয়া তো একেবারে ফিট হবার যোগাড়, ঘড়িটা কি একরকম করে বেঁধে দিল হাতে, তারপরে টানতে টানতে কুজনেস্তকী বাজারে একটা চুল কাটার দোকানে নিয়ে গিয়ে তুলল। ওরা আমার চুল কোঁকড়া করে দিলে ভলোদিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে।

"বেশ ঠিক হয়েছে, কিন্তু চুলের ঝুঁটিটাকে একটু ঠিক করে দিতে পার না?"

কিন্তু মঁসিয়ে চার্লস যতই কেন না চেষ্টা করে চটচটে কোনো জিনিস লাগিয়ে চুলের ঝুঁটিটাকে বাগাতে, ততই সেটা টুপিটা মাথায় চড়াতে না চড়াতেই আবার পূর্বমূর্তি ধারণ করে। সব মিলিয়ে কোঁকড়ান চুল নিয়ে আমায় বরং আগের চাইতেও খারাপই লাগছে। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে একটা উদাসীন-উদাসীন ভাব দেখানো। তাতেই তবু যাহোক একরকম দেখাবে।

ভলোদিয়ারও মনে হল তাই মত—কেননা, ও তাড়াতাড়ি আমাকে চুলের কোঁকড়া ভাবটা নষ্ট করে দিতে অনুরোধ করল। তা করার পরেও যখন চেহারার কিছুমাত্র উন্নতি ঘটল না, ভলোদিয়া তখন আর আমার দিকে তাকাল না, আর করনাকোভদের বাড়ি পৌছনো পর্যন্ত সারা পথটা মুখ ভার করে বসে থাকল। করনাকোভদের বাড়িতে পৌছে, বেশ গটগট করে ভলোদিয়াকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। কিন্তু একটু পরে প্রিন্সেস এলে আমাকে নাচতে আমন্ত্রণ জানালে সোজা বললাম, আমি কখনো নাচি না। কেন যে একথা বললাম জানি না, একমাত্র নাচার আনন্দেই তো উৎসাহের সঙ্গে এখানে আসা! এর ফল হল কি সবাই নাচতে চলে গেল আর আমি আশেপাশে, অপরিচিত লোকদের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে বসে থাকলাম আর একটু-একটু করে আমার সেই চিরদিনের লজ্জা এসে আমাকে অভিভূত করে ফেলল। সারাটা সময় সেই একই জায়গায় চুপ করে বসে কাটালাম।

একবার ওয়ালট্‌জ নাচের সময় একজন প্রিন্সেস এসে স্বাভাবিক মধুর স্বরে জানতে চায় আমি কেন নাচছি না। আজও মনে আছে এই প্রশ্নে সেদিন আমি প্রথমটায় কিরকম লাজুক-লাজুক হয়ে পড়লাম আবার তা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছে না থাকলেও আমার মুখে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল আর তারপর হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলাম—মস্ত মস্ত ফরাসী শব্দ লাগিয়ে জাঁকালো ভাষায় আজেবাজে সব কথা বলতে শুরু করলাম—এত বছর পরে আজও সে কথা মনে করলে লজ্জা পাই। গানের সুর নিশ্চয় আমার মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। আমি উঁচু সমাজের কথা বললাম, মানুষের বিশেষত। মেয়েদের দম্ভের কথা বললাম, শেষ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে সব গুলিয়ে ফেলে একটা বাক্য অসমাপ্ত রেখেই অপ্রস্তুত হয়ে থেমে পড়লাম।

এত যে ভদ্র বিনয়ী প্রিন্সেস, সে পর্যন্ত হকচকিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে

তাকাল আমার দিকে। আমি হাসলাম। ডলোদিয়া বোধহয় খানিকক্ষণ ধরে আমাকে উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে লক্ষ্য করছিল, এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সে ডুবকভকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়াল, বোধহয় ভাবল, দেখে আসি না নাচার ক্ষতিটা কথা দিয়ে কিভাবে আমি পুষিয়ে নিচ্ছি। আমার হাসি-হাসি মুখ, প্রিন্সেসের ভীতচকিত ভাব আর আমার শেষের দু-চারটে কথা শুনে ও রাঙা হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে চলে গেল। প্রিন্সেসও উঠে চলে গেল। আমি হাসতেই থাকলাম, কিন্তু মনটা তখন হায় হায় করছে, উঃ; কি বোকামিই না করলাম, মা-ধরিত্রী যদি আমায় তখন গ্রাস করে নিত তো বেঁচে যেতাম! কি করে যে অবস্থাটা ফেরাই ভাবতে ভাবতে ডুবকভের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ও প্রিন্সেসের সঙ্গে অনেকগুলো ওলাটজ নেচেছে কিনা। কথাগুলো বললাম বিদ্রূপের ভঙ্গীতে। আসলে কিন্তু মনে মনে ডুবকভের কাছে সাহায্য চাইছিলাম —সেই ডুবকভ্, যাকে সেই সেদিন "ইয়ারে" মুখ সামলাতে বলেছিলাম। ডুবকভ যেন শুনতেই পায়নি এভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকল। ভলোদিয়ার কাছে গেলাম, গলার স্বরে ঠাট্টার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম, "ভলোদিয়া কি নাচতে নাচতে হয়রান হয়ে যাওনি?" ভলোদিয়া আমার দিকে তাকাল, ওর দৃষ্টিটা যেন আমাকে বলল, "আমরা যখন একা থাকব, তখন যেন একবার এভাবে কথা বলে দেখো," তারপর নিঃশব্দে দূরে চলে গেল, বোধহয় ভয় পেল—পাছে ওর সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকি।

"হা ভগবান, নিজের ভাই পর্যন্ত আমাকে পরিত্যাগ করল!" আমি ভাবলাম।

তবুও কি জানি কেন বিদায় নিতে পারলাম না। সন্ধ্যের শেষ পর্যন্ত সেই একই জায়গায় মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একে একে সবাই যখন বিদায় নিতে লাগল, ফুটম্যান আমায় কোট পরতে সাহায্য করতে এল, তখন আমি চোখের জলের ভেতর কোনরকমে বিদায় জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

পানোৎসব

দমিত্রির প্রভাবের ফলে যদিও এতদিন আমি ছাত্রদের সাধারণ উৎসব, পানোৎসব বলা চলে, তাতে কখনো যোগ দিইনি, তবুও একটি দিন আমি ওদের সঙ্গে আমোদে মেতেছিলাম আর তার যে স্মৃতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম তা মোটেই মধুর নয়। ব্যাপারটা হল :

বছরের প্রথম দিকে একদিন ক্লাসে ব্যারন জেড—লম্বা ফর্সা একটি ছেলে, মুখের ভাব খুব গম্ভীর, আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করল সেদিন সন্ধ্যেটা ওদের বাড়িতে আমোদফুর্তি করে কাটাতে। সবাইকে বলতে অবশ্য বোঝাচ্ছে ক্লাসের তাদের যারা আমাদের ঠিক হিসেবে পড়ে।—এদের মধ্যে গ্রাপ, সেমেনভ, ওপিইভ বা ওদেরই মত নীচু স্তরের ছাত্ররা পড়ে না। ভলোদিয়া যখন শুনল আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের পানোৎসবে যাচ্ছি, তখন সে নাক সিঁটকে সামান্য একটু হাসল। কিন্তু আমি ভয়ানকভাবে উৎসাহিত হলাম, ভাবলাম সময় কাটাবার নতুন পন্থা একটা, কত আমোদ-আহ্লাদ হবে—কাজেই ঠিক ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটায় ব্যারন জেডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। আলো দিয়ে চমৎকার করে সাজানো হল আর ড্রইংরুমে ব্যারন জেড্ সাদা ভেস্ট পরে সব বোতাম খুলে তার অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছে। ব্যারন জেডের বাবার এই বাড়িটি ছোট, কিন্তু আজকের সান্ধ্য-উৎসবের জন্য তার অভ্যর্থনা-কক্ষগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বারান্দায় কৌতূহলী পরিচারিকাদের মাথা আর পোশাকের আভাসইঙ্গিত পাচ্ছিলাম, ভাঁড়ারঘরে একবার যেন মহিলার পোশাকের ঝিলিকও দেখতে পেলাম—ভাবলাম স্বয়ং ব্যারনই হবেন বোধহয়।

অতিথির সংখ্যা কুড়ি, বেশীর ভাগই ছাত্র। কেবল হের ফ্রস্ট বাদে। উনি ইভেনের সঙ্গে এসেছেন, আর একজন লম্বা গোলাপী-রঙ ভদ্রলোক, উনি ব্যারনদের আত্মীয় বলে সবার কাছে পরিচিত আর দরপাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

প্রথমটায় এই সব অভ্যর্থনা-কক্ষগুলোর আলোকসজ্জা আর জাঁকজমকে ছেলের দল একটু কুঁকড়ে গিয়েছিল, বেশীর ভাগই দেওয়াল ঘেঁষে চুপচাপ বসেছিল; কেবল সামান্য কয়েকজন অতি-সাহসী আর সেই দরপাতের প্রাক্তন ছাত্র ছাড়া—ওরা ইতিমধ্যেই ওয়েস্টকোটের বোতাম সব খুলে দিয়ে ঘরময় স্ফূর্তিতে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, ওরা যেন একই সময়ে প্রতিটি ঘরের প্রতিটি কোণে হাজিরা দিচ্ছে। ওদের উজ্জ্বল হাসি আর গন্ধে ঘরটা ভরপুর। কিন্তু বাকিরা হয় চুপচাপ বসে আছে নয়তো নীচু গলায় অধ্যাপক, বিজ্ঞান, পরীক্ষা এমনি সব নানা গুরুতর নীরস বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। সবাই খাবার-ঘরের দিকে একবার করে তাকাচ্ছে ভাবটা—"আর কেন, সময় হয়েছে এবার আরম্ভ করলেই তো হয়।" আমারও তাই মনে হচ্ছিল, শুরু হবার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে সময় গুনছিলাম।

ফুটম্যান ঘুরে ঘুরে সব অতিথিদের চা দিচ্ছিল, দরপাতের ছাত্র-ভদ্রলোক হের্ ফ্রস্টকে রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন:

"মদের পাঞ্চ্ কি করে করতে হয়। তা জান, ফ্রস্ট?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়," ফ্রস্ট হাঁটুজুটো নাড়াতে নাড়াতে ফরাসীতে জবাব দিলেন। কিন্তু দরপাত-ছাত্র আবার রুশ ভাষায় বলেন, "তাহলে লাগিয়ে দাওতো" (ফ্রস্টও দরপাতের ছাত্র বলে তাকে তুমি বলেই সম্বোধন করলেন)। ফ্রস্ট এবার ড্রইংরুম থেকে খাবারঘর আবার সেখান থেকে ফিরে ড্রইংরুমে যাতায়াত শুরু করলেন পেশীবহুল সুগঠিত পা দুখানা লম্বা লম্বা ফেলে; বার কয়েক যাতায়াতের পরে টেবিলের ওপর রাখলেন সুপের পাত্র আর দশ পাউণ্ডের একটা চিনির ডেলা—ছাত্রদের তিনটি ছোরাকে আড়াআড়িভাবে রেখে তার ওপরে বসান।

ইতিমধ্যে ব্যারন জেড্ ড্রইংরুমে সব অতিথিদের কাছে একে একে গিয়ে গম্ভীর মুখে একই সুরে একই ভঙ্গীতে প্রায় এক কথাই সবাইকে বলছে, "আসুন ভদ্রমহোদয়গণ, প্রকৃত বন্ধুর মত সবাই একসঙ্গে পান করি। আমাদের ক্লাশে সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব নেই এটা খুবই দুঃখের কথা। ওয়েস্টকোটের বোতাম খুলে দিন, দেবেন? নাকি, জামাটাই খুলে ফেলবেন অন্যদের মতন?" এদিকে দরপাতের ছাত্র সত্যি সত্যিই কোট খুলে ফেলে সাদা শার্টের হাতা গুটিয়ে ফর্সা কনুইয়ের ওপর তুলে দুপা ফাঁক করে, দাঁড়িয়ে ততক্ষণে সুপের পাত্রে-রাখা মদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

"বন্ধুগণ, আলো নিবিয়ে দিন।" দরপাত ছাত্র মিষ্টি গলায় জোরে হেঁকে

উঠল। আমরা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম স্থপের পাত্রের দিক আর দরপাত ছাত্রের সাদা শার্টের দিকে—সবাই অনুভব করলাম "সেই মুহূর্তটি" এসে গেছে।

"ফ্রস্ট, আলোগুলো সব নিবিয়ে দাও," দরপাত ছাত্র আবার চেঁচিয়ে উঠল, বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বোঝা গেল। ফ্রস্ট আর আমরা সবাই মিলে লেগে গেলাম আলোগুলো নিবিয়ে দিতে। সারা ঘরটা অন্ধকার, মদের নীলচে আলোয় দেখা যাচ্ছে খালি সাদা শার্টের হাতাদুটো, ছোরা তিনটের ওপর থেকে চিনির টুক্‌রোটা তুলছে। এখন আর শুধু দরপাত ছাত্রের গলা নয়, গোটা ঘরেই এদিকে-ওদিকে কথাবার্তা আর হাসির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। অনেকে কোট খুলে ফেলেছে (বিশেষ করে তারা যাদের দামী কাপড়ের ফর্সা ধবধবে শার্ট গায়ে আছে)। আমিও তাই করলাম, বুঝতে পারলাম এইবার 'আরম্ভ হয়েছে।' যদিও এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু একটা মজা ঘটেনি, তবুও নিশ্চিত জানি ঐ যে পানীয়টি তৈরি হল, ঐটির এক গ্লাস খেলে—ওঃ, সে যা মজাটা হবে!

মদের শরবতটি তৈরি হল। দরপাত ছাত্র গ্লাসে গ্লাসে তা ঢেলে দিতে দিতে টেবিলের ওপর ঢেলে ছিটিয়ে চেঁচাতে লাগল। "এবার ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন, চলে আসুন।" যতবার আমরা সেই চট্‌চটে তরল পদার্থটি দিয়ে গ্লাস ভর্তি করে নিচ্ছিলাম ততবারই দরপাত ছাত্র আর ফ্রস্ট দুজনে মিলে একটা জার্মান গান শুরু করে দিচ্ছিল। আমরাও ভাঙা গলায় নানাস্বরে তাতে যোগ দিচ্ছিলাম। গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকির শব্দ, নানা কথার চেঁচামেচি, শরবতের প্রশংসা আর পরপর গ্লাসের পর গ্লাস চালাচ্ছি—নানাভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে কেউ একা একা কেউ অন্যের সঙ্গে হাতজড়াজড়ি করে। আর অপেক্ষা করার কিছু নেই—পুরোদমে উৎসবে মেতেছে সবাই। আমি পুরো এক গ্লাস চালিয়েছি, ওরা আরেক গ্লাস ঢেলে দিল; কপালটা দপ্‌দপ করছে, আগুনের রংটা গোলাপী দেখাচ্ছে, আশেপাশে সবাই মিলে চেঁচামেচি, হৈ-হুল্লোড় করছে। আমি খুব একটা মজা খুঁজে পাচ্ছি না, শুধু তাই নয়, আমার ধারণা আর সবাইয়েরও আমার মতই একঘেয়ে লাগছে, কিন্তু সবাই ঠিক করে নিয়েছে, এতবড় একটা উৎসব, এখানে আনন্দের ভান তো করতেই হয়। অদম্য উৎসাহ হচ্ছে একমাত্র আমাদের দরপাত ছাত্রের। ওর মুখচোখ আরও রাঙা, কথার ফুলঝুরি খেলছে, প্রতিটি গ্লাস ভরে দিচ্ছে, তা করতে গিয়ে

টেবিলের ওপর সমানে ফেলছে, চারিদিক একেবারে মিষ্টিতে আঠা-চটচটে। ব্যাপারটা কি যে ঘটেছিল ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে সে সন্ধ্যেয় ফ্রস্ট আর দরপাত ছাত্রকে ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল, একটা জার্মান গান মুখস্থ করে ফেলেছিলাম আর তাদের দুজনের মিষ্টি-মিষ্টি ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলাম। আরও মনে পড়ে সে সন্ধ্যেতেই দরপাত ছাত্রকে ভীষণ ঘৃণা করেছিলাম, একবার একটা চেয়ার ছুঁড়েই মারতে যাচ্ছিলাম, তারপর নিজেকে সম্বরণ করি। সেই 'ইয়ারে' মদ খাওয়ার দিন দেখেছিলাম শরীরের কোনো অঙ্গ আমার কথা মানছে না, এইদিন উৎসবে আবার তাছাড়াও যেমনি মাথা ঘুরছিল, তেমনি গা গুলোচ্ছিল—প্রতিটি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, এইবার নিশ্চয় মরে যাব। আরও মনে পড়ে আমরা সবাই, কি জানি কেন, মাটিতে বসেছিলাম আর দাঁড় টানার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে নেড়ে গান করছিলাম, "মা ভল্গা বেয়ে"—আমার অবসন্ন চেতনায় খালি সর্বক্ষণ মনে হচ্ছিল এগুলো করার তো কোনো দরকার নেই। একটা পা দিয়ে আরেকটা পা আটকে লম্বা হয়ে আমি মেঝেতে শুয়ে পড়লাম, তারপর সবাই মিলে জিপসী ঢঙে খানিকটা ধস্তাধস্তি করলাম, একজনের গলাটা একটু মুচড়ে দিয়ে মনে মনে ভাবলাম ও মদ খেয়েছে বলেই এমনটা হতে পারল, নইলে হত না। মনে পড়ছে আমরা সাপার খেলাম, অন্য আর কিছু পানীয়ও। তারপর খোলা বাতাসে প্রাঙ্গনে নেমে গেলাম, মাথাটা ঠাণ্ডা হল; মনে হল, চারপাশে কি ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার ড্রস্‌কির সিঁড়িটা কি খাড়া আর পিছল, কুজমা যেন নরম, নড়বড়ে হয়ে গেছে—ধরতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু সব চাইতে বেশী মনে পড়ছে সেদিন গোটা সন্ধ্যেটায় আমার কেবলি বারেবারে মনে হয়েছে আমি নিতান্তই নির্বোধের মত আনন্দের ভান করছি, দেখাচ্ছি যেন বেশী মদ খেতে কত ভালবাসি, মাতাল হবার কথা মোটেই ভাবছি না। আর ভাবছি, অন্যেরাও ঠিক আমারই মত বোকার মত ভান করছে। আমার মনে হল, নেশাটা আমারই মত প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকছে, কিন্তু সবাই ভাবছে ওটা নিতান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই সাধারণ আনন্দ নষ্ট যাতে না হয় সেজন্যে খুশীর ভান করা ওর একান্তই কর্তব্য। দশ রুবল করে তিনটি শ্যাম্পেনের বোতল চার রুবল করে দশ বোতল রাম, অর্থাৎ সাপার বাদে আরও সত্তর রুবল ওই সুপের পাত্রটিতে ঢালা হয়েছে—অতএব ভাবলাম আমাকেও তো আনন্দের ভানটি বজায় রাখতেই হয়! কি আশ্চর্য! পরের দিন অবাক হলাম দেখে যে আমার সব

বন্ধুরা মোটেই লজ্জিত না হয়ে বরঞ্চ গর্বভরে এ নিয়ে জোরে জোরে আলোচনা চালাচ্ছে যাতে অন্যেরা সবাই শুনতে পায়। ওরা বলাবলি করছে, ওটা নাকি চমৎকার পানোৎসব, দরপাতের ছাত্রেরা নাকি এ ব্যাপারে বিশেষ ওস্তাদ, কুড়িজনে নাকি চল্লিশ বোতল রাম সাবাড় করেছে, অনেককে নাকি মারা গেছে মনে করে টেবিলের তলায় ফেলে রেখেছিল। আমি বুঝতেই পারলাম না, কেন ওরা এ নিয়ে আলোচনা করছে, কেনই বা নিজেদের নামে এত মিথ্যে কথা বলছে।

চত্বারিংশ অধ্যায়

নেখ্‌লুইদভ পরিবারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব

নেখ্‌লুইদভ সবসময়ই আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করত ; কিন্তু সেবার শীতে শুধু নেখ্‌লুইদভ নয়—ওদের গোটা পরিবারটার সঙ্গেই আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হল।

নেখ্‌লুইদভরা—মা, মেয়ে, মাসী,—ওঁরা সন্ধ্যেবেলাটা বাড়িতেই কাটান ; প্রিন্সেস চান, যেন অল্পবয়সী ছেলেরা সন্ধ্যেবেলায় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়, অর্থাৎ সেই সব ছেলেরা যারা ওঁর ভাষায় একটা সন্ধ্যে তাস না খেলে কিংবা না নেচে কাটাতে পারে। কিন্তু এরকম ছেলের সংখ্যা বোধহয় খুবই কম, কারণ আমি সেখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যেতেই হাজিরা দেওয়া সত্ত্বেও অতিথি খুবই কম দেখেছি। তাদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই ভালভাবে পরিচয় ঘটল, ওদের হাবভাবও জানলাম আর জানলাম ওদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, ওদের ঘরদোর আসবাব সবকিছুই আমার চেনা হয়ে গেল, ঘরে অন্য কোনো অতিথি না থাকলে বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবেই থাকি, কেবল ভারেনকার সঙ্গে একা এক ঘরে থাকতে হলেই যা একটু মুস্কিল। আমার মাথা থেকে এ ধারণাটা কিছুতেই তাড়াতে পারি না যে ও যখন সুন্দরী নয়, তখন আমাকে ওর প্রেমে পড়াতে পারলে ও খুব খুশী হয়। কিন্তু এই আড়ষ্ট ভাবটাও আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল। কারণ এই মেয়েটির ব্যবহারে একটা সহজ সুন্দর ভাব ছিল। ও কথা বলছে কার সঙ্গে, লোকটা কি আমি না ওর ভাই না লিউবভ সার্জিয়েভনা, সে-সব নিয়ে ও মাথাই ঘামাত না মোটে—ক্রমে আমারও ধারণা হল ওর সাহচর্যে আমি যে আনন্দ পাই ওর কাছে স্বচ্ছন্দে সেটা প্রকাশ করতে পারি, কোনো বাধা বা লজ্জার কারণ নেই। গোটা পরিচয়টাতে আমার ওকে কখনো মনে হয়েছে খুব কুৎসিত, কখনো মনে হয়েছে, না, অতটা নয়, কিন্তু একবারও নিজেকে এ প্রশ্ন করিনি,—আমি ওর প্রেমে পড়েছি কিনা। দু-চারবার সোজাসুজি কথা বলেছি ওর সঙ্গে। বেশীর ভাগই কথা বলতাম ওকে শুনিয়ে

শুনিয়ে লিউবভ সার্জিয়েভ্‌না বা দ্‌মিত্রির সঙ্গে—এটাতেই আমার ভাল লাগত বেশী। ওর সামনে বসে কথা বলতে, ওর গান শুনতে, এমনকি যে ঘরে আছি সে ঘরে ওর উপস্থিতিতেই বিশেষ আনন্দ পেতাম। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি হতে পারে অথবা দ্‌মিত্রি যদি আমার বোনকে ভালবাসে তবে ওর জন্য কেমন ত্যাগ স্বীকার করব—ও-সব চিন্তা আর মাথায় ঢুকত না। যদি হঠাৎ মুহূর্তের জন্যেও এ-সব কিছু মনে হত তো তখুনি ভবিষ্যতের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতাম, বর্তমান নিয়েই আমি তখন সন্তুষ্ট ছিলাম।

কিন্তু এত যে বন্ধুত্ব আর ভাল লাগা—তা সত্ত্বেও গোটা নেখ্‌লুইদভ-পরিবারে—বিশেষ করে ভারেনকার কাছ থেকে আমি আমার আসল রূপটা সযত্নে লুকিয়ে রেখে চলেছি, সেটাকে অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করেই করেছি; যা আমি নই, ভবিষ্যতেও কখনো হবার সম্ভাবনা নেই, তারই ভান করেছি। নিজেকে খুব প্রাণবন্ত দেখাতে চেয়েছি, খুশী হবার কোনো কারণ ঘটলে হৈ-চৈ, উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছি, আবার সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে বা শুনলে নিরাসক্ত ভাব দেখিয়ে বসে থেকেছি। সব ব্যাপারেই একটা বিদ্রূপাত্মক মনোভাব দেখিয়েছি, এদিকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়েছি। আমার প্রতিটি কাজের পেছনে যুক্তি আছে, আমার জীবন মার্জিত, কিন্তু জাগতিক সব সুখের ওপরেই আমার বিতৃষ্ণা। আমি নিরাপদে এ কথা বলতে পারি এই অদ্ভুত জগাখিচুড়ি কল্পনার 'আমি'র চাইতে বাস্তবের 'আমি'ই অনেক ভাল ছিলাম। কিন্তু নেখ্‌লুইদভরা আমাকে ভালবাসত আর সুখের বিষয় আমার ছলনাও ওরা ধরতে পারেনি। লিউবভ্‌ সার্জিয়েভ্‌নাই কেবলমাত্র এদের মধ্যে আমাকে অপছন্দ করতেন, আমাকে মনে করতেন দাম্ভিক, নাস্তিক আর নাক-উঁচু, কথায় কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া করতেন, মেজাজ খারাপ করতেন, সে-সময়ে ওঁর অসংলগ্ন অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনে খুবই অবাক হতাম। দ্‌মিত্রির কিন্তু এখনও সেই আগেরই মত মনোভাব বলে ওকে কেউ বুঝতে পারে না আর তিনি নাকি দ্‌মিত্রির অনেক উপকার করেছেন। ওর এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব এখনও ওর পরিবারের বিশেষ দুঃখের কারণ।

দ্‌মিত্রির এই অনুরাগ ওদের পরিবারের সকলের কাছে দুর্বোধ্য; ভারেনকা একদিন এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিল, "দ্‌মিত্রি হচ্ছে দাম্ভিক; ভীষণ অহঙ্কারী আর খুব বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও নিজের প্রশংসা শুনতে খুব ভালবাসে—

সবসময়ে সবতাতে ও প্রথমে থাকতে চায়। মাসীমা ওঁর নিজের মনটি সুন্দর বলে সবসময়ই দ্মিত্রির ভেতর প্রশংসার যোগ্য গুণ খুঁজে পান আর সেটাকে আবার কায়দা করে চেপে রাখতে জানেন না। কাজেই উনি ওর মনোরঞ্জন করেন—আন্তরিকভাবেই করেন, ছল করে নয়।

এই ব্যাখ্যাটা আমি মনে করে রেখেছিলাম, পরে বিচার করে দেখে মনে হয়েছে, ভারেনকা খুবই বুদ্ধিমতী, সেই থেকে আমার মনের দাঁড়িপাল্লাটা ওর দিকে একটু ঝুঁকে গেল। কিন্তু ওর ভেতর এত বুদ্ধিমত্তা ও আরও সব গুণ আবিষ্কার করা সত্ত্বেও ওর সম্বন্ধে আমার মনের তারটা খুব উঁচু সুরে বাঁধতে দিলাম না, কোনোরকম উচ্ছ্বাসেরই প্রশ্রয় দিতাম না। সোফিয়া ইভানোভ্না কখনো ওর বোনঝির গল্প করতে ক্লান্তি বোধ করতেন না, একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন, ভারেনকা নাকি চার বছর আগে একদিন গ্রামে থাকতে ওর নিজের সব জামাকাপড় চাষী-ছেলেমেয়েদের বিলিয়ে দিয়েছিল—বিনানুমতিতে দিয়েছিল তাই সব পরে ফেরত নিতে হল। আমি এটাকে তখন বিশেষ প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করলাম না—এমনকি মনে মনে বিদ্রূপও করলাম এমনি একটা বাস্তববুদ্ধিহীন কাজের জন্যে।

যখন নেখ্লুইদভদের বাড়িতে অন্য অতিথি থাকত, তাদের মধ্যে ভলোদিয়া আর ডুবকভ্, আমি তখন বেশ একটা আত্মতৃপ্তির সঙ্গে পেছনে গিয়ে বসি, যেন আমিও এই পরিবারেরই একজন, কথাবার্তা না বলে চুপচাপ বসে বসে শুনি। ওরা যে যাই বলুক না কেন, আমার মনে হয়, উঃ, কি ভীষণ বোকামি, আর মনে মনে ভেবে অবাক হই, প্রিন্সেসের মত একজন উচ্চশিক্ষিতা রুচিশীলা মহিলা ও তার মার্জিত পরিবার কি করে এরকম অসহ্য বোকামি সহ্য করছেন! আবার তার জবাবও দিচ্ছেন। তখন যদি আমি নির্জনে একবার বসে আমার মতামতের সঙ্গে অন্যদের মতামতটা তুলনা করে দেখতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আরও কম আশ্চর্য হতাম যদি বুঝতে পারতাম আমার পরিবারের লোকেরা—আভ্দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্না, লিউবোচ্কা, কাটেনকা—এরাও আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মত, কোনো অংশে খারাপ নয়।

ঘরে অন্য কোনো অতিথি থাকলে ভারেনকা আমার দিকে খুব কম নজর দিত। তখন আর আমি যা ভালবাসতাম সেই গান বা পড়াও থাকত না। ভারেনকার যে গুণদুটি আমার প্রিয় অর্থাৎ ওর চিন্তাশীলতা আর ওর সহজ

স্বাভাবিক ভাব—সে-ত্রুটিও ওর নষ্ট হয়ে যেত অতিথিদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে। আমার মনে পড়ে, কি ভয়ানক অবাক হয়েছিলাম আমার ভাই ভলোদিয়ার সঙ্গে ওকে থিয়েটার আর আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে শুনে। আমি জানতাম, এইসব সাধারণ কথাবার্তাগুলোকেই ভলোদিয়া সবচাইতে বেশী এড়িয়ে চলে, ঘৃণা করে। ভারেনকাও এগুলোকে ঠাট্টা করে। তবে কেন ওরা দুজনে একসঙ্গে হলে এ ধরনের আলোচনা করে—তাও আবার একজন আরেকজনের জন্য লজ্জিত এমন ভাব দেখিয়ে? এরকম একটা আলোচনা হবার পর প্রতিবারই আমি মনে মনে গজরাই আর পরের দিন অতিথিদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করি। তবুও ঐ পরিবারের সাহচর্যে একা থাকতে ভালবাসি।

যাইহোক, সে সময়টা দ্মিত্রির মুখোমুখি পড়ার চাইতে বরং ওর মায়ের ড্রইংরুমে বসে ওঁর সঙ্গে দেখা করতেই বেশী পছন্দ করতাম।

একচত্বারিংশৎ অধ্যায়

নেখলুইদভের সঙ্গে বন্ধুত্ব

ঠিক সেই সময়টায় দ্‌মিত্রির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে চিড় ধরেছিল। গত কিছুদিন ধরেই আমি এই বলে ওকে সমালোচনা করেছিলাম যে নিজের দোষ সম্বন্ধে ও একেবারেই অন্ধ। যৌবনের শুরুতে আমরা ভালবাসি মনের আবেগ দিয়ে, তাই সে সময় আমরাই একমাত্র নিখুঁত লোক। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আবেগের ঘোর যখন কাটে, বিচারের তীব্র রশ্মির নীচে পড়ে, আমাদের ভালবাসার পাত্রের প্রকৃত স্বরূপ যখন ধরা পড়ে তার দোষগুণ সমেত, তখন শুধুমাত্র দোষগুলোই প্রকট হয়ে, বেশীর ভাগ সময়েই অতিরঞ্জিত হয়ে আমাদের আঘাত করে। আমাদের মনোভাব কঠিন হয়ে যায়, এমনকি ঘৃণা বোধ করি সেই লোকটি সম্বন্ধে: নির্দয়ভাবে তাকে পরিত্যাগ করে অন্য জায়গায় আমার কল্পনার নিখুঁত লোককে খুঁজে ফিরি। দ্‌মিত্রি আর আমার বেলাতেও যদি ঠিক তাই না ঘটে থাকে তবে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে—এই যে দ্‌মিত্রির সঙ্গে আমার বন্ধনটা হৃদয়-ঘটিত ছিল না, আমরা পরস্পরের মনকে ছুঁয়েছিলাম বুদ্ধি আর জ্ঞান দিয়ে। তাছাড়া, সরলতার একটা অদ্ভুত গ্রন্থিতে আমরা দুজনে বাঁধা ছিলাম। দুজনেরই মনে গভীর আতঙ্ক ছিল আমাদের বন্ধুত্ব যদি ভেঙে যায় তবে একজনের জীবনের যত গোপন কথা সব আরেকজনের অধিকারে থেকে যাবে—যে-সব মনের কথা বিশ্বাস করে আরেকজনকে বলেছি—যে-সব কথা নিয়ে আমরা দুজনেই লজ্জিত। তাছাড়া অনেকদিন ধরেই তো আমাদের মন খোলাখুলির ব্যাপার চলছে—এই সব কারণে অদ্ভুত অস্বাভাবিক একটা সম্বন্ধ ছিল আমাদের দুজনের মধ্যে।

সেবার শীতকালে আমি যখনই দ্‌মিত্রির সঙ্গে দেখা করতে যেতাম দেখতাম, ওর কাছে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র, নাম বেজোবুয়েদভ্—ওর সঙ্গে দ্‌মিত্রি পড়াশুনা করে। ছেলেটি রোগা, ছোটখাট, মুখভরা বসন্তের দাগ, খুব ছোট ছোট হাত—তাতে ভর্তি মেছেতা, আর একমাথা অযত্নে-রাখা লালচে চুল। সবসময়েই নোংরা, ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা, পড়াশুনাতেও খুবই খারাপ। সেই

লিউবভ্ সাজিয়েভ্নার মতন এর সঙ্গেও দ্মিত্রির সম্পর্কটা আমার কাছে দুর্বোধ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ছাত্র থাকতে দ্মিত্রি কেন যে ওকে বেছে নিল ঘনিষ্ঠতা করতে —তার প্রধান কারণ বোধহয় গোটা বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজলেও ওর চাইতে বেশী কুৎসিত একটি ছেলে পাওয়া যাবে না। এই জন্যেই বোধহয় দ্মিত্রি অন্যদের বাদ দিয়ে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে ভালবাসে। ওর সঙ্গে প্রতিটি ব্যবহারে যেন দ্মিত্রির দম্ভ ছুটে বেরোয়, "তুমি কে, তাতে কিছু যায় আসে না, আমার কাছে সবাই সমান। আমি যদি পছন্দ করি তবেই সে ঠিক আছে।"

আমি খুব আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম ও কি করে সবসময় এমনি একটা অস্বাভাবিক মনোভাব পুষে বেড়ায় আর ঐ হতভাগ্য বেজোবুয়েদভ্ই বা কি করে সহ্য করে! ওদের এই বন্ধুত্ব আমার একটুও ভাল লাগত না।

একদিন আমি দ্মিত্রির বাড়িতে গেলাম, সন্ধ্যেটা ওর মায়ের ড্রইংরুমে বসে ওঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে আর ভারেনকার গান বা পড়া শুনে কাটাব বলে—কিন্তু বেজোবুয়েদভ্ বসে আছে ওপরে। দ্মিত্রি তীক্ষ্ণ গলায় আমাকে বলল, তার ঘরে লোক রয়েছে কাজেই সে নীচে যেতে পারবে না—সে তো আমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

"তাছাড়া, ঐ নীচে বসার মজা কি আছে?" ও আবার বলে, "তার চাইতে বরং এখানে গল্পগুজব করা অনেক ভাল।" যদিও বেজোবুয়েদভের সঙ্গে গল্পগুজব করে কয়েকটি ঘণ্টা কাটাবার প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলাম না, তবুও বন্ধুকে ছেড়ে একা একা নীচে যাওয়াটা শোভন নয় বলে ওখানেই একটা দোলানো চেয়ারে বসে চুপচাপ দোল খেতে লাগলাম। আমাকে নীচে যাবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করল—ওদের দুজনের ওপরই রেগে কাঁই হয়ে থাকলাম। বিরক্তির সঙ্গে চুপচাপ বসে ওদের কথাবার্তা শুনি আর অপেক্ষায় থাকি বেজোবুয়েদভ্ কখন বিদায় নেয়। ফুটম্যান চা নিয়ে এলে দ্মিত্রিকে অন্তত পক্ষে বার পাঁচেক অনুরোধ জানাতে হল—তবে গিয়ে ছেলেটি এক গ্লাস চা নিল। ও বোধহয় ভাবল লজ্জার খাতিরে চা-টা প্রত্যাখ্যান করাই ওর কর্তব্য, তাই দ্মিত্রি যতই অনুরোধ জানায়, ও ততই লজ্জিত মুখে বলে, "না, না, আমার জন্য কিছু ভেবো না।" আহা, কি আমার একটি চমৎকার অতিথি! মনে মনে বলি। দ্মিত্রি, বেশ বোঝা গেল, যথেষ্ট চেষ্টা করেই অতিথিকে কথাবার্তায় আটকে রেখেছে—মাঝে মাঝে দু-একবার আমাকেও সে আলোচনায় টেনে নিতে চাইছে। কিন্তু আমি গম্ভীর মুখে চুপচাপ বসে থাকলাম।

"আমার একঘেয়ে লাগছে মোটেই ভেবো না, এরকম একটা ভাব দেখাতে চেষ্টা করছ কেন?" চেয়ারে বসে বসে তাল রেখে দুলতে দুলতে আমি মনে মনে দ্‌মিত্রিকে জিজ্ঞেস করি। চুপচাপ বসে মনে মনে বন্ধুর বিরুদ্ধে একটা শান্ত ঘৃণার আগুন উস্কে উস্কে দিই। উঃ, কি নির্বোধ! ভাবি, "চমৎকার একটা সন্ধ্যে ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কাটাতে পারত, তা না, এই জানোয়ারটাকে নিয়ে বসে আছে। আরও বসে থাকবে যতক্ষণ না ড্রইংরুমে যাবার পক্ষে দেরি হয়ে যায়।" চেয়ারের পেছন থেকে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। ওর হাত দুটো, ভাবভঙ্গী, গলা, ওর হাঁটু দুটো—সব, সবই এত বিদ্‌ঘুটে লাগছে যে সেই মুহূর্তে ওর সম্বন্ধে কিছু একটা, বিশেষ অপ্রীতিকর কিছু একটা করতে পারলে যেন খুব খুশী হতাম।

অবশেষে বেজোবুয়েদভ উঠল; কিন্তু এমন একটি অতিথিকে ছেড়ে দিতে দ্‌মিত্রির কিছুতেই মন সরছিল না তাই রাতটা থেকে যেতে অনুরোধ জানায়। সৌভাগ্যক্রমে বেজোবুয়েদভ তাতে রাজী হল না, বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ওকে বিদায় দিয়ে দ্‌মিত্রি ফিরে এল—মুখে বেশ একটু আত্মতৃপ্তির হাসি নিয়ে হাত দুটো ঘসতে ঘসতে বোধহয় নিজের জেদ বজায় রাখতে পেরেছে আর শেষ পর্যন্ত আপদ-বালাইটাকে বিদায় করতে পেরেছে তাই—ঘরময় পায়চারি করতে করতে এক-আধবার আমার দিকে তাকায়। আমার আরও বিশ্রী লাগে ওকে দেখতে। 'এভাবে ঘুরতে ঘুরতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাকাচ্ছে কেন আমার দিকে?' মনে মনে ভাবি।

"তুমি চটেছ কেন?" হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে দ্‌মিত্রি জিজ্ঞেস করে।

"মোটেই চটিনি", সাধারণত এ অবস্থায় লোকে যা বলে থাকে, আমিও তাই বললাম। "শুধু বিরক্তি লাগছে যে তুমি সকলের সঙ্গেই ছলনা করছ—আমার সঙ্গে, বেজোবুয়েদভের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে।"

"কি বাজে বকছ! আমি ছলনা-টলনা করিনি কারুর সঙ্গেই। কোনো কিছু গোপন না করার একটা নিয়ম যে আমাদের মধ্যে ছিল, আমি সেটা ভুলিনি, তাই খোলাখুলিই বলছি তোমাকে। আমার বিশ্বাস ঐ বেজোবুয়েদভ আমার কাছেও যেমনি অসহ্য, তোমার কাছেও তাই কারণ, ওটি একটি নিরেট মূর্খ—ভগবান জানেন আরও কি! কিন্তু তুমি ওর কাছে নিজের মহত্ত্ব দেখাতে চাও।"

"ওটা সত্যি কথা নয়। তাছাড়া বেজোবুয়েদভ চমৎকার ছেলে—"

"কিন্তু আমি বলছি তোমাকে এটাই সত্যি। আরো আমি তোমাকে এমন কথাও বলছি যে লিউবভ্ সার্জিয়েভনার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের ভিত্তি হচ্ছে এই যে উনি তোমাকে একটি ভগবানের অবতার বলে মনে করেন।"

"আমি বলছি, এসব সত্যি নয়।"

"আমি একদম খাঁটি কথা বলছি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি," চাপা বিরক্তির আগুনে জলতে জলতে তিক্তকণ্ঠে বলি, ভাবি আমার অকপট কথাবার্তায় ওকে ঘায়েল করে দেব, "আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আবার বলছি আমি নিজে সবসময় তাদেরই পছন্দ করি, যারা আমার সম্বন্ধে ভাল কথা বলে। ব্যাপারটা যখন তলিয়ে দেখি, তখন বুঝি আসলে আমার কারুর ওপরেই আকর্ষণ নেই।"

"না", চটেমটে গলাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে গলার রুমালটা ঠিক করতে করতে দ্মিত্রি বলে চলে, "আমি যখন ভালবাসি, নিন্দা, প্রশংসা কোনকিছুই আমার হৃদয়কে টলাতে পারে না।"

"এটা সত্যি নয়। আমি তোমাকে বলেছি বাবা যখন আমাকে অকর্মণ্য বলে গাল দিয়েছিলেন, আমি তখন তাঁকে ঘৃণা করেছিলুম, এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যু কামনা করেছিলুম ঠিক যেমন তুমি…"

"আমাকে জড়িও না। এই যদি তুমি হয়ে থাক তবে সেটা খুবই দুঃখের…"

"বরঞ্চ ঠিক উল্টোটাই," আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে মরিয়া হয়ে সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকাই, "তুমি যা বলছ তা মোটেই ভাল নয়। আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে তুমি আমাকে বলনি? আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই না। বলনি তুমি আমাকে—আমি বলছি, এখন আমি তোমাকে বেশ চিনতে পারছি—"

আমাকে যতখানি আঘাত দিয়েছে, তারচাইতেও শক্ত আঘাত ওকে দেব বলে আমি প্রমাণ করতে লাগলাম যে আসলে ও কাউকেই ভালবাসেনি, আরও যত গোপন কথা ওর জানি, সবগুলো ওকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলাম—যে ব্যাপারগুলো নিয়ে ওকে গালাগালি করবার আমার অধিকার আছে। মুখের ওপর সব কথা বলে দিয়ে আমি মনে মনে খুব খুশী কিন্তু একথাও ঘুণাক্ষরেও একবার আমার মনে হল না যে কথাগুলো বলার আমার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ ওকে দিয়ে ছোটখাটো দোষত্রুটিগুলো স্বীকার করিয়ে নেওয়া—এই উত্তেজনার মুহূর্তে

সেটা কোনমতেই সম্ভব নয়। মন যখন ওর শান্ত—যখন এগুলো ওর পক্ষে স্বীকার সম্ভব, তখন কিন্তু আমি কখনো এসব কথা একবারও বলিনি।

কথা কাটাকাটি এসে তুমুল ঝগড়ায় পর্যবসিত হতে চলল; হঠাৎ দ্মিত্রি একদম চুপ করে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। আমিও কথা বলতে বলতে ওর পিছু পিছু যাচ্ছিলাম কিন্তু ও কোনো জবাব দিল না। আমি জানতাম ভীষণ রাগে পাগল হয়ে যাওয়া ওর দোষের মধ্যে একটি—এখন ও সেটাকেই সম্বরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

অতএব, "একজনের মনের কথা আর একজনকে খুলে বলব, দুজনের কথা তৃতীয় পক্ষের কারুর কাছে বলব না"—এই নিয়মের ফল শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল। আবেগের মুখে আমরা পরস্পরকে কত যে গোপন কথা বলেছি তার আর ইয়ত্তা নেই। কত যে লজ্জাজনক কথাবার্তা, কত যে অবাস্তব, অস্পষ্ট কল্পনা আর বাসনা, এর ফলে আমাদের বন্ধন দৃঢ় হয়নি; পরস্পরের অনুরাগ শুকিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এখন দম্ভের নেশা অতি সামান্য ত্রুটিস্বীকারেও ওকে বাধা দিল। উত্তেজনায় পাগল হয়ে গিয়ে আমরা আমাদের তূণে যত বিষাক্ত তীর ছিল সব ছুঁড়ে একে অন্যকে আঘাত করতে লাগলাম—যে অস্ত্র এর আগে আমরা পরস্পরের হাতে তুলে দিয়েছি, তাতেই এখন নিজেরা ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলাম। কি অসহ্য দাহ তার!

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়

সৎমা

যদিও বাবা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে নতুন বছরের আগে মস্কোতে আসতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তবুও শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন অক্টোবর মাসে, যখন কুকুর সঙ্গে নিয়ে চমৎকার শরৎকালীন শীকারের সময়। বাবা বললেন, মত বদলাতে হল কারণ সেনেটে নাকি ওঁর মামলা ওঠার কথা; কিন্তু মিমি চুপিচুপি জানাল আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার গ্রামে এত একঘেয়ে লাগছিল সব সময়—শুধু মস্কোর কথা বলত আর সবসময় অসুস্থতার ভান করত যে শেষ পর্যন্ত বাবা ওর ইচ্ছেকেই মেনে নেওয়া ঠিক করলেন। "ও তোমার বাবাকে কখনোই ভালবাসেনি, কিন্তু সকলের কানে খালি প্রেমের কথা বলত তার কারণ আর কিছু নয় আসলে ও একজন বড়লোককে বিয়ে করতে চেয়েছিল।" মিমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, যেন বলতে চাইল "ভাব একবার 'অন্য একজন' ওঁর জন্য কতটা করত, কেবলমাত্র উনি যদি জানতেন, তাকে কি করে পুরস্কৃত করা যায়।"

কিন্তু তবুও সেই "অন্য একজন" আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেছিলেন। বাবার ওপর ওঁর ভালবাসা, একনিষ্ঠ ও আবেগমুখর ভালবাসা—তা ধরা পড়ত ওঁর প্রতিটি কথাতে, চাউনিতে, প্রতিটি ভঙ্গীতে। কিন্তু স্বামীর প্রতি শত ভালবাসাও তার সাজপোশাকে, তার নিজেকে জাহির করবার ইচ্ছেটি চাপা দিতে প্যারেনি। .ম্যাডাম আঁনেতের তৈরি চমৎকার টুপি চাই, বনেটের জন্য চাই দুষ্প্রাপ্য নীল উটপাখির পালক, নীল ভিনিসিয়ান ভেলভেটের গাউন চাই, যাতে ফর্সা টুকটুকে হাত আর গলা দেখা যায়—এতদিন কেবল পোশাক পরাবার ঝি আর স্বামী এছাড়া আর কাউকে দেখাবার সুযোগ পাননি। কাটেনকা অবশ্য ওর মায়ের পক্ষই নিয়েছে, আমাদের সঙ্গে সৎমার সেই প্রথম দিনটি থেকেই ভারী একটা মজার সম্বন্ধ। গাড়ি থেকে নামতেই ভলোদিয়া এক পা এক পা করে তার হাতে চুমু খেতে গেল—মুখখানা খুব গম্ভীর, চোখে একটা বোকাটে চাউনি; তারপর ধীরে

ধীরে যেন তৃতীয় একজন কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে, এমনি ভঙ্গীতে বলে, "প্রিয় মা-মণির আগমনে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি।"

"ও আমার সোনা ছেলে!" আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না তাঁর মিষ্টি একঘেয়ে হাসি হেসে বলেন।

"আর তোমার দ্বিতীয় ছেলের কথাও ভুলো না", আমি এবার চুমু খেতে এগিয়ে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভলোদিয়ার মুখচোখের ভাব নকল করতে চেষ্টা করি।

যদি আমাদের সৎমা আর আমরা নিশ্চিত জানতাম যে আমরা পরস্পরকে ভালবাসব তাহলে এর মানে হতে পারত যে আমরা দুপক্ষই বাইরে কোনরকম স্নেহের ভাব প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক; যদি এর আগেই আমাদের মধ্যে কোনরকম অসদ্ভাব গড়ে থাকত, তবে এর মানে হতে পারত বিদ্রূপ, কপটাচরণ, বাবা সেখানে উপস্থিত আছেন তাই তাঁর কাছ থেকে আমাদের সঙ্গে ওঁর আসল সম্বন্ধটা লুকিয়ে রাখা; কিন্তু বর্তমানে এই কথাকটা, যা আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিভ্‌নার রুচিতে ঠিক খাপ খেয়েছিল, তা একেবারেই অর্থহীন, এতে কেবল বোঝাচ্ছিল আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই। এই ভাবটি থেকে ভবিষ্যতেও আমরা কখনো বিচ্যুত হইনি; সামনাসামনি পড়লেই ছলনার আশ্রয় নিতাম, খুবই নম্র ব্যবহার করতাম; ফরাসীতে কথা বলতাম, মাথা নত করে ঘনঘন নমস্কার জানাতাম, মুখে বুলি থাকত, "ওঃ মা-মণি, আমাদের প্রিয় মা-মণি!" উনিও সেই একইভাবে মিষ্টি একঘেয়ে একটু হেসে ঠাট্টার ছলে জবাব দিতেন। কেবলমাত্র লিউবোচ্‌কা, আমাদের অশ্রুমতী লিউবোচ্‌কা, তার খোঁড়া পা আর ছেলেমানুষী কথাবার্তা নিয়ে আমাদের সৎমাকে ভালবেসে ফেলেছিল, তাই ও নিজের বুদ্ধিমতন সরলভাবে চেষ্টা করত আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নাকে আমাদের পরিবারের আর সকলের একটু কাছাকাছি নিয়ে আসতে; পরিবর্তে, একমাত্র বাবা ছাড়া এই লিউবোচ্‌কাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী যার সম্বন্ধে ভদ্রমহিলার ছিটেফোঁটাও স্নেহ ছিল।

প্রথম প্রথম আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না সবসময়েই নিজেকে সৎমা বলে উল্লেখ করতে ভালবাসতেন, ইঙ্গিত করতেন ছেলেপুলেরা ও পরিবারের আর পাঁচজন সাধারণত, সৎমার সঙ্গে কিরকম অন্যায় ব্যবহার করে থাকে আর এর ফলে ওর নিজের অবস্থাটা কি সাংঘাতিক! যদিও ওঁর নিজের অপ্রীতিকর

অবস্থাটা উনি ঠিকই বুঝতেন, কিন্তু তবুও আশ্চর্য, কখনো উনি সেটা দূর করতে চেষ্টা করেননি ; এই ধরুন যেমন কাউকে একটু আদর করা, আর কাউকে হয়তো একটা উপহার দেওয়া, নিজের অসন্তুষ্টিটা নিজের মনেই চেপে রাখা—এমনি টুকটাক নানা সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে পরিবারের মন জয় করতে চেষ্টা করতে পারতেন, ওঁর পক্ষে সেটা খুব সহজও ছিল কারণ স্বাভাবিকভাবে ওঁর স্বভাব ছিল মিষ্টি আর ব্যবহারও ভদ্র। কিন্তু উনি এসব কিছু তো করতেনই না, উপরন্তু নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করে সবসময়েই একটা আত্মরক্ষার ভাব নিয়ে থাকতেন, আক্রান্ত হবার আগেই। উনি এটা ধরেই নিয়েছিলেন যে গোটা সংসারটাই ওঁকে অপমান করতে আর অসন্তুষ্ট করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, কাজেই সবকিছুর ভেতরেই একটা মতলব খুঁজে পেতেন আর ভাব দেখাতেন যেন চুপ করে সহ্য করাটাই ওঁর পক্ষে একমাত্র সম্মানিত পথ। ওঁর এই ব্যবহারটাই গোটা পরিবারকে আরও বেশী বিরূপ করে তুলেছিল। বিশেষত আমাদের পরিবারে যে একটা নিজস্ব ভাষা গড়ে উঠেছিল, যার কথা আগেই বলেছি, প্রায় কথাবার্তা না বলেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারতাম—আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার মাথায় সেগুলো কিছুতেই ঢুকত না, শুধু তাই নয়, আমাদের সংসারে যে সব অভ্যেসগুলো শেকড় গেড়ে বসেছে, ওঁর অভ্যেসগুলো আবার ঠিক উল্টো, এটাই বিশেষ করে সকলকে ওব বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তুলেছিল। আমাদের সাজানো-গোছানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়িতে উনি সবসময় দিন কাটাতেন যেন এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন ; উনি ঘুমোতেন, ঘুম থেকে উঠতেন কখনো তাড়াতাড়ি, কখনো দেরিতে। কোনসময়ে ডিনার টেবিলে আসেন কোনসময় আসেন না ; কখনো সাপার খান, কখনো খান না। বাড়িতে কোনো অতিথি না থাকলে অর্ধেক দিনটাই অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ান—আমাদের এমনকি চাকরবাকরদের কাছেও একটা মাত্র সাদা পেটিকোট পরে আর একটা শাল জড়িয়ে, হাতদুটো খালি রেখে ঘুরে বেড়াতে একটুও লজ্জা পান না। ওঁর এই সামাজিক আচারকে না মানা প্রথম প্রথম আমার খুব ভাল লাগত কিন্তু এর ফলে ওর সম্বন্ধে সব শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেল। সবচাইতে বেশী আশ্চর্য লাগত দেখে ঐ ভদ্রমহিলার ভিতরে দুটি নারীর বিচিত্র সমাবেশ, সেটা ঠিক হত বাড়িতে অতিথি থাকা না থাকার ওপর ; বাড়িতে অতিথি থাকলে, আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না চমৎকার, সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী একটি তরুণী, মনমাতানো সাজ, খুব চালাকও নয়, বোকাও নয়, কিন্তু ভারী হাসিখুশী ; কোনো অতিথি না থাকলে

খুব দমে যাওয়া ক্লান্ত একজন ভদ্রমহিলা, তরুণী নয় ; এলোমেলো তবে স্নেহশীলা। বাইরে থেকে বেরিয়ে যখন ফিরতেন, শীতের ঠাণ্ডায় গাল দুটোয় রক্তাভা, নিজের সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং আনন্দিত, খুশীতে জলজল করতে করতে বনেট খুলতে খুলতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন অথবা দামী, গলাখোলা বলনাচের পোশাকে খসখস্ করতে করতে গাড়িতে গিয়ে যখন উঠতেন, একটু লজ্জিত আবার একটু গর্বিত ও চাকরবাকরদের সামনে, অথবা বাড়িতেই যখন আমরা ছোটখাট সান্ধ্য উৎসবে মিলি, তখন উনি একটি আঁটসাঁট সিল্কের গাউনে সুন্দর নরম গলার চারপাশে সূক্ষ্ম একটু লেসের কাজ, একটু একঘেয়ে কিন্তু মিষ্টি হাসিতে ঝলমল করছেন—আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি যাঁরা এখন ওঁকে নিয়ে মাতামাতি করছেন তারাই কি বলতেন যদি ওঁকে দেখতেন সেই সব সন্ধ্যেয় আমরা যেমন সেই যখন উনি একা একা বাড়িতে থাকেন, সামান্য কিছু একটা গায়ে জড়িয়ে উস্কোখুস্কো চুলে স্বল্পালোকিত ঘরগুলোর ভিতর ঘুরে বেড়াতেন ক্লাব থেকে স্বামীর ফেরবার প্রতীক্ষায়। কোনসময় হয়তো একটু পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসলেন, ভুরুটুরু কুঁচকে বহু চেষ্টা করে একটা ওয়াল্ট্জ বাজালেন ; তারপরে হয়তো একখানা উপন্যাস খুলে বসলেন, মাঝখান থেকে কয়েক লাইন পড়ে বইটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আবার হয়তো চাকরবাকরদের জাগাবেন না মনে করে নিজে নিজেই ভাড়ার ঘরে গিয়ে একটা শশা কিংবা একটুকরো মাংসের হাড় নিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে খেতে থাকেন, অথবা শুধুই ঘুরে বেড়ান এ-ঘরে সে-ঘরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, ক্লান্ত অবসন্ন ভঙ্গীতে। আমাদের মধ্যে অসদ্ভাবের প্রধান কারণ ছিল আমাদের কোনকিছুই উনি বুঝতেন না।

ভদ্রমহিলার একটা অভ্যেস ছিল নিজের উৎসাহ নেই এমন কোনো বিষয়ে কেউ কোনো কথা বললে (নিজের সম্বন্ধে আর স্বামীর সম্বন্ধে ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই ওঁর কোনো উৎসাহ নেই) উনি মিষ্টি ঠোঁট দুটিতে ফিকে একটু হেসে মাথাটি একটু নত করতেন—এর জন্যে অবশ্য ওঁকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না, নিজের অজান্তেই এই অভ্যেসটা হয়েছিল ; কিন্তু একঘেয়ে ঐ হাসি আর মাথা নোয়ান দেখতে দেখতে ভারী ক্লান্তি লাগত। ওঁর আনন্দে যেন মনে হত ঠাট্টা করছেন নিজেকে, আমাদের পৃথিবীর সবাইকে, ভারী বিশ্রী মনে হত সবাইয়ের, সে আনন্দের ছোঁয়াচ লাগত না কারুর , সব চাইতে অসহ্য লাগত যখন ভদ্রমহিলা অবিশ্রান্তভাবে সকলের কাছে স্বামীর সঙ্গে ওর প্রেমের

গল্প বলে যান। যখন বলতেন সমস্ত জীবনটাই ওঁর একমাত্র স্বামীর কল্যাণেই নিবেদিত, তখন মিথ্যে বলতেন না, সে কথা ঠিক, সারা জীবন ধরে এ কথাটা তিনি প্রমাণও করেছিলেন কিন্তু তবু'ও এমনি অকুণ্ঠিতভাবে সকলের কাছে নিজের প্রেম জাহির করে বেড়ান আমাদের কাছে একেবারে অসহ্য ঠেকত—নতুন কোনো অতিথির কাছে এই গল্প শুরু করলে আমরা লজ্জায় একেবারে মরে যেতুম, ভুল ফরাসী বললেও বোধহয় এতটা লজ্জার কারণ ঘটত না।

আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভনা স্বামীকে ভালবাসেন পৃথিবীতে সবচাইতে বেশী, তাঁর স্বামীও তাঁকে ভালবাসতেন, অন্ততপক্ষে প্রথম দিকটায় আর যখন দেখতেন বাইরের আর পাঁচজন লোকও ওঁকে দেখে খুশী হন। স্বামীর প্রেম পাওয়াটাই হচ্ছে আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কিন্তু মনে হত যেন ভদ্রমহিলা নিজে ইচ্ছে করেই বাবার অপ্রীতিকর সব কাজগুলো করে যেতেন—ওর নিজের প্রেমের ক্ষমতা দেখাতে আর উনি যে সব সময় স্বামীর জন্যে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত, সে কথা প্রমাণ করতে।

উনি খুব সাজগোজপ্রিয় ; কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে সুন্দরী সুসজ্জিতা স্ত্রীকে আর পাঁচজনের ঈর্ষা ও প্রশংসা কুড়োতে দেখতে বাবাও ভালবাসতেন। বাবার জন্যেই উনি উৎসব-অনুষ্ঠানের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে বেশীর ভাগ সময়ে বাড়িতে বসে থাকতে অভ্যস্ত হলেন, ধূসর রঙের একটা জামা গায়ে দিয়ে। বাবা চিরদিন স্বাধীনতা ও সাম্যকেই পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে মনে করেন, তাই তিনি চাইতেন তাঁর স্নেহের পাত্রী লিউবোচ্‌কা ও তাঁর তরুণী স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের একটা বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে উঠুক। কিন্তু আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না নিরন্তর স্বার্থত্যাগ করেই চলেছেন, তাই তিনি লিউবোচ্‌কাকে ডাকেন, "সত্যিকারের গৃহিণী", আর তাই সে পদের উপযুক্ত একধরনের সম্মানও দেখান,—এটা একেবারেই অনুচিত, বাবা এতে গভীর আঘাত পান। সেবার শীতে বাবা প্রচুর জুয়া খেললেন, শেষের দিকে হারলেনও একটা মোটা অঙ্ক ; অন্যান্যবারের মতই এবারেও হারের খবরটা পরিবারের কাছে চেপেই রাখলেন, কারণ সংসারের সঙ্গে উনি খেলাটা জড়াতে চান না। আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না কেবলি স্বার্থত্যাগ করেন ; মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লেও আর শীতের শেষের দিকে সন্তানসম্ভবা হলেও উনি ধীরেসুস্থে হেলতেদুলতে প্রতিদিন দরজা পর্যন্ত যেতেন বাবাকে এগিয়ে আনতে, এটাকে তার নিতান্তই কর্তব্য বলে মনে করতেন—ভোর চারটে

পাঁচটায় বাবা যখন ক্লাব থেকে ফিরতেন, কোনো কোনোদিন মোটা হারের ফলে ক্লান্ত ও লজ্জিত হয়ে।

অন্যমনস্কভাবে কথায় কথায় বাবাকে জিজ্ঞেস করেন আজ খেলায় জিতেছেন কিনা। বাবা ওর ক্লাবের খবর সব বলেন আর সেই সঙ্গে হাজারবার-করা অনুরোধটা আবার করেন, উনি যেন বাবার জন্য রাত জেগে বসে না থাকেন— আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে নাড়তে শোনেন। যদিও বাবার হারজিত, যার ওপর বাবার সম্পত্তি নির্ভর করছে, সে সম্বন্ধে ওঁর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না, তবুও প্রতি রাত্রেই ক্লাব থেকে ফিরলে ওঁর সঙ্গেই সর্বপ্রথমে বাবার দেখা হত। বাবার জন্য এই জেগে বসে থাকার পেছনে শুধুমাত্র স্বার্থত্যাগের প্রেরণাই নয়, আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল—সেটা হচ্ছে একটা চাপা ঈর্ষার ভাব, যার ফলে উনি সব সময় কষ্ট পেতেন। পৃথিবীতে কেউই বোধ হয় ওঁকে এ-কথাটা বিশ্বাস করাতে পারতেন না—বাবা এত দেরিতে ফিরছেন ক্লাব থেকে, কোনো মেয়েমানুষের কাছ থেকে নয়। বাবার মুখচোখ থেকে উনি তাঁর প্রেম রহস্য বার করতে চাইতেন, কিন্তু কিছুই খুঁজে পেতেন না, তখন আর কি করবেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের দুঃখের কল্পনায় ডুবে যেতেন।

এই সব ও আরও নানা স্বার্থত্যাগের ফল দাঁড়াল এই যে সেবার শীতের শেষের দিকে যখন বাবা খেলায় ঘন ঘন হারতেন আর তার ফলে অতিমাত্রায় বিশ্রী মনমেজাজে থাকতেন, তখন থেকে মনের গহনে স্ত্রীকে তিনি ঘৃণা করতে শুরু করলেন, বাইরে যদিও তার বিশেষ কিছু প্রকাশ ছিল না।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়

নতুন বন্ধুর দল

শীতটা উড়ে চলে গেল ; বরফ গলতে শুরু করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই পরীক্ষার তালিকা টাঙিয়ে দিয়েছে—হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে আঠারটা বিষয় নিয়ে ক্লাসে বক্তৃতা হয়েছে, অথচ আমি তার একটাও শুনিনি, লিখিনি বা তৈরি করিনি—সেই সবকটা বিষয়ে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। কি আশ্চর্য, নিতান্তই একটা সহজ সরল প্রশ্ন "কি করে পরীক্ষায় পাস করব ?" এ প্রশ্নটা একটিবারের জন্যও আমার মনে জাগেনি ! গোটা শীতকালটাই কেটে গেল 'তানানানা' করে, আমি সাবালক হয়েছি সেই আনন্দে আর ঠিক "হিসেবমতন" কি করে হওয়া যায় সেই চিন্তায়, পরীক্ষার চিন্তা মাথায় এলেই এইভাবে তুলনা করেছি আমার বন্ধুদের সঙ্গে, "ওরা সবাই পাস করবে কিন্তু তবুও ওরা কেউই ঠিক এখনও হিসেবমতন নয়। কাজেই আমার একটা গুণ বেশী, অতএব পাশ আমি নিশ্চয়ই করব।" ক্লাশে বক্তৃতা শুনতে যেতাম, শুধুই অভ্যেসের বশে, আর বাবা বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। তাছাড়া বন্ধুবান্ধব বিস্তর জুটেছিল, সময়টাও বেশ মজাতেই কাটত। বক্তৃতার হলে গোলমাল, হাসি-গল্প, কথাবার্তা শুনতে ভালবাসতাম, ভালবাসতাম, পেছনের বেঞ্চিতে বসে বসে বন্ধুবান্ধবদের লক্ষ্য করতে আর অধ্যাপকদের একঘেয়ে সুর শুনতে শুনতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে কোনকিছুর স্বপ্ন দেখতে। ভাল লাগত মাঝে মাঝে পালিয়ে চলে যেতে রেস্তোঁরায় একটু ভদ্‌কা পান করতে, সামান্য একটু খাবার খেতে ; তারপর দেরি করে আসার জন্য অধ্যাপকের বকুনি খাব বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে দরজা খুলে ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকতে। করিডরে চারপাশে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের লড়াই চলত—খুব মজা লাগত দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেতাম না।

ইতিমধ্যে ছাত্রেরা সবাই ক্লাশে নিয়মিত হাজিরা দিতে শুরু করেছে, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক তাঁর বক্তৃতা শেষ করে ফেলে পরীক্ষা পর্যন্ত ছুটি নিয়ে

চলে গেছেন। ছাত্রেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নোটখাতা যোগাড় করতে, নিজে তৈরি হতে। আমি নিজেও তৈরি হবার কথা ভাবতে লাগলাম। ওপেরভের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এসে ঠেকেছে: দেখা হলে একটা নমস্কার ঠোকায়—কিন্তু সে-ই এখন নিজে থেকে এগিয়ে এসে আমাকে নোটখাতা দিতে চাইল, শুধু তাই নয় ওদের কয়েকজনের সঙ্গে মিলেমিশে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে ডাকল। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে রাজী হলাম, এই সম্মানটুকু দেখিয়ে পূর্বেকার মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলতে চাইলাম বলে। কেবল বললাম আমার বাড়িতেই সবসময় আমরা জুটব, কারণ চমৎকার জায়গা আছে আমার।

ওরা জবাবে জানাল: ঠিক করা হয়েছে, সকলের বাড়িতেই ঘুরে-ফিরে যাওয়া হবে—আজ হয়তো একজনের বাড়িতে, কাল হয়তো আরেকজনের, যেটা কাছাকাছি হয়। প্রথম দিন বসা হল জুখিনের বাড়িতে। ত্রাব্‌নি বুলেভারে মস্ত একটা বাড়িতে পার্টিশানের আড়ালে ছোট একটা ঘর। আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল প্রথম দিনটায়, যখন পৌঁছলাম ওরা শুরু করে দিয়েছে। জুখিন যে কড়া তামাক ব্যবহার করে, তার ধোঁয়ায় কামরাটা ধোঁয়াকার। টেবিলের ওপর ভদ্‌কার একটা চৌকো বোতল, গ্লাস, নুন আর একটা মাংসের হাড়।

জুখিন চেয়ারে বসে বসেই আমায় অভ্যর্থনা জানাল, কোটটা খুলে ফেলে এক গ্লাস ভদ্‌কা নিতে আমন্ত্রণ জানাল।

"আমার মনে হয় ঠিক এ-ধরনের অতিথি-সৎকারে বোধহয় তুমি ঠিক অভ্যস্ত নও।" সে যোগ দিল।

সকলের গায়েই একটা করে নোংরা ক্যালিকো শার্ট। আমাকে নাকউঁচু মনে না করতে পারে তাই আমিও কোটটা খুলে ফেলে সোফায় ওদের পাশে হেলান দিলাম। জুখিন জোরে জোরে পড়তে থাকে, মাঝে মাঝে থেমে নোটবইগুলো দেখে নেয়, অন্যেরা থামিয়ে প্রশ্ন করলে তার সোজাসুজি, সংক্ষিপ্ত, ঠিকঠিক জবাব দেয়। খানিকটা চুপচাপ বসে শুনলাম, কিন্তু আগে কি হয়ে গেছে না জানা থাকায় বিশেষ কিছু বুঝতে পারছিলাম না, তাই একটা প্রশ্ন করলাম।

"তুমি যদি ওটাই না জান, তবে আর এখন শুনে কোনো লাভ হবে না, বুঝলে হে বন্ধু", জুখিন বলে, "তার চাইতে নোটখাতাগুলো দিয়ে দেব কালকের ভেতর পড়ে ফেলো।"

খুব লজ্জা পেলাম, দেখলাম জুখিনের কথাটা খুবই খাঁটি। অতএব এবার থেকে শোনা বন্ধ করে বসে বসে নতুন পরিচিত বন্ধুদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। আমার ধারণা অনুযায়ী কারা 'হিসেবমতন', কারা নয়—সে বিচারে এরা নিশ্চিত দ্বিতীয় দলে পড়ে ; এতে ওদের ওপর শুধু একটা বিরূপভাবই নয়, ব্যক্তিগত একটা আক্রোশের ভাবও জন্মাল—ওরা ঠিক 'হিসেব মতন' নয়, তবুও ওরা কিনা আমাকে ওদের সমান তো মনে করছেই না, উপরন্তু ভালমানুষীর সঙ্গে মিশিয়ে একটা পিঠ-চাপড়ানোর ভাব দেখাচ্ছে ! ওদের সবকিছু থেকেই আমার মনে এই ধারণা জন্মাচ্ছে—ওদের পা, ওদের নোংরা হাত, তাতে কামড়ান নখ, ওপেরভের ছোট হাতে একটা মস্ত লম্বা নখ, ওদের গোলাপী শার্ট, সামনের দিকে-পরা চামড়ার জ্যাকেট, যে ঘনিষ্ঠতাসূচক ভাষায় ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে, নোংরা ঘরটা, জুখিনের মাঝে মাঝে হাঁচার অভ্যেস, একটা নাক আঙুল দিয়ে টিপে ধরে, কতকগুলো শব্দকে জোর দিয়ে বলা, সেগুলো আমার কাছে নিতান্তই পুঁথিগত আর ঠিক ভদ্রজনোচিত নয় বলে ঠেকছে, এসব থেকে। সবচেয়ে বেশী অপ্রসন্ন হচ্ছিলাম কতকগুলো রুশ আর বিশেষ করে কয়েকটা বিদেশী শব্দের ওপর ওদের বিশেষ জোর দিয়ে বলার অভ্যেস দেখে।

যদিও ওদের বাইরেটা দেখে আমার বিরক্তির আর সীমা ছিল না তবুও ওদের ভিতর কি যেন একটা জিনিস ভারী ভাল লাগল আমার। ওরা কি সুন্দর হাসিখুশী, সহজ, মিশুকে, নিজেদের মধ্যে কি চমৎকার বন্ধুত্ব—একটু ঈর্ষার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় করতে ইচ্ছুক হলাম। আমার পক্ষে অবশ্য তা কিছুমাত্র শক্ত নয়। ভদ্র কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ ওপেরভের সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। এখন দেখলাম খুব সাহসী বুদ্ধিদীপ্ত জুখিনকে, ওই এই চক্রের মধ্যমণি—আমার খুবই ভাল লাগল ওকে। ছোটখাটো, গোলগাল, রং ময়লা, একটু ফুলোফুলো কিন্তু সব সময় বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, সতেজ হাসিখুশী মুখখানা। মুখের এই বিশেষ ভাবটির মূলে আছে ওর কপাল, বেশী উঁচু নয় কিন্তু ঘন কালো চোখদুটির ওপরে অর্ধচন্দ্রাকার, ছোট ছোট ফুরফুরে চুল, আর ঘন কালো চাপদাড়ি দেখলে মনে হয় কখনো বোধহয় কামায় না। ও নিজের সম্বন্ধে কখনো কিছু ভাবে বলে মনে হয় না (এই গুণটিকে আমার ভীষণ পছন্দ) তাহলেও এটা বেশ বোঝা যায় যে ওর মন কখনো ফাঁকা থাকে না। এক ধরনের মুখের ভাব আছে যা তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সামান্য কয়েক ঘণ্টা পরেই হয়তো হঠাৎ একেবারে আমূল বদলে যায় তোমার চোখে,—জুখিনের মুখ হচ্ছে সেই জাতীয়।

হঠাৎ ওর সারামুখে চিন্তার বলীরেখা ফুটে ওঠে, চোখ দুটো যেন আরও বসে যায়—হাসিটা বদলে যায়, মুখখানার এতই পরিবর্তন ঘটে যেন চিনতেই পারা যায় না।

কাজ শেষ হয়ে যেতে, জুখিন, অন্যান্য ছাত্রেরা আর আমি সবাই এক এক গ্লাস করে ভদ্‌কা খেলাম অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বচক—বোতলে আর বিশেষ কিছু পড়ে থাকল না। জুখিন জিজ্ঞেস করল কারুর কাছে একটা কোয়ার্টার-রুবলের নোট আছে কিনা তাহলে তাই দিয়ে ঝিকে পাঠাবে আর এক বোতল ভদ্‌কা আনতে। আমি টাকা দিতে চাইলাম কিন্তু জুখিন যেন শুনতে পায়নি এইভাবে ওপেরভের দিকে মুখ ফেরাল, ওপেরভ তার কড়ির ব্যাগ খুলে টাকা বার করে দিল।

"দেখো যেন আবার বেশী খেয়ে ফেলো না।" ওপেরভ বলে, ও নিজে একফোঁটাও খায়নি।

"না, তা মনে হয় না", এক টুকরো ভেড়ার হাড়ের ভেতরকার মজ্জা চুষতে চুষতে জবাব দেয় (মনে পড়ে সে সময় ভাবছিলাম, হাড়ের ভিতরটা খায় বলেই বোধহয় এত চালাক), "তা করা উচিত নয়," ধূর্তামি মেশানো একটু মুচকি হাসি হাসে বলে ঐ হাসিটুকু কারুরই নজর এড়াতে পারে না আর লোকে তার জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করে। "আর যদি করি তাতেই বা ক্ষতি কি ? এখন আমি ঐ শুকনো মুখওয়ালা যে কারুর সঙ্গে বাজী রাখতে পারি। সবজিনিসটাই ইতিমধ্যে এইখানে চলে গেছে", গর্ব ভরে মাথায় দুটো টোকা মারে, "কিন্তু সেমেনভ নির্ঘাৎ ফেল করবে, যেভাবে সমানে চালাচ্ছে।"

সত্যিসত্যিই সেই পাকাচুলওয়ালা সেমেনভ পরীক্ষার সেই প্রথম দিনে যার ওপর আমি খুব খুশী হয়েছিলাম আমার চাইতেও খারাপ পোশাক পরেছিল বলে, পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়ে প্রথম মাসটায় নিয়মিতভাবে ক্লাশে যেত, সে নাকি এমন ভয়ঙ্করভাবে মদ খেতে শুরু করেছে যে প্রথম বছরের শেষের দিকে তার আর চুলের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

"সে এখন কোথায় ?" একজন জিজ্ঞেস করে।

"আজকাল আর দেখাই হয় না," জুখিন বলে চলে, "শেষ যেদিন দেখা হয়, লিস্‌বনে সেদিন একটা রাত কাটিয়েছিলাম বটে! চমৎকার লেগেছিল। লোকে বলে তারপর নাকি কোথায় একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে। ঐ একটি মানুষ বটে! ভেতরে কি আগুন! কি মন! ও যদি কোনো বিপদে পড়ে,

তবে সেটা খুবই দুঃখের হবে। কিন্তু পড়বে ও ঠিকই। বিশ্ববিদ্যালয়ে চুপচাপ বসে থাকার পাত্রই নয় সে!"

আরও একটু কথাবার্তা বলে সবাই উঠে পড়লাম; জুখিনের বাড়িটাই সবচাইতে কাছে—কাজেই ওর বাড়িতেই আসছে কয়েকদিনই আমরা জুটব ঠিক করে সবাই যখন আঙ্গিনায় নামলাম, দেখি, দলের মধ্যে একমাত্র আমার জন্যেই ড্রসকি অপেক্ষা করছে, একটু লজ্জা পেয়ে ওপেরভকে অনুরোধ করলাম আমার গাড়িতে আসতে, পৌঁছে দেব। জুখিনও আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, ওপেরভের কাছ থেকে একটা রুবল ধার করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফুর্তি করতে চলে গেল। গাড়িতে চলতে চলতে ওপেরভ জুখিনের সম্বন্ধে অনেক কথা বলল, ওর চরিত্র, ওর জীবনযাত্রা ইত্যাদি। বাড়িতে পৌঁছে বহুক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না, এই সব নব-পরিচিতদের কথাই কেবল মনে ঘুরেফিরে বেড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে জেগে জেগে শুয়ে থেকে আমার মন বিপরীত দুটো ভাব-তরঙ্গে কেবলি দুলতে থাকে—একটা হচ্ছে এদের বিদ্যে-বুদ্ধি, সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার, সততা, সরলতা, সাহস আর কাব্যধর্মী যৌবনের প্রতি এক শ্রদ্ধা; আরেকটা হচ্ছে এদের বাইরেকার অমার্জিত ভাবভঙ্গীর প্রতি একটা অশ্রদ্ধা। শত ইচ্ছে সত্ত্বেও সে সময়ে ওদের সঙ্গে মিশে যাওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার কাছে জীবনের কত মানে, তার আকর্ষণের কত রূপ, রস, গন্ধ, ওদের সে সম্বন্ধে ক্ষীণতম ধারণাও নেই। কথাটা দুদিক থেকেই সত্যি। কিন্তু আমাদের না মেলবার মূল কারণ হচ্ছে আমার কুড়ি রুবল দামের কাপড়ের কোট, আমার ড্রসকি আর আমার সুন্দর শার্ট। পোশাক-পরিচ্ছদে আমার অর্থের সাক্ষ্য বহন করে আমি যেন ওদের অপমান করছি। ওদের কাছে আমি নিজেকে অপরাধী বোধ করি, ওদের সঙ্গে সমান বন্ধুত্বের ধাপে কখনও পৌঁছতে পারি না; প্রথমে নিজেকে নত করি, তারপর অকারণে অযোগ্যের কাছে নিজেকে ছোট করেছি মনে করে নিজের মনে গজরাই। তবুও যৌবনের অফুরন্ত প্রাণধারায় উচ্ছল জুখিন আমাকে সে সময় এতটা মুগ্ধ করেছিল যে সাময়িকভাবে ওর চরিত্রের রুক্ষ, কঠিন অমার্জিত, অসংস্কৃত দিকটা আমার চোখে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় জুখিনের ওখানে যেতাম পড়াশুনা করতে। পড়তাম খুবই কম, কারণ আগেই বলেছি, আমি প্রথমেই পিছিয়ে পড়েছি, তারপর একা একা পাছে ওদের সঙ্গ নেবার মত যথেষ্ট উৎসাহ না

পাই—তাই ওখানে বসে বসে ওদের পড়া শোনবার আর বোঝবার ভান করতাম মাত্র। মনে হত আমার সঙ্গীরাও ছলনাটা ধরে ফেলেছিল—কারণ, দেখতাম সে সব জায়গাগুলো ওদের জানা সেগুলো না পড়েই উল্টে চলে যেত, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করত না।

এই চক্রের বিশৃঙ্খলতার প্রতি আমার বিরূপতা একটু একটু করে কমতে থাকে। ক্রমেই বেশী আকৃষ্ট হই এর দিকে—এই চক্রের যা-কিছু সুন্দর শোভন, কাব্যিক আছে তার দিকে। কেবল দ্মিত্রিকে আমি যে কথা দিয়েছিলাম ওদের সঙ্গে কোথাও পানোৎসবে যাব না, সেটাই শুধু ওদের আনন্দের ভাগ নিতে আমাকে বাধা দিত।

একদিন মনে হল ওদের কাছে আমার সাহিত্য—বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে দেওয়া যাক—অতএব আলোচনাটা সেই খাতেই চালালাম। বিস্মিত হয়ে দেখি, যদিও বিদেশী বইয়ের নামগুলো ওরা আমাদের রুশ ঢঙে উচ্চারণ করছে, কিন্তু আসলে বিদেশী সাহিত্য ওরা পড়েছে আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশী, ইংরেজী—এমনকি স্পেনীয় লেখকদের কদর পর্যন্ত জানে, একজন লেখকের নাম করল "লিসেজ", আমি তার নামটাও কখনো শুনিনি। পুশকিন, জুকোভ্স্কির পুরো সাহিত্য ওদের জানা (আমার মত ছোটবেলায়-পড়া হলুদ রঙের বাঁধানো ছোট ছোট বই নয়); ডুমা, সু, ফেবেলকে ওরা সমানতালে অবজ্ঞা করে, ওদের বিশেষ করে জুখিনের সাহিত্যবিচার আমার চাইতে অনেক বেশী ভাল ও সুস্পষ্ট—সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। আমার বিস্ময় আর সীমা মানে না যখন দেখি ওপেরভ বাঁশি বাজায়, দলের আরেকজন বাজায় সেলো আর পিয়ানো,—দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্কেস্ট্রা পার্টির বাজিয়ে, গানবাজনা খুব ভাল জানে, খুব কদরও করে। এক কথায় ফরাসী আর জার্মান উচ্চারণ-ভঙ্গী ছাড়া ওরা সব কিছু জানে, যা যা আমি ওদের কাছে জাহির করতে চেয়েছিলাম, বরঞ্চ আমার চাইতে ভালই জানে। আর তার জন্যে ওদের মনে কোনো গর্বও নেই। নিজেকে একজন বাস্তবমুখী লোক বলে দম্ভ করতে পারতাম, কিন্তু ভলোদিয়ার মত আমি তাও ছিলাম না। তাহলে কোথায় আমার সেই উঁচু আসনটি যাতে বসে নীচে এদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলাম? প্রিন্স ইভান ইভানিচের সঙ্গে আমার সম্পর্ক? আমার ফরাসী উচ্চারণ? দ্রস্‌কি? আমার দামী কাপড়ের শার্ট? আঙুলের নখ? এগুলো সব একেবারেই বাজে নয় কি? আমার সামনে যে বন্ধুত্ব আর আনন্দের স্রোত

বইতে দেখতাম তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার মাথায় এইসব চিন্তাগুলো মাঝে মাঝে ঝলসে উঠত। ওরা সকলে পরস্পরকে "তুমি" বলত। ওদের ব্যবহারিক সরলতা প্রায় অভব্যতার সীমায় পৌছত। কিন্তু ওদের বাইরের কর্কশ ভাবও একথা গোপন করতে পারত না যে ওরা একে অন্যকে আঘাত করতে ভয় পায়। ওদের মুখে হরদম স্নেহের স্বরে উচ্চারিত "হতভাগা", "শুয়োর" প্রভৃতি ডাকগুলো শুনে আমি একটু কুঁকড়ে যেতাম, মনে মনে ওদের ব্যঙ্গ করতাম। ওদের কাছে এসব শব্দগুলো কিছুই নয়, এতে ওদের বন্ধুত্ব বিন্দুমাত্র চিড় খায় না। ওরা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করে খুব হিসেব করে—অতি দরিদ্র আর তরুণেরাই একমাত্র যে কাজ করে থাকে। আসল কথা, জুখিনের চরিত্রে আর তার লিসবনের এ্যাড্‌ভেঞ্চারে আমি একটা উদারতা আর উদ্দামতার গন্ধ পেতাম। আমার একটা সন্দেহ ছিল, ওর এই পানোৎসবগুলো ব্যারন জেডের বাড়িতে আমি যা দেখেছিলাম, সেই রাম আর শ্যাম্পেন একসঙ্গে জ্বালিয়ে হৈ-হুল্লোড় করা তার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

জুখিন ও সেমেনভ

জুখিন সমাজের কোন স্তরের লোক ছিল তা আমি জানতাম না, জানি না, তবে এটুকু জানি ও এস, জিম্‌নাসিয়াম দলের ছেলে, পকেটে একটাও পয়সা নেই, আর দেখে মনে হত খুব ভাল ঘরে জন্ম নয়। সে সময় ওর বয়স আঠারো, দেখতে অবশ্য অনেকটা বেশী মনে হত। খুব চালাক, খুব তাড়াতাড়ি যে-কোনো কথা ধরে নিতে ওস্তাদ। কোনো একটা বিষয়ের যতগুলো শাখা-প্রশাখা আছে, তাদের প্রত্যেকটিকে অনুসরণ করলে যে-সব সিদ্ধান্তে পৌছনো যায়, তার সবগুলোকেই ও একসঙ্গে বুঝতে পারে। ও নিজে জানে যে ও খুব চালাক; তাই নিয়ে মনে ওর গর্ব আছে আর এই গর্বের ফলে বাইরের লোকের সঙ্গে ওর ব্যবহারটা খুবই সরল আর ভদ্র। জীবনে নিশ্চয় ও অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছে। ওর সংবেদনশীল অন্তরের উষ্ণতায় ইতিমধ্যেই নানা বিষয় নিয়ে চিন্তার আলোড়ন জাগত—প্রেম, বন্ধুত্ব, ব্যবসা, অর্থ ইত্যাদি। বাইরে থেকে মনে হত যে-কোনো নতুন জিনিসকেই ও গ্রহণ করে বোধহয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরে তাই নিয়ে ব্যঙ্গ করতে—ওর দক্ষ মন সহজেই সব কিছুকে গ্রহণ করতে পারত, তাই বোধহয় ওর প্রতিভা ছিল। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক এক কথাই খাটত: ও পড়ত কম, কোনো নোট নিত না, তবুও অঙ্কশাস্ত্রটা জানত খুব ভাল, যখন বলত অধ্যাপকদের ও হারাতে পারে, সেটা ওর অসার দম্ভ ছিল না। ওর ধারণা ওঁরা যা পড়ান তার অনেকটাই একেবারে বাজে কিন্তু তবুও ওর বাস্তব-বুদ্ধি আর দুষ্টুমি-বুদ্ধিতে অধ্যাপকেরা ঠিক যেমনটি চান ঠিক তেমনটি হয়ে থাকত, সব কজন অধ্যাপকই ওকে পছন্দ করতেন। কর্তৃপক্ষের কাছে খোলাখুলিই সব কথা বলত তবুও তাঁরা ওকে সমীহ করতেন। বিজ্ঞানের প্রতি ওর শ্রদ্ধাও ছিল না, ভালবাসাও ছিল না। শুধু তাই নয়, যে জিনিস ওর খুব সহজে আসে তাই নিয়ে যারা খেটে মরে তাদের সম্বন্ধে ওর মনে অশ্রদ্ধার ভাব। ওর মতে বিজ্ঞানে ওর বিদ্যেবুদ্ধির দশভাগের এক ভাগেরও দরকার হয় না; ছাত্র হিসেবে

ও যে জগতে বাস করে সেখানে এমন কোনো বিষয়ই নেই যাতে ও পুরো মাথাটা খাটাতে পারে; কিন্তু ওর মনের আগুন খোঁজে জীবন, তাই যথাসম্ভব আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়েই ও চলত।

এখন পরীক্ষার আগে ওপেরভের ভবিষ্যৎবাণীই সফল হল। কয়েক সপ্তাহের জন্যে ও উধাও হল, আমরা আরেকজন ছাত্রের ঘরে বসে পড়াশুনা করলাম। কিন্তু প্রথম পরীক্ষার দিন হলে ওর দেখা মিলল, ফ্যাকাসে উস্কোখুস্কো চেহারা, হাত কাঁপছে, কিন্তু যথারীতি খুব ভাল ফল করে দ্বিতীয় কোর্সে উঠে গেল।

কোর্সের প্রথম দিকে পানোৎসবে যোগদানকারীদের মধ্যে আটজন ছিল, জুখিন ছিল নেতা। ইকোনিন আর সেমেনভও প্রথমদিকটায় ওদের দলে ছিল। বছরের প্রথমদিকে ওরা দুর্নীতিতে আর অপব্যয়ে একেবারে মেতে উঠল, তাই দেখে প্রথমজন ওদের দল ছাড়ল; দ্বিতীয়জন ছাড়ল কারণ ওদের এই সব উৎসব তার কাছে নিতান্তই জলো। প্রথম প্রথম আমাদের ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা ওদের এই দলটার দিকে ভীতনেত্রে তাকাত, নিজেদের মধ্যে ওদের সব বদখেয়াল নিয়ে আলোচনা করত।

প্রধান নায়ক ছিল জুখিন আর বছরের শেষের দিকে সেমেনভ। সেমেনভ সম্বন্ধে সকলের যেন একটা আতঙ্ক ছিল, যদি কোনোদিন ও ক্লাসে বক্তৃতা শুনতে আসত—তা ঘটত কচিৎ—তবে গোটা ঘরটায় একটা চাপা কোলাহল পড়ে যেত।

সেমেনভ তার মত্ততার খেলায় দাঁড়ি টানল পরীক্ষার ঠিক আগে। সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে, আমার নিজের চোখেই তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল—সেজন্য জুখিনের সঙ্গে আমার পরিচয়কে ধন্যবাদ। যা ঘটেছিল তা এই: একদিন সন্ধ্যায় জুখিনের বাড়িতে সবাই জড়ো হয়েছি, বাতিদানে মোমবাতি ছাড়াও একটা বোতলে আরেকটা বাতি সাজিয়ে নিয়ে ওপেরভ সবে তার পদার্থবিদ্যার নোট-খাতাখানার ওপর ঝুঁকে পড়ে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় পড়তে শুরু করবে এমন সময় গৃহকর্ত্রী ঘরে ঢুকে জুখিনকে জানালেন বাইরে কে যেন একটা চিঠি নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

জুখিন বেরিয়ে গেল, একটু পরেই ফিরে এল, মাথা নীচু, মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। বাদামী রঙের মলাটের কাগজে লেখা একখানা চিঠি আর দুটো দশ রুবলের ব্যাঙ্ক-নোট হাতে।

"বন্ধুগণ, একটা অদ্ভুত খবর আছে তোমাদের জন্যে।" জুখিন মাথা তুলে

আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীর স্বরে বলে: "ছাত্র পড়াবার টাকা পেয়েছ ?" ওপেরভ্ নোটবইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলে, "এস হে, শুরু করা যাক্।" আরেকজন বলে, "না হে, আমার টাকা নয়।" জুখিন সেই একইরকম গলার স্বরে বলে, "বললাম না তোমাদের একটি চমকপ্রদ খবর আছে। সেমেনভ্ একজন সৈন্যকে দিয়ে এই কুড়ি রুবল পাঠিয়েছে: কবে যেন একদিন ধার করেছিল আমার কাছে সেটা শোধ দিতে আর লিখেছে যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই তো যেন ব্যারাকে যাই। তার মানে বুঝলে ?" জুখিন পর্যায়ক্রমে আমাদের সকলের দিকে একবার করে তাকায়। আমরা কেউ কোনো জবাব দিই না। "আমি সোজা যাচ্ছি ওর ওখানে", জুখিন বলতে থাকে: "তোমরা যদি চাও তো এস।" সবাই তক্ষুনি উঠে পড়ে যে যার কোট নিয়ে তৈরি হলাম। "সবাই মিলে যাওয়াটা একটু কেমন কেমন ঠেকবে না ?" ওপেরভ্ তার বাঁশির মত সরু গলায় বলে, "যেন কি একটা দ্রষ্টব্য বস্তু দেখতে যাচ্ছি সবাই মিলে ?" আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম বিশেষ করে সেমেনভের সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই সামান্য তাই কিন্তু তাহলেও এদের দলের একজন বলে গণ্য হবার ব্যগ্রতায় আর তাছাড়া সেমেনভকে দেখতেও একটু উৎসুক ছিলাম, অতএব আমি কোনো মন্তব্য করলাম না।

"বাজে কথা।" জুখিন বলে, "একজন বন্ধুকে বিদায় দিতে যাব, তার আবার কেমন কেমন কি ? সে কোথায়, তাতে কি আসে যায় ? যদি ইচ্ছে থাকে, তবে চলে এস, তাতে কিছু আসে যায় না।"

কয়েকটি গাড়ি ভাড়া করে পত্রবাহক সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা হলাম। ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রথমে আমাদের ব্যারাকে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু জুখিন তার সঙ্গে একটু ফিস্‌ফাস্ করার পরে সেই পত্রবাহক লোকটি আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল, ঘরে কয়েকটা ছোট ছোট আলো জ্বলছে, সব মিলিয়ে একটা আলো-আঁধারি ভাব। দুপাশে বাঙ্ক; তাতে শুয়ে বসে আছে নতুন নাম-লেখা সৈন্যের দল, মস্ত মস্ত ধূসর রঙের ওভারকোট গায়ে, সকলেরই মাথার সামনের দিকটা কামানো। ব্যারাকে ঢুকতেই মনে হল কি অসহ্য গুমোট, আর সামান্য জায়গায় জড়াজড়ি করে থাকা কয়েক শ মানুষের কি প্রচণ্ড নাকের ডাক ! দুপাশে বাঙ্কের ভেতর দিয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক আর জুখিন বেশ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা ওদের পিছু পিছু চলেছি। স্বল্প আলোয় আধশোয়া মূর্তিগুলো দেখে আমার গাটা যেন একবার ছমছম করে

উঠল, মনে মনে এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম সেমেনভের চেহারাটা— সেই সদাক্লান্ত মুখ লম্বা লম্বা, প্রায় পেকে-যাওয়া চুল, ফ্যাকাসে ঠোঁট আর উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটির গভীর চাউনি। চলতে চলতে প্রায় শেষ প্রান্তে পৌছলাম, কালো তেল-ভর্তি একটা মাটির পাত্রে একটাবাতি প্রায় নিবু নিবু হয়ে এসেছে, সেখানে এসে জুখিন তার গতি বাড়িয়ে দিল, তারপর একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"এই যে সেমেনভ্", বাঙ্কের ওপর-বসা অন্যদের মতনই মাথার সামনের দিকটা কামানো মোটা জামা গায়ে, মস্ত একটা ধূসর রঙের ওভারকোট কাঁধে ঝোলান একজন সৈনিককে লক্ষ্য করে জুখিন বলে। ওর মুখের ভাব যথারীতি গম্ভীর কিন্তু উৎসাহব্যঞ্জক। আমার চাউনিতে ও অসন্তুষ্ট হতে পারে তাই আমি একটু পাশে সরে গেলাম। ওপেরভেরও মনের অবস্থাও বোধ হয়, ঠিক তাই, তাই সেও পিছিয়ে থাকল। যাইহোক, সেমেনভ্ যখন তার অভ্যস্ত গলায় জুখিন ও আর সবাইকে স্বাগত জানাল, তখন আমরা ভরসা ফিরে পেয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, ওপেরভও তার কাঠের মত শক্ত হাতখানা বাড়িয়ে দিল কিন্তু সেমেনভ্ যেন আগে থেকে বুঝতে পেরে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্যই ওর মস্তবড় মলিন হাতখানা আমাদের দিকে বাড়িয়ে ধরল। "এই যে জুখিন। আসার জন্যে ধন্যবাদ। আসুন, সবাই বসে পড়ুন। কুদ্রাশকা, তুমি এখন যাও", একজন নতুন সৈন্যের সঙ্গে ও খেতে খেতে কথা বলছিল, তাকে এবার বলল, "আমাদের কথাবার্তা পরে শেষ করব'খন। এস, বসা যাক। তারপর জুখিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে, না?" "তোমার কোনো ব্যাপারেই আমি কখনও অবাক হই না", জুখিন বাঙ্কে ওর পাশে বসে পড়ল, মুখের ভাবখানা ঠিক যেন একজন ডাক্তার তার রোগীর পাশে বসেছে। "আমি আরও বেশী অবাক হতাম যদি তুমি ঠিকঠাক পরীক্ষা দিতে। নাও, এবার বল তো, তুমি কোথায় গিয়েছিলে আর এসব কি করে ঘটল?" "কোথায়?" ও বেশ ভরাট গলায় জোরের সঙ্গে বলতে থাকে, "এই হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি নানা জায়গায়। কই হে, সব বস তোমরা, যথেষ্ট জায়গা আছে। এই, পাটা সরাও তো তোমরা।" হঠাৎ আধো অন্ধকারে এক সারি দাঁতের ঝিলিক মেরে ও চেঁচিয়ে উঠল, ওর বাঁপাশে শোয়া সৈনিকটিকে লক্ষ্য করে, সে হাতের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে শুয়ে কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দেখছিল। মদের আসরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল অবশ্য। খুব বিশ্রী, আবার খুব ভালও। প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের ভাব পরিবর্তন ঘটতে থাকে, "সে ব্যবসায়ীর কথা শুনেছ

তো ? বদমাসটা মরে গেল। ব্যাস্, তারপরে আর কি যা টাকাপয়সা ছিল সব দুহাতে ছড়ালাম। সেখানেই শেষ নয়—দেনায় একেবারে ডুবে গেলাম। বিচ্ছিরিরকম সব দেনা ; শোধ করবার কোনই উপায় নেই। ব্যাস্, আর কি।

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু এখানে ঢোকবার মতলবটা মাথায় ঢুকল কি করে ?"

"খুব সহজে। স্তোঝেনকাতে একটা আড্ডা ছিল, জান তো ! সঙ্গে থাকতাম যে, সে আগে বণিক ছিল এখন সে সৈন্যসংগ্রাহক। তাকে বললাম, এক হাজার রুবল দাও তো নাম লেখাই।" নাম লেখালাম। "কিন্তু দেখ, তুমি একজন ভদ্রলোক তো ?" জুখিল বলল, "সে কিছু নয়। ফিরিল ইভানোভ্ তার ব্যবস্থা করেছিল।" "কোন্ ফিরিল ইভানোভ্ ?" "ঐ যে, যে আমাকে কিনে নিয়েছিল (ওর চোখদুটো যেন একবার ঝলসে উঠল, মনে হল কথাটা বলতে গিয়ে বোধহয় একটু হাসল) সেনেট থেকে অনুমতি পেলাম। আরেকদিন আড্ডায় গেলাম, ধারটার সব শোধ করে দিলাম। তারপরে আর কি, সেইথেকে এখানে স্থিতি। তা খুব খারাপ নয়। কে বলতে পারে, একটা যুদ্ধও বেধে যেতে পারে।"

তারপর জুখিনকে ওর সব মজার, অবিশ্বাস্য এ্যাড্ভেঞ্চারের গল্প বলতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে ওর মুখের ভাব-পরিবর্তন ঘটে, চোখদুটো জ্বলজ্বল করে।

ব্যারাকে আর যখন থাকা চলে না, তখন সবাই বিদায় নিলাম। ও বসে বসেই আমাদের সঙ্গে হাত মেলাল, "আবার একসময় এসো সবাই। শুনছি মাসখানেক পরে নাকি আমাদের পাঠাবে।" আবার ওর মুখে সেই হাসির মতন একটু ভাব দেখা গেল, সেটা কেবল ওরই বিশেষত্ব। জুখিন কয়েক পা মাত্র গিয়েই আবার ফিরে তাকাল। ওদের বিদায়ের দৃশ্যটা দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল তাই সঙ্গে সঙ্গে আমিও থামলাম। দেখলাম জুখিন পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে সেমেনভের দিকে বাড়িয়ে ধরল, কিন্তু সে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর দেখলাম ওরা চুমু খাচ্ছে, এবার আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জুখিন একটু জোরগলায় বলে, "বিদায় বন্ধু। আমি বাজী ধরতে পারি, আমার পড়া শেষ হবার আগেই তুমি একটা অফিসার-টফিসার বনে যাবে। সেমেনভ্ সাধারণত বড় একটা হাসে না, এই কথার জবাবে সে হঠাৎ ভীষণ জোরে তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠল—আমি মনে একটা ধাক্কা খেলাম। আমরা বেরিয়ে এলাম।"

হেঁটে বাড়ি ফেরা হল। জুখিন একদম চুপচাপ, খালি হাঁচছে, একবার এই নাক টিপে ধরে, আরেকবার আরেক নাক। বাড়ি এসে পৌছতে ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল মদের একটা আড্ডায়, সেখানেই ও মজে ছিল পরীক্ষা পর্যন্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

ফেল

অবশেষে পরীক্ষার প্রথম দিন এল—ডিফারিন্সেল ও ইন্‌টিগ্রেল ক্যালকুলাসের পরীক্ষা—আমার মন তখনও দ্বিধান্বিত, কি যে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। সন্ধ্যেবেলা জুখিন আর তার বন্ধুবান্ধবদের দল থেকে ফিরে এসে মনে হত ওদের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা অর্থাৎ ওদের ভেতর বিশেষ অপ্রীতিকর কিছু একটা আছে, যেটা থাকা উচিত নয়—সে ধারণার একটু পরিবর্তন দরকার। আবার সকালবেলা নিজের রূপে ফিরে যেতাম, মনে হত, না, কোনো পরিবর্তনেরই দরকার নেই।

এইরকম মানসিক অবস্থা নিয়ে প্রথম দিন আমি পরীক্ষা দিতে গেলাম। একটা বেঞ্চিতে বসে প্রিন্স ব্যারন কাউন্টদের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলতে লাগলাম। আশ্চর্য যে এ কথাটা একবারও মনে হচ্ছিল না যে এক্ষুনি ডেকে আমাকে এমন একটা বিষয়ে প্রশ্ন করবে, যেটা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। দিব্বি বসে বসে তাদের দেখতে লাগলাম যারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, এমনকি কাউকে কাউকে নিয়ে একটু-আধটু মজাও করলাম।

"এই যে গ্রাপ!" ও টেবিল থেকে ফিরে এলে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি ভয় পেয়েছিলে?"

"দেখা যাবে, তোমার নিজের বেলায় কি হয়।" ইলেনকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার দিন থেকেই আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আমি কথা বললে হাসে না, খুব চটা আমার ওপরে।

ইলেনকার কথার জবাবে আমি অবজ্ঞার সঙ্গে একটু হাসলাম, যদিও ওর সন্দেহটা মুহূর্তের জন্য আমাকে ধাক্কা দিল। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য, তারপরেই আবার নির্বিকারভাবে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকলাম: এমনকি ব্যারন জেড্‌কে কথা দিলাম, আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাওয়া মাত্রই ওর সঙ্গে সেতার্নে গিয়ে লাঞ্চ খাব (যেন এটা একটা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার)।

ইকোনিনের সঙ্গে যখন আমার ডাক পড়ল ইউনিফর্মটা ঠিকঠাক করে নিয়ে, কোনো কিছু গ্রাহ্য করি না এমনি একটা ভাব নিয়ে পরীক্ষার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার পরীক্ষায় যে তরুণ অধ্যাপক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি যখন মুখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন আর আমি হাত বাড়িয়ে প্রশ্নপত্রখানা ধরলাম—হঠাৎ যেন একটা কনকনে ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। ইকোনিন সেই আগের বারের মতনই সারা শরীরটা দুলিয়ে প্রশ্নপত্র নিল, যাহোক-তাহোক করে জবাবও দিয়ে দিল, অবশ্য খুবই খারাপভাবে। আর আমি নিজে করলাম, ও প্রথমবারে যা করেছিল ঠিক তাই: না, তার চাইতেও খারাপ, কারণ আমি দ্বিতীয় একখানা টিকিটও তুললাম কিন্তু কোনোই জবাব দিলাম না। অধ্যাপক করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে তারপর বেশ শান্তভাবে কিন্তু কঠিন স্বরে বললেন:

"তুমি দ্বিতীয় কোর্সে উঠতে পারবে না মিঃ ইরতেনিয়েভ, অন্য পরীক্ষাগুলো তোমার না দেওয়াই ভাল। মিঃ ইকোনিন, তোমার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।"

ইকোনিন আবার পরীক্ষা দেবার অনুমতি চাইতে লাগল, যেন ভিক্ষে চাইছে। কিন্তু অধ্যাপক জবাব দিলেন পুরো এক বছরে সে যা শিখতে পারেনি দুদিনে তার কি হবে? ইকোনিন আবার নম্র করুণ স্বরে অনুমতি ভিক্ষে করল, কিন্তু তিনি এবার দৃঢ় স্বরে বললেন "তোমরা এবার যেতে পার।"

এতক্ষণে যেন আমি পায়ে বল ফিরে পেলাম, টেবিল ছেড়ে চলে এলাম। এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আমিও যেন ইকোনিনের ঐ হৃদয়ভিক্ষেতে যোগ দিয়েছিলাম, মনে করতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। কি করে যে হেঁটে ফিরে এলাম, সকলের প্রশ্নের জবাবে কি বললাম, পাশের ঘর পার হয়ে সোজা বাড়ি চলে এলাম, কিছুই জানি না। লজ্জা অপমান দুঃখের আর সীমা রইল না।

তিন দিন ঘর থেকে বেরোলাম না, কারও মুখ দেখলাম না। সেই ছোটবেলার মতন কান্নাতেই একমাত্র সান্ত্বনা পেলাম, কাজেই কদিন ধরে সমানে কাঁদলাম প্রাণ ভরে। একটা পিস্তলের খোঁজ করলাম যদি দরকার বুঝি দেব নিজেকে শেষ করে; মনে হল, ইলেন্‌কা গ্রাপের সঙ্গে এরপর দেখা হলে মুখে থুতু দেবে, ঠিকই করবে; ওপেরভ আমার দুর্ভাগ্যে খুশী হয়ে সবার

কাছে গল্প করে বেড়াবে। কলপিকভ্ ঠিকই করেছিল সেদিন আমাকে ইয়ারে অপমান করে। মনে পড়ল প্রিন্সেস করনাকোভার সঙ্গে নির্বোধের মত আজেবাজে সব কথাবার্তা বলেছি। জীবনে যতদিন দুঃখ পেয়েছি সব একে একে মনের পটে ছায়াছবির মত ভেসে যায়, আর সব কিছুর জন্য মনটা কারো না কারো ওপর দোষ চাপায়। ঠিক করলাম কেউ ইচ্ছে করেই এই কাজটি করেছে, আমার বিরুদ্ধে একটা মস্তবড় ষড়যন্ত্র স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সকলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করলাম, অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে বন্ধুবান্ধব, ভালোদিয়ার ওপর, দ্মিত্রির ওপর, বাবার ওপরে রাগ কেন আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন ; ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করলাম কেন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এই অপমান সহ্য করতে। শেষ পর্যন্ত এই কালো মুখ আর কাউকে দেখাতে পারব না বলে অশ্বারোহী সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্যে বাবার কাছে অনুমতি চাইলাম। ককেশাসে চলে যাব। বাবা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু আমার দুঃখের গভীরতা দেখে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। এতে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেনি, অন্য ফ্যাকালটিতে বদলী হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভলোদিয়ারও মত তাই, আমার একবার মাত্র ফেল করায় এমন কিছু অঘটন ঘটেনি। অন্য কোর্সের ছাত্রদের কাছে আমার অত লজ্জা পাবার কোনো কারণই নেই।

মেয়েরা কিছু জানেই না ব্যাপারখানা কি। বুঝতেই পারে না কিংবা চায় না—পরীক্ষা কি, ফেল করাই বা কাকে বলে, কেবল আমার দুঃখ দেখে সকলেরই খুব মন খারাপ।

দ্মিত্রি আমার সঙ্গে রোজ দেখা করতে আসত, চমৎকার নম্র, ভদ্র, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার কিন্তু আমার ওপর তার প্রতিক্রিয়া হল ঠিক উল্টো। ওর ভদ্র ব্যবহারেই ওর আন্তরিকতায় সন্দেহ জাগল মনে হল আমার সম্বন্ধে ওর আর কোনো উৎসাহ নেই। যখন রোজ রোজ আমার ঘরে এসে চুপচাপ আমার পাশে বসত ঠিক যেন একজন ডাক্তার তার একজন রুগীর পাশে বসেছে—আমার তখন অস্বস্তি লাগত, অপমানও বোধ হত। সোফিয়া ইভানোভনা আর ভারেনকা দ্মিত্রির হাত দিয়ে আমাকে বই পাঠাত, সেগুলো আমি আগে পড়তে চেয়েছিলাম, বলে পাঠাত আমি যেন ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু ওদের এই সদয় ব্যবহারের পেছনেও আমি আবিষ্কার করতাম যে নীচে পড়ে গেছে তার প্রতি একটা অপমান, অবজ্ঞা আর উদ্ধত মনোভাব। দিন তিনেক

পরে মনটা একটু শান্ত হল ; তাও গ্রামে রওনা হবার আগে পর্যন্ত আমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরোলাম না। নিজের দুঃখের ভিতরেই ডুবে থেকে লক্ষ্যহীন-ভাবে এ ঘরে সে ঘরে ঘুরে বেড়াতাম, চেষ্টা করতাম যাতে বাড়ির কারুর সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়।

বসে বসে খালি ভাবি আর ভাবি। সন্ধ্যের দিকে নীচে বসে আভ্‌দোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার 'ওয়াল্‌ট্‌স্‌ শুনছিলাম, হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে চলে গেলাম। সেই নোটখাতাখানা, যাতে "জীবনের নীতি" লেখা ছিল, সেখানা খুলে ধরতেই অনুতাপে, ক্ষোভে মনটা মুচড়ে উঠল। আমি কাঁদলাম কিন্তু সে অশ্রু হতাশার নয়। যা একটু ঠাণ্ডা হতে ঠিক করলাম জীবনের নীতি আবার লিখব। এবারে আমি স্থির নিশ্চয় জানি এরপর থেকে জীবনে কখনো অন্যায় করব না। একটি মুহূর্তও অলস কাটাব না, জীবনে কখনো নিয়ম থেকে বিচ্যুত হব না।

এই নিয়ম-নিষ্ঠার উৎসাহ বেশী দিন ছিল কিনা, আর কিই বা সেই নীতি যেগুলোর উপর নির্ভর করেছিলাম আমার মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য—যৌবনের আনন্দময় বাকি অংশটুকুতে সে কথা লিপিবদ্ধ করব।

সেপ্টেম্বর ২৪,

যাসনায়া পলিয়ানা